১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৪৫
প্রতি সংখ্যা
।৹

সম্পাদক :—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পরিচয়—মাঘ, ১৩৪৫

বিষয়-সূচী

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা
মাঘ, ১৩৪৫

পরিচয়

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

(৫।গ)

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছিলাম, 'ধর্মতত্ত্বে'র উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে তাহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। (ঈশ্বরের বৈদান্তিক নাম 'ব্রহ্ম') ঈশ্বরমুখতাই বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।' প্রথমেই লক্ষ্য করা উচিত, বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাত ধর্মতত্ত্বের কেন্দ্রে ব্রহ্ম বা জগদীশ্বর। তিনি ধর্মতত্ত্বের সপ্তম অধ্যায়ে শিষ্যকে বলিতেছেন—

> যদি বল, ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি,* কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি।†

বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্মতত্ত্ব কিরূপ বুঝিয়াছিলেন ?

---

* বঙ্কিমচন্দ্র নিজে পরকাল মানিতেন। তিনি ধর্মতত্ত্বের সপ্তম অধ্যায়ে শিষ্যকে বলিতেছেন—'তুমি পরকাল মান না মান, আমি মানি। * * ধর্ম নিত্য—ধর্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। * * ইহলোককে আমি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সৎবৃত্তিগুলি মার্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি (পরকালে) অনন্ত সুখের কারণ হইবে ; আর যে কেবল অসৎ বৃত্তিগুলি স্ফুরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ।

† বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে নাস্তিক ছিলেন। 'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম। তাহা হইতে হিন্দুধর্মে আমার মতিগতি অতি আশ্চর্য রকমের......'। (সাধনা—শ্রাবণ, ১৮৯৪)

ব্রহ্মতত্ত্ব অতিশয় দুরবগাহ—বুদ্ধদেবের ভাষায় 'সেয়্যথপি মহাসমুদ্দো'—কারণ, অজর অমর অক্ষর ব্রহ্ম নামরূপের অতীত, দেশ-কাল-নিমিত্তের দ্বারা অপরিচ্ছন্ন—বাক্য মন তাঁহার লাগ না পাইয়া হটিয়া আসে—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তিনি বচনের মননের লক্ষণের বহির্ভূত। তাঁহার সম্বন্ধে শেষ কথা এই—'যস্যামতং তস্য মতং'—যে জানে সে জানে না, যে না জানে সেই জানে।

যিনি ঐরূপ, তাঁর সম্পর্কে তর্কযুক্তির অবসর আছে কি? নৈষা তর্কেণ মতি রাপনেয়া, সেইজন্য তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।)।

অতএব ব্রহ্মসম্বন্ধে চরম প্রমাণ—অপরোক্ষ অনুভূতি—পাশ্চাত্য মিষ্টিকেরা যাহাকে 'temperamental reaction to the *vision* of Reality' বলেন। এইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—Religion is realisation, অর্থাৎ ধর্ম hearsay-এর ব্যাপার নয়—'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাম্' নয়—কিন্তু ধর্ম প্রত্যক্ষ, অপরোক্ষ অনুভূতি। যাঁহাদের ঐরূপ অপরোক্ষ অনুভূতি আছে, তাঁহাদের এ দেশীয় নাম ঋষি–ঋষি অর্থে দ্রষ্টা (Seer)। অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উত্তর দিবার অধিকারী পুরোহিত নয়, পৈগম্বর—priest নয়, prophet—যিনি ঋষিদিগের সহিত (তা' সে ঋষি যে দেশের, যে কালের হউন না কেন) সুর মিলাইয়া বলিতে পারেন—

বেদাহম্ এতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
জানিয়াছি আমি সেই পুরুষ মহান্
তমসের পারে যিনি, চির জ্যোতিষ্মান্।

লক্ষ্য করুন বঙ্কিমচন্দ্র যদিও শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি কোন দিন ঋষিত্বের অভিমান করেন নাই। তিনি বলিতেন—

"আমি সেই আর্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার একত্বই মুক্তি। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ঐ ব্রহ্মকে

জানিলেই মুক্তি লাভ হয়।' বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু অন্যত্র লিখিয়াছেন—'ভক্তিবাদী বলেন জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিষ আমরা জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? ব্রহ্ম অশরীরী—যিনি অশরীরী তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলে তবেই আমরা তাঁহাকে পাইব।'

এ ভক্তিমার্গীর কথা। জ্ঞানমার্গী বলিবেন, আমরা যে জানার কথা বলি, তাহা এরূপ জানা নহে, তাহা 'তত্ত্বতঃ' জানা। যিনি ব্রহ্মকে 'তত্ত্বতঃ' জানেন—অর্থাৎ realise করেন, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বুদ্ধিলব্ধ নয়—বোধিগ্রাহ্য অপরোক্ষ অনুভূতি—তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে তাঁহাকে পাইবেন বই কি! সেইজন্য গীতাকার ভগবানের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—ততো মাম্ তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ —১৮।৫৫

সুখের বিষয় ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ঋষিরা ব্রহ্মসম্পর্কে স্ব স্ব অনুভূতি অমর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই সর্বজাতির বেদ এবং বেদের সার বেদান্ত বা উপনিষদ্। দেখা যায়, ব্রহ্মসম্পর্কে আচার্যদিগের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। শঙ্কর বলেন—ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরুপাধি, নির্বিকল্প, নিরঞ্জন। রামানুজের মতে তিনি সমস্ত কল্যাণগুণের আশ্রয়—অধিকন্তু নির্বিশেষে ব্রহ্মণি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি। উপনিষদের প্রতি দৃষ্টি করিলে কিন্তু দেখা যায় যে, ঋষিদিগের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম একাধারে নির্বিশেষ-সবিশেষ, নিরুপাধি-সোপাধি, নির্বিকল্প-সবিকল্প, নিরঞ্জন-পুরঞ্জন। এই কথা আমি ৩০ বৎসর পূর্বে আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদে' প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং দেখাইয়াছিলাম যে, ব্রহ্ম একাধারে বিশ্বানুগ ও বিশ্বাতিগ, উপাদান ও নিমিত্ত, চিৎ ও জড়, অণু ও মহান্, সগুণ ও নির্গুণ, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, দূরে ও নিকটে, অন্তরে ও বাহিরে, Principle ও Person, তৎ ও সঃ—এক কথায় ব্রহ্ম "Supreme Unity of all contradictions"—তাঁহাতে সমস্ত বিরোধের চির সমন্বয়, সমস্ত দ্বন্দ্বের চির অবসান।

সেইজন্য তিনি 'সর্বেন্দ্রিয়-গুণাভাসং' অথচ 'সর্বেন্দ্রিয়-বিবর্জিতং'। তিনি 'অশব্দম্, অস্পর্শম্, অরূপম্, অব্যয়ম্' অথচ 'সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ সর্বমিদম্ অভ্যাত্তঃ।' তিনি 'আপণিপাদো' অথচ 'জবনো গৃহীতা—পশত্যচক্ষুঃ স

শৃণোত্যকর্ণঃ'—অচক্ষু দেখিতে পান, অপদ সর্বত্র যান, বিনা কর্ণে করেন শ্রবণ। সমুদ্রের যেমন নিষ্কম্প নিথর অবস্থা আবার ফেনিল তরঙ্গিত অবস্থা, ব্রহ্মেরও সেইরূপ static ও kinetic অবস্থা। নিরুপাধি ব্রহ্ম static—নির্বিশেষ, নির্গুণ, কিন্তু মায়া-উপহিত ব্রহ্ম (মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতর) kinetic—সবিশেষ, সগুণ। ঐ মায়াই ব্রহ্মের শক্তি—সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩০)। ঐ শক্তির potential অবস্থায় সৃষ্টি—ব্রহ্মের সবিশেষ সগুণ ভাব এবং ঐ শক্তির static অবস্থায় প্রলয়—ব্রহ্মের নির্বিশেষ নির্গুণ ভাব। তিনি যখন অমায়ী—তখন তিনি static—নির্বিকল্প নিরুপাধি, নির্বিশেষ, নির্গুণ। আর যখন তিনি মায়ী, তখন তিনি kinetic—সবিকল্প, সোপাধি, সবিশেষ, সগুণ। অতএব সগুণ নির্গুণ বিভিন্ন তত্ত্ব নয়—একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই দ্বিবিধ বিভাব মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও ঠিক্ এ ভাবে কথাগুলি বলেন নাই—তবে 'ধর্মতত্ত্বে' মোটের উপর এ কথার অনুমোদন আছে।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে অথবা ঈশ্বরকে দুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নির্গুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজীতে যাহাকে 'Absolute' বা 'Unconditioned' বলে, তাহাই নির্গুণ। যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না। যিনি নির্গুণ, যাঁহার কোন "Conditions of Existence" নাই বা বলা যাইতে পারে না, তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে—নির্গুণবাদে উপাসনা নাই।

কৃষ্ণ চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা সম্প্রসারিত করিয়াছেন ঃ—

আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না; কেননা, মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেননা, আমাদের সে শক্তি নাই। মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। "চতুষ্কোণ গোলক" বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু 'চতুষ্কোণ গোলক' মানে ত' কিছুই বুঝিলাম না। তাই হার্বর্ট স্পেন্‌সর্

এতকাল পরে নির্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর ("Something higher than Personality") তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস আমরাও নির্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, ধাতা, ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্‌মারিতে কাজ কি ?

এ কথায় আপত্তি করা চলে না—কেন না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এ মতের পোষকতা করিয়াছেন।

> ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
> শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
> যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
> সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
> সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
> তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
> ক্লেশোঽধিকতর স্তেষাম্ অব্যক্তাসক্ত-চেতসাম্।
> অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভি রবাপ্যতে॥—গীতা ১২।২-৫

"যাহারা আমাতে মনোনিবেশ করিয়া পরমশ্রদ্ধা সহকারে নিত্য নিবিষ্টচিত্তে আমার উপাসনা করে, আমার মতে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যোগী ; আর যাহারা সর্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া সমস্ত ভূতের হিতে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমপূর্বক অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই পায় বটে। তবে যাহারা ঐ অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করে, তাহাদিগকে অধিকতর ক্লেশ পাইতে হয়। কারণ, দেহধারী জীব অতি কষ্টে অব্যক্তাগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।"

এই সগুণ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দ মঠে' সত্যানন্দের মুখে বলিয়াছেন ঃ—

> যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির বিনাশহেতু, যিনি সর্বান্তর্যামী, সর্বজয়ী, সর্বশক্তিমান্ ও সর্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।
>
> অন্যত্র—ঈশ্বর মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য, তাহাও তাঁহার অপরিমেয়।

এক কথায় ঈশ্বরের স্বরূপ বলিতে গেলে বলিতে হয়—তিনি সচ্চিদানন্দ—'সচ্চিদানন্দ-রূপায়'—তিনি একাধারে অস্তি-ভাতি-প্রিয়। জগতে যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু 'সত্য' বলিয়া প্রতীত হইতেছে—সে সমুদয় সেই সৎ-এর উপর নির্ভর করিয়া—সেইজন্য তিনি 'সত্যস্য সত্যং'। বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা, বহুত্বের মধ্যে ঐক্য সিদ্ধ হয় কিরূপে? বিশ্বের পশ্চাতে যে এক অনন্ত অনির্বচনীয় শক্তি আছে (হার্বার্ট স্পেনসর যাহাকে 'Inscrutable Power in Nature' বলিয়াছেন)—যাহা হইতে বিশ্ব জন্মিতেছে, যদ্দ্বারা চলিতেছে, যাহাতে অন্তিমে বিলীন হইতেছে—সেই চিৎ-এর উপর নির্ভর করিয়া। কিন্তু ঈশ্বর যেমন সৎস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ—তেমনি আনন্দস্বরূপ—তিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম। সতে যে চিৎ-এর অবস্থান—তাহারই ফলে জাগতিক শৃঙ্খলা, তাহাতেই জীবনের উপযোগিতা;—চিতে যে আনন্দের যোগ তাহাতেই জীবের সুখ, উহাই নন্দন,—'where pleasure is, there is God' (Browning). এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম অথবা জগৎকে 'তত্ত্বতঃ' জানিলে ঐ সচ্চিদানন্দকে জানিলাম।

ঈশ্বরের উপাসনা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বেশ নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সগুণেরই উপাসনা—নির্গুণের উপাসনা নাই।

ঈশ্বরই সর্বগুণের সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। সেইজন্য বেদান্তের নির্গুণ ঈশ্বরে ধর্ম সম্যক্ ধর্মত্ব প্রাপ্ত হয় না। * * যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই ধর্মের মূল—কেন না তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে 'Impersonal God' (?) বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাঁহাকে 'Personal God' বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

উপাসনার বিবিধ প্রণালী ও পদ্ধতি আছে—অধিকারি-ভেদে প্রত্যেকেরই উপযোগিতা আছে। কিন্তু (বঙ্কিমচন্দ্র বলেন) মানুষের সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা কি হইতে পারে? উপাসনার সার নির্যাস করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন:—

ঈশ্বরের সর্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে, প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে।

তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে।—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্মলতার মত নির্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্বত্র মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলেই আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব ;—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে।

ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার—বঙ্কিমচন্দ্র এই বিবাদারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করেন নাই। তবে তিনি গুরুর মুখে শিষ্যকে বলিয়াছেন—'আর যদি বল ঈশ্বর সাকার—তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল।' প্রকৃত কথা এই—তিনি অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা—

অচক্ষুঃ দেখিতে পান, অপদ সর্বত্র যান, বিনা করে করেন গ্রহণ।

অর্থাৎ; তিনি 'সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং' যদি চ 'সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্'। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে সার কথা—অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে !

কৌতূহলী পাঠক এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতা-ভাষ্য ৮৭-৮ পৃষ্ঠা ও ১২৯১ পৌষের 'প্রচারে' প্রকাশিত 'গৌরদাস বাবাজিকে রামবল্লভ বাবুর ভিক্ষাদান' প্রবন্ধ পাঠ করিতে পারেন। সাকার-বাদের সার্থকতা ঐ প্রবন্ধে চমৎকার ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঈশ্বর যদি নিরাকার হন, তবে সাকার উপাসনা—বিশেষতঃ প্রতিমা-পূজা কেন ? ঋষিরাই ত' বলিয়াছেন—ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্ যশঃ।

ধর্মতত্ত্বের বিংশতিতম অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্ন উৎথাপন করিয়াছেন এবং ভাগবত হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটি সাদরে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অর্চাদৌ অর্চয়েৎ তাবদ্ ঈশ্বরং মাং স্বকর্মকৃৎ।
যাবৎ ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষ্ববস্থিতম্ ॥—৩।২৯।২৫

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বকর্মে রত, সে যতদিন না আপনার হৃদয়ে সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদির পূজা করিবে। তবেই বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। নিম্নাধিকারীর পক্ষে বিহিত এবং উচ্চাধিকারীর পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। 'পূজা হোম যজ্ঞ নামসংকীর্তন সন্ধ্যাবন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র।' এ সকল যে পরাভক্তির সাধন এবিষয়ে সন্দেহ নাই; ভক্ত্যা কীর্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরাভক্তিং সাধয়েদিতি।—তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে বলিলেন উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর মুখে আরও বলিতেছেন—

"এ সকল নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য-ভক্তির লক্ষণ। যথা জীবন্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণুস্তুতি মুখ্য ভক্তি। আর 'আমার পাপ ক্ষালিত হউক, আমার সুখে দিন যাউক', ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা prayer —গৌণভক্তি মধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্মতৎপর হও।"

গীতাভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ-প্রসঙ্গ আবার উত্থাপিত করিয়াছেন।

অবিনাশি তু তদ্‌বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্—গীতার এই শ্লোকের ভাষ্য করিতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্বব্যাপী হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী হন, তবে তিনি সাকার নহেন। ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের ও হিন্দুধর্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ ও দর্শনশাস্ত্রেরও এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেকস্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এস্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত

হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

* * তবে কি হিন্দুধর্মে সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত' প্রত্যহ প্রতিমা পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্মে সাকারবাদ নাই কি করিয়া বলিব?

ইহার উত্তর এই যে, অন্যদেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চনা সাকারের উপাসনা নয়। এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছুমাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে এবং সে জানে তাহা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না।

তবে সে এ মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, "হে বিশ্বব্যাপিনি সর্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমায় যেরূপে কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।"

এই প্রতিমা পূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। (ইঁহারা) অন্য মত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ,—সকলের অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন। কি নিরাকারের উপাসক কি সাকারোপাসক কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য; কেহই তাঁহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকটে পৌঁছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও

কেহ উৎসন্ন যাইবে না; আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, ধর্মের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিতে হইলে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়।

ধর্মের প্রথম সোপান বহু দেবের উপাসনা,—দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা—তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা (বা বৈষ্ণবধর্ম) অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।—কৃষ্ণচরিত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মমত বুঝিতে হইলে ঐ দেবোপাসনা বুঝিতে হয়। অতএব আগামীতে আমরা তাঁহার কথিত দেবতত্ত্বের আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

স্বপ্ন-শেষ

সিগারেটটা শেষ করেই তারক আফিসের জন্যে তৈরী হবে ; ইতিমধ্যে খবরের কাগজটা ও আর একবার উল্টে দেখ্‌ছিলো কোন সংবাদ বাদ গেল কিনা। ঠিক এমনি করেই চলে আস্‌ছে গত তিন বছর। এ-সময়টা সুলতার কাজ থাকে, তবু সে একবার এসে খোঁজ নিয়ে যায়। কোন কোন দিন সে কাজ ফেলে আস্‌তে না পারলেও তারক তার জন্যে অপেক্ষা করে না।

আরও কয়েক মিনিট সময় অতিবাহিত হল। আর দেরী করা চলে না, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারক চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। জামা গায়ে দিতে দিতে সে ভাবছিলো ভাগ্যের ওপর কারুর হাত নেই, সবাইকে ভেসে যেতে হয় স্রোতে, ইচ্ছার কোন মূল্য নেই, সুখ-দুঃখের কোন বিচার নেই। কতদিন সে ভেবেছে অফিসে যাবে না, দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবে, নয়ত শুয়ে শুয়ে পড়বে একখানা হাল্কা উপন্যাস, বা সুলতাকে নিয়ে যাবে কোন সিনেমায় ; আনন্দে আর উত্তেজনায় শরীরের রক্ত-সঞ্চালনই খানিকটা বেড়ে যায়। হাত পা এলিয়ে সে বিছানায় পড়ে থাকে কয়েক মিনিট পরম আলস্যে। কিন্তু অফিসের খালি চেয়ারটার কথা ভেবে অস্বস্তিতে তার মন ভরে যায়, তাকে উঠ্‌তে হয়, কোটটা যথারীতি গায়ে দিতে হয়, তারপর স্রোত।

আজও সে ইজিচেয়ারটায় বসে বসে ভাবছিলো না গেলে কেমন হয়? আদিত্য নিশ্চয় তার জরুরি কাজগুলো চালিয়ে নেবে। সেবার জ্বরে পড়ে রইলো এক হপ্তা, অফিসের কাজ কি আট্‌কে ছিলো? বিন্দুমাত্র না। কিন্তু মন খুঁৎ খুঁৎ করে ; কোথায় যেন কি একটা গোলমাল ঠেকে। অঙ্ক নির্ভুল হয়েছে নিঃসন্দেহ, তবু মনে হয় যেন ভুল আছে। তেমনি ওস্তাদের বেসুরো তানটা তুমি ভালো বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু কান তোমার এড়ায়নি। পা থেকে কাঁটা খুলে ফেলবার পরেও যেমন মনে হয় বুঝি কাঁটার ক্ষুদ্রতম অংশ চামড়ার মধ্যে রয়ে গেছে।

তার চাইতে অফিস যাওয়া অনেক ভালো ; শান্তি।

তারক উঠে পড়লো। কয়েক মিনিট তার লাগলো প্রস্তুত হয়ে নিতে।

সুলতা কিন্তু এলো। বেশ চমৎকার এক মেয়ে, উজ্জ্বল মুখ, স্বাস্থ্যবতী, মাথায় অনেক চুল, বয়েস বছর পঁচিশ, সুগৌর দু'খানি হাত, দেহে একটা বঙ্কিম ভঙ্গিমা। 'দেখ, আজ একটু তালতলা যাবো দুপুরে', সুলতা বল্‌লে, 'কোন খবরই পেলাম না মা কেমন আছেন, তোমাকে বলি অফিস থেকে একবার ঘুরে এস তা তুমি ত গা কর না।'

'বেশ ত! সাধুকে নিয়ে যেও সঙ্গে, ঝিকে বোলো দুপুরে বাড়ীতে থাক্‌তে।'

'সাধুকে দরকার কি?' সুলতা বল্‌লে, 'আমি একাই যাবো, ঘরের কাজগুলো নিয়ে সন্ধ্যের সময় এক অনর্থ বাধাই আর কি!'

'রাস্তা পার হবার সময় দেখে পার হয়ো।' তারক সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে।

চেয়ারে বসে তারক কলম চালাচ্ছিলো আর ভাব্‌ছিলো, না এলেই হত অফিসে। কাজের ভীড়ও আজ কম, ওর রীতিমত আফশোষ হচ্ছিল, সুলতা বোধহয় এতক্ষণ চলে গেছে তালতলা; স্বচ্ছন্দে তাকে নিয়ে সে আজ ম্যাটিনীতে কোন সিনেমায় যেতে পারতো, সেই কমলা নেবু রঙের সাড়ীখানা সে আজ সুলতাকে পরতে বল্‌তো, কি অপরূপ যে তাকে দেখায় সাড়ীখানা পরলে! তারকের মনই খারাপ হয়ে যেতে লাগ্‌লো। কিন্তু ওর কপাল ভালো, বিলেত থেকে টেলিগ্রাম এলো তাদের একজন সায়েব অংশীদার (সেখানে ছুটিতে গিয়ে) ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা গেছে। আর একটু হলে তারক দোয়াতটাই ঢেলে ফেলেছিলো। সবে একটা! ওঃ প্রায় একটা দিন বল্‌তে গেলে! আর আজই কিনা শ্রীমতীর বাপের বাড়ী যাবার দরকার পড়লো।

অফিস ছুটি হয়ে গেল। হুক থেকে কোটটা খুলে সে গায়ে দিয়ে নিলে। দোহারা চেহারা, স্বাস্থ্যবান পুরুষ, মেজাজ বেশ হাল্‌কা, বেসুরো গান গায় মাঝে মাঝে।

'একটা সিনেমায় গেলে হয় না?' আদিত্য বল্‌লে, 'বাড়ী গিয়ে কি করবে?' আদিত্য তারই সমবয়েসি। একই টেবুলে মুখোমুখি বসে গত পাঁচ বছর

ক্যালেণ্ডারে লাল মার্কা দিনগুলোর দিকে চেয়ে আস্‌ছে, একই কোম্পানী থেকে জীবন বীমা করেছে, একই মাসিক পত্রিকা পড়ে।

'বেশ ত!' তারক বল্‌লে, 'চল যাই।' বাড়ী গিয়ে আর কি হবে? সুলতা ত আস্‌বে সেই সন্ধ্যের দিকে। এমন চমৎকার দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে তার কিছুতেই ইচ্ছে করছিল না।

গেল ওরা চৌরিঙ্গীর এক সিনেমায়, দু'খানা আপার সার্কলের টিকিট নিয়ে। শো আরম্ভ হবার কয়েক মিনিট দেরী আছে, দু'জনে বসে বসে সিগারেট টানছিল আর গল্প করছিল।

ঘণ্টা বাজলো, বাতি নিবতে আরম্ভ করলো ধীরে ধীরে। ঘর প্রায় অন্ধকার, এমন সময় তারক যেই এক মুহূর্ত্তের জন্যে মাথা ফিরিয়েছে, দেখে সুলতা, সেই জর্জ্জেট সাড়ীখানা পরেছে, কালো কাপড়ের ব্লাউজ, সোণার কানবালা; তারকের হৃদপিণ্ডের গতি বোধহয় স্তব্ধ হয়ে যেতো যদি না আদিত্য ঠিক সময়ে আর একটি এ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেয়ের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতো। সুলতার কাছে কোন দেশের হেলেন আজ দাঁড়াতে পারে! কিন্তু—তারক ঠাণ্ডা হয়ে গেল, মৃতের মত। সুলতার বাহু স্পর্শ করে যে যুবকটি তাকে এগিয়ে নিয়ে আসছিলো তাকে তারক জীবনে কখনও দেখেনি। সুলতার আত্মীয়দের সবাইর সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কে এই যুবক? তবে কি তালতলা যাবার ছল করে সে—তারক আর ভাবতে পারলে না। হাত দুটো তার ঠাণ্ডা, নিস্তেজ।

বাতি নিবে একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল ঘর। শো আরম্ভ হ'ল। পর্দ্দার ছায়া ছায়াই রয়ে গেল, তারা না কাট্‌লো তারকের মনে কোন দাগ না প্রকাশ করলো কোন অর্থ। মাথার মধ্যে তার ঝিম ঝিম করছে। অন্ধকারে দৃষ্টিকে যথাসম্ভব একাগ্র করে সে আবার তাকালো অন্ধকারে অল্প দূরে সেই দু'খানা আসনের দিকে, অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না; শুধু মনে হল সুলতা লোকটার একেবারে গা ঘেঁসে বসেছে। কিম্বা তার ভুলও হতে পারে, সে বুঝ্‌তে পারলে না।

'কি হে! ওদিকে কি দেখ্‌ছো হাঁ করে?' আদিত্য তাকে একটা ঠেলা মেরে বল্‌লে।

'কৈ, কিছু না।' তারক আবার তাকালো পর্দ্দার দিকে, চেষ্টা করলো

অন্যান্য সমস্ত ব্যাপার ভুল্‌তে, ছবিটা বোঝবার চেষ্টা করলো কিন্তু সব ফাঁকা, একেবারে শূন্য। ভাবলে কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে চলে যায় বাইরে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কিন্তু বলবে কি, দরকার নেই হাঙ্গামা করে, তার চাইতে চুপ করে বসে থাক না বাপু কতক্ষণ, এমন সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটেনি যার জন্যে একবারে ছটফট করে মরতে হবে, নিজেকে সে খানিকটা ধমকেই দিলে, বস্‌লো বেশ স্থির হয়ে। 'কি হে! লাগ্‌ছে কেমন?' বেশ সমজদার গলাতেই সে আদিত্যকে জিজ্ঞেস করলে।

'চমৎকার!'

খানিকটা সময় কেটে গেল।

ইনটারমিশান।

'নাও সিগারেট ধরাও।' আদিত্য প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে; 'চমৎকার বিষয়বস্তু, কি বল?'

একটা সিগারেট নিয়ে তারক বল্‌লে, 'হুঁ, বেশ জমিয়েছে।'

দু'জনেই সিগারেট ধরিয়ে নিলে।

'সত্যিই আমরা সবাই ভুগছি এই স্নায়বিক বিকারে', আদিত্য বল্‌লে, 'আমরা নিজেরাই জানি না, এর বিরুদ্ধে অবিশ্রাম যুদ্ধ করে আমরা প্রায় ক্ষয় হয়ে গেলাম, আগাগোড়া সমস্ত অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি, জীবনকে সহজ করে নিতে আমরা ভুলে গেছি, যুদ্ধ করছি নিজেরই বিরুদ্ধে, অন্ধের মত।'

'এর জন্যে দায়ী কে জানো?' প্রায় কথাটা লুফে নিয়ে তারক বল্‌লে, 'আমাদের আধুনিক সভ্যতা! সভ্যতা নয় শঠতা। চারিদিকে ভীষণ একটা ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত শুধু অন্যকে ঠকাবার জন্যে নয় নিজেকেও। আর দুর্ভাগ্যের কথা কিনা তা আমরা জানি না। চারিদিকে একটা বঞ্চনা, অবিশ্বাস। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না। আর করবই বা কেমন করে? কাকে তুমি বিশ্বাস করবে? তোমার ভাই, তোমার বন্ধু, স্ত্রী? কাউকেই তুমি বিশ্বাস করতে পারো না। যে তোমার প্রিয়তম, যাকে তুমি আজীবন আপনার বলে জেনে এসেছো—সেই কিনা করলো তোমার প্রতি অবিচার, বিশ্বাসঘাতকতা! এ অপরাধের কি ক্ষমা আছে? নেই।' তারক ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগ্‌লো।

'তুমি বোসো আমি বাইরে থেকে আসি।' আদিত্য বল্‌লে, 'আইসক্রীম খাবে ?'

'বেশ ঠাণ্ডা ?'

'আইসক্রীম ঠাণ্ডা নয় ত কি ?' আদিত্য বাইরে গেল।

কয়েক মিনিট পরেই আবার শো আরম্ভ হ'ল। আদিত্য ফিরে এসে বস্‌লো। 'আইস্‌ক্রীম আমি খাবো না, তুমি খাও।' তারক বল্‌লে।

'হল কি তোমার ? নাও, নাও, খেতে খেতে দেখ।'

তারক ঠিক করে ফেলেছে যতক্ষণ আছে এখানে আর একবারও সে তাকাবে না পেছনে। মনকে কাতর করে লাভ নেই, যা হচ্ছে হতে দাও। বিশেষ করে তোমার যখন করবার নেই কিছু।

অবশিষ্ট সময়টা কেমন করে কেটে গেল তারক বুঝতেই পারলে না।

'বেশ! অনেকদিন এমন একখানা বই দেখিনি।' তৃপ্তির সুরে আদিত্য বল্‌লে। সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে। পর্দ্দায় রাজারাণীর ছবি।

তারক আর একবার তাকালো। ওরা উঠে পড়েছে, যাবার জন্যে প্রস্তুত। সে স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলে সুলতার সঙ্গী ঠিক করে দিলে তার মাথার কয়েকটা শিথিল কাঁটা। ধারালো ছুরিতে তারকের হৃদপিণ্ড খান খান হয়ে যাচ্ছে। ভাবলে গিয়ে সামনে দাঁড়ায়, জিজ্ঞেস করে কোন প্রশ্ন! কয়েক পা এগিয়েও গেল সে। কিন্তু তাতেই বা এমন কি মানসিক শান্তি পাবার সম্ভাবনা ? মানুষের মনের ওপর হাত নেই, তারক মনে মনে বার বার বল্‌তে লাগলো মানুষের মনের ওপর হাত নেই।

ওরা বাইরে এলো। ভীড়ের মধ্যে যতটুকু দৃষ্টি যায় তারক তাদের দিকে চেয়ে রইলো। এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে তারক একেবারে হাতে হাতে ধরে ফেল্‌তে পারে। কিন্তু ধরে লাভ নেই, যে যাচ্ছে তাকে যেতে দাও যেদিকে খুসি। নদীর স্রোতকে কেউ আটকাতে পারে না, মানুষের সাধ্য নেই ঝড়কে থামায়।

তারক দেখ্‌লে ওরা দু'জন একটা রেস্তরাঁয় ঢুকলো।

'এসো দু' পেয়ালা চা খাওয়া যাক।' সে বল্‌লে, 'তোমার ক্ষিধে পায়নি ?'

'তা পেয়েছে, এসো।'

পর্দ্দা দিয়ে ভাগ করা ছোট ছোট কামরা। তারক আদিত্যকে নিয়ে পাশের কেবিনটায় ঢুক্‌লো।

চা এবং কিছু আনুসঙ্গিক খাদ্য এলো। মাঝে মাঝে পাশের কেবিন থেকে উভয়ের উচ্ছ্বসিত হাসি শোনা যাচ্ছিলো। ঘড়িতে ছ'টা বাজতে দশ।

খাওয়া শেষ করে ওরা উঠে পড়লো।

আর কোথাও দেরী না করে তারক সোজা বাড়ী চলে এলো। যদি রান্না ঘরে ঢুকেই দেখ্‌তে পায় সুলতা তার জন্যে জলখাবার তৈরী করছে, এতক্ষণ যাকে সে দেখেছে সে সুলতা নয় অন্য মেয়ে, বা সুলতারই কোন বোন। হতেও পারে, আশ্চর্য্য কি? সুলতার এক দিদিকে সে ত দেখেইনি, তিনি হয়তো পাটনা থেকে বেড়াতে এসেছেন। সম্ভব তাই। এতক্ষণ পরে তারকের সত্যি সত্যি মনে হ'ল বায়োস্কোপে দেখা সেই মেয়ে সুলতা নয়, সুলতার দিদি। তা হ'লে—তারকের বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে উঠ্‌লো। তা হ'লে আর কোন কথা নয়, সুলতাকে সে বিনা বাক্যব্যয়ে টেনে নেবে বুকের মধ্যে, দেবে গুণে গুণে এক ডজন চুমো।

কিন্তু এক ডজন চুমো তাকে দিতে হ'ল না, সুলতা কোথায় নেই। সাধুকে জিজ্ঞাসা করে জানলো মাইজি এখনও ফিরে আসেনি। সে তাকে চা বানিয়ে দিতে পারে যদি হুকুম করে।

'নাঃ চা খাবো না, খাবারও নয় কিছু, শরীর ভালো নেই।' তারক কাপড় জামা না ছেড়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো, অর্দ্ধমৃত অবস্থায়।

খানিকটা সময় কেটে গেল। ঘরময় অন্ধকার। ও আজ থেকে ভাববে সুলতা মরে গেছে। আর মরেই ত সে গেছে। মরা ছাড়া এ আর কি? স্ত্রীহীন অনেক লোক সংসারে আছে, সেও থাকবে আজ থেকে, সুলতার সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, কোন সম্বন্ধ নেই, বিন্দুমাত্র না।

সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ। শুধু বারান্দার বাতিটা জ্বল্‌ছে। তারক প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলো; হঠাৎ জুতোর শব্দে সে জেগে উঠ্‌লো। ঘরের বাতি জ্বলে উঠ্‌লো, সুলতা। ঘুমের ভাণ করে তারক পড়ে রইলো। তাকে ঐ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে সুলতা বিস্মিত হ'ল, এগিয়ে এসে তার মাথায় হাত রেখে মৃদুকণ্ঠে তাকে ডাক্‌লে।

'কে ? সুলতা ?' যেন হঠাৎ তার ঘুম ভাঙ্গলো ; 'কখন এলে তুমি ? ছিলে কোথায় এত রাত পর্য্যন্ত ? অন্য কোথাও গিয়েছিলে নাকি ?'

'না, অন্য কোথায় আর যাবো ?' সুলতা জুতো খুল্‌তে খুল্‌তে বল্‌লে, 'অনেক্ষণ এসেছো—না ? অমন করে পড়ে আছ কেন ? অসুখ করেছে ?'

'না, অসুখ করেনি, কিছু ভালো লাগ্‌ছিল না অফিস থেকে এসে, মা কেমন আছেন ?'

'ভালো, আজ এক জায়গায় গিয়েছিলাম', খুসির সুরে সুলতা বল্‌লে।

'কোথায় ?' তারক উঠে বস্‌লো।

'এখনি বল্‌বো না, রাত্রে।' সুলতা কাপড় ছাড়তে গেল পাশের ঘরে।

কিছ্ছু বলতে হবে না, সব জানি আমি, তারক ভাবছিলো, এক কাঁড়ি মিথ্যে কথা বলে লাভ কি ? তুমি ভাবছো তোমার এই অভিজানের কেউ সাক্ষী নেই। কিন্তু আমি তোমায় কোন প্রশ্ন করবো না। আজ থেকে সমস্ত ভালবাসার সম্পর্ক শেষ হল। কিন্তু তা হলে কি সুলতা তাকে বলতে চাইতো কিছু ? তাই ত !

তারকের মনটা শান্ত হল। সে উঠে জামা খুলে আলনায় রাখলে। অভ্যাসবশতঃ ডাকতে যাচ্ছিলো সুলতাকে এক পেয়ালা চা বানাতে বল্‌তে কিন্তু নিজেকে সংযত করলো, সুলতার হাতে চা খাওয়া মানে বিষ খাওয়া। সে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছে ঘৃণায় তার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে না কেন ?

যখন সে স্নান করে এলো তখন তার মানসিক তাপ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। সুলতার ওপর কোন রাগ প্রায় তার নেই। আর রাগ করেই বা লাভ কি ? যার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ সে ছেদ করে ফেল্‌তে যাচ্ছে তার ওপর রাগ করা নিজের মানসিক দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছু নয়। সে ক্ষমা করলো সুলতাকে, সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা।

সুলতাকে বল্‌তে হল না, সে তারকের জন্যে চা বানিয়ে আনলে। তারক হাত বাড়ালে নিতান্ত নিস্পৃহভাবে। চায়ে চুমুক দিয়ে তার বলা অভ্যাস— 'চমৎকার।' কিন্তু আজ নীরবে গিল্‌তে লাগ্‌লো। সুলতা ভাবলে শরীর ভালো নেই।

রাত্রে খেতে বসেও সে একটি কথা বল্‌লে না, সুলতা আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

'কি হয়েছে তোমার ?' সুলতা জিজ্ঞাসা করলে, 'কথা বলছো না যে !'

'কি কথা বল্‌বো ?' তখন খাওয়া প্রায় শেষ।

'এতদিন কি কথা বলে এসেছো ?' সুলতার কণ্ঠস্বর উষ্ণ।

'আজ ভাবছি প্রত্যহ আমরা কি বাজে কথাই বলতে পারি, অনর্থক, অনাবশ্যক।'

ব্যাপার কি ? সুলতা প্রায় ঠাণ্ডা হয়ে আসবার জোগাড়। ভাবলে মন ভালো নেই, আফিসে কাজের গোলমাল করেছে, এমন মাঝে মাঝে সে করে। সে অবস্থায় তার মনের ভাবগতিক সে লক্ষ্য করেছে কয়েকবার।

সুলতা আর কোন কথা বল্‌লে না। তারক উঠে যাবার পর সে একাই খেয়ে নিলে। অন্যান্য দিন তারা এক সঙ্গে খায়, আজ তারক তাকে ডাকলে না পর্য্যন্ত।

তারক তার জন্যে জেগে অপেক্ষা করে রোজ ; আজ সুলতা এসে দেখ্‌লো ঘরের বাতি নেবানো, তারক পাশ ফিরে শুয়ে আছে, বোধ হয় ঘুম। জোড়া খাটে বিস্তৃত শয্যা। ব্যবধান বজায় রেখে স্বচ্ছন্দে ঘুমোনো চলে, কিন্তু সুলতা শুলো প্রায় তারকের গা ঘেঁসে, তারক নিস্পন্দ, সুলতার অনাবৃত হাঁটুটা লাগ্‌লো তারকের পিঠে, তারক শব্দহীন, অচেতন।

সুলতা ঘুমিয়ে পড়লো, ক্লান্ত, বিপর্য্যস্ত।

মাঝ রাত্রে সুলতা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলো হঠাৎ, তারক ধড়মড় করে উঠে বস্‌লো, সুলতাকে টেনে নিলে বুকের মধ্যে, তখনও কাঁপছিলো সে।

'কি হয়েছে ? অমন করে চীৎকার করলে কেন ?' কোমল কণ্ঠে তারক জিজ্ঞেস করলে, 'ভয় পেয়েছো ? ভয় কিসের ? এই ত আমি রয়েছি, লতা ?'

'না, স্বপ্ন দেখছিলাম, ভয়ানক এক খারাপ স্বপ্ন।'

'কি ?'

'না, সে তুমি শুনো না, ভয়ানক বিশ্রী !' সুলতা মুখ লুকালো তারকের বুকের মধ্যে।

'বল না, কি ?'

'দেখছিলাম তুমি যেন আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলছো !'

তারক হো হো করে হেসে উঠ্‌লো, সুলতাকে আরও নিবিড়ভাবে গুছিয়ে নিলে বুকের মধ্যে। 'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে', সে বল্‌লে, 'এখন ঘুমোও দিকি, এই যে! এসো, আমার বুকের মধ্যে!'

সুলতা পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

কয়েকটা দিন কাটলো।

স্বপ্নের কথা সুলতা ভুলে গেছে। আর—তারক আবার সহজ হয়ে আসছে; অকারণ সে আবার হাসে, চা'য়ে চুমুক দিয়েই বলে—'চমৎকার'! সেদিনকার সে ঘটনা প্রায় তার মনে ঝাপসা হয়ে এসেছে। কত কিই হতে পারে, পৃথিবীতে সকল ঘটনাই প্রেমের ব্যাপার নয়, এ-কথা আগে তার মনে হয়নি বলে নিজেকে ধিক্কার দিলে সে। সুলতার ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় তারকের প্রতি গভীর প্রেমের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম সে দেখেনি, সে নিশ্চিন্ত হল, আকাশ থেকে উড়ে গেল সব মেঘ, সূর্য্যের আভায় ঝলমল করে উঠ্‌লো দিক বিদিক।

কিন্তু আবার আর একদিন রাত্রে।

সুলতা চীৎকার করে উঠ্‌লো, শ্বাসরোধের কর্কশ, বিকৃত কণ্ঠস্বর!

'কি হল? লতা, কি হল?' তারক ভয় পেয়ে বলে উঠ্‌লো।

বাতির উজ্জ্বল আলোকে তারক সুলতার বিবর্ণ, রক্তহীন মুখ দেখে বিচলিত হল, 'কি হয়েছে?'

'স্বপ্ন!' স্তিমিত, ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে সুলতা শুধু বল্‌তে পারলে।

'কি স্বপ্ন?'

'বিশ্রী!'

'বল!' তারক পীড়াপীড়ি করলো।

'দেখলাম তুমি আমায় গলা টিপে মেরে ফেল্‌ছো, আমার গলা ছাড়ছো না।'

তারক আর হাসলে না এবারে; বল্‌লে, 'লতা নিশ্চয় তোমার কোন অসুখ করেছে, একজন বড় ডাক্তার ডাকা দরকার, চল বাইরে, মুখ হাত ধুয়ে শোবে।'

সুলতা নামলো খাট থেকে। 'এমন বিদঘুটে স্বপ্ন তুমি কেমন করে দেখ?'

স্থলতা শুধু হাসলো।

পরদিন ডাক্তার ডাকা হল। বল্লে তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, স্বাস্থ্য ভালই, স্নায়বিক বিকার।

ওষুধ আনা হল, সেবন আরম্ভ হল যথারীতি।

আর এক রাত্রি।

তারকের পাশে স্থলতা গভীর নিদ্রিত, তার দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ তার কাছে প্রায় ক্লান্তিকর লাগছিলো। দু' তিনবার এপাশ ওপাশ করে তারক ঘুমোবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ঘুম তার এলো না। স্থলতা কেন বার বার এমন স্বপ্ন দেখছে? কারণ কি? বাস্তব জীবনে এ কি সম্ভব? (তারক চোখ বুজে আবার পাশ ফিরে শুলো) কেন ও অমন স্বপ্ন দেখে? কেউ কি তার স্ত্রীকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারে? কৈ, এমন ঘটনা সে কখনও শোনেনি। অবশ্য একজন স্বাস্থ্যবান পুরুষের পক্ষে যে কোন মেয়েকেই গলা টিপে মেরে ফেলা সহজ, বিশেষ করে যখন সে স্ত্রীলোক গভীর ভাবে নিদ্রিত। কিন্তু কোন মানুষের পক্ষেই কি তা সম্ভব, যতই সে নিষ্ঠুর প্রকৃতির হোক, যতই ভীষণ কোন অপরাধ করুক সে রমণী। এই ত স্থলতা শুয়ে আছে তার পাশে, ইচ্ছে করলেই সে হাত বাড়িয়ে তার গলাটা টিপে ধরতে পারে। (তারক আবার পাশ ফিরে ভাল করে হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করলো) তা ত পারেই, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সে কি পারে? পারে? ধরা যাক স্থলতা ভীষণ কোন অপরাধে অপরাধী, ধরা যাক সে বিশ্বাসঘাতক, শঠ। তাকে আজীবন বঞ্চনা করেই আসছে; তবু কি সে পারে তার গলাটা টিপে ধরতে? বিশেষ করে একটি মেয়ে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য সে ইচ্ছে করলেই একটি মেয়ের প্রাণসংহার করতে পারে, আস্তে আস্তে স্থলতার গলার নরম মাংসের খাঁজে খাঁজে বসে যাবে তার শক্ত আঙ্গুলগুলো। ভাবতেই তারকের আশ্চর্য্য লাগছিল। যে নিশ্বাসের শব্দ সে শুনছে, চিরকাল শুনবে, সামান্য চেষ্টা করলেই সে নিশ্বাস সে বন্ধ করে দিতে পারে একেবারে। কিন্তু মানুষ পারে না, তা যদি পারতো তা হলে সমাজ থাকতো না, থাকতো না কোন শৃঙ্খলা। মিথ্যে হ'ত মানুষের সমস্ত শান্তির সূত্র। সে কি আর ইচ্ছে করলেই পারে, নীতি বলে কিছু কি নেই তার জীবনে? আছে। এবং সে-জন্যেই যা ইচ্ছে তা সে করতে

পারে না, মানুষকে সর্ব্বদাই সামনে রাখতে হয় তার রিপুকে, মানুষ প্রবৃত্তির দাস নয়, প্রবৃত্তি মানুষের দাস। (তারক আবার পাশ ফিরলো।)

তাদের মধ্যে এক হাতেরও তফাৎ নেই। সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুলতা চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে ; চুল খুলে ছড়িয়ে পড়েছে বালিশের চার পাশে। ঘুমোবার আগেও সুলতা তার কাছ থেকে জোর করে কয়েকটা চুমো আদায় করেছে। কে জানে হয়তো আজ রাত্রেও সে আবার সে-রকম বিশ্রী ভাবে চেঁচিয়ে উঠবে। কারণটা কি ? বিনা কারণে মানুষ স্বপ্ন দেখে না। স্বপ্ন অন্তর্মানসিক আকাঙ্খার পরিণতি। কেন সে ভাববে এ বিষয়ে ? তবে কি গোপনে সে কোন অন্যায় করেছে বা করছে যার জন্যে নিজেকে সে অপরাধী মনে করে ? কি অপরাধ সে করতে পারে। তাদের বিবাহিত জীবনের দীর্ঘ তিনটি বৎসর সে সুলতাকে দেখে আসছে। নিরীহ, শান্ত, নম্র, এবং সৎ সে। স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্যে কোন দিন বিন্দুমাত্র তার বিচ্যুতি ঘটেনি। কোন দিন তার একনিষ্ঠতার প্রতি তিল মাত্র সন্দেহ করবার অবকাশ বা সুযোগ সে পায়নি শুধু একটি দিন ছাড়া। কিন্তু কে সেই যুবক ? সুলতার কোন আত্মীয় হতে পারে, তার দূর সম্পর্কের কোন ভাই হতে পারে, পারে ত ! সে ত আর সকলের পরিচয় পায়নি। যদিই বা তার সন্দেহ হয় সে ত পরিস্কার সুলতাকে জিজ্ঞেস করতে পারে, জিজ্ঞেস করাই ত তার উচিত, সব স্বামীই ত করতো, তা হলেই ত সমস্ত মেঘ কেটে যেতো তার মন থেকে। কালকেই সে জিজ্ঞেস করবে সুলতাকে সেদিন সিনেমায় গিয়েছিল যার সঙ্গে কে সে ? তার ইচ্ছে হল সুলতাকে জাগায়, খানিকটা আদর করে, কয়েকটা চুমো দেয়। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুলতা হঠাৎ এক ঝটকায় উঠে বসলো বিছানায়, অস্পষ্ট অন্ধকারে তার ভঙ্গি দেখে তারক বুঝলো কি ব্যাপার ; ভয় পেয়েছে সে ; তারক কোন সাড়া দিলে না, চোখ বুজে চুপ করে পড়ে রইলো।

'শোনো, শুনছো ?' সুলতা তার গায়ে ঠেলা মারলে।

সে তেমনি নিস্পন্দের মত পড়ে রইলো।

'শুনছো ? ওগো ?' সুলতা আবার তার কানের কাছে মুখ রেখে ডাকলে।

'এ্যাঁ, কি হয়েছে ?' তারকের যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সুলতা সরাসরি জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কি আমার গলায় হাত দিয়েছিলে ?'

তারক উঠে বসলো। 'এ্যাঁ, কি বলছো তুমি পাগলের মত ?' সে জিজ্ঞেস করলো, 'আজও আবার সেই স্বপ্ন নাকি ?'

'না, হ্যাঁ, কি জানি,' সুলতা অস্পষ্ট গলায় বল্‌লে, 'আমার মনে হল তোমার হাতখানা আমার গলায়—'

তারক না হেসে পারলে না, আন্তরিক হাসি নয়। 'আজ বুঝি শোবার আগে ওষুধটা খাওনি ?'

'না, ত !'

'দাঁড়াও !' তারক উঠে বাতি জ্বাললে। গ্লাশে ওষুধ ঢেলে নিয়ে এলো, বললে, 'খাও।'

সুলতা ঢক করে গিলে ফেললে ওষুধ।

'এসো, এবার ঘুমোই।'

বাতি নিবলো।

'এসো, আরও কাছে এসো, এই যে ! এই—'

ঘড়িতে বোধ হয় দুটো বাজলো।

তখনও ভালো করে সকাল হয়নি ; সবে রাস্তার গ্যাসগুলো নিবেছে। তারক অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সিঁড়ি দিয়ে যখন সে নিচে নামছিলো তার সমস্ত বোধশক্তি তখন লোপ পেয়েছে ; শূন্য দৃষ্টি, স্খলিত চরণ। সে নিজেই জানে না কেন সে নেমে আস্‌ছে।

সুলতার ঠাণ্ডা, নিষ্প্রাণ দেহ থেকে শেষ উত্তাপটুকুও তখন মিলিয়ে গেছে।

পূব দিকে বুঝি সূর্য্যের আলো দেখা দিল।

শ্রীরজত সেন

য়াকব্ হ্বাক্যার্নাগেল্

পঁচাশী বৎসর বয়সে অধ্যাপক Wackernagel-এর মৃত্যুতে ইউরোপে ভাষাতত্ত্বের একটি যুগের অবসান হইল। তাঁহার নিকট ভারতবাসীর ঋণ অপরিমেয়, কারণ জীবনের শেষ ষাঠ বৎসর তিনি প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষারই একটি ব্যাকরণ লিখিতে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৯৬ সালে এই ব্যাকরণের প্রথম খণ্ড বাহির হয়; দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অংশ বাহির হয় ১৯০৫ সালে; এবং ১৯৩০ সালে তাঁহার শিষ্য অধ্যাপক Debrunner-এর সহযোগিতায় Wackernagel তাঁহার ব্যাকরণের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ করেন। চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড এবং দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় অংশ এখনও বাহির হইতে বাকি। প্রতি খণ্ডের পরিমাণ ৪০০ হইতে ৬০০ পৃষ্ঠা করিয়া। Wackernagel-এর এই ব্যাকরণ যে কি বিরাট ব্যাপার তাহা ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। তাহার উপর আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে Wackernagel-এর ভাষা প্রায় পাণিনীয় সূত্রের ভাষার মত; এত অল্প কথায় এই পরিমাণ তথ্য বোধ হয় ভারতীয় সূত্রকারগণই কেবল সংনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

Wackernagel-এর সংস্কৃত ব্যাকরণের এই বিপুল আয়তন কেন হইল তাহা বুঝিতে হইলে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে তিনটি বিশেষণ সর্বদাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেই তিনটি স্মরণ করিতে হইবে: historical, descriptive, exhaustive। একটি সহজ দৃষ্টান্ত হইতে বোধ হয় সাধারণ ব্যাকরণ হইতে Wackernagel-এর ব্যাকরণের পার্থক্য বুঝা যাইবে। সংস্কৃত ভাষার প্রথম অক্ষর 'অ'। সাধারণ ব্যাকরণে অ-সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু Wackernagel দেখাইয়াছেন ইন্দো-ইউরোপীয় কোন্ কোন্ বর্ণ (=sound) হইতে সংস্কৃত অ-বর্ণের উৎপত্তি, যথা অ, এ, ও, ম্, ন্ ইত্যাদি। কেবল এইটুকু প্রমাণ করিলেই চলিবে না যে এই সকল ইন্দো-ইউরোপীয় বর্ণ হইতেই সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায় অ-বর্ণের উৎপত্তি হয়; সংস্কৃত ভাষার যে শব্দের মধ্যেই অ-বর্ণ আছে সেই শব্দ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইতে হইবে ইন্দো-ইউরোপীয় কোন্ বর্ণ হইতে সেই বিশেষ অ-বর্ণের উৎপত্তি। এই কাজ যে কত দুরূহ তাহা

সহজেই অনুমেয়। এইরূপে পাণিনীয় ব্যাকরণেরও অনেক ভ্রম Wackernagel সংশোধন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, 'সতীর্থ্য' প্রভৃতি শব্দের প্রথম অক্ষরটি সাধারণতঃ 'সহ'-শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে,—পাণিনির ভাষায় "সহস্য সঃ"। কিন্তু Wackernagel দেখাইলেন 'সতীর্থ্য' শব্দের স-অক্ষরটির আদি রূপ ছিল 'সম্'। কিন্তু 'সম্'-এর 'ম্' বাদ গিয়া যে 'স' হইয়াছে তাহা নহে; 'সম্'-এর 'অ' লুপ্ত হওয়ায় প্রথমে হইয়াছে 'স্ম্,' এবং তাহা হইতে উৎপন্ন 'স'। ঠিক এইরূপেই আদিম 'ন্' হইতেও সংস্কৃত ভাষায় অ-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই আদিম 'ম্' ও 'ন্' ছিল প্রকৃত-পক্ষে স্বরবর্ণ, এবং স্বরবর্ণের যেমন হ্রস্ব দীর্ঘ আছে এইগুলিরও সেইরূপ হ্রস্ব দীর্ঘ ছিল। হ্রস্ব 'ন্' হইতে যেমন 'অ' হইয়াছে, দীর্ঘ 'ন্' হইতে সেইরূপ হইয়াছে 'আ'। হন্-ধাতু হইতে 'হত' হয় কিন্তু খন্-ধাতু হইতে 'খাত' হয় কেন? তাহার কারণ 'খন্'-ধাতুর 'ন্'-টি দীর্ঘ 'ন্'।—আর বোধ হয় দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন নাই। সংস্কৃত ভাষার—বিশেষ করিয়া বৈদিক ভাষার—প্রত্যেক শব্দের প্রত্যেক অক্ষর Wackernagel-এর ব্যাকরণে এইরূপে আলোচিত হইয়াছে। পরাধীন জাতির আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে না, নহিলে Wackernagel-এর ব্যাকরণ ভারতবাসীর দ্বারা রচিত নয় বলিয়া আমরা লজ্জিত হইতাম। কিন্তু কৃতজ্ঞতা ইতর প্রাণীর মধ্যেও দেখা যায়,—অন্ততঃ সেই কথা স্মরণ করিয়াও আমাদের স্বর্গত অধ্যাপক Wackernagel এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা উচিত।

১৮৫৩ সালে Switzerland-এর Basle শহরে Jacob Wackerngel-এর জন্ম হয়। যে বংশে তাঁহার জন্ম সে বংশ বহু কাল হইতে ইউরোপে বিদ্বানের বংশ বলিয়া পরিচিত। একাধিক Wackernagel ইউরোপীয় কলা ও বিজ্ঞানের বহু বিভাগ সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। Jacob Wackernagel-এর পিতাও ছিলেন Basle বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পিতার প্রভাব বশতঃই Wackernagel ক্রমশঃ ভাষাতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। হিট্লারী বিভীষিকার অভ্যুদয়ের পূর্বে জার্মানীতে উচ্চ শিক্ষা লাভের যে পদ্ধতি ছিল Wackernagel সেই পদ্ধতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে এক প্রকার নিয়মই ছিল যে উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রগণ আপন রুচি অনুযায়ী অধ্যেয় বিষয় ও অধ্যাপকের অনুসন্ধানে

এক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে। মধ্য যুগের খৃষ্ট সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিদ্যার ক্ষেত্রে যে একটা উদার আন্তর্জাতিকতা ছিল হিট্লারের আগে পর্যন্ত জার্মানীতে সেটি অন্ততঃ আংশিকভাবেও অক্ষুণ্ণ ছিল। ছাত্রগণ যে কেবল জার্মানীরই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাস্বাদন করিয়া বেড়াইত তাহা নহে, সম্ভব হইলেই তাহারা Italy, France, England প্রভৃতি অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েও কিছু দিন কাটাইয়া আসিত। সেই জন্য Wackernagel Basle-বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াই এই বিদ্যাপরিক্রমায় বাহির হন,—প্রথমে Oxford, তাহার পরে Goettingen ও Leipzig। Goettingen-এ আসিয়া Wackernagel-এর মনের মত গুরু মিলিল। এই গুরু স্বনামধন্য অধ্যাপক Theodor Benfey। Europe-এ যাঁহারা বেদ চর্চার প্রবর্তন করেন Benfey তাঁহাদের অন্যতম। জার্মানীর আধুনিক বীভৎস যুগে জন্মাইলে Benfey-কে অবশ্য আর বেদচর্চা করিতে হইত না, Dachau কিম্বা ঐরূপ কোন স্থানেই জীবনান্ত করিতে হইত, কারণ তিনি ছিলেন ইহুদী। Benfey-এর নির্দেশক্রমেই Wackernagel বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বেদচর্চায় নিযুক্ত হইয়া Wackernagel যে অন্যান্য বিষয় বিস্মৃত হইয়াছিলেন তাহা নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে গ্রীক্, ল্যাটিন ও সংস্কৃত—এই তিন ভাষাতেই তিনি ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরূপে পরিগণিত হইতেন। গ্রীক্ সাহিত্যে Wilamowitz-Moellendorff যে স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন গ্রীক্ ভাষায় Wackernagel-এর ছিল সেই স্থান। Schulze, Kretschmer, Sommer প্রভৃতি ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যের দুর্ধর্ষ পণ্ডিতগণও Wackernagel-কে সব সময় সমীহ করিয়া চলিতেন। ইঁহারা তিন জন চিরজীবন পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু Wackernagel-এর কথা ইঁহাদের প্রত্যেকেই প্রায় দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিয়া লইয়াছেন। Brugmann-এর মৃত্যুর পর এক Meillet ভিন্ন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে Wackernagel-এর সমকক্ষ আর কেহ ছিল না।

এত গুণের অধিকারী হওয়াতে Wackernagel-কে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনা করিতে হইয়াছে। ১৮৮১ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্যন্ত Wackernagel সেই বিখ্যাত দার্শনিক Friedrich Nietzsche-র উত্তরাধিকারী-

রূপে Basle বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক্ ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। তাহার পর চতুর্দশ বৎসর Goettingen-বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনায় অতিবাহিত হয়। মহাযুদ্ধের সময় Wackernagel জার্মানী পরিত্যাগ করিয়া আবার তাঁহার জন্মস্থান Basle-এ ফিরিয়া আসেন। Goettingen-এর চতুর্দশ বৎসরই Wackernagel-এর জীবনের স্বর্ণময় যুগ। সেই সময়ে ভাষা ও সাহিত্যে Goettingen-বিশ্ববিদ্যালয় জার্মানীতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিল। Oldenberg ও Kielhorn তখন সেখানে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা করিতেন, Schwartz ও Leo ছিলেন গ্রীক্ ও ল্যাটিনের অধ্যাপক, এবং ইরানীয় ভাষাতত্ত্বের ভার ন্যস্ত ছিল অধ্যাপক Andreas-এর উপর। পৃথিবীর সকল দেশ হইতে উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রগণ তখন Goettingen-এ আসিয়া সমবেত হইত। এই যুগের Goettingen-এ Wackernagel ছিলেন ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। Goettingen-এ অবস্থান কালে তিনি বিশেষ ভাবে Andreas-এর প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং Wackernagel ও Andreas-এর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব তাঁহাদের ইরানীয় গাথার যুক্ত-সম্পাদনার মতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। Andreas একটু অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি নাকি কখনই বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না। দিনের বেলা লোকে আসিয়া প্রায়ই বিরক্ত করিত বলিয়া তিনি দিনকে রাত্রিতে পরিণত করিয়াছিলেন; অর্থাৎ, দিনের বেলা ঘুমাইতেন এবং সারা রাত্রি পড়াশুনা করিতেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু বিশেষ উপলক্ষ্য ব্যতীত কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইতেন না। ছাত্রদের তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার প্রাতঃকালে (অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায়) পড়িয়া যাইতে হইত। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে সারা জীবন গভীর ভাবে বিদ্যাচর্চায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছুই ছাপাইয়া যান নাই, কারণ লোকসমক্ষে নিজের বিদ্যাবত্তার কোন রূপ পরিচয় দেওয়া তিনি অপরাধ বলিয়া মনে করিতেন। Carlyle-এর Teufelsdroeckh-এর এমন দৃষ্টান্ত বোধ হয় আর পাওয়া যাইবে না। Wackernagel ছিলেন অনেক বিষয়ে এই Teufelsdroeckh-এর Heuschrecke।

Goettingen হইতে প্রত্যাবর্তনের পর Wackernagel Basle-এ পুনরায় গ্রীক্ ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন, কিন্তু অল্প দিন পরেই তিনি

গ্রীকের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া Basle-এই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। জীবনের শেষ কুড়ি বৎসর তিনি এই পদেই নিযুক্ত ছিলেন।

তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে Wackernagel-এর আর একটি বিরাট কাজ তাঁহার Vorlesungen uebor Syntax (২ খণ্ড)। Brugmann, Delbrueck প্রভৃতির কেহই ব্যাকরণের সূক্ষ্মতমাংশ Syntax ভাষাতত্ত্বের আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন নাই। Wackernagel এই গ্রন্থে তাহাই সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় Wackernagel এই গ্রন্থে সংস্কৃত ভাষার Syntax-এর বিশেষ কোন আলোচনা করেন নাই, প্রধানতঃ গ্রীক্, ল্যাটিন ও প্রাচীন জার্মান ভাষার Syntax-এরই আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল Altindische Grammatik-এর পঞ্চম খণ্ডেই সংস্কৃত ভাষার Syntax-এর বিশদ আলোচনা করা। Wackernagel-এর এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে Syntax-এর আলোচনা কিরূপে হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধেই ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ-বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিতেন তাঁহারা সমজাতীয় কতকগুলি বাক্য বা বাক্যাংশ একত্র করিয়া সেগুলির একটি গ্রীক্ নাম দিয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করিতেন। ইউরোপে (এবং ভারতবর্ষেও) অধিকাংশ লোক Brugmann-Delbrueck-এর সেই প্রাচীন পন্থাতেই Syntax-এর চর্চা করিয়া চলিতেছিলেন, ফলে Syntax প্রায় indexing-এ পরিণত হইয়াছিল। Wackernagel-এর করস্পর্শে মৃতপ্রায় Syntax আবার নব জন্ম লাভ করিয়াছে। Brugmann, Bartholomae প্রভৃতি লেখক ভাষাকে জড়পদার্থরূপে কল্পনা করিয়া তৎপ্রতি বিবিধ অমোঘ রীতি (laws) প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী ছিলেন। Wackernagel কিন্তু তাঁহার অসংখ্য রচনায়, এবং বিশেষ করিরা তাঁহার Syntax-এর উপর গ্রন্থে, দেখাইয়াছেন মানুষের ভাষা বুঝিতে হইলে আগে তাহার মন বোঝা দরকার। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত হইতে Wackernagel-এর চিন্তাপ্রণালী সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে। বহুদিন হইতেই অনেকে অনুমান করিয়া আসিতেছিলেন যে সংস্কৃত "মূল" কথাটির সহিত সম্পৃক্ত জার্মান "Maul"; কিন্তু এই কথাটির অর্থ 'মুখ'। Wackernagel এই অর্থগত বৈষম্য দূর করিয়া দিলেন।

তিনি দেখাইলেন যে ভারতীয়গণ মূলকে বাস্তবিক মুখ বলিয়াই মনে করিত, নহিলে সংস্কৃত ভাষায় গাছকে "পাদপ" বলা হইবে কেন!

Wackernagel যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন তাহার অনেকগুলি আকারে এক একটি পৃথক্ গ্রন্থের মত এবং পরে সেগুলি পৃথক্ গ্রন্থরূপে প্রকাশিতও হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত তাঁহার "Dehnungsgesetz der griechischen Komposita"। ইহাতে তিনি প্রমাণ করিয়া দেন যে সংস্কৃত, গ্রীক্ প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় শব্দের রূপ অনেক সময়ে ছন্দের দ্বারা নিরূপিত হয়, এবং এই ছন্দের অনুরোধ অধিকাংশ স্থলেই ব্যাকরণের নির্দেশ অপেক্ষা প্রভাবশালী।—এই সম্বন্ধে আমার নিজেরও কিছু গবেষণা আছে। আমি সেইগুলি Wackernagel-কে পাঠাইলে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে চিঠি লেখেন এবং বলেন তাঁহার স্বাস্থ্য যদি আবার ফিরিয়া আসে তবে তিনি নিজেই আমার সঙ্কেত অনুযায়ী এই বিষয়ের আবার আলোচনা করিবেন।—Wackernagel-এর কতকগুলি অতি উপাদেয় প্রবন্ধ বাহির হয় "Sitzungsberichte der preussischen Akademie"-তে। এইগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে বাহির করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ এইগুলিতে সংস্কৃত ভাষা ও অবেস্তার আলোচনাই আছে বেশী। গ্রীক্ ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে Wackernagel-এর যে সমস্ত বই আছে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত "Sprachliche Untersuchungen zu Homer"। আধুনিক যুগে ইউরোপে কেবলমাত্র Meillet-ই ছিলেন Wackernagel-এর সমকক্ষ। Meillet Wackernagel-এর সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা Wackernagel-এর স্মৃতিতর্পণে প্রত্যেক ভারতবাসীর স্মরণ করা কর্তব্য :—cette rigueur de méthode linguistique, cette exactitude de philologue parfait, cette critique jamais en défaut, cette pénétration toujours présente, cette production exhaustive et de faits et de la bibliographie, que M. Wackernagel porte avec aisance.

ব্যক্তিগত জীবনে Wackernagel অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন। আমার অধ্যাপকগণের অনেককে বলিতে শুনিয়াছি "Wackernagel ist furchtbar

fromm"। তাঁহার সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় কখন ঘটে নাই, তবে পত্রব্যবহার প্রায়ই হইত। যখনই কোন বিষয়ে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিয়াছি, তখনই তাঁহার নিকট হইতে আশানুরূপ উত্তর পাইয়াছি। আমার "Lingustic Introduction to Sanskrit" পাইয়া তিনি আমাকে লেখেন "তোমার কাজ দিয়া ভারতে ভাষাতত্ত্বের নবযুগ প্রবর্তিত হইবে"। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভারতীয় ভাষাতাত্ত্বিকদের সম্বন্ধে Wackernagel-এর উচ্চ ধারণা ছিল না।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

ভারতপথে*

(২৩)

মিসেস মূর ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার কর্ত্তব্য কি আবার তোমাদের কিছু বলা? মনে তো হয় তাই—যে ভাবে কেবলই আমার কথায় বাধা দিচ্ছ।"

"যদি শোনবার মতন কিছু থাকে তো শুনতে রাজি আছি।"

"উঃ, কি রকম সব তুচ্ছ আর বাজে কথা—একবারে হয়রান ক'রে দেয়"—ওঁর মনে হোলো 'ভালবাসা' 'ভালবাসা' ব'লে উনি যখন ঠাট্টা করেছিলেন ঠিক তখনকার মতন ওঁর মন বহু দূর থেকে অন্ধকার পেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে চলেছে। "এখন পর্য্যন্ত কেন সব কিছুই আমার কর্ত্তব্য? তোমাদের এই ল্যাঠা যে কবে চুকবে? ওকি গুহার মধ্যে ছিল, আর তুমি কি গুহার মধ্যে ছিলে, আর হ্যানো আর ত্যানো…আর আমাদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করল, আমরা একটি পুত্ররত্ন লাভ করলাম…আর আমি কি ভালো আর সে খুব খারাপ আর আমরা কি রক্ষা পেলাম?…আর সব নিকেশ করে দাঁড়ালো সেই প্রতিধ্বনি।"

এডেলা ওঁর কাছে সরে গিয়ে বলল, "আজকাল আর প্রতিধ্বনি তেমন শুনতে পাই না। আপনি ওটাকে তাড়িয়েছেন। সত্যি আপনি শুধুই উপকার করতে আছেন—কি রকম যে আপনি ভালো।"

"আমি ভালো নই—আমি খারাপ।" অপেক্ষাকৃত শান্তস্বরে এই কথা বলে মিসেস মূর আবার তাসে মন দিলেন, তারপর হাতের তাস উলটে রাখতে রাখতে তিনি বললেন, "অতি বদ এক বুড়ি—বদ, বদ, একেবারে জঘন্য। ছোট ছেলেমেয়েরা বড় হ'য়ে উঠছিল, আমিও ছিলাম ভালো, আর এই ছোকরার

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—পঃ সঃ

সঙ্গে দেখা ওর মসজিদে, আমি চেয়েছিলাম ও সুখী হোক্। বেশ ভালো আর সুখী এই সব সাধারণ লোক। কোথাও এরা নাই, এরা ছিল শুধু স্বপ্ন।... কিন্তু ও যা করেনি তার জন্য তোমরা যে ওকে যন্ত্রণা দেবে তাতে আমি নাই। অন্যায়ের পথ একাধিক—আমার কাছে আমার পথই প্রশস্ত।"

ন্যায়বিচারশীল রাজকর্ম্মচারীর যোগ্য সুরে রণি জিজ্ঞাসা করল, "আসামীর স্বপক্ষে তোমার কিছু প্রমাণ আছে? যদি থাকে তাহলে আমাদের বদলে তার হ'য়ে স্বাক্ষীর কাঠগড়ায় হাজির হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।"

"তোমরা যাকে বলো চরিত্র, কার যে কি রকম তাতো বোঝা যায়।" এই ভাবে উনি কথাটা বললেন যেন চরিত্র ছাড়া আরো বেশি কিছুর সন্ধান উনি পেয়েছিলেন, কিন্তু কথায় তা বোঝাতে পারছিলেন না। "ইংরেজ বলো, এ দেশের লোক বলো, সবাইকেই শুনেছি ওর সুখ্যাতি করতে; মনে হয় তাই এরকম কাজ ও করবে না।"

"না, এতে চলবে না।"

"একেবারেই না।"

"আর এডেলার দিক একেবারে যে তাকিয়ে দেখলে না।"

এডেলা বলল, "আমি যদি ভুল ক'রে থাকি তো কি ভীষণ! আমি তাহলে আত্মহত্যা করব।"

রণি একেবারে খাপ্পা হ'য়ে ওকে বলল, "এক্ষুনি কি বলছিলাম তোমাকে? তুমি যে ভুল করোনি তা বেশ ভালোই জানো আর গোটা সিভিল ষ্টেশন তা জানে।"

"হ্যাঁ, ও...সত্যি, ভয়ানক ব্যাপার। ও যে আমার পিছন পিছন গিয়েছিল তাতে আমার একটুও সন্দেহ নাই...শুধু, এই মামলা এখন তুলে নেওয়া যায় না? সাক্ষী দিতে হবে এই ভেবে আমার ক্রমেই ভয় বাড়ছে। মেয়েদের সঙ্গে এদেশে তোমরা সবাই এত ভালো ব্যবহার করো আর ইংল্যাণ্ডের থেকে এখানে তোমাদের হাতে এত বেশি ক্ষমতা—ঐ দেখ না মিস্ ডেরেকের মোটরকার। অবশ্য, ওটা একেবারে আলাদা কথা—আমার বলাই উচিত হয়নি, কি যে আমি। আমাকে ক্ষমা করো।"

রণি যেমন তেমন ক'রে বললো, "তা যদি বলো তো ক্ষমা করছি। কিন্তু এই মামলা এখন কোনো ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উঠবে, না উঠে উপায় নাই, কল ঘুরতে আরম্ভ করেছে।"

"কলে দম ওই দিয়েছে। এখন শেষ পর্য্যন্ত চলবে।" এই রূঢ় উক্তিতে এডেলার দশা হোলো প্রায় কাঁদ কাঁদ। রণি বিলাতগামী সব জাহাজ ছাড়ার তারিখের এক ফর্দ্দ তুলে দেখতে আরম্ভ করল। ওর মাথায় ভারি এক বুদ্ধি এসেছিল—অনতিবিলম্বে ওর মার এদেশ পরিত্যাগ করা উচিত, উনি থেকে উপকার হচ্ছিল না ওঁর নিজের না অন্য কারও।

মিসেস মূর যাবার পর গরম একেবারে দেখতে দেখতে বেড়ে গেল। ক্রমে ১১৩ ডিগ্রিতে গিয়ে ঠেকল থার্ম্মোমিটার, এই অসহ্য উত্তাপের মধ্যেই সবাইকে করতে হোলো জীবনভার বহন, আর অপরাধীর দণ্ডবিধান। ইলেকট্রিক পাখা বনবন ঘোরে, আর খসখসের টাট্টির উপর থেকে থেকে জল ছিটিয়ে দেয়, গেলাসে গেলাসে শোনা যায় বরফের ঠুন্ঠান্ আর এই সবের বাইরে ধূসর আকাশ আর পীতাভ মাটির মাঝখানে চলে ধূলোর খেলা—থম্‌কে থম্‌কে। ইউরোপে মানুষ ঠাণ্ডার কবল থেকে পালিয়ে বাঁচে, তাই সৃষ্টি হয়েছে আগুন পোহানোর সময়ের আশ্চর্য্য সব কাহিনী—বলডার, পারসিফোন প্রভৃতি, কিন্তু এদেশে মানুষের পালায় একেবারে জীবনের উৎস—বিশ্বাসঘাতী সূর্য্যের কাছ থেকে। কবিতা দিয়ে একে চিত্রিত করা হয় নাই কেননা এ হোলো বাস্তবের নির্ম্মম প্রকাশ, এর মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকতে পারে না। মানুষ চায় কাব্য, মুখে তা স্বীকার না করলেও; মানুষ চায় আনন্দের মধ্যে শোভনতা, দুঃখের মধ্যে মহিমা আর অসীমের মধ্যে চায় রূপ, ভারতবর্ষ এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে না। মানুষের সংযত আশা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের মন্তব্য বৈশাখের তাণ্ডব, যখন উষ্ণ মেজাজ আর উগ্র প্রবৃত্তি ক্ষতের মতন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর চাইতে মাছেরা থাকে ভালো, পুকুরের জল যত শুকিয়ে যায় তত তারা গিয়ে ঢোকে কাদার মধ্যে, আবার বর্ষা নামলে কাদা গ'লে বেরোবে এই আশায়। কিন্তু মানুষেরা চায় গোটা বছরই সব কিছুই মানিয়ে নিয়ে কাটাতে, ফলে মাঝে

মাঝে সব কিছুই যায় ওলটপালট হ'য়ে। সভ্যতার জয়রথ হঠাৎ যায় বিগড়ে, তখন পাথরের মতন তা অচল হ'য়ে পড়ে; এই রকম যখন ঘটে তখন ইংরাজদের অবস্থা হয় তাদের পূর্ব্বগামীদের মতন, তারাও এদেশে এসেছিল ঢেলে সাজবার সঙ্কল্প নিয়ে। কিন্তু শেষে এদেশের ছকের সঙ্গে নিজেরাই গেল মিশে, এদেশের ধুলোয় পড়ল তারা ঢাকা।

এডেলা বহু বৎসর ছিল বুদ্ধিবাদী, ধর্ম্মতন্ত্রের ধার ধারত না, কিন্তু সম্প্রতি আবার প্রতিদিন সকালে ক্রিষ্টানি ঢঙে ও নমাজ সুরু করেছিল। এতে লোকসান কিছু ছিল না, অপার্থিব শক্তির সঙ্গে যোগাযোগের এই হোলো প্রশস্ততম পথ, আর এরই সঙ্গে ওর যা কিছু দুঃখ কষ্ট ও নির্ব্বিবাদে জুড়ে দিত। হিন্দুর কেরাণীরা যেমন লক্ষ্মীর কাছে বেতন বৃদ্ধির কামনা জানায়, তেমনি জেহোভার কাছে ও প্রাণপণে চাইত মামলার রায় ওদের মনমত হোক। ভগবান যদি রাজাকে রক্ষা করেন নিশ্চয় পুলিশকেও তিনি সমর্থন করবেন। ইষ্টদেবতার কাছে ও আশ্বাস পেল বটে, কিন্তু ওর নিজেরই হাতের ছোঁয়া লেগে ওর মুখে হোলো ঘামাচি আর সারারাত ওর বুকের ওপর যে এক নিরেট হাওয়ার তাল ছিল ভর ক'রে, সেই গোটা তালটাই যেন ও গিলে আবার থুথু ক'রে ফেলে দিল—অন্তত ওর তাই মনে হোলো। এর ওপর ওর কানে এল মিসেস টার্টনের গলা। পাশের ঘর থেকে তিনি ডাকছেন, "তুমি তৈরি হয়েছ ?"

"এই যে, এক্ষুণি যাচ্ছি।" মিসেস মূরের প্রস্থানের পর টার্টন-দম্পতী ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। অসম্ভব তাঁদের অনুগ্রহ কিন্তু এর কারণ ওর প্রতি ব্যক্তিগত স্নেহ নয়, ওর বর্ত্তমান অবস্থা—ও হোলো নির্য্যাতিত এক ইংরাজ মেয়ে যার জন্যে করা যায় না এমন কিছু নাই। কিন্তু ওর মনের কথা এক রণি ছাড়া কেউ বুঝত না, রণিও তা বুঝত খুব অস্পষ্টভাবে, কেননা আমলাগিরি এসে পড়লেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সহজ সম্বন্ধ খানিকটা না বিগড়ে উপায় নাই। বিমর্ষ মনে এডেলা রণিকে বলল, "আমার জন্যে তোমার শুধু ঝঞ্ঝাট; সেই ময়দানে যা বলেছিলাম, তাই ঠিক—আমরা বন্ধু থাকলেই ভালো।" রণি সায় দিল না, কেননা এডেলা যত দুঃখ পায় ওর মূল্যও রণির কাছে তত বেড়ে যায়। রণিকে কি এডেলা সত্যি ভালবেসেছিল ? মারাবারের সঙ্গে এই প্রশ্ন কেমন যেন গুলিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রথম গুহায় ঢোকবার সময়ে এডেলার

এই কথা মনে হচ্ছিল। কেনো কাউকে কি ভালবাসার মতন ক্ষমতা এডেলার ছিল ?

"মিস কেষ্টেড, এডেলা—কি যেন বলে সবাই ডাকে—সাড়ে সাতটা বাজল ; এবার তোমার মন হ'লেই আদালতে যাবার কথা ভাবা যেতে পারে।"

কালেকটার সাহেব উত্তর দিলেন, "ও প্রার্থনা করছে।"

"তা বেশ, কোনো তাড়াতাড়ি নাই, তোমার চা-টা সব ঠিকমত দিয়েছিল তো ?"

জেহোভাকে ভাসিয়ে দিয়ে ও বলল, "একেবারে কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না ; একটু ব্রাণ্ডি দিতে পারেন ?"

ব্রাণ্ডি এলে ও শিউরে উঠে বলল, "চলুন, যাওয়া যাক, অমি তৈয়ের আছি।"

"ওটা খেয়ে ফেল, নিতান্ত মন্দ জিনিষ নয়—এই এক চুমুক।"

"না, বড় সাহেব, ওতে বিশেষ সুবিধে হবে মনে হয় না।"

"আচ্ছা, মেরি, আদালতেও ব্রাণ্ডি পাঠিয়ে দিয়েছ, কেমন ?"

"মনে তো হয়—শ্যাম্পেনও।"

প্রত্যেকটা কথা আলাদা আলাদা উচ্চারণ ক'রে—যেন পরিষ্কার বর্ণনা দিলেই তার সব ল্যাঠা চুকে যাবে—মেয়েটি বল্‌ল, "সন্ধ্যা বেলায় আপনাদের কৃতজ্ঞতা জানাব—এখন আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি।" এডেলার ভয় হচ্ছিল যে একেবারে চুপ ক'রে থাকলে এমন একটা অনর্থ হয়তো পাকিয়ে উঠবে যা ও টেরও পাবে না। তাই ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে ও গুহার ভিতর যা যা ঘটেছিল সেই সব দারুণ ঘটনা আনুপূর্ব্বিক একবার আওড়ে নিয়েছিল—বেখাপ্পা কাটা কাটা ভাষায়। লোকটি যে একবারও ওকে ছোঁয়নি অথচ ওকে ক্ষুরপাক খাইয়েছিল,—এই সব ব্যাপার। আজকে সকালে ওর উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার সবিস্তারে জানিয়ে দেওয়া যে এই রকম ভাবে সব বলা ওর পক্ষে একেবারে অসহ্য। আর আসামী পক্ষের কৌঁসুলি অমৃতরাওর জেরার চোটে ও একেবারে ভেঙে পড়ে ওঁদের সকলকে একেবারে ডোবাবে। "আমার সেই প্রতিধ্বনি আবার শুনতে পাচ্ছি—খুব বেশি।"

"একটু এসপিরিন খেলে কেমন হয় ?"

"মাথা ধরেনি তো। শুধু প্রতিধ্বনি শুনছি।"

মেজর ক্যালেণ্ডার ওর কানের ভিতরকার ভন্‌ভন্‌ আওয়াজের কিছু গতিবিধান করতে না পেরে শেষমেষ বলেছিলেন ওটা শুধু ওর কল্পনা সুতরাং আমল না দেওয়াই ভালো। সুতরাং টার্টন-দম্পতী অন্য কথা পাড়লেন। রাত আর দিনের মাঝামাঝি এই সময়টা বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, মিনিট দশেকের মধ্যেই তা ফুরিয়ে যাবে, এই বেলা সহরে যাওয়াই প্রশস্ত।

"আমি নির্ঘাত ভেঙে পড়ব।"

স্নিগ্ধস্বরে কালেক্টার বললেন, "না, না, কিচ্ছু হবে না।"

"মোটেই না—ও খুব বাহাদুর মেয়ে।"

"কিন্তু, শুনুন, মিসেস্ টার্টন…"

"হ্যাঁ, বলো ?"

"ভেঙে যদি পড়িই, কি তাতে আসে যায় ? অন্য সব মামলার কথা আলাদা কিন্তু আমার এই মামলায় তাতে কিছু ক্ষতি হবে না। আমি ভাবছি এই কথা—কেঁদে ফেলি, বা যা তা করি না কেন, রায় ঠিকমতই হবে, যদি ম্যাজিষ্ট্রেট, মিষ্টার দাশ, নিতান্ত অবিচার না করেন।"

রায়ের বিরুদ্ধে যে আবার আপিল হতে পারে তা চেপে গিয়ে টার্টন উৎসাহ দিয়ে বললেন, "তুমি তো জিতে ব'সে আছ।" আসামীর খরচ যোগাচ্ছিলেন নবাব বাহাদুর। দেউলে হতে হয় তাও স্বীকার কিন্তু 'নিরপরাধ এক মুসলমানের সর্ব্বনাশ' তিনি কিছুতে হতে দেবেন না। এছাড়া আসামীর পিছনে আরো সব খুঁটি ছিল—অতটা সম্ভ্রান্ত না হলেও। সুতরাং মামলাটা বোধহয় এক আদালত থেকে আর এক আদালতে ঘুরবে আর ফল যে কি দাঁড়াবে তা ওঁদের ধারণাতীত। ওঁর চোখের সামনে চন্দ্রপুরের লোকদের মেজাজ যাচ্ছিল বিগড়ে। বাড়ির হাতার থেকে ওঁদের মোটর গাড়ি বের হতে ছোট্ট একটা ছেলে টন্‌ করে মারল গাড়ির গায়ে একটা ঢিল। মসজিদের কাছাকাছি বেশ বড় গোছের কটা পাথর এসে পড়ল। ময়দানের কাছে একদল দেশী পুলিশের লোক মোটর সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছিল ওঁদের বাজারের রাস্তা পার করিয়ে দেবার জন্যে। টার্টন বিরক্ত হ'য়ে বললেন, "ম্যাকব্রাইডের কাণ্ড দেখ না, মেয়েদেরও অধম।"

টার্টন-গিন্নি কিন্তু মন্তব্য করলেন, "মহরমের পর এরকম একটু কড়াকড়ি

ব্যবস্থা মন্দ নয়। ওরা আমাদের প্রতি যে বিরূপ নয়, তা ভাণ করে লাভ কি ? ও সব ন্যাকামি ছাড়ো।”

বিমর্ষ বেখাপ্পা সুরে টার্টন সাহেব জবাব দিলেন, “না, ওদের ওপর আমার কোনো রাগ নেই—কেন তা বুঝি না।” কথাটা সত্যি ; কেননা রাগ যদি হোতো, তাহলে ওঁকে স্বীকার করতে হোতো ওঁর এই এতদিনের আমলাগিরি একেবারে পণ্ডশ্রম হয়েছে। এতদিন যাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছেন তাদের সম্বন্ধে খুব অবজ্ঞাপূর্ণ একটু স্নেহের ভাবে ওঁর ছিল—ওঁর পরিশ্রমের নিশ্চয় যোগ্য পাত্র তারা। লম্বা ফাঁকা খানিকটা দেওয়ালের উপর অশ্লীল হিজিবিজি দেখে মনে মনে উনি ভাবলেন, “এদেশে সব কিছুতে অনর্থ ঘটায় আমাদের দেশের মেয়েরা।” মিস কেষ্টেডের প্রতি সম্ভ্রম আর সহানুভূতির তলে তলে ওঁর মনে কি রকম একটা রাগ জমে উঠেছিল, সুবিধা পেলেই তা আত্মপ্রকাশ করবে—বোধহয় মেয়েদের প্রতি সম্ভ্রম ও সহানুভূতির মধ্যে এরকম একটু রাগ সব সময়েই থাকে। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতের সামনে একদল ছাত্র জড় হয়েছিল—রাগে আত্মহারা সব ছোকরা, একলা থাকলে উনি ওদের সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়াতেন—কিন্তু ড্রাইভারকে বললেন গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে আদালতের পিছন দিকে যেতে। ছেলেরা উচ্চৈস্বরে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করল। রাফি নামে একটা চেনা ছেলে পাছে ওঁরা দেখেন তাই এক সঙ্গীর পিছনে লুকিয়ে চীৎকার করে উঠল, “ইংরেজরা কাপুরুষ।”

রণির খাসকামরায় গিয়ে ওঁরা উঠলেন—ওঁদের দলবল আগে থেকেই সেখানে হাজির ছিল। কাপুরুষতার লক্ষণ কারও ছিল না, কিন্তু সবারই মনে ছিল উদ্বেগ, কেননা অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর শোনা যাচ্ছিল। মেথররা সব করেছিল ধর্ম্মঘট, ফলে চন্দ্রপুরের অর্দ্ধেক কমোডের অবস্থা হয়েছিল সঙ্গীন, কিন্তু যত কমোড ছিল তার অর্দ্ধেকের বেশি নয়। ডাক্তার আজিজ যে নিরপরাধ মফঃস্বলের মেথরদের এই বিশ্বাস অতটা প্রবল হয়ে ওঠেনি—তারা নাকি একদল ওবেলার মধ্যে এসে পৌঁছে এই ধর্ম্মঘট পণ্ড করে দেবে। কিন্তু যাই হোক—এ রকম একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটবার কি মানে ? আর একদল মুসলমান মেয়ে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে আজিজ খালাস না হলে তাঁরা খাদ্যস্পর্শ করবেন না। অন্তঃপুরবাসী অদৃশ্য এই মেয়েরা প্রায় মরেই তো ছিলেন, সুতরাং

তাঁদের মৃত্যু এমন কিছু একটা ব্যাপার নয়। কিন্তু তবু, খবরটা ঠিক নির্ব্বিবাদে হজম করার মতনও নয়। কি রকম একটা যেন সাড়া পড়েছিল, সব কিছু যেন বদলে যাচ্ছিল, কেন যে এরকম ঘটছিল তা বুঝিয়ে বলার সাধ্য ঐ ক্ষুদ্র দৃঢ়পণ শেতাঙ্গ দলের পক্ষে কারও ছিল না। এ সবের পিছনে রয়েছেন ফিলডিং এই রকম একটা ভাব দেখা গিয়েছিল; তিনি যে দুর্ব্বলমতি, মাথাপাগলা লোক এই ধারণা গিয়েছিল ঘুচে। ফিলডিংকে ওরা প্রাণপণে গালাগাল দিচ্ছিল; অমৃতরাও আর মামুদ আলি, আসামীর পক্ষের এই দুই কৌঁসুলির সঙ্গে ওঁকে নাকি এক গাড়িতে যেতে দেখা গিয়েছিল; 'বয়-স্কাউট' দলে ওঁর যে উৎসাহ তাঁর মূলে রাজদ্রোহিতা; বিদেশী ডাক টিকিট মারা সব চিঠি নাকি ওঁর কাছে আসত, সম্ভবত উনি জাপানীদের গুপ্তচর। এই আজ সকালেই মামলার রায় বেরোলে ওঁর কারিকুরি ঘুচবে, ওঁর স্বদেশ আর সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি উনি ইতিপূর্ব্বেই করেছিলেন তার আর ইয়ত্তা হয় না। যতক্ষণ ফিলডিং-এর বংশপাত হচ্ছিল, মিস কেষ্টেড চেয়ারের হাতলের উপর হাত রেখে চোখ বুঁজে ছিলেন ব'সে—দেহমনের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে। খানিকটা পরে ওঁকে লক্ষ্য ক'রে ওরা লজ্জিত হোলো—ওরকম গোলমাল করার জন্যে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

গল্প-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী

"There seem to be two extreme and opposed styles of writing : the liquid style that flows and the bronze or marmoreal style that is moulded or carved."—বাঙলা সাহিত্যে এই দুই বিপরীত ষ্টাইলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম চৌধুরীর রচনা। বাঙলা ভাষার দুই বিশেষ গুণ, তার গতিশীলতা ও কমনীয়তা, অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ষ্টাইল তৈরী ক'রলেন। অপূর্ব্ব কারুকার্য্যে সমৃদ্ধ হ'য়ে, বিচিত্র ভঙ্গীতে এঁকে বেঁকে তাঁর ভাষা ক্রমাগত এগিয়ে চলে। উপকরণের বাহুল্যে ও গতির তোড়ে সে ভাষার ঐশ্বর্য্য অনেক সময় পাঠকের মনে বেশীক্ষণের জন্য স্থায়ীত্ব লাভের অবকাশ পায় না। বর্ণ ও গতি হচ্ছে রবীন্দ্র-ষ্টাইলের ধর্ম্ম। প্রমথ চৌধুরী অতি বেশী গতিমুখী বাঙলা ভাষায় মন্থরতা সৃজন ক'রলেন। গতিকে প্রতিহত ক'রে ভাষার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বেগ ও সূক্ষ্ম ধ্বনির উদ্ভাবন তাঁর ষ্টাইলের অন্যতম কৃতিত্ব। প্রতিটি শব্দ স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, যথাস্থানে দৃঢ়ভাবে বসানো,—একে অন্যের মধ্যে কখনো নিজের সুস্পষ্ট অর্থ ও ধ্বনিকে নষ্ট করে না। নিজের রচনা সম্বন্ধে ভার্জ্জিল নাকি ব'লেছেন, মেষ-শাবকের জননী যেমন তাকে লেহন ক'রে শুদ্ধ করে, তিনিও তেমনি সযত্ন প্রয়াসের সঙ্গে বার বার ঘষে-মেজে নিজের রচনার আবিলতা দূর করেন। প্রমথ চৌধুরীর ধর্ম্মও অনেকটা ভার্জ্জিলের মত। "মস্তিস্কের বকযন্ত্রে" প্রতিটি শব্দ শোধন ক'রে তিনি তার ভার কমিয়ে ধার বার ক'রে নূতন ক'রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রমথ চৌধুরীর লক্ষ্য হ'চ্ছে তাঁর বক্তব্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ, যথাযথ অথচ রসঘন, প্রত্যক্ষ ও সাকার ক'রে তোলা। সব কিছু গোচরীভূত ক'রে তোলার দিকে অত্যন্ত ঝোঁক থাকার ফলে তাঁকে বড় বেশী epigram ও antithesis-এর আশ্রয় নিতে হয়। স্থানে স্থানে এ দুয়ের অতিব্যবহার জটিলতা সৃষ্টি করে। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা উড়ে চলে না, পাঠকের মনে দাগ কেটে তা' ব'সে পড়ে। তাঁর মতে "অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির ক'রবার

নামই হ'চ্ছে রচনাশক্তি।" এ কাজে তিনি যে কী সিদ্ধহস্ত তার একটা নমুনা দিচ্ছি।—

"ছাই-রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যে রকম আলো দেখা যায় সেই রকম আলো। আকাশ-জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনও দেখিনি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি প'ড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত, স্তম্ভিত, মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়েছিল। চার-পাশে তাকিয়ে দেখি গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর-দোর, সব যেন কোনও আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মত দাঁড়িয়ে আছে; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাসছে। মরার মুখে হাসি দেখ্‌লে মানুষের মনে যে রকম কৌতূহল-মিশ্রিত আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে রাত্তিরের দৃশ্য দেখে আমার মনে ঠিক সেইরকম কৌতূহল ও আতঙ্ক, দুই-ই এক সঙ্গে উদয় হ'য়েছিল। আমার মন চাচ্ছিল, হয় ঝড় উঠুক, বৃষ্টি নামুক, বিদ্যুৎ চমকাক্, বজ্র পড়ুক, নয় আরো ঘোর ক'রে আসুক্—সব অন্ধকারে ডুবে যাক। কেননা, প্রকৃতির এই আড়ষ্ট দম-আট্‌কানো ভাব আমার কাছে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে অসহ্য হ'তে অসহ্যতর হ'য়ে উঠ্‌ছিল, অথচ আমি বাইরে থেকে চোখ তুলে নিতে পারছিলাম না—অবাক্ হ'য়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কেননা, এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল।"

কথা-সাহিত্যে সাধারণতঃ দুই জাতের লেখকের দেখা মেলে। এক হ'চ্ছে, যাঁদের সৃষ্টির উৎস ও উদ্দেশ্য তাঁদের স্ব স্ব বিশেষ আইডিয়া। সমস্যাবহুল বর্ত্তমান জগতে ঐ ধরণের সাহিত্যিকের সংখ্যা বেড়ে চ'লেছে। অপর যে শ্রেণী, তাঁরা সৃষ্টির প্রেরণা কোন বিশেষ আইডিয়া থেকে লাভ করেন না, লাভ করেন বস্তুর রূপের মধ্য থেকে। এঁরা নির্লিপ্ত দর্শক। প্রমথ চৌধুরী এই শেষোক্ত শ্রেণীর একজন। "পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানস-প্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি ক'রে" তাকে আনন্দঘন ও স্বপ্রকাশ ক'রে তোলা প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সাহিত্যের আর্ট। এরিষ্টটল ব'লেছিলেন—There is no Excellent Beauty that hath not some Strangeness in the Proportion"। প্রমথ চৌধুরীর রচনা এ উক্তির অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যক্ষ নিদর্শন। অতি সাধারণ জিনিষ সম্বন্ধেও যখন তিনি কোন কিছু বলেন তখন অদৃষ্টপূর্ব্ব ও

অপ্রকাশ তার এমন সব দিক প্রকাশ করেন এবং এমনি একটু মোচড় দিয়ে তা' ক'রে থাকেন যে, নতুন আবিষ্কারের বিস্ময় ও আনন্দে পাঠকের মন নাড়া পেয়ে সচেতন হ'য়ে ওঠে। বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা করাকে তিনি বর্ণনা ব'লে জ্ঞান করেন না ; সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ ক'রে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করারই নাম বর্ণনা। এ শক্তির প্রাচুর্য্য প্রমথ চৌধুরীর রচনায় বিস্ময়কর। তাঁর গল্প অনেক সময় স্বল্প হ'য়েও যে সার্থক হ'য়ে ওঠে তার কারণ তাঁর এই অনন্যসাধারণ ক্ষমতায় নিহিত। প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস "ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হ'চ্ছে সকল জ্ঞানের মূল।" এ জ্ঞানের তিনি যে কিরূপ আশ্চর্য্য অধিকারী তার পরিচয় তাঁর লেখার সর্ব্বত্র ছড়ানো। ক্রমাগত ভাবের রাশ টেনে টেনে, জগৎকে তিনি ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব ক'রেছেন। ভাব ও আবেগকে "মস্তিষ্কের বকযন্ত্রে" বার বার চুঁইয়ে নিয়ে তিনি তার নির্য্যাস বার করেন। "অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি ভাষায় পরিণত না হ'লে" তাঁর তৃপ্তি হয় না। তাই তাঁর গল্পের সৌন্দর্য্য ভাব-প্রধান নয়, রূপ-প্রধান।

জীবন প্রমথ চৌধুরীর নিকট ট্রাজি-কমেডির সংমিশ্রণ। এক সঙ্গে ও-দু' রসই তিনি একই বস্তুর মধ্যে দেখে থাকেন। ফলে ও-দুয়ের কোনটিরই মাত্রাধিক্য সাধারণতঃ তাঁর গল্পে লক্ষ্য হয় না। তিনি যে-রস পরিবেশন ক'রে থাকেন তা' হ'চ্ছে ও-দুয়ের অতিরিক্ত এক রস, "যাকে বলা যেতে পারে 'মনন রস'।" অনুভূতি অপেক্ষা বুদ্ধির সঙ্গেই সে রসের যোগ বেশী।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও আঙ্গিকরূপ পরিবর্ত্তন প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বৈশিষ্ট্য। তাঁর কল্পনা নূতন রূপের সন্ধান ক'রে নূতন ভাবে তা ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করে। তাঁর গল্পের ঘটনা ও চরিত্রের বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক অল্প, তারা সাধারণতঃ নিছক কল্পনাজাত। অতি-পরিচিত ঘটনার অতীত অবাস্তব অথবা তুচ্ছ কোন কাহিনী ব্যতীত তাঁর গল্প গ'ড়ে ওঠে না। সেই অবাস্তবতার সঙ্গে অতি-প্রত্যক্ষ সূক্ষ্ম জ্ঞান মিশিয়ে তিনি তাকে রসলোকে উত্তীর্ণ করেন। কল্পনাকে তিনি বাস্তবের মধ্যে সংহত করেন, বাস্তবকে কখনো কল্পনার মধ্যে উধাও হ'তে দেন না। কলাবিদ্যা ও সাহিত্যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন ইংলণ্ডের জনৈক বৈজ্ঞানিক

ব'লেছেন—"'In all probability matter is composed mainly of holes,'....'there is no such thing as matter, there is only holes in the ether.' The World is made out of Nothing, and all Supernal Beauty would seem to be an approach to the Divine Mystery of Nothingness."—এই 'Mystery of Nothingness'-এর আভাস প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ গল্পগুলিতে র'য়েছে। এর কারণও সম্ভবতঃ নির্দ্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রমথ চৌধুরীর গল্প কল্প-লোকের, দ্বিতীয়তঃ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে কোথায় যেন সব কিছুকে "রহস্য—ও পদের সংস্কৃত অর্থেও বটে, বাংলা অর্থেও বটে—অর্থাৎ both a mystery and a joke" হিসেবে গ্রহণ করবার প্রবণতা আছে। এই জন্য তাঁর গল্প পড়া শেষ হ'লে মনে হয় ভোজবাজি দেখা হ'লো, মনে হয় লেখক যেন চোখ টিপে ইঙ্গিত ক'রছেন আগাগোড়া সমস্ত দুনিয়াটাই ভোজবাজি—"both a mystery and a joke।" কিন্তু গল্প-শেষের আগে, গল্পের ঠাস-বুনানি, সব কিছুর সুঠাম রূপ ও বর্ণনা, ভার-সাম্যের তারতম্যের অভাব, পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে লেখকের চরম দৃষ্টিভঙ্গীটি লুকিয়ে রাখে। শুধু গল্প-শেষে তা' চোখে পড়ে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের যে-সব গুণের কথা উল্লেখ করা হ'লো, তাদের সব চেয়ে ভালো দৃষ্টান্ত—'দিদিমার-গল্প', 'নীল লোহিতের' অধিকাংশ গল্প, 'আহুতি,' 'সহযাত্রী,' 'বীণাবাই' ও সর্ব্বোপরি 'চার-ইয়ারী-কথা'। 'চার-ইয়ারী-কথার' প্রথম গল্পের প্রধান চরিত্র—উন্মাদ, দ্বিতীয় গল্পের—প্রবঞ্চক, তৃতীয় গল্পের—প্রথম দুয়ের সংমিশ্রণ, চতুর্থ গল্পের—প্রেতাত্মা। প্রথম গল্পে শুভ্র জ্যোৎস্নার বিস্তার, দ্বিতীয় গল্পে মলিন স্যাঁতসেঁতে বর্ষার আবহাওয়া ও হীনতা, তৃতীয় গল্পে ক্ষণদীপ্ত বিদ্যুতের অস্থির তীব্র বক্রগতি, চতুর্থ গল্পে সম্ভব অসম্ভবের সীমা-বহির্ভূত মধ্যরাত্রির স্বপ্ন। আর এ গল্পগুলির ফাঁকে ফাঁকে বাইরের আকাশের দম-আটকানো, দুষ্ট, মলিন, অপার্থিব, uncanny, মরা আলো ভরে তোলা হ'য়েছে। বিচিত্র বর্ণের সাহায্যে এ গল্প রচিত হ'য়েছে। অথচ কোথাও তারা অস্পষ্ট নয়, অত্যন্ত প্রত্যক্ষ।

যেমন দেহের জগতে তেমনি "আর্টের জগতেও মোটা ভাত মোটা কাপড় অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রয়োজন।" প্রমথ চৌধুরী দেশের উপভোগের উপযোগী রসের সরবরাহ কখনো করেন নি। তাই তিনি লোক-প্রিয় লেখক নন। হাটের লোক তাঁর লেখা-পাঠে আনন্দ-আস্বাদন ক'রতে অক্ষম। অথচ তাঁর হাত দিয়ে এমন কিছু কিছু প্রবন্ধ ও গল্প বেরিয়েছে, যা যে-কোন ভাষার সাহিত্যকে গৌরব-দানের সম্পদ রাখে। তাঁর গল্পগুলি সম্বন্ধে শুধু এই আক্ষেপোক্তি মনে জাগে, যে-আক্ষেপোক্তি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মিল্‌টনের সনেট সম্বন্ধে ক'রেছিলেন—Alas ! too few.

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ

অহিংসা

প্রথম ভাগ

সদানন্দ সাধুর আশ্রমের তিনদিকটা তপোবনের মত। বাকী দিকটাতে একটা নদী আছে। আশ্রম ঘিরিয়া অবশ্য তপোবনটি বাড়িয়া ওঠে নাই, স্থানটি তপোবনের মত নির্জ্জন আর শান্তিপূর্ণ দেখিয়াই আশ্রম গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আশ্রমের বয়স আর কত হইবে, বছর পাঁচেকের বেশী নয়। তপোবনের বড় বড় গাছগুলির কোন কোনটা হয়ত শতাব্দীরও বেশী সময় ধরিয়া নিবিড় ছায়া বিলাইয়া আসিতেছে।

তপোবনের সমস্তটা আশ্রমের সম্পত্তি নয়। দলিলপত্রের হিসাবে দেখা যায়, আশ্রমের ভূমির পরিমাণ শ'খানেক বিঘার কাছাকাছি। তপোবন আরও বিস্তীর্ণ—উত্তরে বাসুপুরের গা-ঘেঁষা প্রকাণ্ড কলাবাগান এবং দক্ষিণে সাতিনার বাগদী পাড়া পর্য্যন্ত এলোমেলোভাবে ছড়ানো আর বড় আমবাগানটা ধরিলে আশ্রমের ভূমির দশ বার গুণ। তবে দলিলপত্রে ছাড়া আশ্রমের সীমানা ভাল করিয়া কোথাও দেখানো নাই কিনা, তাই বন, উপোবন, আমবাগান কলাবাগান সমস্তই আশ্রমের তপোবন বলিয়া মনে হয়।

নদী পূবদিকে।

একটি শাখানদীর এই উপশাখাটিকে স্থানীয় লোক আদর করিয়া ডাকিত রাধা বলিয়া, বোধ হয় আদরের আতিশয্যেই একটা ইকার জুটিয়া এখন হইয়াছে রাধাই।

বড় আশ্চর্য্য নদী। প্রতি বছর বাঁচে আর মরে। আকাশে যেই কালো কালো মেঘ জমিয়া থম থম করে, লোকে জল আটকানোর জন্য চালের ফুটা আর ছাতির ফুটা মেরামত না করিয়া আর উপায় খুঁজিয়া পায় না, রাধাই নদীতে অমনি দেখা দেয় ঘোলা জলের স্রোত। ক'মাস ধরিয়া রোদে যে বালি তাতিয়াছে সে বালি যায় ঢাকিয়া, স্থানে স্থানে যে আবদ্ধ জল পচিয়া উঠিতেছিল সে জল যায় ভাসিয়া। সকলে অবাক হইয়া একবার তাকায় আকাশের দিকে, একবার তাকায় রাধাই নদীর দ্রুতবর্দ্ধনশীল জীবনসঞ্চারের দিকে। বড় রহস্যময়

মনে হয় ব্যাপারটা সকলের কাছে। বৃষ্টি আর হইয়াছে কতটুকু, কদিনের ছাড়া ছাড়া বর্ষণে পথঘাট ভাল করিয়া ভেজে নাই পর্য্যন্ত। কোন পুকুরে জল বাড়ে নাই, কোন ডোবায় জল জমে নাই। রাধাই এত জল পাইল কোথায় ?

দূরদেশে কোথায় ইতিমধ্যে প্রবল বর্ষা নামিয়াছে, কোন্ বড় নদী সেই জল বাহিয়া আনিয়া কোন্ শাখানদীকে দিয়াছে, আর কোন্ শাখানদীর দানে তাদের এই নদীতে দেখা দিয়াছে নবযৌবনের আবির্ভাব, এতসব রহস্যের সন্ধান কয়জনে আর রাখে। চোখের সামনে মরা নদীকে বাঁচিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হয়।

নদীর একেবারে ধারে প্রকাণ্ড চালাটায় বিকালের দিকে সাধুজীর দর্শন-কামীদের সমাগম হয়। আশ্রমের সকলে তো উপস্থিত থাকেই, কাছাকাছি গ্রাম হইতে অনেকে আসে, দূরের গ্রাম ও সহর হইতেও আসে। সদানন্দ সকলকে দর্শনও দেন, দর্শনের মনোমত বাখ্যাও শোনান।

এবার যেদিন প্রথম রাধাই নদীর বুকে স্রোত দেখা দিল, সেদিন অহিংসা ও প্রেমের কথা বলিতে বলিতে সদানন্দ হঠাৎ আনমনে চুপ করিয়া গেলেন। নদীর স্রোতের দিকে পলকহীন চোখে এমনভাবে চাহিয়া রহিলেন যে, কারও বুঝিবার উপায় রহিল না অন্যমনস্ক তিনি ইচ্ছা করিয়া হইয়াছেন। আজ কথা জমিতেছিল না। যার কথা মনের মধ্যে কাঁটার মত বেঁধে, মধুর মত মাখা হইয়া যায়, মধুপের মত গুঞ্জন করে, শুনিতে শুনিতে থাকিয়া থাকিয়া হয় রোমাঞ্চ, আজ যেন তার কথায় জোর নাই, সুর নাই—নিছক কতকগুলি নীরস ভোঁতা শব্দমাত্র পরিবেশন করিতেছেন। অস্বস্তি বোধ করিতে করিতে এতক্ষণে কারণটা টের পাইয়া সকলে স্বস্তি লাভ করে। তাই বটে, সাধুজী আজ অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। কথায় সাধুজীর মন নাই।

পুরুষরা চুপ করিয়া রহিল মেয়েদের মধ্যে শোনা গেল ফিস ফিস কথার গুঞ্জন। এখানে মেয়ে পুরুষের বসিবার পৃথক ব্যবস্থা নাই, সদানন্দ পুরুষ ও নারীর পার্থক্য স্বীকার করেন, পৃথক রাখিবার প্রয়োজন স্বীকার করেন না। এই সভায় যারা বসে তাদের মধ্যে যেমন ছোটবড় নাই, জানা-অজানা নাই, আপন-পর নাই, তেমনি মেয়েপুরুষও নাই। অন্ততঃ সাধুজীর তাই নির্দ্দেশ। তবু-মেয়েরা দল বাঁধিয়া একপাশে তফাতে সরিয়া বসে, ব্যবধানটা ঘুচাইবার

চেষ্টাও পুরুষদের মধ্যে কখনও দেখা যায় না। চালার নীচে স্থানাভাব ঘটিলেও নয়।

চালার কাছে খানিকটা যায়গা গাছপালা কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে গাছের ছায়া নাই। তপোবনের মাথা ডিঙ্গাইয়া বাঁকাভাবে রোদ আসিয়া মেয়েদের বসিবার যায়গায় পড়িয়াছে, বড় তেজ এখনকার রোদের। ঘামে সকলে ভিজিয়া গিয়াছে, তবু সরিয়া ছায়ায় গিয়া বসিবার সাহস কারও নাই। একটি কম বয়সী বিধবা, গায়ের রঙটা যার আশ্চর্য্য রকমের ফর্সা, মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙ্গা করিয়া চোখ বুজিয়া পাশের ঘোমটা-টানা বৌটির গায়ে নির্ল্লজ্জ ভঙ্গিতে হেলান দিয়া আছে। হয় মূর্চ্ছা গিয়াছে, নয় যাওয়ার উপক্রম করিয়াছে।

আনমনে নদীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই সদানন্দ বলিলেন, 'মেয়েদের গায়ে রোদ লাগছে বিপিন।'

বিপিন সদানন্দের বন্ধু, শিষ্য এবং আশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার। একদিন সে সদানন্দের নাম ধরিয়াও ডাকিত, হাসিতামাসাও করিত। আজও অন্তরালে করিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু দশজনের সামনে হঠাৎ ভুল করিয়া বসিবার ভয়ে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সব সময়েই সে শিষ্যত্বের খোলসটা বজায় রাখিয়া চলে।

বিপিন হাত জোড় করিয়া বলিল 'কি করব প্রভু ?'

'ছায়ার ব্যবস্থা করে দাও।'

'দিই প্রভু।'

হোগলার বেড়া আনিয়া চালার খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড় করাইয়া বিপিন অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। আগেও কদিন মেয়েরা রোদে কষ্ট পাইয়াছে, রৌদ্র নিবারণের এমন সহজ উপায় থাকিতে আগে কেন এ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই, কে তা অনুমান করিবে ? হয়ত কারও খেয়াল হয় নাই—সদানন্দেরও নয়। হয়ত তফাতে জমাট বাঁধিয়া বসিবার জন্য মেয়েদের উপর সদানন্দের রাগ হইয়াছিল, তাই কদিন তাদের রোদে ভাজা করিয়া শাস্তি দিয়াছেন। আজ বিধবা মেয়েটির রাঙ্গা মুখখানা দেখিয়া মায়া হইয়াছে। কিন্তু রাগ কি সদানন্দের আছে ? শাস্তি কি কারোকে তিনি দেন ? মায়া কি তাঁর

হয় ? শুধু তাঁকে দর্শন করিয়া আর তাঁর দর্শনের বাখ্যা শুনিয়া কে তা অনুমান করিতে পারিবে !

মেয়েরা ছায়া পাওয়া মাত্র সদানন্দ মুখ ফিরাইলেন। মেয়েদের মৃদুগুঞ্জন সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেল। প্রেম ও অহিংসা সম্বন্ধে না জানি সাধুজী এবার কি বলিবেন ?

'নদীতে এবার অনেক আগে জল এল, না বলাই ?'

কোথায় প্রেম ও অহিংসা, কোথায় রাধাই নদীতে জল আসা। কোথায় সতরঞ্চি জোড়া ভদ্রলোকের ভিড়, কোথায় এককোণে মাটির আসনে সাতুনার মূর্খ দোকানদার বলাই। বলাই নামে একজন যে আসিয়া আসরের একপাশে বসিয়াছে, তাই বা এতক্ষণ কয়জনে খেয়াল করিয়াছিল ? বলাই কৃতার্থ ও নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

তার হইয়া জবাব দিল শ্রীধর। অনেক বয়স হইয়াছে শ্রীধরের, ষাটের কাছাকাছি। সাতুনায় সে সম্পন্ন গৃহস্থ, তিন তিনটা রোজগেরে ছেলে লইয়া মস্ত সংসার পাতিয়াছে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে সে অদ্বিতীয়। সুতাবাঁধা চশমা আঁটিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বাড়ীতে সে রামায়ণ মহভারতের বাছাবাছা অংশ পাঠ করে, মাঝে মাঝে থামিয়া অতি সরল ও সহজবোধ্য কাহিনীর রসালো ব্যাখ্যা করিয়া শোনায়। তার বাড়ীতেও প্রায়ই এরকম সভা বসে,—তবে এত বড় নয়। আর সে সভায় ভদ্রলোক আসে না, সে শুধু চাষীমজুর তেলি-তাঁতি কামার-কুমারের সভা।

বিপিনের অনুকরণে হাত জোড় করিয়া শ্রীধর বলিল 'চারবাদ্‌লা নেমে গেছে আজ্ঞা।'

চারবাদলা নামার সঙ্গে রাধাই নদীতে জল আসার সম্পর্ক কি ? চারবার বৃষ্টি হইয়া গেলেই রাধাই নদীতে নাকি জল আসে। চিরদিনের নিয়ম। টিপ্ টিপ্ করিয়া দু'চার ফোঁটা জলই পড়ুক আর ঝমঝম করিয়া সৃষ্টি-ভাসান বাদলাই নামুক, চারবার বর্ষণ হইয়া গেলে নদীতে জল আসিবেই আসিবে। সদানন্দ মৃদু হাসেন। জবাব দিয়াছে শ্রীধর, কিন্তু স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে তিরস্কার করিয়া বলেন, এসব ধারণা পোষণ করা কেন, এ ধরণের সব কুসংস্কার ? সাধুজীর স্নেহমধুর আবেগভরা ধমক শুনিয়া মনে হয়, আর যেসব কুসংস্কার তাদের আছে

সেসব যেন কিছু নয়, এটাই তাদের কুসংস্কারের চরম। মনে মনে এই কুসংস্কার পুষিয়া রাখিয়া ইহকাল পরকাল সব তারা নষ্ট করিয়াছে। তারপর শুষ্ক নদীতে হঠাৎ স্রোত দেখা দিবার কারণ ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যা করিতে করিতে আসে রহস্যময়ী প্রকৃতির কথা। প্রকৃতির আসল রহস্য কোথায় মানুষ যে তার সন্ধান জানে না, একি সহজ আপশোষ! অজানার মধ্যে মানুষ প্রকৃতির রহস্যকে খুঁজিয়া মরে—রাধাই নদীতে জল সঞ্চারের কারণ না জানায় ভাবে, এই বুঝি তবে প্রকৃতিদেবীর দুর্ব্বোধ্য লীলার অভিব্যক্তি। জানামাত্র যখন অজানার সমস্ত রহস্যের আবরণ খসিয়া যায়, অজানার জন্য মাথা ঘামান কেন? জানার মধ্যে, যে যতটুকু জানে তারই মধ্যে, যে প্রকৃতির সবটুকু রহস্যের খনি নিহিত থাকে। রাধাই নদীতে জলস্রোত আসিবার কারণ নাই বা জানিলে, জলস্রোত যে আসিয়াছে এটুকু তো জান? এই জানাটুকুর মধ্যে সন্ধান কর, রহস্যানুভূতির অজ্ঞাত জগতের দিগন্তে আত্মজ্ঞানের ছায়া নিরবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সঙ্কেতে তোমায় সাড়া দিতেছে দেখিতে পাইবে।

সকলে মসগুল হইয়া শোনে। এতক্ষণে আসর জমিয়াছে। শুধু সদানন্দের বলিবার কৌশলে প্রত্যেকের মনে হয় দুর্ব্বোধ্য কথাগুলি যেন জলের মত বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কি বুঝিয়াছে একথা কেউ ভাবে না, বুঝিতে পারিয়াছে এই ধারণার উন্মাদনায় বিভোর হইয়া থাকে। বিপিনের শীর্ণ ম্লান মুখে আনন্দের ছাপ পড়ে। আজ প্রণামী জুটিবে ভাল।

মাঝে মাঝে দু'একজন নতুন শ্রোতা আসিয়া চুপি চুপি আসরের একপাশে বসিয়া পড়িতেছিল। দেরী হওয়ায় তারা গ্রাম হইতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তপোবনে ঢুকিবার পর আর তাদের ব্যস্ততা নাই। সমস্ত তপোবন পার হইয়া চালায় পৌঁছিতে হয়, সেই অবসরে তপোবন তাদের শান্ত করিয়া দিয়াছে। না, তাড়াহুড়া করিবার কিছু নাই। সাধুজীর কথা যদি শেষ হইয়া যায়, তাতেই বা কি? আরেকদিন সময়মত আসিলেই হইবে। সদানন্দের কথা শুনিবার আগ্রহে যারা ছুটিয়া আসে তাদের সকলের মনেই তপোবন কম বেশী প্রায় এইরকম প্রভাব বিস্তার করে, সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত অধীরতা যেন জুড়াইয়া যায়, আশা-আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থাকে না। পতঙ্গ যেমন মধুতে ডুবিয়া চাপল্য হারায়, তপোবনের উদ্ভিদগুলির রক্ষণাবেক্ষণে যে নিবিড়

শান্তি আছে তার অদৃশ্য ঘনত্বের কবলে আসিয়া পড়ামাত্র মানুষের মনের বিভিন্ন গতিগুলি তেমনি সংযত হইয়া যায়।

তবে সকলের নাগাল তপোবন পায় না। কত অন্যমনস্ক জীব আছে জগতে, কত মন ইন্দ্রিয়ের মৃদুতর উপাচারগুলি নির্ব্বিচারে প্রত্যাখ্যান করে, কত মানুষ নিজের চারিদিকে লইয়া বেড়ায় দুর্ভেদ্য আবরণ। আট বেয়ারার হুম্ হুম্ শব্দে তপোবনকে কিছুক্ষণের জন্য নিছক জঙ্গলে পরিণত করিয়া একটা পাল্কী আসিয়া একেবারে আশ্রমের ভিতরে আসিয়া থামিল, সদানন্দের তিনমহাল কুটীরের সামনে। আসর বসিবার চালা হইতে সদানন্দের কুটীর বেশী তফাতে নয়, একটা বাঁশ ঝাড় এবং কয়েকটা জাম ও বকুল গাছের জন্য চোখে পড়ে না।

না দেখিয়াও অনুমান করা গেল কে আসিয়াছেন। মহীগড়ের রাজা ছাড়া আট বেয়ারার পাল্কীতে আর যাঁরাই চাপুন, আশ্রমে তাঁরা আসেন না। সদানন্দের কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিপিন ব্যস্ত হইয়া নিবেদন করিল, 'রাজাসাহেব দর্শনলাভ করতে এসেছেন প্রভু।'

'এখানে আসতে বল।'

'এখানে প্রভু ?'

সদানন্দের আকস্মিক বিদ্রোহ বিপিন প্রত্যাশা করে নাই, মুখে অনেকগুলি রেখা সৃষ্টি করিয়া সে চাহিয়া রহিল। হোক গুরুদক্ষিণা, আশ্রমের ভূমি তো রাজাসাহেবের দান, নিজে তিনি আশ্রমে পায়ের ধূলা দিয়াছেন তাই কি যথেষ্ট নয় ? তাঁর প্রজাদের এই আসরে তাঁকে ডাকিয়া আনার তো কোন মানে হয় না। যাঁর কলমের এক খোঁচায় আশ্রম উঠিয়া যাইতে পারে, শিষ্য হইলেও তাঁকে একটু, খুব সামান্য একটু, খাতির করিলে দোষ কি ?

রাধাই নদীর ঘোলাটে জলস্রোতই যেন আজ সদানন্দকে আনমনা করিয়া দিতেছে। বিপিনের প্রশ্নের মানে বুঝিতে দুবার শুনিতে হয় না, মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টির মানে বুঝিতে দুবার চাহিতে হয় না। আনমনা হইয়া না বুঝার ভাণ করাই সব চেয়ে সহজ।

'হ্যাঁ, বল গে' আমি এখানে আছি।'

বহুকাল শিষ্যত্বের অভিনয় করিতে করিতে কিভাবে যেন বিপিনের সংযম অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া মানুষটা সে বড় চালাক, ভাবিয়া চিন্তিয়া

ফন্দি না আঁটিয়া কখনও সে কিছু করে না, যদি বা করে অন্তরালে করে। জীবনের সমস্ত অসংযম তার গোপনীয়। সদানন্দের বোকামিতে রাগে গা জ্বলিয়া গেলেও তাই সে শুধু বলিল, 'প্রভু ?'

সদানন্দ চুপ। আনমনে কথা বলার চেয়ে নীরবে আনমনা হওয়া ঢের সহজ। একটু অপেক্ষা করিয়া বিপিন কুটীরের দিকে চলিয়া গেল। আর ফিরিয়া আসিল না। সূর্য্য নামিয়া গেলেন তপোবনের গাছের আড়ালে, মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল, সকলকে পা ছুঁইয়া প্রণাম ও প্রণামী দিবার অনুমতি দিয়া সদানন্দ ঠায় বসিয়া রহিলেন রক্তমাংসের দেবতার মত। দেবতার মতই তাঁর মূর্ত্তি, বটতলার ছবির মহাদেবের ছাঁচে ঢালিয়া যেন তার সৃষ্টি হইয়াছে। আসন করিয়া বসায় ভুঁড়ি গিয়া প্রায় ঠেকিয়াছে পায়ে এবং তাতেই যেন মানাইয়াছে ভাল। নয় তো এই বৃষস্কন্ধ বিশালদেহ পুরুষের চওড়া বুক আর পেশীবহুল সুডৌল বাহু দেখিয়া মনে হইত, দেহের শক্তি ভিন্ন আর বুঝি তাঁর কিছু নাই। কথায় তাহা হইলে মানুষ মুগ্ধ হইত, কারও ভক্তি জাগিত কিনা সন্দেহ। মাথায় জটা নাই বলিয়াই ভক্তেরা অনেকে মনে মনে আপশোষ করে। যার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি স্থৈর্য্যের নিখুঁত প্রতীক, জটা ছাড়া কি তাকে মানায় ?

সদানন্দের মুখে যে উদ্বেগের ছাপ পড়িয়াছিল, মাথার জটায় হয়ত তা আড়াল হইয়া থাকিত। তবে তার মুখে উদ্বেগের ছাপ দেখিয়াও দেখিবার মত মানুষ এখানে কেউ নাই। প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া যদি কারও চোখে পড়ে, সাধুজীর মুখে চোখে অস্বস্তির ভাব স্পষ্ট ফুটিয়া আছে, নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করিবে না, মনে করিবে তারই দৃষ্টি বিভ্রম। সাধুজী নির্ব্বিকার, সাধুজীর স্বস্তি অস্বস্তি নাই।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতে আসিতে অধিকাংশ দর্শনপ্রার্থী ও প্রার্থিনী বিদায় হইয়া গেল। রহিল কেবল আশ্রমে যারা বাস করে তারা এবং অন্ধকারে তপোবন পার হইয়া গ্রামে ফিরিবার ভয় জয় করার মত গভীর বৈরাগ্য যাদের জন্মিয়াছে এমন কয়েকজন গ্রামবাসী। আশা তাদের মিটিবার নয়। সংসারে তাদের এমন গভীর বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে যে আশ্রমে আসিয়া বাস করিবার জন্য তারা পাগল, সাধুজীর পদতলে দিবারাত্রি পড়িয়া থাকিবার কামনা ছাড়া আর সব সাধ তারা বিসর্জ্জন দিয়াছে। কিন্তু আশ্রমে বাস করিবার অনুমতি তারা

পায় না। বড় গরীব তারা, বিপিন তাদের এ অধিকার দিতে নারাজ। তাদের ব্যাকুল প্রার্থনার জবাবে সদানন্দকে তাই বলিতে হয়, অধিকার না জন্মালে তো অনুমতি পাবে না বাপু। কেবল দারিদ্র্য নয়, আরও অনেক কারণে বিপিন অনেককে আশ্রমবাসের সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। বাগবাঁদা গায়ের মহেশ চৌধুরীর টাকা আছে যথেষ্ট, কিন্তু তার উপর বড় রাগ রাজাসায়েবের। মহেশ চৌধুরীর ছেলে খাসমহলের প্রজাদের তিন বছরের মধ্যে প্রায় ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছিল। রাজাসায়েবের এক বিদেশী অতিথিকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করায় ছেলেটা জেলে গিয়াছে তাই রক্ষা, নয় তো কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইত কে জানে।

মহেশ চৌধুরী আজও প্রত্যাশীর ভঙ্গিতে বসিয়া আছে দেখিয়া সদানন্দ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহেশ চৌধুরী সম্বন্ধে বিপিনের নির্দ্দেশ বড় কঠোর। সকলের সামনে মহেশ চৌধুরীকে অপদস্থ করিতে হইবে, বলিতে হইবে সে মহাপাপী, সারাজীবন প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তার আশ্রমবাসের অধিকার জন্মিবে না। রাধাই নদীতে ঘোলা জলের স্রোত দেখিতে দেখিতে মনটা আজ কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে, আজ কোন মানুষকে এমন ভয়ানক কথা বলিবার ক্ষমতা সদানন্দের নাই। একদিনে দুবার বিপিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সাহসও তার নাই। বিশেষতঃ রাজাসায়েব যখন স্বয়ং আশ্রমে হাজির হইয়াছেন, মহেশ চৌধুরীর আবেদন-নিবেদন এড়াইয়া চলাই আজ ভাল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রোহিণী

বাংলা সাহিত্যের যে কয়েকটি সমস্যা সাহিত্যরসিক সমাজের চিত্তে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর মৃত্যু তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই উপন্যাসে বঙ্কিমপ্রতিভা যে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছে তাহার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বিরল, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে চরিত্রসৃষ্টিতে, ঘটনাবিন্যাসে ও মানবহৃদয়ের বিকাশের সহিত বহিঃপ্রকৃতির নিগূঢ় সম্পর্কের রহস্য উদ্ঘাটনে বঙ্কিমচন্দ্র যে অপরূপ শিল্পকৌশল দেখাইয়াছেন তাহা যে কোন দেশের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু রোহিণী-নিশাকর সম্পর্কীয় ঘটনাবলী পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে তুমুল মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন ঘটনার স্বাভাবিক স্রোতকে জোর করিয়া হঠাৎ নূতন খাতে প্রবাহিত করা হইয়াছে, চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে একটি আকস্মিক অসঙ্গতির অবতারণা করা হইয়াছে; ঘটনা ও চরিত্রের স্বাভাবিক পরিণতি ব্যাহত হওয়ায় আমাদের শিল্পীচিত্ত ব্যথিত ও পীড়িত হইয়া উঠে। 'রোহিণীকে হত্যা করিয়া বঙ্কিমের শিল্পই আত্মহত্যা করিয়াছে' এই মত শরৎচন্দ্র অসঙ্কোচে প্রকাশ করায় একজন প্রতিভাবান্ শিল্পস্রষ্টার অনুমোদন পাইয়া এই মতাবলম্বিগণ অনেকটা প্রসন্ন বোধ করেন। আর একদল বলেন যে এই ঘটনার মধ্যে আকস্মিকতা বা অসম্ভাব্যতা কিছু নাই, চরিত্র ও আখ্যানের এই বিকাশ ও পরিণতির বীজ চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। রোহিণী স্বৈরাচারিনী, তাহার গোবিন্দলাল-আসক্তির মধ্যে প্রেমের গভীরতা ছিল না, ছিল শুধু দেহভোগলালসা যাহা হরলাল, গোবিন্দলাল, নিশাকর বা অন্য যে কোন লোকের দ্বারা চরিতার্থ হইতে পারিত। রোহিণী হরলালকে দেখিয়া মজিয়াছিল, গোবিন্দলালকে দেখিয়া মজিয়াছিল, সে রূপবান্ নিশাকরকে দেখিয়া মজিবে ইহাতে অবিশ্বাস্য কিছুই নাই। প্রসঙ্গতঃ এই বিষয়ে অনেকেই মতামত প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়া এই বিষয়টির বিস্তৃত আলোচনা কেহ করেন নাই।

এই সমস্যার আলোচনা করিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা ও শিল্পসৃষ্টির স্বরূপের সহিত পরিচয় আবশ্যক। রামেন্দ্রসুন্দর ও বিপিনচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে

যুগপ্রবর্ত্তক আখ্যা দিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুমূর্ষু ভারত উদ্দাম গতিবেগবান্ পাশ্চাত্যজীবনের সংস্পর্শে আসিয়া নবজীবন লাভ করিল। ভারতীয় জীবনের মরা গাঙে আবার বান ডাকিল। এই নবউৎসারিত উচ্ছলিত অপরিমেয় প্রাণধারা দেখিয়া দেশহিতৈষিগণ আনন্দে বিহ্বল হইলেন কিন্তু তাঁহাদের মনে এই সংশয় সর্ব্বদা জাগরূক রহিল যে এই তীব্রগতিশীল পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। এই বিরাট প্রাণহিল্লোলকে প্রাচ্য আদর্শ অনুসারে সুনিয়ন্ত্রিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র তৎকালীন বাঙ্গালীজীবনের রসরূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিতে একটি আদর্শ বাংলা তথা আদর্শ ভারতের রূপ বর্ত্তমান ছিল, তাঁহার সতত চেষ্টা ছিল তাঁহার এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য দেশবাসীকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁহার সাহিত্যের ভিতর দিয়া তিনি আমাদের জাতীয়জীবন গঠনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। গান্ধী, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সমন্বয়াচার্য্যগণের মধ্যে প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিক আদর্শ সম্বন্ধে যে সূক্ষ্ম ও গভীর অনুভূতি দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে যেন তাহার অভাব ছিল; অনেক সময় তিনি হিন্দুসমাজের প্রচলিত আচারব্যবহার ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে ভারতের শাশ্বত আদর্শ বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন। এইজন্য সমন্বয়াচার্য্য বঙ্কিম অনেকটা প্রতিক্রিয়াপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন; যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিম কবি বঙ্কিমের পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমাদের দেশের আলঙ্কারিকেরা মানুষকে রসিক ও অরসিক এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। শিল্পজগতে প্রবেশ করিলে রসিকচিত্তের জড়জীবনের জৈব প্রয়োজনের সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, প্রাত্যহিক জীবনের সহিত যে সকল তুচ্ছ স্মৃতি জড়িত থাকে তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে মন হইতে খসিয়া যায়। কবির রস-আবেদনে রসিকচিত্তের সুপ্ত রসাবেগ কল্লোলিত হইয়া উঠে। অরসিকেরা শিল্পরস-অপরিবাহী মন লইয়া সাহিত্যজগতে প্রবেশ করে, আপনাকে কল্পনালোকে উন্নীত করিতে না পারিয়া দৈনন্দিন জীবনের পঙ্কিল আবর্জ্জনারাশি দিয়া কবির অপরূপ ভাবপ্রতিমাগুলিকে আপনার মনের মত

করিয়া গড়িয়া লয়। রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রসঙ্গ উঠিলে অরসিকেরা অসংবরিত আবেগে বলিয়া উঠেন—রোহিণী গণিকা, রোহিণী বারবনিতা, সে না মরিলে মরিবে কে, সে ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাঁহারা জীবনে যে সকল ভ্রষ্টা ও কামুক দেখিয়াছেন তাহাদের সহিত যে সকল কদর্য্য স্মৃতি জড়িত আছে সেই ছাঁচে রোহিণী ও গোবিন্দলালকে গড়িয়া তুলেন। এই রসানুভূতিশূন্য রসবিচারকে আমরা কোন গুরুত্ব দিব না।

অনেক সময় আবার একই মানুষের ভিতর রসিক ও অরসিক দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা পাশাপাশি বাস করে। এইজন্য কোন কোন রসস্রষ্টাকে অরসিকের মত মতামত প্রকাশ করিতে দেখিতে পাই। যে গীতময়, রূপময় স্বপ্নলোকে মানুষের বাস্তবজীবন অলীক মনে হয়, যেখানে অসম্ভব সম্ভব হয়, অপরূপ রূপ নেয়,—সেই স্বপ্নলোকের স্রষ্টা স্পেন্সর ভাবিতেন যে তিনি ভদ্রজনোচিত চরিত্রগঠনের জন্য তাঁহার কাব্য লিখিয়াছেন। মানুষের চিরবিদ্রোহী আত্মার বিরাট ছবিকে কাব্যে রূপ দিবার সময়ও মিল্টন ভাবিতেন যে মানুষকে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহার মহাকাব্য লিখিতেছেন। কবির অভিপ্রায় ও সৃষ্টির মধ্যে এই অসামঞ্জস্য সাহিত্যজগতে বিরল নয়। বিশ্বের চিরন্তন প্রণয়শীল নারী-হৃদয়, অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় নারীত্বের ছবি আঁকিতেও বঙ্কিম ভাবিতেন যে তিনি লোকশিক্ষার জন্য এক পাপীয়সী রূপসীর চিত্র সৃষ্টি করিতেছেন। সমস্ত উপন্যাসটি ধরিয়া কবি বঙ্কিম ও লোকশিক্ষক বঙ্কিমের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। রসিক বঙ্কিম ও অরসিক বঙ্কিমের এই টাগ্ অব্ ওয়ারে প্রথম খণ্ডে অরসিক বঙ্কিম রসিক বঙ্কিমকে যদিও মাঝে মাঝে সজোরে ধাক্কা দিয়াছেন তথাপি আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডে রসিক বঙ্কিম একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন বলিলেই হয়, অরসিক বঙ্কিম আধিপত্য বিস্তার করিয়া অপ্রতিহত ভাবে আপনার স্বৈরাচার চালাইয়াছেন।

নীতিকার বঙ্কিম লোকশিক্ষার উপযোগী করিয়া পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় দেখাইবার জন্য এইরূপ একটি পরিকল্পনা খাড়া করিয়াছিলেন: হরিদ্রাপুর গ্রামে গোবিন্দলাল নামে এক ধনবান্, রূপবান্, গুণবান্, যুবক ছিল। তাহার এক গুণবতী, পতিপ্রাণা, সরলা, শ্যামাঙ্গী স্ত্রী ছিল। তাহাদের দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত সুখের ছিল, কলহাস্যমুখরিত, আনন্দহিল্লোলিত দিনগুলি বেশ কাটিয়া

যাইতেছিল। কিন্তু নির্ম্মল আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল। গ্রামে রোহিণী নামে এক অনন্ত প্রতিভাশালিনী, অপরূপ রূপবতী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী যুবতী বিধবা ছিল। তাহার বিধবার মত রকম সকম ছিল না। রোহিণী লোক ভাল ছিল না, সে পারিত না এমন কোন কাজ ছিল না। হরলাল তাহাকে বিবাহ করিবে আশা দেওয়ায় সে উইল চুরি করিয়াছিল। সে অপরের সুখ দেখিলে হিংসা করিত, ভ্রমরের সুখের জীবন তাহার সহ্য হইত না। সে হরলালের দ্বারা প্রত্যাহৃতা হইয়া গোবিন্দলালকে পাইবার চেষ্টায় রহিল। গোবিন্দলালের উদ্যানবাটিকার সুবৃহৎ বারুণী পুষ্করিণীতে রোহিণী একা প্রত্যহ জল আনিতে যাইত। রোহিণীর রূপ দেখিয়া গোবিন্দলাল মুগ্ধ হইল, তাহার রূপতৃষ্ণা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দলালের যৌবনের অপরিসীম রূপতৃষ্ণা ভ্রমর মিটাইতে পারে নাই। গোবিন্দলালের মনকে লইয়া সুমতি নামে দেবকন্যা, কুমতি নামে রাক্ষসী টানা ছিঁড়া করিতে লাগিল। ভ্রমর গোবিন্দলালের চরিত্রে সন্দেহ করায় তাহার দুর্জ্জয় অভিমান হইল। ভ্রমরের এই অপরাধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া দেশান্তরে চলিয়া গেল এবং ভোগসুখের মধ্যে দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু এই রোহিণী লোক ভাল ছিল না। সে সেখানে একটি প্রিয়দর্শন পুরুষের পটলচেরা চোখ দেখিয়া ভুলিয়া গেল এবং গোপনে তাহাকে প্রেমনিবেদন করিতেছিল এমন সময় গোবিন্দলালের কাছে ধরা পড়িল। গোবিন্দলাল এই বিশ্বাসহন্ত্রীকে হত্যা করিল। এতদিন পরে গোবিন্দলাল নিজের ভুল বুঝিতে পারিল, ভ্রমরের গুণের কদর শিখিল। কিন্তু সরলা, পতিপ্রাণা, সতীলক্ষ্মী দুঃখশোকে কাতর হইয়া এখনে মৃত্যুশয্যায় শয়ান। গোবিন্দলালের তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল কিন্তু তাহাকে আর পাইবার উপায় রহিল না। সুতরাং বিধবা যেন প্রবৃত্তির মার্গে চলিবার লোভ দমন করে, পুরুষ যেন নারীর গুণ ছাড়িয়া রূপের উপাসনা না করে নতুবা সোনার সংসার ছারখার হইয়া যাইবে।

উচ্চ আদর্শবাদের উন্মাদনা আসিয়া যেমন আমাদের ভয়ভাবনাহীন আপদ্-বিপদ্হীন সুখসমৃদ্ধিময় সাধারণ জীবন বিপর্য্যস্ত করিয়া দেয় কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য ও মহত্বকে ফুটাইয়া তুলে, একটি দিব্য আভায় জীবনকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয় সেইরূপ কবি বঙ্কিম তাঁহার উদ্দাম, অজস্র, অপ্রমেয়

সৃজনী-প্রতিভা লইয়া নীতিবিলাসীর এই লোকশিক্ষার উপযোগী পরিপাটি, শুষ্ক, রসহীন পরিকল্পনাটি বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন কিন্তু অল্পপরিসরের মধ্যে যে ভাবঘন রসনিবিড়তার পরিচয় দিলেন, অল্প কয়েকটি বলিষ্ঠ রেখাপাতে যে মহামহিমময় দুইটি চরিত্র চিত্রিত করিলেন তাহার তুলনা শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্য ও নাট্যসাহিত্যে মিলিতে পারে কিন্তু গদ্যসাহিত্যে দুর্লভ। কল্পনার রথে চড়িয়া সৃষ্টির আনন্দে আত্মবিস্মৃত কবি বঙ্কিম তাঁহার পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ধরার ধূলিধূসর পথ ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে কল্পলোকে চলিয়া গেলেন, যখন চমক ভাঙ্গিল তখন আবার স্বীয় গন্তব্যপথে চলিতে সুরু করিলেন। নাটক ও উপন্যাসের চরিত্র প্লটের প্রয়োজনের তটভূমি উপছাইয়া অপরূপ জীবন লাভ করিয়াছে সাহিত্যে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইংরেজী সাহিত্যের দুইটি সুপরিচিত উদাহরণ সেক্সপীয়রের শাইলক ও ফলষ্টাফ্। আদি-কল্পনার শাইলক নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, অর্থপিশাচ কুসীদজীবি কিন্তু তিনি সৃষ্টির আনন্দে যে শাইলক আঁকিলেন তাহার মুখে সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানবসমাজের মর্ম্মবেদনা ভাষা পাইয়াছে। নাটকের প্লটে রাজকুমার হেনরির চিত্তবিনোদনের জন্য একটি ভাঁড়ের প্রয়োজন ছিল কিন্তু সেক্সপীয়র যে ফল্ষ্টাফের ছবি প্রথম ভাগে দিয়াছেন সে একজন প্রতিভা-বান্ হাস্যরসিক—তাহার অফুরন্ত হাস্যরসের উৎস হইতে মানবজীবনের সর্ব্ববিধ প্রচ্ছন্ন অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের উপর, মানবের ত্রুটি বিচ্যুতি দুর্ব্বলতার উপর রাগদ্বেষলেশহীন, শুভ্র, স্বচ্ছ, নিষ্কলঙ্ক হাসিরাশি অজস্র ধারায় বর্ষিত হইয়াছে। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য চরিত্রসৃষ্টিতে এই অসঙ্গতি ও বৈপরীত্য কি শিল্পকলা-সঙ্গত অথবা শিল্পের দিক দিয়া হানিকর?

সাহিত্যের চরিত্রের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর ভিতর একটি যান্ত্রিক সুসঙ্গতি থাকার কোন প্রয়োজন নাই। যদি ধার্ম্মিকের কার্য্যগুলি সকলক্ষেত্রেই ধর্ম্মসঙ্গত হয়, পাপীর কার্য্যগুলি সকল সময় ধর্ম্মবিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে চরিত্র প্রাণহীন হইয়া পড়ে। যাহা প্রাণবান্ তাহা ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে নব নব রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রাণবন্ত চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া শিল্পী আমাদিগকে অনন্ত রহস্যময় মানবপ্রকৃতির পরিচয় দেন। ঘটনার প্রবাহ যদি এক সুনির্দ্দিষ্ট ঋজুপথে সকল সময় কলের মত চলিতে থাকে তাহাতে লীলাময়ী মানবনিয়তির বিচিত্র পথরেখার কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। অনেক সময় আকস্মিক ও

অসঙ্গত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই চরিত্রগুলি তাহাদের গভীরতর ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। চরিত্রসৃষ্টি ও আখ্যানরচনার কতকগুলি নিজস্ব সুকঠোর মূলনীতি আছে যাহা শিল্পীকে মানিয়া চলিতে হয়। চরিত্রের খণ্ড খণ্ড বিচিত্র প্রকাশের অন্তরালে একটি সুসংহত সমগ্রপুরুষীয় সত্তা বিদ্যমান থাকা চাই। চরিত্র-সৃষ্টিতে, আখ্যানরচনায় নৈয়ায়িক-নির্দ্দিষ্ট আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি না থাকিতে পারে কিন্তু তাহার বৈচিত্র্যকে রসসংহতির কড়া আইনের নাগপাশে বাঁধিতে হইবে, অপরূপ শিল্পকৌশলে আকস্মিক পরিবর্ত্তনকে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিতে হইবে। রোহিণীর চরিত্রের বিকাশে, উপন্যাসের কাহিনীর পরিণতিতে এই অবশ্যম্ভাবিত্ব ও রসসংহতি আছে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে রোহিণী-চরিত্রের বিকাশের সূক্ষ্ম ধারাটি আমাদিগকে সম্যক্ আলোচনা করিতে হইবে।

এই চরিত্রের আলোচনা করিলে আমরা বঙ্কিম-প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার সহিত উচ্চাঙ্গের কবিত্বের অপরূপ সম্মিলন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথমভাগের প্রধান বিশেষত্ব। চরিত্রের বিকাশে, ঘটনার পরিণতিতে কোথাও নাটকীয়তা নাই, রোহিণী-গোবিন্দলালকে মুহূর্ত্তের জন্যও রঙ্গমঞ্চের নায়ক-নায়িকা বলিয়া ভুল হয় না, সৌন্দর্য্যসৃষ্টির জন্য ঔপন্যাসিক কোথাও বাস্তবজীবনের সীমা ছাড়াইয়া নিছক কল্পলোকে চলিয়া যান নাই। রোহিণীর হৃদয়ের উদ্বোধনের জন্য যে অদ্ভুত কবিত্বময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা কুমারসম্ভব কাব্যের অকাল বসন্তের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় কিন্তু তাহার মধ্যেও আমাদের বাঙ্গালী জীবনে যাহা চিরপরিচিত ও অতি সাধারণ তাহাদিগকে ছাড়াইয়া চিরপ্রচলিত কবিপ্রসিদ্ধিগুলি গ্রহণ করেন নাই। রোহিণী-গোবিন্দলালের প্রথম মিলন ও কথোপকথনের মধ্যে কোথাও নাটকীয়তা নাই, তাহাদের চারিচক্ষুর মিলনে তাহাদের মনোমৃগ দৃঢ় প্রণয়জালে বদ্ধ হয় নাই, মন্মথ-শরাহত যুবক যুবতীর পরস্পরের নিকট আত্মনিবেদন নাই; মন মাতানো কোকিলের ডাক, প্রাণ আকুল করা দক্ষিণ পবন, ফুলসাজে সজ্জিতা নানাবর্ণগন্ধময়ী বহিঃপ্রকৃতি রোহিণীর জীবনের শূন্যতা তাহার কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল সত্য কিন্তু কেবলই তাহাদের সাহায্যে সে গোবিন্দলালের প্রণয়াসক্তা হয় নাই। জীবনে নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে একজন যেভাবে অন্যের মনে স্থান পায় গোবিন্দলাল সেইভাবে রোহিণীর মনে স্থান পাইল।

জীবনকে কবিতার কৃত্রিম ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা এখানে করা হয় নাই। এই স্বাভাবিকতা ও বাস্তবতার কথা মনে রাখিয়া আমাদিগকে রোহিণী-চরিত্রের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

রোহিণী যুবতী—তাহার যৌবন পরিপূর্ণ, রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল, শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। অধরে পানের রাগ, পরনে পাড়ওয়ালা কাপড়, হাতে চুড়ি, কাঁধের উপর চারুবিনির্ম্মিতা, কালভুজঙ্গিনীতুল্যা, লোলায়মানা ভুবনমনোমোহিনী কবরী। শুষ্কতাময়, রুক্ষতাময় নিবৃত্তির পথে চলিবার কোন অন্তপ্রেরণাই সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে নাই। সে শুনিয়াছিল যে পণ্ডিতেরা বলিতেছেন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত। মনের ভিতর তাহার বাসনা উঠিত যে সে'ও আবার বিবাহ করিয়া শতসহস্র নরনারী যে ভাবে জীবন কাটায়, সেও সেইভাবে কাটাইবে। হরলাল তাহাকে বিবাহ করিবে লোভ দেখাইতে সে কৃষ্ণকান্তের দেরাজে হরলালের জাল উইল রাখিয়া কৃষ্ণকান্তের আসল উইল চুরি করিল। কিন্তু হরলাল তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় সে উইল তাহাকে দিল না। রোহিণী-চরিত্র বুঝিতে হইলে হরলাল-রোহিণীর সম্পর্কটির মর্ম্মার্থ উদ্‌ঘাটন করিতে হইবে। রোহিণী অবৈধভাবে ভোগসুখ কামনা করে নাই। মনের যে অবস্থায় সাধারণ নরনারী বিবাহে রাজী হয় রোহিণীর মনের সেই অবস্থা। সে হরলালের রূপ গুণ দেখিয়া যে আত্মহারা হইয়াছিল তাহা নহে। রোহিণীর প্রণয়াবেগ উদ্বোধিত হয় নাই কিন্তু তাহার অভাববোধ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার হৃদয়ের জাগরণ হয় নাই কিন্তু তাহার পূর্ব্বাভাস সূচিত হইয়াছে। তাহার দেহের প্রতিরক্তবিন্দু নিজেকে উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে বিকসিত করিবার জন্য উন্মুখ। প্রেমের অমরাবতীর সিংহদ্বার এখন তাহার জন্য উন্মুক্ত। তাহার অন্তরের অভিসারিকা নারী বরেণ্য প্রেমিকের আবাহনের জন্য হৃদয়ের মধ্যে বাসকশয্যা রচনা করিয়াছে।

হরলালের দ্বারা প্রত্যাহৃতা হইয়া রোহিণীর অভাববোধ উগ্র হইয়া উঠিল। আর পাঁচজনের সুখদুঃখের সহিত তাহার সুখদুঃখের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। অশ্রুসজল দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে সে আর হাল্কা মেয়েদের সঙ্গে হাল্কা হাসি হাসিতে হাসিতে জল আনিতে যাইতে পারিত না। সে একাই গোবিন্দলালের বারুণী পুকুরে জল আনিতে যাইত। তাহার সারাদেহে যৌবনের প্লাবন।

তাহার চলনের দোলনের তালে তালে কক্ষের কলসী নাচিতেছে—যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে তেমনই গা দোলাইয়া দোলাইয়া নাচিতেছে। মাতাল বসন্ত আসিয়া সমস্ত ধরা যৌবনের রাগে রাঙাইয়া দিয়াছে। পুষ্পরেণুগন্ধমাখা উন্মত্ত অধীর মলয় পবন আকাশে বাতাসে প্রলাপ বকিতেছে। সরোবরতীরে গোবিন্দলালের পুষ্পোদ্যানে ফুল ফুটিয়াছে—ঝাঁকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে, শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায়, যেখানে সেখানে রঙ বেরঙের ফুল ফুটিয়াছে। মত্ত মধুকর তাহাদের মদিরাময় যৌবন দস্যুর মত লুটিয়া লইতেছে। রোহিণী কলসী ডুবাইতেছিল—বসন্তের কোকিল পঞ্চম সুরে ডাকিল 'কুহু'। চারিদিকের এই অনন্ত সৌন্দর্য্যস্রোত, অফুরন্ত প্রাণের স্রোত, নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্রোতের মধ্যে তাহার মহাশূন্যতাময় রুক্ষ শুষ্ক জীবনের কথা ভাবিল। ভাবিল কি অপরাধে আমার এই বালবৈধব্য ঘটিল, আমি এ পৃথিবীর সুখভোগ করিতে পারিলাম না, এমন যৌবন থাকিতে শুষ্ক কাঠের মত জীবন কাটাইতে হইল— ভাবিয়া সোপান শ্রেণীতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া গোবিন্দলাল সুন্দরী প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিল। নীল কাঁচের আয়নার মত সুবৃহৎ বারুণী পুষ্করিণী ঘাসের ফ্রেমে আঁটা পড়িয়া আছে। ঘাসের ফ্রেমের চারিদিকে শ্বেতপীতনীলরক্ত বৃক্ষশ্রেণীর ফ্রেম। উর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ, সৌধসমূহ অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে ঝলমল করিতেছে। এ সমস্তই নীল জলের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। সরোবর-সোপানে অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী কাঁদিতেছিল। গোবিন্দলালের পরদুঃখকাতর সমুদ্রবৎ হৃদয় উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল, ভাবিল—সব সুন্দর কেবল নির্দ্দয়তা অসুন্দর, সৃষ্টি করুণাময়ী, মনুষ্য অকরুণ। রোহিণীর কাছে যাইয়া বলিলেন "তোমার যদি কোন বিষয়ে কষ্ট থাকে জানাইও। নিজে না বলিতে পার আমাদের বাড়ীর স্ত্রীলোকদের দ্বারা জানাইও।"

এই কয়টি কথা যেন রোহিণীর দেহমনে সুধা মাখাইয়া দিল। উইলের কথা মনে পড়িল। এই পরদুঃখকাতর উদারহৃদয় যুবকের উপর সে যে অন্যায় আচরণ করিয়াছে তাহা ভাবিয়া মরমে মরিয়া গেল। কি করিয়া এই অন্যায়ের প্রতিকার করিবে এই চিন্তা মনকে অহর্নিশি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। নানা রকমের উপায়ের কথা ভাবিল কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

সে নিত্য কলসী কক্ষে জল আনিতে যায়, নিত্য কোকিল ডাকে, নিত্য গোবিন্দলালের চারুদর্শন মূর্ত্তি দেখিতে পায়, অন্যায় প্রতিকারের কোন উপায় আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই পরদুঃখকাতর যুবকের মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগিয়া রহিল। অহর্নিশি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে রোহিণীর হৃদয়ে গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আসল উইল রাখিতে গিয়া রোহিণী উইল চুরি করিতে আসিয়াছে বলিয়া ধরা পড়িল। যাহার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিল বলিয়া সকলেই জানিল, সেই তাহাকে এই বিপদে রক্ষা করিবার জন্য আগাইয়া আসিল। রোহিণী অন্তরে অন্তরে সম্পূর্ণভাবে এই হৃদয়বান্ যুবকের কাছে আত্মনিবেদন করিল। কিন্তু সে জানিত গোবিন্দলালকে পাইবার কোন উপায় নাই। তখন সে ভাবিল বিষ খাইবে, নতুবা জলে ডুবিয়া মরিবে। রোহিণী যখন জানিল যে সে গোবিন্দলালের মনে স্থান পাইয়াছে তখন তাহার সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া গেল, এই পৃথিবী স্বর্গ বলিয়া বোধ হইল, তাহার বাঁচিতে সাধ হইল। মানুষ এমনই পরাধীন!

গোবিন্দলাল রোহিণীর মনের অবস্থা বুঝিল, বুঝিল ভ্রমর যে মন্ত্রে মুগ্ধ এ ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ—তাহার রাগ হইল না, আনন্দ হইল না, রোহিণীর প্রতি তাহার করুণার উদ্রেক হইল, সে ভগবানের কাছে আত্মজয় করিবার শক্তি প্রার্থনা করিল। যাহাতে তাহাদের পরস্পরের সহিত দেখাশুনা না হয় এইজন্য রোহিণীকে হরিদ্রাগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় যাইতে বলিল কিন্তু রোহিণী রাজী হইল না। সে ভাবিল গোবিন্দলালকে না দেখিতে পাইলে মরিয়া যাইব। হরিদ্রাগ্রাম আমার স্বর্গ এখানে গোবিন্দলালের মন্দির, হরিদ্রাগ্রামই আমার শ্মশান এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। কৃষ্ণকান্ত রায় তাড়াইয়া দেয় আবার আসিব, গোবিন্দলালকে দেখিব, কেহ ত আমার চোখ কাড়িয়া লইতে পারিবে না। গোবিন্দলালকে দেখিলে তাহার অসহ্য যন্ত্রণা ও অনন্ত সুখ। তাহার স্ফীত, হৃত, অপরিমিত প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে কত রকমের চিন্তা উদয় হইতে লাগিল। একবার ভাবিল বিষ খাইব, জলে ডুবিয়া মরিব, কখনও ভাবিল ধর্ম্মাধর্ম্মের জঞ্জাল জলাঞ্জলি দিয়া গোবিন্দলালকে লইয়া পলাইয়া যাইব। দিন দিন তাহার প্রেমবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল।

তাহার অন্তরে দুঃসহ পিপাসা, সম্মুখে শীতল জল কিন্তু পান করিবার উপায় নাই। অবশেষে একদিন অপরাহ্ণে সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য বারুণীর জলে ডুবিল। গোবিন্দলাল জলমগ্না রোহিণীকে উদ্যানভবনে তুলিয়া পুনর্জীবিত করিল। গোবিন্দলাল রোহিণীর মনের অবস্থা বুঝিল, নিজের হৃদয়ের তলদেশে তাকাইল, ভ্রমরের কথা ভাবিল। সে বুঝিল যে রোহিণী-আসক্তিরূপ যে দুর্বার শক্তি তাহার হৃদয়ের মধ্যে মাথা তুলিতেছে তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিতে না পারিলে সে মরিবে। মরিতে হয় মরিবে কিন্তু ভ্রমরের কাছে অবিশ্বাসী হইবে না। তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া এই প্রবল শক্তিকে জয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। রোহিণীর সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই সে রোহিণীকে ভুলিতে পারিবে এবং তাহাকে ভুলিয়া আবার তাহাদের চিরাভ্যস্ত আনন্দময় দাম্পত্য জীবনের পথে অব্যাহতভাবে চলিতে থাকিবে, এই আশায় জমিদারীর কার্য্য উপলক্ষে মফস্বলে গেল।

এদিকে হরিদ্রাগ্রামে রটনাকৌশলময় জনরব শতসহস্র কণ্ঠে কালান্তক বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। রোহিণী-গোবিন্দলালের নিষিদ্ধ প্রণয়ের সম্ভব অসম্ভব সকল কাহিনীর সুবিস্তৃত আলোচনায় নিভৃত পল্লীটি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সকল কথা রোহিণীর কানে গেল, ভ্রমরের কানে গেল, কৃষ্ণকান্তের কানে গেল। দলিতা ফণিনীর ন্যায় রোহিণী অন্যায়কারীকে দংশন করিবার জন্য চলিল। অকারণে তাহার মাথায় এই কলঙ্কের ডালি কে তুলিয়া দিল? ভ্রমর ছাড়া এত গায়ের জ্বালা কাহার? ভ্রমরের জীবনকে অসহ্য করিয়া তুলিবার জন্য সে অপরের বস্ত্রালঙ্কার লইয়া গোবিন্দলালের তাহার উপর অনুরাগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইল। ভ্রমর এই মায়াবিনীর ফাঁদে ধরা দিল। এই পতিপ্রাণা বালিকা গোবিন্দলালকে সন্দেহ করিতে পারিত না কিন্তু এ যে সন্দেহ নয় একেবারে প্রতীতি জন্মিল। বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য ভ্রমর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয় বরং বুদ্ধিবৃত্তির অভাবই তাহার এক বিশেষত্ব। ভ্রমরের চরিত্রের সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে বাংলা কথাসাহিত্যের জন্ম ও বিকাশ বাঙ্গালী জীবনের এক সন্ধিক্ষণে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত নিবিড় পরিচয়ের ফলে ভারতীয় মনের রূপ রঙ্ বদলাইয়া গেল। সর্ব্বত্র একটি জিজ্ঞাসা ও সমালোচনার ভাব জাগিয়া উঠিল। স্বাধীনচিন্তাবাদ, প্রবৃত্তিবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদের মূলভিত্তির

উপর গঠিত পাশ্চাত্য রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি অনুসারে তাহার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবন গঠিত করিবার প্রবল আকাঙ্খা দেখা দিল। ভারতীয় সমাজদেহের প্রত্যেক অঙ্গে জরা ও মৃত্যুর লক্ষণ দেখিতে পাইল। এই সমাজ-ব্যবস্থার ছোটখাট বিধি-নিষেধ, তুচ্ছ নগণ্য আচার-বিচার পুরুষের পুরুষকার ও নারীর নারীত্বকে পদে পদে খণ্ডিত ও ব্যাহত করিতেছিল। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার বিকৃত স্বরূপ যাহাই হউক হিন্দুর সামাজিক জীবনের সুবিশাল সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছিল এক উচ্চ আদর্শবাদের প্রেরণায় ধর্ম্মের মূলনীতির প্রশস্ত বনিয়াদের উপর। মোক্ষান্বেষী ভারতীয় মন সামাজিক জীবনের বিভিন্ন মানব-সম্পর্কের মধ্য দিয়া রহস্যময়ের পূজা করিতে চাহিয়াছিল। নারীর পতিভক্তি, পুত্রের পিতৃভক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের উপাসনা নহে, উহা একটি ভাবের উপাসনা—তাই পতি—তাহার রূপ গুণ ব্যক্তিত্ব যেমনই হউক—হিন্দু নারীর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তাই পিতা স্বর্গ, ধর্ম্ম ও সর্ব্বদেবতার স্বরূপ। এই পতিভক্তি, পিতৃভক্তি মিষ্টিকের (mystic) ভগবদ্ভক্তির সমজাতীয়। যে চরিত্রের মধ্যে এই ভক্তির বিকাশ দেখা যায় তাহার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য দেখা যায় না, সেখানে হৃদয়বৃত্তিই প্রধান। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা নারীত্বের যে আদর্শকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে ভ্রমরে আমরা তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। প্রাচীন সমাজব্যবস্থার অগণিত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কমলা ও সুরবালার চরিত্রে এই বিলীয়মান সমাজব্যবস্থার যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের পরিচয় পাই তাহার তুলনা বোধ হয় উদীয়মান সমাজব্যবস্থায় মিলিবে না। যে বিচক্ষণতা, যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া উপস্থাপিত ঘটনার মায়া-আবরণ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করে ভ্রমর-চরিত্রে তাহার লেশ মাত্র ছিল না। গোবিন্দলালের রোহিণীপ্রীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখার পর তাহার পায়ের তল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া গেল, অতল সাগর জলে যে আশ্রয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে নির্ভর করিয়াছিল তাহা অকস্মাৎ অপসারিত হইল। ভ্রমর দিশাহারা হইয়া পড়িল। হতবুদ্ধি হইয়া গোবিন্দলালকে সকল কথা পত্রে জানাইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যাওয়াই স্থির করিল।

ভ্রমরের এই অবিশ্বাসে গোবিন্দলাল প্রচণ্ড আঘাত পাইল। ভক্ত যেমন দেবতার চরণে হৃদয়ের গহনতম প্রদেশের গোপনতম ইচ্ছাটিও অসঙ্কোচে প্রকাশ

করে গোবিন্দলাল তেমনি ভ্রমরের নিকট রোহিণী সম্পর্কিত সমস্ত কথা অকপটে প্রকাশ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল। রোহিণী-অনুরাগ তাহার জীবনের ভারসাম্য বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছিল। ভ্রমরের অবিশ্বাস তাহার হৃদয়কে বিকল করিয়া দিল। যাহার জীবন সুখময় করিবার জন্য সে নিজের হৃদয়ের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, যাহার অধিক প্রিয় এ জীবনে তাহার কেহ ছিল না, সেই ভ্রমর বিনা বিচারে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিল, তাহার মুখ দেখিতেও ঘৃণাবোধ করিল—এই নিষ্ঠুর আঘাতে গোবিন্দলালের সমস্ত চিত্ত বিষাদে, বিতৃষ্ণায় ও অবসাদে ভরিয়া গেল।

পুত্রপ্রতিম গোবিন্দলালের চরিত্রের অধঃপতনের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের অংশ ভ্রমরের নামে লিখিয়া দিলেন। ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মিলনসাধনের শুভেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া তিনি যে কাজ করিলেন তাহাতে এমন এক নূতন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের বিচ্ছেদ চিরস্থায়ী হইতে চলিল। ঘটনাগুলি একটির পর একটি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘটিতেছে, তাহারা কার্য্যকারণের সুকঠোর শৃঙ্খলায় পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। আমরা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের সহিত ভাবিতে থাকি ঘটনার এই দুর্নিবার করালস্রোত কোন্ অতলস্পর্শী গহ্বরের পানে ছুটিয়াছে, কে এই দুর্বার শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে, কোন্ ভয়াবহ করুণ পরিণতি গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণীর জন্য অপেক্ষা করিতেছে, গোবিন্দলালের গৌরবময় মানবতা, রোহিণীর ঐশ্বর্য্যময় নারীত্ব, ভ্রমরের মহামহিমময় সতীত্ব কি চরমব্যর্থতার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছিল? আমাদের ভয় ও বিস্ময় গভীরতর হয় যখন ভাবি এই নিদারুণ বিফলতার কারণ কোন আকাশচারী দেবদেবীর খেয়াল মাত্র নহে, যে বিষাক্ত আবহাওয়ায় ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল ফলপ্রসূ হইতে পারিল না সেই হলাহল পাতালের নাগলোক হইতে আসে নাই, তাহার বীজ নিহিত ছিল এই তিনটি নরনারীর হৃদয়ের প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে, তাহাদের মানবীয় ত্রুটি দুর্ব্বলতার মধ্যে, মানবজীবনের অতিসাধারণ ঘটনাসমূহের মধ্যে। মানবের হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, মানবজীবনের প্রতি স্তরে স্তরে ব্যর্থতার বীজ উপ্ত রহিয়াছে, মানবজীবনকে আবেষ্টন করিয়া একটি ভয়াবহ দুঃসময়ের পরিমণ্ডল রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনটি জীবনের অনন্ত সম্ভাবনীয়তা ও মহতী বিনষ্টির যে আভাস

দিয়াছেন তাহা আমাদের মনকে এই তিনটি নরনারীর জীবনকাহিনী হইতে বহু উর্দ্ধে এক ধ্যানলোকে লইয়া যায়, মানবজীবনের অপরূপ মহিমা ও চরম বিফলতার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমাদের মন মানবনিয়তির রহস্যময়তায় ভয়, বিস্ময় ও করুণায় সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

সৃষ্টির আনন্দে মানবজীবনের এই ট্রাজিডির ছবি আঁকিয়া তিনি সচকিতে দেখিলেন যে তিনি কোথায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার সৃষ্টি কোন ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। অন্তরের দরদ দিয়া নিষিদ্ধ প্রেমের তিনি যে মহিমময় চিত্র দিয়াছেন, যে সমাজবন্ধন তাহার চরমচরিতার্থতার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে মানুষের মনে বিদ্রোহের ভাব জাগিয়া উঠিবে। সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে সমাজবিদ্রোহের কথা ভাবিয়া যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্কিম শিহরিয়া উঠিলেন। সমাজের মঙ্গলের অনুকূল উপদেশের উপযোগী করিয়া উপন্যাসের অবশিষ্ট অংশ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিলেন সমাজের অনুশাসন লঙ্ঘন করিলে অপরাধীকে মঙ্গলময়ের বিধান অনুসারে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে, নিষিদ্ধ প্রণয় উদারহৃদয় পুরুষকেও নীচাশয় করে, বিধবার ভালবাসা দেহভোগলালসার নামান্তর—তাহার মধ্যে একনিষ্ঠতা নাই। এই শিক্ষার বাহন হইতে পারে এরূপভাবে চরিত্র চিত্রিত হইল, আখ্যান রচিত হইল। উন্নতমনা প্রেমিক গোবিন্দলাল দেখা দিল কুটিল, পাপাশয়, আত্মপ্রবঞ্চক কামুকরূপে, গোবিন্দলালগতপ্রাণা রোহিণী দেখা দিল শিকারিণীবেশে, এবং তাহাদের কল্পলোকের সুষমামণ্ডিত প্রণয় দেখা দিল ঘৃণ্য বীভৎস মিলনের ছবিতে। নীতিকার বঙ্কিম সপ্রতিভ, স্বপ্রতিষ্ঠ, দ্বিধাহীন, হাকিমী চালে, মানবচরিত্রকে স্থূল ভাগে ভাগ করিয়া, মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতিকে তাঁহার জাঁতাকলে ফেলিয়া, প্রত্যেক অপরাধকে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট শাস্তি দিতে লাগিলেন। তিনি দেখাইলেন ভ্রমরকে কাঁদাইবার জন্য গোবিন্দলাল রোহিণীর সহিত মিলিত হইয়া ভোগসুখে গা ঢালিয়া দিল, কিন্তু রোহিণী বিষ, ভ্রমর সুধা, গোবিন্দলাল ইহা জানিয়াও ভ্রমরের কাছে যাইতে পারিল না কেননা পাপ পুণ্যের কাছে যাইতে পারে না। রোহিণী এদিকে নিশাকরের পটলচেরা চোখ দেখিয়া ভুলিয়া গেল এবং তাহাকে জয় করিয়া বিজয় পতাকা উড়াইবার চেষ্টা করিল। বঙ্কিমচন্দ্র ভুলিয়া গেলেন যে চরিত্র ও কাহিনীর স্বাভাবিক বিকাশে বাধা দিয়া জুলুম

জবরদস্তি চালাইলে শিল্পকলার অপকর্ষ ঘটিবে ও আমাদের রসিকচিত্ত ব্যথিত ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে।

যে গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে আকৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে তাহার দুঃখে বিগলিত হইয়াছিল ও তাহার অন্যায়কারিণীকে উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট ছিল, যে রোহিণী-সম্পর্কিত সমুদয় চিত্তভাব ভ্রমরের কাছে নিবেদন করিতে ব্যগ্র ছিল, যে চিত্তজয়ের জন্য গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল, যে উপযাচক হইয়া ভ্রমরের নামে লিখিত উইলে সাক্ষী হইল, সেই গোবিন্দলাল এমনি ক্রূর ও পাপাশয় হইয়া উঠিল যে ভ্রমরের অবিশ্বাসের প্রতিহিংসার জন্য রোহিণীর রূপধ্যানে মগ্ন হইল? এই সরলা পতিপ্রাণা বালিকাকে গোবিন্দলাল অপেক্ষা কে অধিক চিনিত, কে অধিক ভালবাসিত কিন্তু তাহার একটি ত্রুটির জন্য এই হিংস্র প্রতিহিংসা! সে মৃত্যুমৃগশরীরে বজ্রসার শর নিক্ষেপ করিল! সে স্বেচ্ছায় তুলারাশির উপর জ্বলন্ত আগুণ ঢালিয়া দিল! একথা সত্য যে রোহিণী-আসক্তি গোবিন্দলালের মনে স্থান লাভ করার পর ভ্রমর ও গোবিন্দলালের জীবনের নির্ম্মল আনন্দের অবারিত প্রবাহের উৎসমুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে সেই হাসি যাহা আধ হাসি, আধ প্রীতি, সেই কথা যাহা অর্দ্ধেক ভাষায়, অর্দ্ধেক অধরে অধরে, নয়নে নয়নে প্রকাশিত হইত তাহা আর ছিল না। চিত্তের যে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন অখণ্ডতায় মানুষ আনন্দের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে গোবিন্দলালের তাহা ছিল না। নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত গোবিন্দলাল পরাস্ত হইয়া রোহিণী-আকর্ষণের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারে কিন্তু সে ভ্রমরের অবিশ্বাসের ছলের সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাকে কাঁদাইবার জন্য সঙ্কোচ-সংশয়হীন চিত্তে রোহিণীর পিছনে ছুটিয়া ভ্রমরের অবিশ্বাসজনিত যন্ত্রণার অবসান করিতে গেল ইহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। পরস্ত্রীলুব্ধ যুবকের চরিত্রে মহত্ব প্রকাশিত হইবে এই আশঙ্কায় ভ্রমরকে ত্যাগ করিতে গোবিন্দলালকে কিরূপ দুঃসহ মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করিতে হইল তাহার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্কুচিত হইলেন। ভ্রমর-ত্যাগের অসহ্য যন্ত্রণা সত্বেও গোবিন্দলালকে রোহিণীর আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করিতে হইল—নিষ্করুণ দুর্ব্বার প্রবৃত্তির হাতে মানুষ এমনি নিরুপায়! এমনি অসহায়!

রোহিণী ও গোবিন্দলালের প্রাসাদপুরে মিলনের যে কদর্য্য চিত্র দেওয়া

হইয়াছে তাহা গণিকালয়ের ছাঁচে ঢালা। অপরূপ কবিত্বময় পরিবেশে যে প্রণয়ের উদ্বোধন হইয়াছিল তাহার এই কুৎসিত পরিণতি! বঙ্কিমচন্দ্র ভাবিলেন যে পাঠকের মনে পাপের উপর তীব্র বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেওয়াই সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য। রোহিণী-গোবিন্দলালের ভালবাসা ত্রিকালদর্শী সর্ব্বজ্ঞ মুনি ঋষিগণের সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন করিয়াছে সুতরাং তাহার মিলনচিত্র কুৎসিত ঘৃণ্য হওয়াই উচিত। উপন্যাসের কাহিনী মিলনের যে চিত্রের ইঙ্গিত দিতেছিল তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। রোহিণীর সহিত মিলনের ভোগসুখের একটি উজ্জ্বল মধুর ছবি গোবিন্দলালের মনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই মিলন-চিত্রের ইন্দ্রজাল ও ইন্দ্রধনুচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া সে অকলঙ্ক চরিত্র, রাজার অধিক সম্পদ্, জগতে অতুল, চিন্তায় সুখ, দুঃখে অমৃত যে ভ্রমর তাহাকে বিসর্জ্জন দিল। কিন্তু নবীন প্রণয়োদয়ের পর যুবক-যুবতীর মিলনে যে আনন্দ তাহাদিগকে আত্মহারা করে, তাহাদের রক্তধারাকে নাচাইয়া তুলে তাহা তাহাদের ভাগ্যে ঘটিল না। পুত্রশোককাতর জননী যেমন নিরন্তর একটি বিষাদের পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করে, সে চন্দ্রকিরণে পুলকের শিহরণ দেখিতে পায় না, সূর্য্যালোকে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে না, জীবনের কোন মহোৎসবেই তাহার উল্লাস উথলিয়া উঠে না, ভ্রমরবিরহবিধুর গোবিন্দলালও সেইরূপ রোহিণীর উচ্ছলিত রূপ, যৌবন ও লাবণ্যের সঙ্গলাভ করিয়াও আনন্দে মাতিয়া উঠিতে পারে নাই। ভ্রমরের অদৃশ্য ভাস্বর মূর্ত্তি তাহাদের মিলনের মধ্যে এক অলঙ্ঘনীয় ব্যবধান রচনা করিয়া রহিল। নিদারুণ মারীগুটিকায় যে রোগীর সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া গিয়াছে সে যেমন কোন পাশেই ভর দিয়া সুস্থির ভাবে শয়ান থাকিতে পারে না, প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করিতে থাকে গোবিন্দলালও সেইরূপ এই দুইটি নারীর কাহারও সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় জীবন যাপন করিতে পারে না। একটি দুঃসহ বিরহে তাহার শূন্য হৃদয় খাঁ খাঁ করিতেছে। করুণ স্মৃতির ছায়া মিলনের আনন্দ, আলোক ও হাস্যকে প্রচ্ছন্ন রুদ্ধ অশ্রুজলে ম্লান করিয়া দিতেছে। ইহাই গোবিন্দলালের জীবনের ট্রাজিডি! মিলনের এই চিত্র আঁকিতে বঙ্কিমচন্দ্র সাহস করেন নাই।

রোহিণীকে লইয়া গোবিন্দলাল বড় গোলে পড়িয়াছিল। তাহাকে লইয়া আরও বেশী গোলে পড়িলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি যে প্রেমময়ী নারীর সৃষ্টি

করিলেন, সুবিশাল হিন্দুসমাজব্যবস্থায় তাহার জন্য সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থান নাই। কিন্তু দরদী বঙ্কিম, কবি বঙ্কিম, সত্যের পূজারি বঙ্কিম রোহিণীর জীবনের এই গভীর ও মহান্ সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিলেন না, অথচ নীতিকার বঙ্কিম তাহার গৌরবময় স্থানের দাবী স্বীকার করিয়া সমাজসৌধের ভিত্তি প্রশস্ততর করিবার কথা ভাবিতেও আতঙ্কিত হইলেন। যাহা কিছু জটিল ও সমস্যাময় ছিল তাহার অতি সহজ ও সরল মীমাংসা করিয়া দিলেন বিচারক বঙ্কিম। রোহিণীর বিরুদ্ধে একসাজসী কেস্ খাড়া করা হইল। রোহিণী নিশাকরকে প্রেম নিবেদন করিতে করিতে গোবিন্দলালের কাছে ধরা পড়িল। এই পাপের সমুচিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড তাহাকে দেওয়া হইল।

উপন্যাসে উল্লিখিত ঘটনাপর্য্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রোহিণীচরিত্রের এই নব অভিব্যক্তি কি অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী? রোহিণীর জীবনকাহিনীতে কি নিশাকর-আসক্তির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়? রোহিণী-হরলাল আখ্যানভাগে রোহিণীর যে ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহার সাহসিকতা ও বিবাহ-বাসনার পরিচয় পাই কিন্তু মদনপীড়িতা অধীরা যুবতীর উদগ্র রমণাভিলাষের কোন ইঙ্গিত তাহার মধ্যে নাই। তাহার গোবিন্দলাল-আসক্তির মধ্যে প্রেমাকুলা নারীর পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন আছে, নবীন নারীহৃদয়ের উত্তপ্ত প্রেমতৃষ্ণা ও চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা আছে কিন্তু কোথাও মায়াবিনীর কুহক-জালের আভাসমাত্র নাই। তাহার প্রণয়াসক্তি বিজ্ঞের নিকট নিন্দনীয়, সমাজপতির চক্ষে গর্হিত, কিন্তু সে মিলনের চিরন্তন, সার্ব্বভৌম আদর্শটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, যে বন্ধনের দ্বারা সে নিজেকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল তাহা চিরকালের নয় বলিয়া কোন সঙ্কোচ কোন সংশয় তাহার মনে স্থান পায় নাই। নানা কারণে ধীরে ধীরে যে গোবিন্দলালের প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, গোবিন্দলালের গৌরবময় মানবতা যাহার চিত্ত জয় করিয়াছিল সে, যাহার প্রণয়কাহিনীর মধ্যে কিছুমাত্র নাটকীয়তা ছিল না সে শুধু নিশাকরের পটলচেরা চোখ দেখিয়াই মজিয়া গেল? যে গোবিন্দলালকে অপ্রাপ্য বস্তু জানিয়াও কায়মনোবাক্যে চাহিয়াছিল, যে অনুরাগ ভরে আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিল সে হঠাৎ দেখা দিল বিজয়িনীবেশে?

অনেকে বলেন গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর আত্মনিবেদনে পরিপূর্ণতা আছে

কিন্তু তাহা ক্ষণিকের। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সাহিত্যের দৃষ্টি ও বাস্তবজীবনের দৃষ্টি হুবহু এক নহে। বাস্তবজীবনে আমরা কোন মানুষের যে পরিচয় পাই তাহা তাহার সত্যস্বরূপ নাও হইতে পারে, তাহার কার্য্যাবলীর যে কারণ নির্দ্দেশ করি তাহার কারণ ভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু সাহিত্যে আমাদের মনে চরিত্রের যে রূপটি ফুটিয়া উঠে, তাহাই চরিত্রের সত্য পরিচয়, পাত্রপাত্রীর জীবনের যে অংশ সাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে, সেই চিত্রে তাহাদের ব্যক্তিত্বের যে অভিব্যক্তি দেখিতে পাই, তাহাদের সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই আমরা তাহাদের উত্তর ও পূর্ব্ব জীবনে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করিতে পারি। 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু' গীতিকবিতায় রাধিকার যে অতৃপ্ত প্রিয়জনদর্শন ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা মুহূর্ত্তের কিন্তু আমাদের ভাবলোকে রাধিকার এই প্রিয়দর্শনব্যাকুল রূপ তাহার চিরন্তন রূপ। গোবিন্দলালের নিকট রোহিণীর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ক্ষণিকের—কিন্তু এই চরম ক্ষণটির মধ্যেই তাহার সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তর জীবন সঞ্চিত আছে; তাহার এই প্রেমময়ী মূর্ত্তি মুহূর্ত্তের নয়, নিত্যকালের।

রোহিণীর গোবিন্দলাল-আসক্তির মধ্যে নিছক দেহভোগলালসা ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না এবং অন্যের দ্বারাও এই ভোগপিপাসা পরিতৃপ্ত হইতে পারিত এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহা হইলে উপন্যাসের বিষয়বস্তু এই দাঁড়ায়— একজন হৃদয়বান্ যুবক রূপতৃষ্ণার মোহে একজন রূপসী ভ্রষ্টার দ্বারা প্রতারিত হয় ও তাহাকে বধ করে। এই কাহিনী "সংযম ও চরিত্রগঠন" বক্তৃতায় সন্নিবেশিত হইলে বক্তব্যবিষয় পরিস্ফুট হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু ইহা এমন কোন রস-সম্পদের বাহন হইতে পারে না যাহাতে আমাদের হৃদয় সকল সময়ই প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইবে; সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অন্তরে যে "রসময় রহস্যময় আয়ত্তের অতীত সত্য থাকে যাহা আমাদের আত্মচেতনাকে মধুর, উজ্জ্বল ও গভীর করে, আমাদের অন্তরপুরুষকে রাঙাইয়া দেয়, রসাইয়া দেয়" সেই সত্য এই আখ্যানের মধ্যে নাই। উপন্যাসের শেষভাগে কাহিনীটি এইরূপ হইয়া পড়ায় ট্রাজিডির সমস্ত মহিমা লুপ্ত হইয়াছে। দুইটি মহৈশ্বর্য্যশালিনী, মহামহিমময়ী নারীর সুগভীর প্রেমের প্রতিকূল স্রোতে পড়িয়া উদারহৃদয় গোবিন্দলালের মনে যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, এই দুইজনের একজনকে ফেলিয়া, আর একজনকে গ্রহণ

করিবার স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারায় সকলের জীবন মহাশূন্যতায় ভরিয়া গেল, ট্রাজিডির এই গৌরব একবার মাত্র দ্বিতীয়খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে—বারুণীতীরে ভূলুণ্ঠিত গোবিন্দলাল রোহিণী-ভ্রমরময় জগৎ দেখিতে লাগিলেন।

নীতিবোধের সহিত রসবোধের চিরন্তন দ্বন্দ্বের জন্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' শেষাংশ শিল্পসৃষ্টি হিসাবে নিকৃষ্ট হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কোন বিশেষ আদর্শবাদের প্রচারের চেষ্টা থাকিলেই যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অপকর্ষ হয় তাহা নহে। আধুনিক সাহিত্যের সহিত প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান পার্থক্যই এই যে আধুনিক সাহিত্য প্রচার-সাহিত্য। প্রাচীন সাহিত্য বিচরণ করিত কল্পনার অলকাপুরীতে; যক্ষ, কিন্নর, বিদ্যাধর তাহার নায়ক; অপ্সরা, কিন্নরী, বিধ্যাধরী তাহার নায়িকা। আধুনিক সাহিত্য নামিয়া আসিয়াছে আমাদের গৃহের প্রাঙ্গণে, সমাজের সাধারণ নরনারীই তাহার নায়ক নায়িকা, আমাদের বাস্তবজীবন তাহার উপজীব্য। আমাদের জীবনের উৎকট সমস্যাগুলি শিল্পীর রসাবেগকে উদ্বোধিত করে, এবং তিনি এই সকল সমস্যার রসময় রূপ সাহিত্যে প্রতিফলিত করেন। প্রচার-আবেগ যদি শিল্পীর সৃষ্টি-প্রতিভাকে উদ্দীপিত করে, বাস্তবজীবনের রসাত্মক রূপসৃষ্টির প্রেরণা যোগায় তাহা হইলে প্রচার-সাহিত্যও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' শেষভাগে নীতিপ্রচার প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রতিভার উদ্বোধন না করিয়া উদ্বন্ধন ঘটাইয়াছে।

শ্রীসন্তোষকুমার প্রতিহার

কবিতাগুচ্ছ

ভোরে

থেমে গেছে অন্ধ ঝড়। শান্ত হল গ্রহ আকাশের।
হৃৎপিণ্ড কাঁপিছে তবু ধরিত্রীর শঙ্কায় আহত।
তুমি যেন মাতরিশ্বা, অন্তরীক্ষে মোর জীবনের
কামনার বনস্পতি মুহুর্মুহু নাড় অবিরত।
প্রশান্তি দিয়েছে যেন হৃদয়ের দীর্ঘ আশীর্বাদ।
বনপথ অলিগলি স্বপ্নালোকে হল জাগরিত।
ভগ্ন মৃত দেহ নিয়ে ঈগলের নেইকো বিবাদ।
কুক্কুটের জয়গাথা অরণ্যেরে করে বিচলিত।
তবু কি রয়েছে ভ্রান্তি? জানি জানি নগরে বিপ্লব
আর যত নাগরিক হৃদয়ের ঘন ওঠা পড়া
মুহূর্তে গিয়েছে থেমে। জাতিস্মর অরণ্য-পল্লব
প্রাক্তন ধরণী-বক্ষে ছিন্ন পত্রে দেয় বুঝি ধরা।
ধনতন্ত্র রজনীর বিপর্য্যস্ত পেটিকোটে আহা,
মেদবাহী গণিকার সুষুপ্তিতে কি আছে সুরাহা।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

জোনাকি

জোনাকির আলো—তারি তরে মরে শর্বরী।
অন্ধকারের ভয়সঙ্কুল আর্তনাদ,
বিষ-বনানীর ক্ষীণভূয়িষ্ঠ প্রাণশিখা
ক্ষণিক কিরণে জপিছে নীরব মুক্তি।

বিরহক্ষপায় জ্বলিছে হাসির জোনাকি।
পীড়িত প্রাণের তমোময় পটভূমিকা
কখনো দীপ্ত কামনার আলো-ইসারায়,
ক্ষণবিরতির ভ্রূকুটি-কালিমা-শঙ্কিত।

নিকষ চিকুর, তিমির নিচোল তারি তলে
স্তিমিত দ্বিধায় নীহারিকা রয় গুণ্ঠিত।
হৈমরেখার স্ফুরণের প্রতিসাধনে
স্পন্দিত মূক মনোগহনের মর্ম্মর।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভিনাসের জন্ম

প্রশান্ত সমুদ্রবক্ষে ডুবে গেলো সায়াহ্নের রবি,
আরক্ত সিন্দূর-রাগ ধীরে ধীরে হয়ে এলো ম্লান ;
সন্ধ্যা এলো দীপ হাতে যেন স্নিগ্ধ স্বপ্নময়ী ছবি,
বাতাসে ভাসিয়া এলো জল-পরীদের কলগান।
যাদুকরী তুলি দিয়া নীলিমায় কোন শিল্পী কবি,
অজস্র নয়ন আঁকি মুহূর্ত্তে করিল দৃষ্টিদান।

অদূরে পর্ব্বত-শিরে লে-পড়া রজনীর চাঁদ,
সাগর পাখীর গানে জেগে ওঠে কিশোরীর মত।
লজ্জার জড়িমা ভাঙ্গি ছিঁড়ে ফেলি সঙ্কোচের বাঁধ,
গগনে খুঁজিয়া ফিরে আপনার অভিসার পথ।
রক্তে তার বাজে বাঁশি—তনু হতে ঝরি পড়ে সাধ,
সুরের মূর্চ্ছনা সম—রূপালী জ্যোছনা-রেণু শত।

অনন্ত নীলাম্বু আজ আহা মরি ! সেজেছে মধুর,
লাজুক বধূর মত উতরোল আবেশ হিল্লোলে।
পাইন পাতার গানে ভেসে আসে আনন্দের সুর,
নব সম্ভাবনা জাগে ফেনময় তরঙ্গ-কল্লোলে।
সহস্র বীণার ধ্বনি বক্ষোময় হল ভরপুর,—
কে এলে গো প্রাণময়ী আলোময়ী, সমুদ্রের কোলে।

তুমি কী স্বর্গের জ্যোতি অকস্মাৎ পড়িয়াছ খসি'
দেবের উদয়াচল ম্লান করি মর্ত্ত্যের দুয়ারে ;
তোমার ও অঙ্গ হেরি খসে গেল লজ্জানতা শশী,
রজনী লুকালো ভয়ে পর্ব্বতের গুহার আঁধারে।
অঙ্গে তব বাস নাই, মৃদু হাসি কে তুমি রূপসী,
উন্নত ও স্তন-যুগ করপুটে চাহ ঢাকিবারে।

গভীর নীলাভ চোখে স্বপ্নাতুর বিদ্যুদ্‌-বিলাস,
অঙ্গের মদির গন্ধ, বিশ্বের যৌবন আনে টানি,
অধরের হাসি হেরি সৃষ্টি হয় ও চরণে দাস,
রক্তিম কপোলে ভাসা মিনতির ভীরু দীপখানি
বক্ষের পঞ্জর ভাঙ্গি ধীরে টেনে আনে দীর্ঘশ্বাস।
দখিণা পবন কহে—এসো এসো বসন্তের রাণী !

শ্রীঅরুণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশ

লণ্ডনস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জোসেফ কেনেডি ইউরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে "A world war may start in spring"। প্যারিসস্থ রাষ্ট্রদূত মিঃ বুলিট-এর মতও তদনুরূপ। এরূপ অভিমতের মূলে রয়েছে জার্ম্মানীর ইউক্রেন অভিযানের সঙ্কল্প ও ইতালীর তুনীসলিপ্সা। সর্ব্বত্রই সমরায়োজন পূর্ণোদ্যমে অগ্রসর হচ্ছে—স্পেনেও ইতালী ও জার্ম্মানীর উদ্যমের অবসান নেই। নিরপেক্ষতা নীতির ষোলআনা অকৃতকার্য্যতায় বেলজিয়ামের মত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে ও সরিয়া পড়িতে কৃতসঙ্কল্প। মিউনিক চুক্তির পর হইতেই যুদ্ধের কথাবার্ত্তা ও আশঙ্কা একটু বেশীরকম দেখা দিয়াছে। ইঙ্গ-জার্ম্মান কোলাকুলি ও ফরাসী-জার্ম্মান মিতালীর সাথে সাথেই রোমে তুনীসলিপ্সা যেন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মিঃ দালাদিয়ে উপনিবেশ হস্তান্তর হইবার আশঙ্কায় উপনিবেশে ফরাসীভক্তি প্রকট করিবার জন্যই সাড়ম্বরে সফর করিয়া আসিলেন এবং তাহাতে ইতালীর বিক্ষোভ বাড়িল ছাড়া কমিল না। এদিকে হাঙ্গেরীর সীমান্তে ছোটখাট একটু যুদ্ধের মহল্লা হইয়া গেল—চেক প্রধানমন্ত্রী হিটলারের সহিত সলাপরামর্শে ব্যস্ত। ইউরোপের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যেন গোপন ষড়যন্ত্র ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহারই মধ্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন ও পররাষ্ট্রসচিব লর্ড হ্যালিফাক্স ইতালীর অভিমুখে অগ্রসর। তাঁহাদের মতে শান্তি-স্থাপন, সৌহৃদ্য ও সাধারণ আলোচনাই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু সকলের মনেই এক ভয়—এমনকি কয়েকখানি বিলাতী সংবাদপত্রেও জানা যায়—যে রোমে মিউনিকের পুনরাবৃত্তি না হইলেই যথেষ্ট। সকল বিষয় অবশ্য এখনও প্রকাশ হয় নাই তবে আলোচনার মধ্যে স্পেন, তুনীস, ভূমধ্যসাগর, সুয়েজখাল ও ইঙ্গ-ইতালীয় বাণিজ্য সমস্যা স্থান পাইবে বলিয়াই বিশ্বাস। বিলাতে অনেকে চেম্বারলেনকে অনুরোধ করিয়াছেন যে তিনি যেন যে কোন প্রকারে একটি চুক্তি বা ঘোষণা লাভ করিতে যত্নবান না হন। ঘটনাচক্রে সকলের মনেই একটা বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে যে ডিক্টেটারী শাসনতন্ত্রের চুক্তি

ও ঘোষণার মূল্য কত সামান্য। সত্যই যে হিটলার বা মুসোলিনী ইউরোপ বা জগতের শান্তির উদ্দেশ্যে কিছু বিসর্জ্জন দিবেন ইহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। ইতালী ও ফ্রান্সের এই বর্ত্তমান মনোমালিন্যের মধ্যে চেম্বারলেন ও হ্যালিফাক্সের ইতালীর উপর অগাধ আস্থা একটু বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। আরও বিস্ময়কর এই যে রোমযাত্রার পথে প্যারিসে চেম্বারলেন-দালাদিয়ে আলোচনায় মুসোলিনীর নিকট চেম্বারলেনের বক্তব্য ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে—ফলে ইস্তাহার যে বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ব বিষয়ে একমতাবলম্বী। এ যেন ভৌতিক ব্যাপার! হিটলারের কার্য্যাবলী বরাবরই নাটকীয় ধরণের, ইঙ্গ-ফরাসী ব্যাপার একটু রহস্যময়।

এইরূপে ইউরোপীয় ঘটনাজাল বিস্তৃত হইতে থাকিলে, ইউরোপ গণশাসন ও স্বৈরাচার উভয়কেই প্রশ্রয় দিতে পারে না। এ দুইয়ের আদর্শ ও কার্য্যধারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হয় ইউরোপীয় শক্তিবর্গ ডিক্টেটারী ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গণশাসনের বিসর্জ্জন দিবে না হয় ইউরোপ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইবে। পরেরটিই ঐতিহাসিক ভিত্তি হেতু সম্ভব। ডিক্টেটারী শক্তিকে ক্ষণেকের জন্য ক্ষান্ত করিতে পারিলে আসন্ন সমর এড়ান যায় বটে কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। সমস্যা ক্রমশঃই জটিল হইয়া ওঠে ও গণশাসনকে শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয় মাত্র।

*　　*　　*　　*

ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের অবস্থাও ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চরম ও শোচনীয় পরিণতি গিয়া দাঁড়াইয়াছে মেজর বাজালগেটের মৃত্যুতে। এইরূপ ঘটনা গণআন্দোলনের পথে সত্যই বিঘ্ন ঘটায়। দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন সম্পর্কে গণ আন্দোলনের মূলকথা ও ভাবধারা একটু তলাইয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে; এসম্বন্ধে দেশীয় রাজ্যের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বৃটিশভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাদেরও চিন্তা করা প্রয়োজন। এইরূপ অবিমৃষ্যকারিতার জন্য জনগণ দায়ী ও দোষী; কিন্তু তাহাদের নিন্দা করিলেই কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। বৃটিশভারতে রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের সম্পর্ক বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। "সহানুভূতি" কথাটির মধ্যে অনেক গলদ রহিয়া

গিয়াছে। বৃটিশ-ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের ইহার সবিশেষ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন নচেৎ তাঁহাদের সহানুভূতি ও নিন্দার কোন অর্থ হয় না। কংগ্রেস নেতাদের উচিত কংগ্রেসী আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রজা-আন্দোলনের সহিত সম্পর্ক নির্দ্দেশ ও প্রকাশ করা। নচেৎ "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" অবস্থা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের একটা প্রচেষ্টা সবসময়েই রাজনীতির উপর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে। কংগ্রেস-মুস্‌লীম লীগ আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ার পর মনে হইয়াছিল যে এই চেষ্টার একটা অবসান ঘটিবে কিন্তু আবার সংবাদ আসিয়াছে যে বারদৌলীতে গান্ধী-আগাখাঁ সাক্ষাৎকারে এবিষয়ের আলোচনা হইবে। ইতিমধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে। স্থিরসিদ্ধান্ত করা হইলেই কংগ্রেস মন্ত্রিবর্গকে তদনুসারে কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। ইহাতে কোন সম্প্রদায়ের ঊর্দ্ধতন নেতৃবর্গকে খুসী করা যাইতে পারে, ইহাতে মন্ত্রিত্ব কায়েমী হইতে পারে, কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধান হইতে পারে না। এমনকি কংগ্রেস-মুস্‌লীম লীগ মিলন হইলেও যে সাম্প্রদায়িকতা দূর হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রকৃত গণজাগরণের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে গণআন্দোলনের ফলেই সাম্প্রদায়িকতা স্থায়ী ভাবে দূর করা যাইতে পারে। সত্যই "Economic considerations will cut across communal groups"। জনসাধারণের স্বার্থ এক—তাহার মধ্যে সম্প্রদায়বিচার নাই। এক সম্প্রদায়ের অভিযোগ আর এক সম্প্রদায়ের জনগণের বিরুদ্ধে নয়—সম্প্রদায়ের তথাকথিত নেতৃস্থানীয়দের বিরুদ্ধে। জনসাধারণের হিন্দুসংহতি কিম্বা মুসলিমসংহতিতে বিশেষ কিছুই লাভের আশা নাই; লাভ হইতে পারে ঊর্দ্ধতন ব্যক্তিদের। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা অবসানের বর্ত্তমান আলোচনা সফল হইলে—রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া যাইলেও—স্থায়ী ফল পাওয়া সন্দেহজনক।

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

পুস্তক-পরিচয়

British Social Life in India—by Denis Kincaid

(George Routledge & Sons.)

আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় সেকাল ও একালের এতদ্দেশীয় বৃটিশ সমাজ। লেখক ইংরেজ সিবিলীয়ান, সম্প্রতি শোচনীয় আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে অকালে প্রাণ হারাইয়াছেন। অল্পবয়সেই তিনি অনেকগুলি সুপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার প্রণীত শিবছত্রপতির জীবনী পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলাম। জাতিতে সাহেব ও পদগৌরবে সিবিলীয়ান হইয়াও এতটা অপক্ষপাত ও দরদ তিনি কোথায় পাইলেন, এই কথা কেবলই মনে হইয়াছিল। এই লেখকের বিশেষত্ব তাঁহার প্রাঞ্জল ভাষা ও মনোরম লিখনভঙ্গী। হয়ত তাঁহার গ্রন্থাবলীতে পাঠক গভীর তথা নীরস তত্ত্বানু-সন্ধানের পরিচয় পাইবেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ ভাবিলে ভুল হইবে যে তিনি ইতিহাসের বা সমাজতত্ত্বের বড় বড় কথাগুলি বাদ দিয়া কেতাব লিখিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য। সপ্তদশ শতকের আরম্ভ হইতে আজ অবধি বৃটিশ সমাজের কি কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভারতবাসী ইংরেজের চরিত্র, ভাবনা ও চালচলনের কিরূপ ক্রমপরিণতি হইয়াছে তাহা এই তরুণ গ্রন্থকার যত্নপূর্ব্বক অনুধাবন করিয়াছেন। পরিবেশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন কি কি কারণে এই সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিংকেড সাহেবের পিতা এবং পিতামহও তাঁহাদের কর্ম্মজীবন ভারতেই কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার পারিরারিক আবহাওয়া ইঙ্গ-ভারতীয় হওয়াতে সেকালের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাঁহার কাছে সহজলভ্য হইয়াছে। কিন্তু এই সহজ অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেও তিনি পুরানো চিঠিপত্র, কেতাব, দলিল, দপ্তর হইতে বিস্তর খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সমস্ত তথ্য তিনি এমন নিপুণ হস্তে সাজাইয়াছেন যে কোথাও পরিপ্রেক্ষার ব্যতিক্রম হয় নাই। চিত্রখানি—অবশ্য চলচ্চিত্র, panorama—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। রসের অভাব একটুও নাই, একটা

মৃত্নমন্দ শ্লেষের আভাস পুস্তকের প্রতি পত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লেষের পাত্র প্রধানতঃ লেখকের স্বজাতি। কিন্তু বোম্বাই-এর অযথা ইঙ্গভাবাপন্ন পারসী সমাজকে একটু আধটু খোঁচা দেওয়ার লোভ গ্রন্থকার সংবরণ করিতে পারেন নাই। আমাদের সৌভাগ্য যে সাহেব বঙ্গদেশে বাস করেন নাই, নহিলে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে যে একেবারে রেহাই দিতেন তাহা মনে হয় না। তবু এই গ্রন্থকারের ঠাট্টা তামাসায় বিষ নাই, উৎকট জাতীয় হাম্-বড়া ভাবও নাই। তাই পুস্তকখানি এমন সুপাঠ্য হইয়াছে। অবশ্য সাহেবলোগেদের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ কুতূহল থাকার কথা নয়। আগের যুগের সাহেব-কুঠীতে আসবাবপত্র কিরূপ থাকিত, তাঁহারা কিরূপ জাঁকজমক করিয়া বড়া-খানা ভোজ দিতেন, কিরূপ অদ্ভুত কাপড়চোপড় পরিতেন, কি রকমের নাচ নাচিতেন, এ সব কথা বাঙ্গালী পাঠকের হয়ত ভাল লাগিবে না। কিন্তু কিংকেড সাহেব ঠিক অতটা পল্লবগ্রাহী ভাসা-ভাসা ভাবে ব্যাপারটা আলোচনা করেন নাই। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় দেখাইয়াছেন, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে প্রথম যুগের ভবঘুরে বোম্বেটের স্থানে ব্যাপারী ইংরেজের উদয় হইল, কেমন করিয়া এই ব্যাপারীর দলে আস্তে আস্তে অর্থলোলুপ লক্ষপতি "নবাব" সমূহ দেখা দিল, কেমন করিয়া এই নবাবের দল ক্রমশঃ রাজ্যলোভী আমলাতন্ত্রে পরিণত হইল। তারপর উনিশ শতকের শেষার্দ্ধে সিপাহী যুদ্ধের ফলে কোম্পানীর রাজত্বের অবসানে আধুনিক সিবিলীয়ান-শাসিত ভারত সাম্রাজ্যের কিরূপে উদয় হইল। আবার সব শেষ, বিশ শতকের মহাযুদ্ধের পরে কেমন করিয়া সেই একচ্ছত্রী সাম্রাজ্যের রূপান্তর আরম্ভ হইল। এই যে রাষ্ট্রনীতিক পরিবেশের ক্রমপরিবর্ত্তন, ইহা ইংরেজ ও ভারতীয় দুই জাতিরই অনুধাবনের বিষয়। লেখকের বাহাদুরী এই যে সরস সামাজিক চিত্রের মধ্য দিয়া ঐতিহাসিক ব্যাপারসমূহ ও তাহার গূঢ় অর্থ পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করিয়াছেন। ফিরিঙ্গী বা ফরাসীরা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে যতটা প্রাচ্য-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন, ইংরেজ ততটা কখনই হন নাই। চোপদার পাইক হরকরার বহর যতই হউক না কেন, আমাদের সাহেবেরা তাঁহাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবন নেটিব সংস্পর্শ হইতে অনেকটা বাঁচাইয়া চলিতেন। তথাপি সিপাহীযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত অনেক সাহেব-কুঠীতেই বিবিখানা থাকিত, এবং সেই

বিবিখানাতে সাহেব নিত্য মোগলাই ভোজ্য পদার্থ খাইতেন, ও লম্বা নলওয়ালা আলবোলায় অম্বুরী তামাকু সেবন করিতেন। কোম্পানীর রাজ্য লুপ্ত হওয়ার পর ধীরে ধীরে গার্হস্থ্য দুর্নীতি ও নেটিব কু-অভ্যাস নিচয় দূরীভূত হইল। ইহার এক কারণ ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের কঠিন সুনীতিপরায়ণতা, দ্বিতীয় কারণ সুয়েজ খাল খোদিত হওয়ার ফলে অধিক সংখ্যক ইংরেজ মহিলার ভারতে আগমন। শুধু যে মহিলারাই বেশী ভারতে আসিতে লাগিলেন তাহা নয়, সাহেবেরাও ঢের বেশী স্বদেশে যাওয়া আসা আরম্ভ করিলেন। ফলে আগেকার কালে যে টাকা আমীরী চাল বজায় রাখিবার জন্য খরচ হইত, এখন সে টাকা জমা হইতে লাগিল বিলেত ভ্রমণের জন্য। "হাথীপর হাওদা, ঘোড়েপর জিন, বাহের হোতে হ্যাঁয় স্যর ওয়ারেন হষ্টীন" এখন রূপকথায় দাঁড়াইয়াছে। এ সমস্ত বিষয়ই কিংকেড সাহেব লিখিয়াছেন, অতি সুন্দর সরস ভাষায় লিখিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠক কষ্ট করিয়া বইখানি পড়িলে আনন্দ পাইবেন, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

পুস্তকে কয়েকটি সুন্দর ছবি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ছবিগুলি প্রধানতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের চিত্র। মোগল জাঁকজমক ও ইংরেজী সাদা চালের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! আজ মোগল জাঁকজমক প্রায় খসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও দেখা যায়। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ আপন ইংলণ্ডীয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের চালচলন ছাড়িয়া দিয়া বিলেতী upper ten-এর অনুকরণ করিতে সদাই ব্যস্ত। ইহার ফল কতকটা হাস্যাস্পদ না হইয়া যায় না। এ কথাও গ্রন্থকারের নজর এড়ায় নাই।

আলোচ্য গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি প্যারা উদ্ধৃত করার ইচ্ছা ছিল। বাহুল্য ভয়ে করিলাম না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

Secret Agent of Japan (A handbook to Japanese Imperialism)—by Amleto Vespa. (Gollancz.)

বইখানার শিরোনামা থেকে এটা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে এর মধ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী অভীপ্সার যথেষ্ট জ্ঞাতব্যতথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

"Secret Agent"-এর অর্থে গ্রন্থকার এ্যামলেটো ভেস্পাকেই আমরা বুঝব, কারণ তিনি বহুবৎসরব্যাপী জাপানী গুপ্তচর বিভাগের গোপন কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং পাঠকের গ্রন্থকারের জীবনী সম্পর্কে কৌতূহলী হওয়া অনিবার্য এবং সেজন্য সমালোচনা করবার পূর্বে গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অবশ্য-প্রয়োজন।

গ্রন্থকার একজন ইটালীয়ান। বাইশবৎসর বয়সে ১৯১০ সালে মেক্সিকোয় রিভল্যুশনারী আর্মীতে যোগদান করেন এবং পরে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। ১৯১২ সালে তিনি মেক্সিকো ত্যাগ করে য়ুনাইটেড্ ষ্টেটস্, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ফরাসী ইন্দোচীন ভ্রমণ করে শেষে চীনে উপস্থিত হন। মহাসমরের সময় মিত্রশক্তি (Allied powers) ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে তাদের "Intelligence Service"-এ এশিয়ায়, বিশেষ করে, সাইবেরিয়া ও চীনের গুপ্তচর বিভাগের অন্যতম কর্মকর্তা হয়ে কাজ করেছেন। War-lord চ্যাংশোলিন যখন চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কুয়োমিংটাঙের বিরোধিতা করে তিনটি প্রদেশ একত্র করে স্বতন্ত্রভাবে মাঞ্চুকুয়ো গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন, তিনি গ্রন্থকার ভেস্পাকে তাঁর অধীনে গুপ্তচর বিভাগে নিযুক্ত করেন। চ্যাংশোলিনের আমলে ইটালী থেকে বে-আইনীভাবে বন্দুক ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য আমদানী হত। হারবিনের ইটালীয় রাজদূত ভেস্পাকে স্বদেশে প্রেরণ করবার বন্দোবস্ত করতে লাগলেন। এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ভেস্পা জাতি বদলাতে হলেন বাধ্য অর্থাৎ তিনি চৈনিকরূপেই স্বীকৃত হলেন। ১৯৩২ সালে War-lord চ্যাংশোলিনকে জাপানীরা হত্যা করে মাঞ্চুরিয়াতে তাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে। ভেস্পার ভাগ্যও এর সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। গ্রন্থকার জাপানীদের দুর্ধর্ষ কবলে পড়ে জাপানী গুপ্তচর বিভাগে তাদের নির্দেশমত কাজ করতে হয়ে পড়লেন বাধ্য। "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" চীনের সংবাদদাতা টিম্পারলী সাহেবের মুখবন্ধ থেকে উপরোক্ত জীবনী পুনরুদ্ধৃত করলাম।

চীনের বুকে জাপানীদের সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার কী ভীতিপ্রদরূপে প্রকট হয়ে উঠেছে তার নগ্নরূপ লেখক সমস্ত বইখানার ছত্রে ছত্রে দেখিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, গুপ্তচর বিভাগে গোপন কুচক্রী ষড়যন্ত্র সমগ্র জাপানী পররাষ্ট্রনীতির

মধ্যে সক্রিয়ভাবে কতদূর কাজ করেছে সেটার পরিক্রমা বাস্তব ঘটনার মাঝে বইখানায় আদ্যোপান্ত বিস্তার লাভ করেছে।

বইখানার মধ্যে ভেস্‌পা যে-সমস্ত ফ্যাক্টের সমাবেশ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক।

প্রথম চারিটি পরিচ্ছেদে লেখকের জাতি-পরিবর্তন থেকে সুরু করে শেতাঙ্গ ক্রীতদাস ব্যবসায়, War-lord চ্যাংশোলিনের হত্যাকাণ্ড, জাপানীদের মুকদেন অধিকার এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপানীদের সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির জটিল গতিভঙ্গী দেখান হয়েছে। তারপর দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত জাপানী গুপ্তচর বিভাগের চীফের অমানুষিক অত্যাচারী মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ, সরকারী বারবণিতার একচেটিয়া ব্যবসায় (official prostitution monopoly), প্রতিক্রিয়া, লীগ অফ্ নেশনস্-প্রেরিত লিটন কমিশন ইত্যাদি ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। শেষের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কেবল জাপানীদের কর্তৃক নরনারী-হরণ এবং তাদের উপর জান্তব নিপীড়নকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেখিয়ে সর্বপরিশেষে গ্রন্থকার নিজস্ব একটি বক্তব্য লিখে বইখানা সমাপ্ত করেছেন।

১৯১৬ সাল থেকে সুরু করে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মাঞ্চুরিয়ায় চৈনিকদের উপর যে-সকল মর্মন্তুদ কাহিনী ঘটেছে—বইখানা তারই একটা বিরাট ইতিহাস এ-কথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। "Kidnapping á la Mode", "The Kaspe case", "Shanghai, a Heaven without rest"—এ-সকল ঘটনা লেখক ভেস্‌পা যে মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন তা অনবদ্য। নারীর উপর শ্বাপদের মতো অত্যাচারকে জাপানীরা কোন অভিযোগের বিষয়ই বলে আদৌ মনে করে না। শ্রীমতী ভেস্‌পা "My wife tells her story" নাম দিয়ে যে পরিচ্ছেদটা লিখেছেন সেটা বইখানাকে আর একটা সাপ্লিমেণ্ট দিয়েছে।

জাপানীদের অন্তর্নিহিত স্বরূপ সমস্ত জগতের কাছে প্রায় অজ্ঞাত বললেই চলে এবং বাহিরের জগতে যাও পরিচিত তাও প্রোপাগাণ্ডা-বিকৃত। গ্রন্থকার ভেস্‌পা যে জাপানী গুপ্তচর বিভাগে কয়েকবৎসর যাবৎ কাজ করে তাদের গোপনতথ্য এ-বইখানার মধ্যে প্রকাশ করেছেন তার জন্য বাস্তবিকই তিনি ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বইখানার মধ্যে যে দামী জ্ঞাতব্যবিষয় আশা করেছিলাম এটা পড়ে সে-আশা নিষ্ফল হয়েছে। গ্রন্থকার কেবল জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সুপ্রচুর ফ্যাক্টেরই সমাবেশ করেছেন—এই ফ্যাক্টের পারম্পরিক সুবৃহৎ ঐতিহ্য থেকে কোন "significant" মতবাদ বা উপসংহারে আসা যায় না। জাপানের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কী সম্পর্ক?—সে-সম্বন্ধে লেখক কোন কথাই বলেননি। লেখক সারা বইখানার মধ্যে মাঞ্চুরিয়া এবং পরে সমগ্র চীনের বুকে জাপানী (?) সাম্রাজ্যবাদের বর্বরতার বিরুদ্ধে ক্রুসেড চালিয়েছেন।

"Munchuria : the Cockpit of Asia"—গ্রন্থে বহুপূর্বেই Colonel Etherton এবং H. Tiltman বলে গেছেন : "Munchuria was the place of International ambition"। লেখক ভেস্‌পা কিন্তু সে-কথা আদৌ বলেননি। তিনি চীনগ্রাসের প্রচেষ্টাকে নিছক জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়া বলেই স্বীকার করেছেন। ১৯২৬ সালে কুয়োমিংটাঙের মধ্যে কম্যুনিষ্টদের সাথে সম্পর্কস্থাপনে বিরোধিতা করে চিয়াংকাইশেক যখন স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করলেন এবং পরে ১৯২৭ সালে কম্যুনিষ্ট International-কে ব্যর্থ করবার প্রয়াসে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে গণ-আন্দোলনের আমূল উচ্ছেদসাধনের জন্য যে রক্তাক্ত অভিযান চালিয়েছিলেন গ্রন্থকার ভেস্‌পা তা মিত্রশক্তির মিশনে কার্যকালে প্রত্যক্ষভাবেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। লেখক কি এ-কথা জানতেন না চিয়াঙের নীতি নিঃসন্দেহে : "He declared a policy of Non-resistance to Japan. Peace with the International Imperialists and war on the masses........"

পরে চিয়াঙের গভর্ণমেণ্টও যখন আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের কাছে প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত করতে পারলেন না, অর্থাৎ চীনের জাতীয় ক্যাপিটালের শক্তিবৃদ্ধির সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালের বিপরীত গতিতে আসন্ন সঙ্কট থেকে তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারলেন না, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকাকে বাধ্য হয়েই এ-আরদ্ধ কাজ সমাধার জন্যই জাপানকে হুকুম দিতে হল।··· "Chinese Government had failed to create such conditions.... Now Japan has undertaken the charge....England and America

know that Japan has not got the means...so, Japan will have to fall back upon English and American capital...that means, that the profit will go to England and America, and Japan will be more or less the paid policeman in China"। সুতরাং এ-থেকে সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে জাপানী (?) সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক ফ্যাসিষ্টবাদের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ।

১৯৩২ সালের মে মাসে লীগ অফ্ নেশনস্-প্রেরিত লিটন কমিশন মাঞ্চুরিয়ার প্রকৃত পরিস্থিতি জানবার জন্য আসে। লেখক এটাকে মিত্রশক্তির চীনের প্রতি অসম্ভব রকম দরদ ও সহানুভূতির স্বরূপ বলেই দেখিয়েছেন। কিন্তু মূলতঃ জাপানীদের কর্তৃক চীনের জাতীয় ক্যাপিটাল ধ্বংস এবং ইয়াং ইয়াংকি ক্যাপিটালের নিরাপত্তা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের ক্যাবিনেট লীগ অফ নেশনস্ চীনলুণ্ঠন কার্যে জাপানকে *"Laissez faire"* দিতে উপরোক্ত লিটন কমিশন পাঠিয়েছিল। কিন্তু গ্রন্থকার ভেস্‌পা ঠিক এর বিপরীত ব্যাখ্যাই করেছেন।

এ-কথা খুবই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মনপলি ক্যাপিটালের যুগে স্বতন্ত্র জাতীয় ক্যাপিটালের জীবনধারণ অসম্ভব। কেননা জাতীয় ক্যাপিটালের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনতন্ত্রের চরম পরিণতি—বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালের সঙ্কট আসা অনিবার্য। এই কারণে আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালিষ্ট কর্তৃক পৃথক জাতীয় ক্যাপিটালের উচ্ছেদসাধনের অভিযানই আবিসিনিয়া, অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভেকিয়ার স্বাধীনতা হরণের মূলে বর্তমান। ঠিক এই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই ঘটছে জাপানের সাহায্যে চীন ধ্বংসের ব্যাপারে। সুতরাং ধনতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণের চরমোন্নতির যুগে কোন জাতীয় বিরোধকে আন্তর্জাতিক সমস্যা থেকে পৃথকরূপে দেখা অজ্ঞতার লক্ষণ।

অবশ্য গ্রন্থকার ভেস্‌পা যে চীনলুণ্ঠন ব্যাপারে সমস্ত দোষ জাপানের উপর চাপিয়েছেন এর মূলে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে দোষমুক্ত করবার যথাসাধ্য চেষ্টাই যে ক্রিয়াশীল একথা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায়। আমাদের এ-সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ সত্য তার নিদর্শন পাই যখন পড়ি যে "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের" চীনের সংবাদদাতা টিম্পারলী সাহেব তাঁর ভূমিকায় উক্তি করেছেন :—"Mr.

Vespa…is—a loyal Fascist and an ardent admirer of Mussolini" সুতরাং গ্রন্থকারের পক্ষে সাম্রাজ্যবাদনিরপেক্ষ না-হওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।

লেখক আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের নীতিকে গোপন করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তিনি একস্থানে অনবধানতাবশতঃই বোধহয় বলে ফেলেছেন: "The world's knowledge of Japan would form a bulky volume of misinformation.…At the time before and after the Portsmouth treaty of 1906 when the British Lion inspired by fear and prompted by ambition, felt compelled to pull out the claws of the Russian Bear…the nations of the earth were made almost dizzy by the din of Britannic propaganda in praise of that…little Japan…British Tories helped to create this myth of a heroic Japan; and behind the myth has matured a monster Frankenstein…"

মুখ্যতঃ লেখক মিত্রশক্তি এবং পরে জাপানীদের (একই কথা) পক্ষ থেকে কম্যুনিষ্ট দলনের জন্য চীনে গিয়েছিলেন এবং জাপানী গুপ্তচর বিভাগে বহুবৎসর ধরে যথেষ্ট মূল্যবান কাজও করেছেন এবং পরে কাজসমাপ্তির পর জাপানীদের কবলে পড়ে অত্যাচারী ব্যবহার পেয়েছিলেন। লেখক নিশ্চয়ই জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তে কার্যোদ্ধারের পর এ-রকম ব্যবহার পাওয়া আদৌ স্বভাব-বিরুদ্ধ নয়। সুতরাং ব্যক্তিগতভাবে লেখক ও তাঁর পরিবারের উপর যে মর্মন্তুদ উৎপীড়ন চালিয়েছে জাপানীরা এর আনুপূর্বিক ইতিহাস পড়ে আমাদের মনে করুণার উদ্রেক হয় কিন্তু সহানুভূতি জাগে না মোটেই।

তা-সত্বেও লেখক জাপানীদের দুর্নীতি ও নপুংসক সংস্কৃতির যে উলঙ্গ মূর্তি জগতের সম্মুখে তুলে ধরেছেন এর জন্য তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন, বিশেষভাবে ভারতবাসীর। এ-প্রসঙ্গে ভারতের সাথে জাপানের রোম্যান্টিক সম্পর্ক একটু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া খুব প্রয়োজন। অধিকাংশ ভারতবাসীর ভ্রান্ত বদ্ধমূল ধারণা আছে যে জাপানই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের দুর্মর কবল থেকে রক্ষা করবে সমগ্র প্রাচ্যকে। যে জাপান আজ আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের "paid

policeman in China"-র নামান্তর এবং তা-ভিন্ন যার সমরপ্রস্তুতির জন্য কাঁচা মাল বলতে কিছুই নেই—পেট্রোলিয়াম, লোহা প্রভৃতির আমদানীর জন্য যে সম্পূর্ণ নিঃসহায়ভাবে মুখাপেক্ষী আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদের করুণার উপর—সে যে আবার তাদের বিরোধিতা করে তাদের দুর্নিবার গণ্ডী থেকে উদ্ধার করবে ভারতবর্ষকে এবং সমগ্র প্রাচ্যকে, এর চেয়ে হাস্যকর মনোভঙ্গী আর কী হতে পারে ? এদিক থেকে ভেস্‌পা-র বইখানা বাস্তবিকই আলোর রেখাপাত করবে ভারতবাসীর এই অহেতুক অজ্ঞতান্ধ দৃষ্টির উপর। এ-জন্য গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধাময় ভট্টাচার্য

Fascism—by M. N. Roy, (D. M. Library.)

শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় বিপ্লবী কম্যুনিষ্ট নেতা বলে পরিচিত। এতদিন তাঁর নাম ও কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকরকম সত্যাসত্য গুজব শুনতে পাওয়া যেত ; অনেক তরুণ মন এই অস্পষ্ট কুহেলিকাচ্ছন্ন চরিত্রের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট হতো। এড্‌গার স্নো'র Red Star over China-র মত বিখ্যাত বইয়ে তাঁর সম্বন্ধে এখানে ওখানে দুএকটি মন্তব্যও হয়তো অনেকের চোখে পড়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে এসে জেল থেকে মুক্তি পাবার পরে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্ম্মপদ্ধতির সঙ্গে দেশের লোকের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে ; ফ্যাসিজম্‌ সম্বন্ধে আলোচ্য বইখানিতে তিনি ফ্যাসিষ্ট দর্শন, অতিমানববাদ, নাৎসিবাদের মর্ম্মকথা, সামাজিক বিপ্লববিরোধিতা, ফ্যাসিজমের আসল উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে খুব জোরালো আলোচনা করেছেন ; আলোচনার ভঙ্গী বেশ সাবলীল ও সাময়িক সংবাদপত্রের ভাষায় লেখা বলে সহজেই সকলের বোধগম্য। ইতালী ও জার্ম্মেনীর ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী মতবাদ ও কর্ম্মপদ্ধতির বিচার ও বিশ্লেষণই এই বইখানাতে গ্রন্থকারের মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে হয়, কারণ স্পেন, চীন, বা জাপান সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই ; প্রসঙ্গতঃ ভারতবর্ষ ও ভারতীয় দর্শন, বিশেষতঃ উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ,

গান্ধী প্রভৃতি সম্পর্কে খুব গরম ও ঝাঁঝালো মন্তব্য আছে। ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান দার্শনিকদের মধ্যে যাঁদের মতবাদের আশ্রয়ে ফ্যাসিজম্ পুষ্ট হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কেও মুখরোচক মন্তব্যের কিছুমাত্র অভাব নাই। অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সংবাদপত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি যে পক্ক খেচরান্ন পরিবেশন করেছেন, তাতে নুন ঝালের মাত্রা একটু বেশী থাকলেও মোটের উপর স্বাদ বেশ উপাদেয় হয়েছে, একথা স্বীকার করতেই হবে।

ফ্যাসিজমের কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে শেষের পরিচ্ছেদগুলিতেই বইখানার প্রথমাংশের দার্শনিক বিষয়ে দ্রুতসিদ্ধান্ত অপেক্ষা বেশী তথ্য ও গভীরতর আলোচনা আছে। কিন্তু যখন ফ্যাসিষ্ট দেশগুলির শিল্পবাণিজ্যের ব্যাপারে সংখ্যা-ঘটিত তথ্য পাওয়া যায় ও সেগুলি উদ্ধৃত হলে ফ্যাসিষ্টবিরোধী কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সত্য ঘটনাও প্রকাশ করা হয়, সে অবস্থায় আরও বেশী সংখ্যাঘটিত আলোচনা থাকলে ভাল হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে হিটলারের পেছনে ক্রুপ, টিসেন্, সিমেন্স, বশ্, ফোগ্‌লের প্রভৃতি কোটিপতি ধনকুবের রয়েছে, তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও মূলধনের পরিমাণের সংখ্যাতালিকা থাকলে, ফ্যাসিজম্ যে ধনিকদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার একটা বর্ব্বর উপায় মাত্র একথাটা বুঝবার পক্ষে সুবিধা হতো; যথা—

ধনকুবের	ব্যক্তিগত সম্পত্তি পাউণ্ড	মূলধন পাউণ্ড
যুদ্ধোপকরণের রাজা হের ক্রুপ ফন্ বোলেন্	৬,০০০,০০০	১৫,০০০,০০০
ইস্পাতের রাজা হের ফ্রিটস্ টিসেন্	৬,০০০,০০০	৫৪০,০০০,০০০
বৈদ্যুতিক উপকরণের রাজা হের ফন সিমেন্স	৬,৫০০,০০০	১২,৫০০,০০০
রং শিল্পের ট্রাষ্টের অধ্যাপক কার্ল বশ্	২,০০০,০০০	৫৫,০০০,০০০
ষ্টীল ট্রাষ্টের ডাঃ এ. ফোগ্‌লের	৬,০০০,০০০	৪০,০০০,০০০

প্রসঙ্গতঃ আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করা দরকার; ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে আলোচনায় রজনী পাম্ দত্তের প্রামাণ্য গ্রন্থ Fascism and Social Revolution-এর অন্ততঃ উল্লেখ থাকা নিশ্চয়ই উচিত ছিল। তাঁর মতের

সঙ্গে রায় মহাশয়ের মতের মিল, অমিল অথবা আংশিক মিল থাকলে, কতটা এবং কোথায় সে বিষয়ে একটা আলোচনা না থাকাতে বইখানির অঙ্গহানি ঘটেছে। আর ফ্যাসিজম্ সম্বন্ধে বইতে ডিমিট্রভের ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে 'ইউনাইটেড ফ্রন্ট' মতবাদের কোন উল্লেখ না থাকা আজকালকার দিনে অপরাধ বলেই গণ্য হবে। ডিমিট্রভের সঙ্গে রায় মহাশয়ের মতানৈক্য থাকলে বা চুকে গিয়ে থাকলে, সে বিষয়ে আলোচনা করবার দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না। এ-রকম একটা গুরুতর ব্যাপারে চেম্বারলেনীয় 'ন যযৌ ন তস্থৌ' নীতি অবলম্বন করলে 'ইতোভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ' হওয়া অবশ্যম্ভাবী, একথাটা তাঁর মত বুদ্ধিমান লোকের কিছুতেই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ফ্যাসিজমের দোষত্রুটি প্রদর্শন করাই যথেষ্ট নয়; কি উপায়ে এই সর্ব্বনাশী বর্ব্বরতার হাত থেকে জনগণকে সার্থকভাবে রক্ষা করা যেতে পারে সে বিষয়ে পরিষ্কার আলোচনা ও পথের নির্দ্দেশ না থাকাতে, সাধারণ পাঠকের তো কথাই নাই, এমন কি তাঁর অনুচর রায়বাদীরাও বইখানা পড়ে অনেকটা হতাশ হয়ে পড়বেন।

দার্শনিক ব্যাপারে রায় মহাশয় মার্কস, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের মতাবলম্বী বলে প্রসিদ্ধি আছে; কিন্তু, দার্শনিক আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি যায়গায় যায়গায় অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিলেও, সমস্যাগুলির উপরে আলোকপাত করার চাইতে উত্তাপই বিকীরণ করেছেন বেশী। অস্পষ্টতা দোষেরও অভাব একেবারেই নাই। নব্য হেগেলবাদীদের সম্বন্ধে যথার্থ মন্তব্য করলেও, রাসেল, পারেটো, জেমস্, সোপেনহাওয়ার, নীট্শে প্রভৃতি সবাইকে ফ্যাসিষ্টবাদের পূর্ব্বাচার্য্যের পর্য্যায়ে ফেলা মোটেই ভারসহ হয় নাই। ইংলণ্ডের নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বা নিও-রিয়ালিজম্ নিশ্চয়ই ফ্যাসিজমের দর্শন নয়। এতে বিশ্লেষণসর্ব্বস্ব বুদ্ধিপ্রাধান্য আছে সন্দেহ নাই; কাজেই মার্কসের 'ফয়েরবাখ্ বিষয়ক প্রস্তাবের সূত্র অনুযায়ী একে ব্যবহার-সম্পর্কচ্যুত ন্যায়ের কূটতর্ক মাত্র বলে অভিহিত করা অন্যায় হয় না; কিন্তু একেবারে একলাফে এই বুদ্ধিসর্ব্বস্ব দর্শনকে বুদ্ধিদ্রোহী রোজেনবের্গীয় দর্শনের পর্য্যায়ে ফেলা অত্যন্ত বেশী বাড়াবাড়ি। আর এতে এমনকি মার্কসীয় সত্যের মর্য্যাদাও রক্ষিত হয় নাই। পারেটোর সমাজতাত্ত্বিক মতবাদকেও সোজাসুজি ফ্যাসিষ্ট মতবাদ বলে প্রচার করলে অত্যুক্তি হয়। অষ্ট্রীয় অর্থনীতিবিশারদেরা যে বিশ্লেষণসর্ব্বস্বতার দিকে,

ঝুঁকেছিলেন, এক হিসেবে তারই পরিণতির পরিচয় পাওয়া যায় ফ্রেজারের "Economic Thought and Language" বইখানিতে। Land, Labour, Capital, Enterprise প্রভৃতিকে অতিবিশ্লেষণের সাহায্যে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল করে শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে দ্বন্দ্বের সীমারেখাটিকে অস্পষ্ট ও ক্রমে বিলুপ্ত করে দেবার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা এই জাতীয় লেখায় দেখতে পাওয়া যায়। পারেটোর লেখাতে আধুনিক যুগে এই ধরণের বিশ্লেষণী মনোবৃত্তির অন্যতম সূচনা। এই বিশ্লেষণী বৃত্তির সঙ্গে রাসেলীয় দর্শন ও ভিয়েনার তার্কিক প্রত্যক্ষবাদীদের দার্শনিক মতবাদের নিকট সম্পর্ক আছে। আগমমান সামাজিক বিপ্লবের সময় বুদ্ধিজীবিরা সাধারণত বস্তু ও চেতনা, ধনিক ও শ্রমিক, শোষক ও শোষিত প্রভৃতির মূল দ্বন্দ্বকে নানারকম বুদ্ধির কারসাজীর সাহায্যে অস্পষ্ট করে দিয়ে বিপ্লবের পথরোধ করবার চেষ্টা করে থাকে ; বিশেষতঃ যারা নিয়মতান্ত্রিক বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের আওতায় মানুষ হয়েছে, তাদের তো কথাই নাই। কাজেই এই জাতীয় বিশ্লেষণী দার্শনিক ও সামাজিক মতবাদ বিপ্লববিরোধী বটে, কিন্তু যুক্তিবাদী বলেই সম্পূর্ণ বুদ্ধিদ্রোহী ফ্যাসিষ্টপন্থী হতে পারে না। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত এই দোলাচলচিত্ততার অবসান বুদ্ধির বিসর্জ্জনে পরিণতি লাভ করে ফ্যাসিজমে রূপান্তরিত হতে পারে ; কিন্তু সে রকম শোচনীয় পরিণতি ঘটবার আগেই এই জাতীয় দার্শনিকদের জোর করে ফ্যাসিষ্টদের দলে ঠেলে দেওয়া বুদ্ধির আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র।

ঠিক এই আত্মঘাতী মনোবৃত্তির প্রাবল্যের ফলেই রায় মহাশয় ভারতীয় দর্শনের উপর খড়্গহস্ত। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন সম্বন্ধে একটু অনুকম্পার ভাব দেখালেও বইখানিতে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট আলোচনার একান্তই অভাব। হেগেলীয় ও মার্কসীয় ডায়ালেকটিকের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে ডায়ালেকটিকের ঐক্য বা পার্থক্য কোথায় সেটা একেবারেই দেখান হয় নাই। এ বিষয়ে সেরবাট্স্কি, রাধাকৃষ্ণনন্, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখার সঙ্গে রায় মহাশয়ের আলোচনার তুলনা করলেই তাঁর অস্পষ্টতা পরিষ্কার ধরা পড়ে। জৈন অনেকান্তবাদের ডায়ালেকটিক হেগেলীয় ডায়ালেকটিকের মত গতিধর্ম্মী নয়, এটুকু জানবার জন্য স্যাদ্‌বাদমঞ্জরীর মত বই পড়বার দরকার হয় না ;

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিতেই রায় মহাশয়ের ব্যবহারের মত প্রচুর উপকরণ আছে ; একটু পরিশ্রম বা অনুসন্ধিৎসা থাকলেই তিনি তার সন্ধান পেতেন। ভারতীয় দর্শনের প্রতি তিনি অতি-চরমপন্থীসুলভ নাসাকুঞ্চন করলেও, কোথাও যুক্তিতর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই। যে ডায়ালেকটিকের তিনি এত ভক্ত, সে ডায়ালেকটিক অনুযায়ীই ভারতীয় দর্শনের মধ্যে কোথায় তার বাস্তব সারপদার্থটি কূটতর্কজালের অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে, তাকে ডায়ালেকটিক ভঙ্গীতে প্রকাশ করা উচিত ছিল। মার্কস্, এঙ্গেলস্, লেনিনের দার্শনিক রচনার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনি এই রকম একদেশদর্শী ভাবে কেবল অতিবামপন্থী আঘাত করেই কি ভাবে ক্ষান্ত থাকতে পারেন, এটা সত্যিই কৌতূহলের উদ্রেক করে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কম্যুনিষ্ট বলে পরিচিত ছিলেন না ; কিন্তু তিনিও তাঁর লোকপ্রসিদ্ধ ফরিদপুর অভিভাষণের প্রারম্ভে উপনিষদের সময় থেকে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ভারতীয় চিত্তের বৈশিষ্ট্য, তাকে অতীন্দ্রিয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে পৃথিবীর ধূলিমাটীর সঙ্গে, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত করবার দিকে প্রচেষ্টার স্বপক্ষে ইঙ্গিত করেছিলেন। অথচ বিশ্ববিশ্রুত কম্যুনিষ্ট রায় মহাশয় একেবারে মারমুখো হয়ে ভারতীয় দর্শনকে ফ্যাসিজমের দর্শন বলে গালাগালি সুরু করে দিলেন। হয়তো ইউনাইটেড ফ্রণ্টের নীতির প্রতি তিনি উদাসীন বা বিরূপাক্ষ বলেই ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের জোর করে ফ্যাসিষ্টদের দলে ঠেলে দিতেও তিনি নারাজ নন।

রায় মহাশয় বিবেকানন্দের উপরও খাপ্পা। কিন্তু ব্যবহারিক বেদান্তের বাণী প্রচারের মধ্যে আর যাই থাকুক বা না থাকুক, অন্ততঃ তত্ত্ব ও ব্যবহার বা জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে যে ঐক্যের কথা মার্কস্‌বাদীরা বলে থাকেন, সেই দিকে ইঙ্গিত যে রয়েছে তা কি রায় মহাশয় অস্বীকার করবেন ? বিবেকানন্দের যুগ আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যাহ্ন—এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ও আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতির বিভিন্নতা যদি গ্রন্থকারের চোখে না পড়ে থাকে, সেজন্য দায়ী বিবেকানন্দ নন, দায়ী রায় মহাশয়ের ঐতিহাসিক অন্ধতা। কয়েকটি মাত্র কথা বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' বইখানা থেকে উদ্ধৃত করে রায় মহাশয়কে উপহার দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় যে বাস্তব ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের ভূমিকা বিবেকানন্দ রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা—"অবাধ

বিদ্যাচর্চ্চার দিনে, উত্তরাধিকারীদের দাও, যতশীঘ্র পার দাও। তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, হেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত থেকে।"

রায় মহাশয় বলেছেন যে বহুদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে ফ্যাসিজমের দর্শন গড়ে উঠেছে ; তিনি এই কথাটি বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য সহকারে কোন্ কোন্ দার্শনিকের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে এর বিভিন্ন অংশ বা সমগ্র দর্শনটি ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করেছে, তা দেখান নাই। সোপেনহাওয়ার, নীট্শে, চেম্বারলেন, গোবিনো, জেমস্, বার্গসন, সোরেল প্রভৃতির মধ্যে বিভিন্ন পর্য্যায়ের প্রতিক্রিয়াশীলতা দার্শনিক চিন্তায় রূপান্তরিত হয়েছে, এর বেশী বললে ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না। ফ্যাসিষ্টরা এই বিভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাগুলিকে সুবিধামত জোড়াতালি দিয়ে একটা তথাকথিত দার্শনিক মত গায়ের জোরে ইতালী ও জার্ম্মেনীতে চালাচ্ছে, এই কথা বললেই বোধহয় ঠিক হয়। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক জর্জ্জ, এইচ্, স্যাবাইন তাঁর "A History of Political Theory" বইখানাতে ফ্যাসিজম্ ও কম্যুনিজমের তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন সেই মন্তব্যই রায় মহাশয়ের দ্রুতসিদ্ধান্তের চাইতে ভারসহ বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, "The philosophy of communism has behind it a long history of intellectual development, the outcome of three generations of investigation and discussion, which has given it a considerable measure of coherence and continuity of growth. In it thought in a measure preceded action, in the sense that neither Marx nor Lenin made his philosophy to fit the exigencies of an occassion. The philosophy of fascism has been largely *ad hoc* and has been patched together from the existing fund of ideas either to justify what had already been done or to meet situations that were immediatly in prospect. The philosophy

of communism at least puts a value on intellectual consistency and objectivity of investigations.…The philosophy of fascism is fundamentally irrationalist offering a myth created by intuition or by instinct and made "true" by the very act of willing or believing it." (pp. 773-774)

যাঁহাদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেই সব মনীষী ছাড়া অন্যান্যদের সম্বন্ধেও মতানৈক্যের বহু অবসর আছে ; বিশেষতঃ বার্গসনের সঙ্গে হেগেলের তুলনামূলক সমালোচনা অনেকের কাছেই হেঁয়ালির মত মনে হওয়া বিচিত্র নয়। রায় মহাশয়ের সঙ্গে পাঠকের হয়তো অনেক বিষয়ে মতের মিল না হতে পারে ; কিন্তু তাঁর স্পষ্টবাদিতা ও ফ্যাসিষ্টবিরোধিতা এবং সেজন্য তিনি যেরকম সাবলীল ভাষায় ও শক্তিমত্তার সঙ্গে লেখনী চালনা করেছেন, সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এদেশে আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ধর্ম্মগত কারণে ফ্যাসিজমের উদ্ভব সুদুর আশঙ্কার বিষয় মাত্র নয়। সুতরাং আশঙ্কা যাতে সত্যে পরিণত না হয় সে জন্য এই রকম ফ্যাসিজম্ বিরোধী সাহিত্য যত বেশী প্রচারিত হয় ততই দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর। বইখানির ছাপা বাঁধাই বেশ ভাল ; কিন্তু একটি নির্ঘণ্ট পত্র থাকলে পাঠকের পক্ষে সুবিধা হতো। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে অন্যান্য ত্রুটির সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘণ্টপত্রের অভাবের ত্রুটিও দূর হবে। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

সেঁজুতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বিশ্বভারতী), মূল্য একটাকা।

সন্ধ্যায় গৃহলক্ষ্মীরা করেন সেঁজুতি, পরিপাটি করে আঁকেন আল্পনা আর মেয়েলি ছড়ায় মন্ত্রপাঠে করেন দীপমালার বন্দনা। রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতা-গ্রন্থ এমনি এক দিন ও রাত্রি, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপলব্ধ অনুভূতির উদ্ঘাটিত রূপ। রবীন্দ্রনাথ মরণকে অন্ধকার তামস গহ্বর রূপেই দেখেছেন, এই জীবনের বিচিত্র লীলার মধ্যে সুন্দরের চরম বিকাশকে আসক্তি ভরেই ভালোবেসেছেন। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী কবি ফিরে এলেন নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে,

মরণকে দেখলেন নতুন রূপে। সেই অচিহ্নিত উদয়লোকের তীরে যে ভাষা ও যে নবজীবনের স্পন্দন এসে তাঁর প্রাণে লেগেছিল, তাই স্বাধিকৃত ছন্দোনৈপুণ্যে, লীলায়িত সৌন্দর্য্যে কবি প্রকাশ করেছেন। এর পূর্ব্বে প্রকাশিত 'প্রান্তিকে'র মধ্যে ভাব-সম্পদ থাকলেও, তাতে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল। 'সেঁজুতি'তে সে ত্রুটি নেই, কারণ প্রথম কবিতা "জন্মদিন" ছাড়া ঠিক্ ঐ জাতীয় কবিতা এ বইয়ে বড় বেশী নেই। অবশ্য অল্পবিস্তর সব কবিতায় একটা ভাবগত সৌসাদৃশ্য আছে, কিন্তু রূপের পার্থক্য ও স্বতন্ত্রতা এত বেশী, যে সকল কবিতাতেই পুনরাবৃত্তি নজরে পড়ে না।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই ধরা যায় যে অনেক কবিতাই, বিশেষ করে "স্মরণ" ও "নিঃশেষ", পূরবী ও মহুয়া-যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্র-নাথের বহুবার রচিত সেই বিদায়ের গান, বিস্মরণীর মোহ, চঞ্চল গতিশীলতার মধ্যে সেই অচঞ্চলের পুরানো লীলা, অসীম সুন্দরের প্রতি সেই নতিভরা কৃতজ্ঞতা, মহাকালের তাপসোচিত সেই যুগান্ত প্রতীক্ষা, আর ছায়ায় ঢাকা আম্‌লকি বন, নিভৃত শালবনের মর্ম্মর, আঙিনার নির্জ্জন দীপ, আঁধার তীর্থগামী নৌকা, অসীম নীরবতায় জীবনের সর্ব্বশেষ ছুটি, এবং অরূপলোকের ব্যর্থপ্রশ্ন পরম-রহস্য প্রভৃতি অতিপরিচিত ভাব ও ভাষা এই বইতে একই অলঙ্কারে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এ ক্ষেত্রে নতুনত্বের দাবী করলেও, তার পরিধি কিন্তু সীমাবদ্ধ ও স্বৈরবৃত্ত। রহস্যময় তামসলোক থেকে প্রাণ-সূর্য্যালোকের তীরে প্রত্যাবর্ত্তন—অতি সুন্দর ও সমাহিত রূপেই চিত্রিত হয়েছে। কবির ভাবমর্য্যাদা অনস্বীকার্য্য, কিন্তু তাঁর সর্ব্বশেষ কাব্যগ্রন্থে আমরা বুঝিবা বেশী প্রত্যাশাই করেছিলাম। ভেবেছিলাম কবির অধ্যাত্মজগতে অজানা নক্ষত্রের কক্ষপরিবর্ত্তনের তির্য্যগ্‌ভঙ্গী নতুন বিপ্লবের সূচনা করবে, দেখাবে কল্পনাপ্রতিভার একটা অপরিচিত রূপ। কিন্তু পেলাম সেই পুরানো সৌর-মণ্ডলেরই অভ্যস্ত আবেষ্টনী। মনে হল, কবির 'পলায়নী' কবিতাটিই মূল তত্ত্বের নির্দ্দেশ করেছে, তার বেশী নয়।

তবে একথাও মান্‌তে হবে, কবির সৃজনীশক্তি সমভাবে অক্ষুণ্ণ না থাক্‌লেও, তাঁর রচনার কারুকার্য্য ও সজীবতা সত্যিই বিস্ময়কর। জগতের সব শ্রেষ্ঠ প্রতিভারই একটি নিজস্ব ধারা থাকে, তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি সেই স্বপ্রতিষ্ঠিত

রাজ্যে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-প্রতিভা আর তার শিল্পিত প্রকাশের মধ্যে যে চিরাচরিত সুসঙ্গতি আছে, 'সেঁজুতি'তে সেই মিলনীশক্তির অপভ্রংশ ঘটেনি, এই কথাটাই অনুরক্ত পাঠকের কাছে আনন্দের বিষয়, আর সেই কথাটা স্বীকার করে নিলে সমালোচকের ক্ষুণ্ণতা-অভিযোগের কারণ থাকে না।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পরিক্রমা—বুদ্ধদেব বসু। (ডি, এম, লাইব্রেরী)

শ্মশানে বসন্ত—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। (ডি, এম, লাইব্রেরী)

বর্ত্তমান যুগ নভেলের যুগ হ'লেও বাংলা সাহিত্যে পাঠযোগ্য উপন্যাসের সংখ্যা এত কম যে আঙুলে গোনা যায়। আধুনিক বাংলা কবিতা ও ছোট গল্পেই যা আমাদের কিছু উন্নতি হয়েছে। উপন্যাসের রাজ্যে শরৎচন্দ্রের কথা বাদ দিলে আধুনিক লেখকগণের মধ্যে শৈলজানন্দের 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস', বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', অন্নদাশঙ্করের 'সত্যাসত্য', ধূর্জ্জটিপ্রসাদের 'আবর্ত্ত' ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। আর যে-সমস্ত উপন্যাস নিয়মিত প্রকাশিত হয়, তাতে বাংলা ভাষার পুস্তক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপকার হয় না ; এবং তাও আমাদের দেশের পক্ষে একেবারে উপেক্ষার নয়।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসুর নাম আছে। তাঁর মতো অজস্র লিখতে পারেন, এমন লেখক সব দেশেই বেশি দেখতে পাওয়া যায় না, বাংলা সাহিত্যের কথা তো ধর্ত্তব্যই নয়। এরই মধ্যে সাড়ে তিন কি চার ডজন বই তাঁর বেরিয়ে গেছে। ভাবলেও শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। সাহিত্যের সকল বিভাগেই তাঁর অবাধ গতিবিধি। 'পার্সোন্যাল এসে' রচনায় তাঁর সমতুল্য নেই বললেও চলে ; কয়েকটা ছোট গল্প ও কবিতাও তিনি ভালো লিখেছেন। তাঁর শক্তি সম্পর্কে কোনো দিনই আমার সংশয় ছিল না, আজও নেই ; যদিও সেই সঙ্গে এই ধারণাও আমি পোষণ করি যে, গদ্য-পদ্য ও উপন্যাস রচনায় তাঁর আশানুরূপ দক্ষতা নেই। ইতিপূর্ব্বে তাঁর বহু উপন্যাস পড়েছি এবং নিরাশ হয়েছি। সেই

কারণে ইদানীং তাঁর উপন্যাস পড়া ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু 'পরিক্রমা' আমাকে বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে। আট-নয় ঘণ্টার ব্যবধানের মধ্যে ছয়-সাতটি চরিত্রকে তাদের চিন্তা ও আচরণের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। অথচ গল্পের স্রোত কোথাও ব্যাহত হয়নি; এই উপন্যাসে দু' একটা সমস্যারও যে ইঙ্গিত নেই, তাও নয়; কিন্তু লিপিকুশলতার গুণে তা গল্পকে ছাড়িয়ে প্রধান হ'য়ে ওঠেনি। পাঁচ বছরের মেয়ে বাবলি-র জন্মদিন উপলক্ষে তার মা বরুণা আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে নিমন্ত্রণ করল, তাদের কথা নিয়েই এই উপন্যাস। ঘটনা এমন্ কিছুই নয়, কিন্তু এই সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বরুণা-প্রশান্ত, সুমিতা-বিজন, মল্লিকা-কুঙ্কুম আর সোমনাথের কাহিনী। মল্লিকা-কুঙ্কুমের ব্যাপার কতকটা অসম্ভব বলে মনে হ'লেও, এই তিনটে গল্পকে এক সুতোয় গাঁথার মধ্যে লেখকের কৃতিত্ব আছে। তাঁর ভাষা স্থানে স্থানে দুর্ব্বল; বাংলা ভাষার 'ইডিয়ম' তাঁর আয়ত্ত নয়।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বইখানিতে সবসুদ্ধ এগারোটি গল্প আছে। লেখক নবীন; 'শ্মশানে বসন্ত' তাঁর প্রথম গল্পের বই। কয়েকটি গল্প পড়ে আনন্দ পেয়েছি, যদিও ভাষার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের অভাব আছে। তাঁর ভাষায় আড়ষ্টতা নেই, ঝরঝরে ও সহজ। বইখানির কাগজ ও বাঁধাই চমৎকার।

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জলের লিখন—শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী (এম-সি, সরকার এণ্ড সন্স)

খসড়া—অমিয় চক্রবর্ত্তী (ভারতী ভবন)

এখন থেকে দশ বারো বৎসর আগে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার চৌধুরীর কবিতা প্রকাশিত হত। বাংলা কাব্য তখন রবীন্দ্রনাথের তৈরি প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে অব্যাহত বেগে চলেছে—তারি পাশ দিয়ে একটি ক্ষীণ মেটে পথ তৈরির চেষ্টা দেখা দিয়েছে মাত্র। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ-বৈচিত্র্য, কালিদাস রায়ের ক্ল্যাসিকাল ভঙ্গী, মোহিতলাল মজুমদারের বলিষ্ঠ দেহাত্মবাদ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের ও নজরুল ইসলামের বিদ্রোহ তখন দেশে একটা নূতন

কাব্যাদর্শের সূচনা করছে—কিন্তু সমগ্র ভাবে একটা নূতন কাব্য-দৃষ্টি গড়ে ওঠেনি। সুধীর বাবু সেই সময়ের কবি—তাঁর মধ্যেও এই স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা দেখা গিয়েছিল। হয়ত দীর্ঘ দিন কাব্য-চর্চ্চায় নিয়োজিত থাকলে, তাঁর কবি-দৃষ্টি একটা পূর্ণতা লাভ করতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর কাব্য-রচনা অল্পদিনেই নিরস্ত হয়ে গেল এবং প্রথম প্রয়াসেই তিনি কাব্যানুরাগী পাঠকদের মনে যে আশার সঞ্চার করেছিলেন, সেইটুকুই অনেকের স্মৃতিতে থেকে গেল—তাঁর কাব্য-সৃষ্টি বৃহত্তর পরিণতি লাভ করলো না।

বর্ত্তমান বইয়ে সেই সময়ের অনেকগুলি কবিতা সংগৃহীত হয়েছে। এর কতকগুলি কবিতা পূর্ব্বের পড়া। কিন্তু অল্প বয়সের অনুরাগ নিয়ে বড় বয়সে কোন লেখা ফিরিয়ে পড়তে বসলে স্বভাবতই একটা ধাক্কা লাগে—জলের লিখনের অনেক জায়গাতেই এই ধাক্কা লাগলো। যদিও প্রত্যেক কবিতাই প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে প্রায় নিখুঁত, বক্তব্যের কোথাও কোন্ ঘোরপ্যাঁচ নেই—শব্দ-চয়ন প্রায় সর্ব্বত্রই কৃতিত্বপূর্ণ এবং আবেদন সরস, তবু বেশীর ভাগ কবিতাই যেন অতিবিস্তৃতিদুষ্ট। মনে হয়, কবির ফেনায়িত ক'রে বলার দিকে ঝোঁক বেশী। যে সংযম, পরিমিতি ও অপরিহার্য্যতা আর্টের প্রাণ, তাকে টেনে টেনে লম্বা করলে, প্রাণ-বস্তু দানা বাঁধতে পারে না—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাতে পৃথক পৃথক ভাবে অনেক জায়গা সুখপাঠ্য হয়ে ওঠে, কিন্তু সমগ্র ভাবে কবিতা জমে না। নজরুল ইসলাম এবং আধুনিক কালে বুদ্ধদেবের কবিতায়ও এই দোষ দেখতে পাই—এটা সুধীর বাবুর নিশ্চয় কমে আসতো, যদি তাঁর কবিতা রচনায় অপ্রত্যাশিত ভাবে আরম্ভেই ছেদ না পড়তো। প্রথম প্রয়াসে অতিশয়তা কবি মাত্রেরই থাকে—কিন্তু তার ভেতর থেকেই কবির শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে।

সুখের কথা সুধীর বাবুর কাব্যে সে শক্তির পরিচয়ই শুধু নেই, বৈশিষ্ট্যের চিহ্নও আছে প্রচুর পরিমাণে। তাঁর ভাষা, দৃষ্টি এবং ব্যঞ্জনায় যদিও রবীন্দ্র-প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অনেক স্থলে বিষয়-নির্ব্বাচনেও তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুগামী, তবু তাঁর নিজস্বতা অনস্বীকার্য্য—সে কাব্যের বিন্যাসেও, অন্তর-সম্পদেও। রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যর্থ অনুকরণে সেদিন বাংলা কবিতা থেকে কবির আত্মকেন্দ্রিক মনের কথাটা প্রায় চাপাই পড়ে গেছলো—যে অনুভূতি ও দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক, তার ভাণই হয়েছিল সেদিনের কবিদের মূলধন। তাঁরা

সাহিত্যের ইতিহাসে কেউ বাঁচেননি, কিন্তু একদা তাঁদের প্রভাব বাংলা সাময়িক পত্রিকার জগৎকে বিশেষ ভাবে অভিভূত করেছিল। সেই নৈর্ব্যক্তিক বাক-চাতুর্য্যের হাত এড়িয়ে বাংলা কবিতাকে মানবীয় পরিবেশের ভেতর আনার আয়োজন চলছিল—এই আয়োজনের উদ্যোক্তা যাঁরা, তাঁদের মধ্যে সুধীর বাবু অন্যতম, যদিও প্রধানতম নন।

অবশ্য এ কথা সত্যের খাতিরে না বলে উপায় নেই যে এই স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টার পেছুনে অন্তরের তাগিদ হয়ত ততটা ছিল না—যতটা ছিল আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। তাই মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ বা নজরুলও ধীরে ধীরে পিছু হটেছেন এবং তাঁদের জায়গায় আধুনিক দল এসে জড়ো হয়েছেন। তাঁরা যা করেছেন তা স্বতন্ত্র ধারার কাব্য-সৃষ্টি নয়, তার উপযোগিতা পূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি। সেই আবহাওয়াতেই এখনো চলছে পরীক্ষা-প্রচেষ্টা—সত্যিকার আধুনিক কাব্য বাংলায় এখনো স্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়নি, বাংলা কবিদের প্রাণ-পুরুষ এখনো রবীন্দ্রনাথ।

জলের লিখনের অলখ-লোকের রাজা, সিন্ধু-পাঞ্চজন্য, যে কান্না কাঁদিতে ভুলি, শিশু-মঙ্গল, বিদ্রোহ প্রভৃতি কবিতায় এক দিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রীতিকে নিপুণ ভাবে আয়ত্ত করার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি রবীন্দ্র-নাথের পথ ছাড়িয়ে অন্য পথে আবেদন-সৃষ্টিরও পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঐতিহ্য ও যুগধর্ম্মের দ্বন্দ্বেই অধিকাংশ কবিতার জন্ম—দ্বন্দ্বাতীত পরিণতি এর পরের অধ্যায়, কিন্তু সে অধ্যায় বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এখনো অলিখিত। তা সত্ত্বেও জলের লিখন কাব্য হিসাবে রীতিমতো উপভোগ্য।

ভালোবেসে যারে বুকে টেনে নিতে চাহি,
সে কি জানে ওগো, সে কি জানে, সে কি জানে ?
মোর প্রেমে কিছু মোর যে বলিতে নাহি,
জীবনেরই ধারা অন্ধ আবেগে টানে ?
কোটি কোটি প্রেম, কোটি কোটি বেদনাতে,
যুগের সাধনা চলেছে দিবস রাতে,
অনাহার-মারী-যক্ষ্মা-পক্ষাঘাতে,
যতিহীন গতি কোন অলক্ষ্য পানে !

এ রকম কবিতা যে সত্যই সুন্দর তা বলাই বাহুল্য। জলের লিখনে এ রকম কবিতার সংখ্যা বড় কম নয়।

দ্বিতীয় বই খসড়ায় কিন্তু এই প্রথম প্রয়াসের সঙ্কোচ-কুণ্ঠিত পদ-বিক্ষেপ নেই—এর ভাষা-ভঙ্গী ষোল আনা আধুনিক। বলা যেতে পারে বাংলা কবিতার আধুনিকতম পরিণতির নিদর্শন আছে এই বইয়ে। কিন্তু এখানেই একটা খটকা জাগে, তা শুধু এই বই সম্বন্ধে নয়, এই শ্রেণীর যাবতীয় কবিতা সম্বন্ধেই।

মানুষের সঙ্গে মানুষের মনোবিনিময়ের বাহন হল ভাষা—সুতরাং অর্থ বাক্যের অপরিহার্য্য উপাদান। অর্থহীন শব্দসৃষ্টির দ্বারা মূক অনুভূতি জাগানো যায় বটে এবং শব্দ মাত্রেরই পেছুনে একটা করে আঙ্গিক ব্যঞ্জনাও থাকে সত্যি, কিন্তু সমগ্রভাবে একের বক্তব্য অন্যের কাছে পাঠাতে হলে অর্থবান ভাষা চাই-ই। তাকে বর্জ্জন করে শব্দ-সঙ্ঘাতে সুর-সৃষ্টি করা ও সেই সুরের আবেদনকেই কাব্যের অবলম্বন বলে মনে করা—সেই আদর্শে কাব্য রচনা করা, ইউরোপও আমেরিকায় হাল আমলে দেখা দিয়েছে। এলিয়ট, পাউণ্ড থেকে কাম্মিংস্ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরে পড়লেই এ কথা টের পাওয়া যায়। এঁরা বলেন, কাব্যের যে একটা অর্থ থাকতেই হবে, এমন কোন মানে নেই—it is not meaning that always means এবং এই মতের সাফাই স্বরূপ এঁরা মগ্ন-চৈতন্যের দোহাই দিয়ে বলেন, আমাদের অনুভূতির স্তরে সংলগ্নতা বা পারম্পর্য্য বলে কিছু নেই, যখন আমরা ভাষায় কোন অনুভূতি প্রকাশ করি—তখন তার আসল রূপটিকে খর্ব্ব করে কেটে ছেঁটে প্রয়োজনের অনুরূপ একটা জিনিষ গড়ে নিই—সেটা কৃত্রিম জিনিষ, তার জন্ম সক্রিয় মন থেকে। মনের এই সজাগ বল্গা রহিত করে দিয়ে অবচেতনাকে যদি প্রকাশ করা যায়, তাহলে তার রূপ হবে অন্য রকম—অর্থহীন, অথচ সকল অর্থই থাকবে তার মধ্যে পুঞ্জীভূত। ঠিক এই মত থেকেই sur-realist চিত্রাঙ্কনেরও উৎপত্তি হয়েছে। বাংলায় বিষ্ণু দে এই শ্রেণীর কবিতা লেখেন—ইংরেজীতে লেখেন কাম্মিংস্। খসড়ার কবি অনেক স্থলে এই পথের পথিক।

বলা বাহুল্য সাহিত্যে কোন নূতন আদর্শই রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে না—প্রচলিত রুচি ও পদ্ধতির সঙ্গে তার ঠোকাঠুকি বাধেই এবং তাই হচ্ছে তার নূতনত্ব ও প্রাণ-শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু মানুষের বোধ-বৃত্তি ও রসানুভূতির

মূল-সূত্র নিয়েই যে দ্বন্দ্ব, তাকে সাম্প্রতিক সমালোচনায় নিঃশব্দে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। মনোবিজ্ঞান চেতনা-প্রবাহ (stream of consciousness) বলে একটা জিনিষকে স্বীকার করে—তা মগ্ন-চৈতন্যের আপাত অসংলগ্নতার তলায় তলায় একটা যোগসূত্র বজায় রেখেই চলে। তাই অবচেতনার ওপরের পর্দ্দায় যখন একটি জানলা, একটুকরো খবরের কাগজ, একটা চায়ের পেয়ালা ও একজোড়া ঘোড়ার ক্ষুর একসঙ্গে দেখা দেয়, তখন তার নীচের পর্দ্দায় ভেসে ওঠে জানলার ধারে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে খবরের কাগজ পড়া ও পথে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে কারোর আবির্ভাবের ছবি—এই রকমের একটা স্থিতিশীলতা তলায় তলায় আছে তাই রক্ষা—নইলে মানুষের সংজ্ঞা-বস্তুই হত অন্য ধরণের জিনিষ—তাতে ধারাবাহিকতাই থাকতো না। ও হল বিজ্ঞানকে কাছ থেকে দেখা—তার সমগ্রতা নিয়ে খতিয়ে দেখতে গেলে তাকে দূর থেকে দেখা ভিন্ন উপায় নেই। সব জিনিষই ইলেকট্রন, তাই বলে কি সোনার নিজস্ব অস্তিত্ব নেই? অবচেতনার ব্যবহারিক স্বরূপ যাই হক, তার অস্তিত্বের প্রমাণ যে ভাষা তা অর্থ-সংস্রবহীন হতে পারে না, কারণ তাহলে তাকে আর ভাষা বলা যাবে না। এই জন্যেই অবচেতনাত্মক কবিতায় বা অতি-প্রাকৃত চিত্রাঙ্কনে আমার বিশ্বাস নেই মনে হয় এ এক জাতীয় এক্সারসাইজ, আর্ট নয়। আনন্দে বা বেদনায় নিজের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে তা নির্ব্বিশেষ হতে পাবে—কিন্তু তাকে 'বিশেষ' রূপ না দিলে, সৃষ্টি করি কি এবং সে সৃষ্টি অন্যের অনুভূতি গোচরই বা হয় কি করে? এতে কৃত্রিমতা যদি হয়, তা আর্টের অভিপ্রেতই বুঝতে হবে। এ বিষয়ে এজরা পাউণ্ডের চেয়ে উলিয়াম জেমসের মত অধিকতর প্রামাণিক হওয়া উচিত। কিন্তু এ বিতর্কের সমাধান এখানে হবার নয়।

খসড়ার সমস্ত কবিতাই এ পথে চলে তা নয়—কতক কবিতা পুরাতন আদর্শে লেখা এবং সেগুলি বেশ সুখপাঠ্যও, কিন্তু লেখকের লোভ সেগুলির চেয়ে নূতনগুলির ওপরই বেশী বলে মনে হয়। সেই নূতন ধারার কবিতা আমি বরদাস্ত করতে পারিনি—বিষ্ণু দে'র কবিতাও সব জায়গায় বুঝি না, কিন্তু তাঁর ভাষায় কাব্যের আমেজ পাই—অমিয় বাবুর ভাষায় গদ্যের স্থূলতা অতি-প্রকট। অবশ্য এটা বুঝি যে এ কবিতা তিনি লিখেছেন এক্সপেরিমেণ্ট হিসাবে—হয়ত এ লাইনে সাফল্য লাভ করলে, তাঁর কাব্য-রূপ আমাদেরও মনোরঞ্জন করতে

সমর্থ হবে। তাঁর ছন্দ-চাতুর্য্য এবং শব্দ-নির্ব্বাচন কৌশলপূর্ণ, কিন্তু তাঁর লেখনীর গতি সমমাত্রিক ধারায় বয়ে চলে না—গদ্য ও পদ্যের সঙ্কর মিলনে তাতে আরোহ-অবরোহ ঘটে অত্যন্ত বেশী। তবু তাঁর কাছে সুকাব্য আশা করা যেতে পারে এমন সম্ভাবনীয়তা এ কাব্যে প্রচুর আছে—

বাড়ি ফিরেছি।
জারুলের বেড়া; কাঁকরের পথ থামবে দরজায়;
আমার পৃথিবী
এইখানে শেষ।

অনেক দেশ
চোখের তৃষ্ণায় ঘিরেছি।
অনাত্ম সংসার দূরে গরজায়
মনের স্মৃতির ঢিবি

আজ নেই।
নূতন হলেম প্রণামে
এই
আপন ঘরের গ্রামে।

বেশ ভালো লাগে। এই ভালো লাগাটাই কাব্যের বড় কথা—যা ভালো লাগে না, তাকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে ভালো লাগাতে গিয়ে শক্তি ক্ষয় করে লাভ নেই। আনন্দের বিষয় এ রকম ভালো কবিতা খসড়ায় অনেকগুলিই আছে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

The Tyranny of Words—by Stuart Chase (Methuen)

দুটি কবিতা কলেজের শত শত ছাত্রের নিকট পাঠান হয়েছিল। তাদের কাছ থেকে কবিতা দুটির যে ব্যাখ্যা পাওয়া গেল তার কোন একটির সঙ্গে আর একটির মিল ছিল না।

আলোচ্য গ্রন্থখানির লেখক একবার প্রায় একশ' জনকে জিজ্ঞাসা করেন—তাঁরা ফ্যাসিজম্ বল্‌তে কি বোঝেন। তিনি যাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিলেন।

নোবেল প্রাইজ যে যে সর্ত্তে দেওয়া হয় তার একটির মধ্যে Idealist tendency এই দুটি শব্দ আছে। এই Idealism-এর অর্থ এ্যালেন আপওয়ার্ড নামে একজন গ্রন্থকার তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি এগারটি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পান।

আমাদের মনের ভাব প্রকাশ ও আদানপ্রদানের প্রধান উপায় হচ্ছে শব্দ বা ভাষার প্রয়োগ। কিন্তু আমরা যে শব্দ বা ভাষা ব্যবহার করি, তার অর্থ-বিষয়ে যদি এইরকম মতানৈক্য থাকে, তার প্রকৃত অর্থ যদি আমাদেরই পরিষ্কার ভাবে জানা না থাকে, তাহ'লে আমাদের মনের ভাব ঠিকভাবে প্রকাশ বা আদানপ্রদান করেছি বলে কি ক'রে বলা যায়? মনের ভাব ঠিকভাবে প্রকাশ বা আদানপ্রদান না হ'লে কি ক্ষতি? কেনই বা মনের ভাব প্রকাশে বা আদানপ্রদানে এরকম গণ্ডগোল হয়?

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে এসমস্ত বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থকার নিজে একজন বক্তা, অন্যান্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেছেন। কতকগুলি বক্তৃতা দেবার ও কয়েকখানি বই লেখার পর তাঁর কাছে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'ল যে তিনি এ যাবত তাঁর সময় বৃথাই নষ্ট করেছেন, কেননা তাঁর শ্রোতা বা পাঠকবর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর মনোভাব সঠিক নির্দ্ধারণ করতে পারেন নি।

কেন আমাদের মনোভাব আদানপ্রদানে এরূপ গণ্ডগোল ঘটে এবং কি উপায়ে এই গণ্ডগোলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, গ্রন্থকার সে বিষয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি Korzybski-র Science and Sanity, Ogden এবং Richards-এর The Meaning of Meaning, Bridgman-এর

The Logic of Modern Physics ও T. W. Arnold প্রভৃতি কয়েকজন লেখকের কয়েকখানা বই পড়ে, মনোভাব আদানপ্রদানের জন্য লেখক বা কথক যে যন্ত্র ব্যবহার করেন, তার বিষয় কিছু, কিছু বুঝতে আরম্ভ করলেন। আর এই পড়াশুনার ফলেই আলোচ্য গ্রন্থখানির উৎপত্তি।

বইখানিতে তিনি Korzybski, Ogden ও Richards প্রভৃতি যাঁরা semantics বা শব্দার্থতত্ত্ব বিষয়ে প্রথম আলোচনায় প্রবৃত্ত হন তাঁদের অভিমত ও সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। ভাষার উপর আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান ও আইনষ্টাইনের থিওরি অফ্ রিলেটিভিটির প্রভাবও বর্ণনা করেছেন। তারপরে তিনি দেখিয়েছেন semantics-এর সহিত পরিচয় থাকা আমাদের কত দরকার। তাঁর মতে semantics-এর জ্ঞান থাকলে শুধু যে আমাদের মনোভাব আমরা আরও ভালভাবে প্রকাশ করতে পারি তা নয়, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনেও এর উপকারিতা কম নয়। শব্দার্থতত্ত্বের কষ্টিপাথরে ফেলে তিনি বহু দার্শনিক, তার্কিক, অর্থনীতিবিদ্, রাজনৈতিক নেতা, বিচারক প্রভৃতির উক্তি এবং অভিমত পরীক্ষা করেছেন। আরিস্‌টটল্ লিখে গেলেন—মাছির আটটি পা আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পণ্ডিতরা তাঁর কথাই বেদবাক্য বলে মেনে নিলেন। তাঁদের কারুরও খেয়াল হল না যে একটি মাছিকে মেরে এই উক্তি সত্য কি না তা নির্ণয় করেন। এই রকম ক'রে বহু দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ্, রাজনৈতিক নেতার উক্তি বা লেখার সমালোচনা ক'রে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন, যে তাঁরা যা বলেছেন বা লিখেছেন অনেক সময়েই তা বাস্তবতার সহিত সম্পর্কশূন্য, ও মানুষের অভিজ্ঞতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়—তা কেবল অর্থহীন শব্দের খেলা মাত্র, কেননা তাদের উদ্ভব আমাদের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়ের থেকে হয়নি। আর এই জন্যই অন্য কোন লোকের পক্ষে এই সকল উক্তি বা লেখা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয় এবং এদের অর্থবিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা বর্ত্তমান। গ্রন্থকারের মতে এরূপ লেখা বা উক্তির দ্বারা ভাবপ্রবণতা জাগিয়ে তোলা যেতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের কোন প্রসার হয় না।

বইখানি বেশ সরস। গ্রন্থকারের লেখার ভঙ্গী এত সুন্দর যে শব্দার্থতত্ত্বের মত নিরস জিনিসকেও তিনি বেশ চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। একবার বইখানি

পড়তে আরম্ভ কর্‌লে শেষ না করে ওঠা যায় না। বইখানিতে শব্দার্থতত্ত্ব এবং শব্দার্থতত্ত্বের উপকারিতা সম্বন্ধে একটু বাড়াবাড়ি করা হলেও, মনে হয়, বাংলা-ভাষা সম্পর্কে এরূপ একখানি বই লেখা হলে বড় ভাল হয়। বাংলা সংবাদপত্র, মাসিকপত্র, সাহিত্য ও দার্শনিক গ্রন্থে অনেক সময় এমন সব লেখা দেখা যায়, যা পড়ে আমাদের আমেরিকার প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানবিদ্ জেমসের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বল্‌তে ইচ্ছা হয়—"Just words, words, words"। ঠিকভাবে মনোভাব প্রকাশ বা আদানপ্রদানের জন্য ভাষা বা শব্দপ্রয়োগে আমাদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত—এ কথা যেন আমরা অনেক সময়েই ভুলে যাই। এর ফলেই, বোধহয়, আমরা এমন ভাষা বা শব্দ বিশেষত এমন গুণবাচক বিশেষ্য শব্দ প্রয়োগ করি যার অর্থ আমরা নিজেরাই হয়ত ঠিক জানি না এবং যার অর্থবিষয়ে মতানৈক্যের পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির মত একখানি বই বাংলাভাষা সম্পর্কে লেখা হ'লে, ভাষাগত এসব দোষগুলি আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত

পরিচয়—ফাল্গুন, ১৩৪৫

বিষয়-সূচী

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৪৫

পরিচয়

স্থিরমতির ত্রিংশিকাভাষ্য (২)*

সমস্তই যদি বিজ্ঞপ্তিমাত্রই হয়, এবং তদতিরিক্ত কর্তা বা করণ কিছু না থাকে, তবে অপরিচালিত (অনধিষ্ঠিত) সেই মূল বিজ্ঞান হইতে কোন প্রকার কারণের সাহায্য ব্যতিরেকে বিবিধ বিকল্পের উৎপত্তি হয় কিরূপে ?—বিজ্ঞানবাদ লইয়া যিনিই আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারই মনে নিশ্চয়ই স্থিরমতির এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে ; ইহাই বিজ্ঞানবাদের মূল প্রশ্ন ও তত্ত্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এই বিষয়ে বসুবন্ধু ও তাঁহার ভাষ্যকার যাহা বলিতেছেন তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার। এতদ্বিষয়ে বসুবন্ধুর কারিকাটি এই :—

সর্ববীজং হি বিজ্ঞানং পরিণামস্তথা তথা।
যাত্যন্যোন্যবশাদ্যেন বিকল্পঃ সঃ স জায়তে ॥ ১৮ ॥

অর্থাৎ, সর্ববিষয়ের বীজ বিজ্ঞানের মধ্যেই নিহিত ; এবং সেই অপরিচ্ছিন্ন (unspecified) বিজ্ঞান হইতেই, পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করার ফলে (অন্যোন্যবশাৎ), বিবিধ বিকল্পের (Vorstellung) উৎপত্তি হয়। ইহাই বিজ্ঞানের পরিণাম। ইহার উপরে স্থিরমতির মন্তব্য সুদীর্ঘ না হইলেও সুস্পষ্ট :—

যেহেতু তাহাতে সমস্ত "ধর্ম" উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে সেই হেতু বিজ্ঞানকে "সর্ববীজ" বলা হইয়াছে ; বিজ্ঞান বলিতে বুঝাইতেছে আলয়বিজ্ঞান।

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture No. 5.

এমন বিজ্ঞানও আছে যাহা সর্বধর্মের বীজ স্বরূপ নহে; সেইজন্যই আলয়-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানকে বলা হইয়াছে "সর্ববীজ"। কেহ কেহ আবার বিজ্ঞান স্বীকার না করিয়া প্রধানাদিকেই সর্বধর্মের বীজ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।[১] সেইজন্যই এই সম্পর্কে এখানে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানের উল্লেখ করিতে হইয়াছে।—পূর্বাবস্থার অন্যথাভাব হওয়াকেই পরিণাম বলে। "তথা তথা" বলিতে বুঝাইতেছে পরিণাম অনন্তর কালেই সেই সেই বিকল্প উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

বিজ্ঞানাবলী পরস্পরকে কিরূপে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে? তাহার উত্তরে স্থিরমতি বলিতেছেন, চক্ষুরাদি বিজ্ঞানের শক্তি (latent form) পরিপক্বতা লাভ করিলে আলয়বিজ্ঞানের পরিণামের (modification) কারণ হইয়া থাকে, এবং আলয়বিজ্ঞানের সেই পরিমাণ দ্বারা আবার চক্ষুরাদি বিশেষ বিজ্ঞানও পরিণত হয়।—অর্থাৎ আলয়বিজ্ঞানস্থ অপরিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানাবলীর একটিও যদি সংস্কার বশে সুপরিচ্ছিন্ন হইয়া উঠে তবে অবশিষ্ট বিজ্ঞানাবলীর অপরিচ্ছিন্নতাও কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস পাইবে। এইরূপে সর্ববিধ বিজ্ঞানধারা সুপরিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিলে বিশেষ কোন নায়কের সাহায্য ব্যতিরেকেও প্রত্যেক বিজ্ঞানধারা একটি বিশেষ আলম্বন (objective form) লাভ করিবে।

বর্তমান জন্মে বিবিধ প্রবৃত্তির বিজ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা এতদ্দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল। এখন বিজ্ঞপ্তি ভিন্ন আর কিছু না থাকিলে, বর্তমান জীবন শেষ হওয়ার পর তাহার সহিত একটি ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপে সংশ্লিষ্ট হইতে পারে তাহাই দেখাইবার জন্য (পরবর্তী কারিকায়) বলা হইতেছে :—

কর্মণো বাসনা গ্রাহদ্বয়বাসনয়া সহ।
ক্ষীণে পূর্ববিপাকেঽন্যদ্বিপাকং জনয়ন্তি তৎ[২] ॥ ১৯ ॥

অর্থাৎ পূর্ব কর্মের ফল ক্ষীণ হইয়া আসিলে কর্মের বাসনা (= সংস্কার = élan vital) গ্রাহ্য ও গ্রাহক বাসনার সহযোগে অন্য বিপাকফল উৎপন্ন করিয়া থাকে।

কর্ম বলিতে বুঝায় পুণ্য, অপুণ্য বা নিরপেক্ষ চেতনা। সেই চেতনা আলয়বিজ্ঞানে যে অনাগত আত্মভাবের (existence) প্রতি অভিমুখিতার

১। ইহা সাংখ্যের প্রতি আক্ষেপ।

২। এখানে 'তৎ' কথাটির অর্থ কি?

(অভিনির্বৃত্তি) সামর্থ্য উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহারই নাম কর্মের বাসনা।[১] গ্রাহদ্বয় বলিতে বুঝায় গ্রাহ্য অথবা গ্রাহকের গ্রাহ (=illusion)। বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ অবস্থাতেও গ্রাহ্য বস্তুর স্বস্থ ও নিরবচ্ছিন্ন পরিস্থিতি (স্বসন্তান) সম্ভব,—এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের নাম গ্রাহ্যগ্রাহ। এবং বিজ্ঞানের দ্বারাই বাহ্যবস্তু বিজ্ঞাত, প্রতীত ও সমধিগত হইতেছে,—এইরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাসের নাম গ্রাহকগ্রাহ। পূর্বোৎপন্ন গ্রাহ্যগ্রাহ ও গ্রাহকগ্রাহের দ্বারা আক্ষিপ্ত তজ্জাতীয় অনাগত গ্রাহ্য ও গ্রাহক গ্রাহের উৎপত্তির বীজই "গ্রাহদ্বয়বাসনা"। কর্মবাসনার ভেদ অনুযায়ী আত্মভাবে (existence) বিবিধ গতি (species) উৎপন্ন হইয়া থাকে, বিবিধ বীজ হইতে যেমন বিভিন্ন অঙ্কুর উদ্গত হয়। প্রত্যেক কর্মেরই বাসনা যখন আপন আপন আত্মভাব উৎপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন এই গ্রাহদ্বয়ের বাসনাও তাহাতে সহকারীরূপে যোগদান করিয়া থাকে।—অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক বস্তু একটি পৃথক্ কাল্পনিক রূপ মাত্র, কিন্তু গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ যে মায়িক প্রতীতি তাহা সকল বস্তুতেই সমভাবে বর্তমান (universal illusion)। বিজ্ঞানোৎপাদনে বস্তুর আপন বাসনা প্রধান কারণ হইলেও বিশ্ব-ব্যাপী গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ (subject-object relation) মায়ার সাহায্য ব্যতিরেকে তাহা কখনই কার্য্যকরী হইতে পারে না। ইহাও যে খাঁটি বেদান্তের কথা তাহা বলাই বাহুল্য।—এই জন্যই বলা হয় নাই যে গ্রাহদ্বয়ের বাসনার দ্বারা অনুগৃহীত না হইয়াও কেবল মাত্র কর্মবাসনাই বিপাকফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। "গ্রাহদ্বয়বাসনয়া সহ" বলার ইহাই তাৎপর্য।

পূর্বকর্মের বিপাক ক্ষীণ হইয়া আসিলে এই সকল বাসনা অন্য বিপাক[২] উৎপন্ন করিয়া থাকে। অর্থাৎ, পূর্বজন্মে উপচিত কর্মাবলীর ইহজীবনে যে বিপাকাভিমুখী প্রবৃত্তি তাহা ক্ষীণ হইয়া আসিলে তবে নূতন কর্মবাসনার বিপাকপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। পূর্বকর্ম নিঃশেষিত হওয়ার শেষ মুহূর্তে

১। এতক্ষণে 'বাসনা'র authoritative definition পাওয়া গেল :—তেন কর্মণা যদনাগতাত্ম-ভাবাভিনির্বৃত্তয়ে আলয়বিজ্ঞানে সামর্থ্যমাহিতং সা কর্মবাসনা।

২। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে 'বিপাক' কথাটি ক্লীব লিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে ব্যকরণের সম্মান রাখিতে হইলে 'অন্যদ্বিপাকং' কথাটিকে বহুব্রীহি সমাস মনে করিতে হয়। তাহা হইলে কিন্তু কথাটির এইরূপ অদ্ভুত অর্থ দাঁড়াইবে :—'বাসনা সকল যাহা উৎপন্ন করিয়া থাকে তাহার বিপাক ফল পৃথক্'।

(আক্ষেপকালে পর্যন্তাবস্থিতে) নূতন কর্মের বাসনা, আপন আপন বলানুযায়ী, গ্রাহ্যগ্রাহক রূপ চিরন্তন মায়িক বাসনার সহযোগিতায়, উপভুক্ত বিপাক হইতে পৃথক্ সেই আলয়বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়া থাকে ; কারণ আলয়বিজ্ঞান ব্যতিরিক্ত কর্মের অন্য কোন বিপাক ফল নাই। "পূর্ব কর্মের বিপাক ক্ষীণ হইয়া আসিলে" বলার উদ্দেশ্য শাশ্বত আত্মা অস্বীকার করা (শাশ্বতান্তং পরিহরতি) ; এবং "অন্য বিপাক উৎপন্ন করিয়া থাকে" বলায় উচ্ছেদবাদও প্রত্যাখ্যাত হইল।—এই অংশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র বিজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে কর্মনিয়ন্ত্রিত অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশ্বজগৎ ও জন্মান্তর সম্ভব হইতে পারে তাহাই এখানে স্থিরমতি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে সকলেই প্রশ্ন করিয়া থাকেন, আত্মা নাই অথচ জন্মান্তর আছে ইহা কিরূপে সম্ভব হয়। স্থিরমতির ভাষ্য হইতে এই প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায়। এক জন্মের কর্মের ফল মানুষ অন্য জন্মে ভোগ করিয়া থাকে,—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই দার্শনিকগণ শাশ্বত আত্মা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বৌদ্ধগণও কর্মানুযায়ী জন্ম স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু তদতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন নাই ; কারণ তাঁহাদের মতে প্রকৃত কোন কর্তারই যখন অস্তিত্ব নাই তখন জন্মজন্মান্তরের কর্তৃগণের মধ্যে সহযোগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটি আত্মা স্বীকার করারও সার্থকতা নাই। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আত্মা স্বীকার করা হয় সে উদ্দেশ্য তাঁহারা অন্য উপায়ে সিদ্ধ করিয়াছেন। জন্ম জন্মান্তরের কথা যতই বলা হউক না কেন, প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক জন্মে কতকগুলি বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু যে আছে তাহা বলিবার উপায় নাই। এই বিজ্ঞানগুলি যদি জন্ম হইতে জন্মান্তরে সংযুক্ত হয় তবেই আত্মা স্বীকার করার কাজ সিদ্ধ হইল। বৌদ্ধমতে গ্রাহদ্বয়ের সাহায্যে আলয়বিজ্ঞানে কর্মাবলীর বাসনা বাস্তবিকই জন্ম হইতে জন্মান্তরে এইরূপে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে,—ইহাই অব্যবহিত পূর্বে দেখান হইয়াছে।

চক্ষুরাদির বিশেষ বিজ্ঞান ব্যতিরিক্তও অপরিচ্ছিন্ন আলয়বিজ্ঞানের অস্তিত্ব আছে ; তাহাই সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের বীজ, চক্ষুরাদি বিশেষ বিজ্ঞান নহে। একথা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় হইতেই জানা যায়। অভিধর্মসূত্রে ভগবান্ বুদ্ধদেব বলিয়াছেন :—

অনাদিকালিকো ধাতুঃ সর্বধর্মসমাশ্রয়ঃ।
তস্মিন্ সতি গতিঃ সর্বা নির্বাণাধিগমোঽপি বা॥

অর্থাৎ, ধাতু (objective reality) অনাদি এবং সর্ব "ধর্মের" সমন্বয়ের ফলে উৎপন্ন। ইহা আছে বলিয়াই বিভিন্ন গতি (species) এবং নির্বাণলাভও সম্ভব হইয়াছে।—ইহাই হইল আলয়বিজ্ঞান বিষয়ে শাস্ত্রবচন। ইহার পরেই স্থিরমতি এ সম্বন্ধে যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি এত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন যে তাহা অবলম্বন করিয়া একটি ছোটখাট thesis লেখা যাইতে পারে,—অবশ্য যদি তাহার সকল অংশের সম্যক্ অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয়। আমাদিগকে কিন্তু এখানে তাঁহার মূল যুক্তিগুলির আভাষ দিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে :—

আলয়বিজ্ঞান ব্যতিরেকে সংসারের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিও সম্ভব নয়। সংসার-প্রবৃত্তি (continued existence) বলিতে বুঝায় অন্য স্থানে অস্তিত্বের আরম্ভ, এবং নিবৃত্তির অর্থ সোপধি বা নিরুপধি নির্বাণ। কিন্তু আলয়বিজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারজ বিজ্ঞান সম্ভব নহে। সংস্কারানুবিদ্ধ ছয়টি বিজ্ঞানকায় সম্বন্ধেও বলা যায় না যে তাহাদের বিজ্ঞান সংস্কার হইতে উৎপন্ন। কারণ বিপাকবাসনা বা নিষ্যন্দবাসনা[১] বিজ্ঞান দ্বারাই বিজ্ঞান মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, যেহেতু কর্তারই কর্ম হওয়া অসম্ভব (কারিতবিরোধাৎ)। অনাগত বিজ্ঞানেও সংস্কার উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ পরবিজ্ঞানের সময় পূর্ববিজ্ঞানের কোন অস্তিত্বই থাকে না, ইত্যাদি। সুতরাং, অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি এবং সেই সংস্কার হইতে উৎপন্ন তদ্দ্বারা অনুবিদ্ধ (তদধিবাসি) আলয়বিজ্ঞানই বিজ্ঞান,—এই নীতি সর্বপ্রকারে সুসঙ্গত। আলয়বিজ্ঞান না থাকিলে সংসার নিবৃত্তিও সম্ভব হয় না। কর্ম এবং ক্লেশই হইল সংসারের কারণ। ক্লেশের অধীন থাকে বলিয়াই কর্ম পুনর্জন্মের কারণ হইতে পারে, নতুবা নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ক্লেশই হইল সংসার প্রবৃত্তির মূল[২]। এই "ক্লেশ" সকল পরাভূত হইলে সংস্কারও নিবৃত্ত হয়। কিন্তু আলয়-বিজ্ঞান ব্যতিরেকে "ক্লেশ" দূর করা সম্ভব নয়, কারণ তাহার দূরীকরণে সহকারী

১। এই পারিভাষিক শব্দটির অর্থ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

২। এ বিষয়ে বেদান্তের মায়ার সহিত বৌদ্ধের 'ক্লেশে'র বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

কারণ রূপে আলয়বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা থাকেই। সুতরাং চক্ষুরাদি বিশেষ বিজ্ঞান ভিন্নও আলয়বিজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। আরও স্বীকার করিতে হইবে যে ইহারই মধ্যে সর্ব "ধর্মের" বীজ নিহিত থাকে, চক্ষুরাদির বিজ্ঞানের মধ্যে নহে[১]।

সমস্তই যদি বিজ্ঞান মাত্র হয় তবে সূত্রের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে না কি? কারণ সূত্রে পরিকল্পিত (subjective), পরতন্ত্র (relative) ও পরিনিষ্পন্ন (absolute) এই তিন প্রকার স্বভাবের উল্লেখ আছে।—এ প্রশ্নের উত্তরে স্থিরমতি বলিতেছেন প্রকৃত বিরোধ কোথাও নাই, কারণ বিজ্ঞপ্তি-মাত্র সিদ্ধ হইলেই তিন প্রকার ভাব সিদ্ধ হইয়া যায়। সেই কথাই পরবর্ত্তী কারিকায় বলা হইয়াছে :—

যেন যেন বিকল্পেন যদ্যদ্বস্তু বিকল্প্যতে।
পরিকল্পিত এবাসৌ স্বভাবো স ন বিদ্যতে ॥ ২০ ॥

অর্থাৎ, যে কল্পিত রূপের দ্বারা যে বস্তুর কল্পনা করা হয় তাহা সেই বস্তুর পরিকল্পিত স্বভাব মাত্র; তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। যে বস্তু বিকল্পের বিষয় সেই বস্তু যেহেতু সত্ত্বাভাববশতঃ অস্তিত্বশূন্য, সেই হেতু সেই বস্তুর অস্তিত্ব নিশ্চয়ই পরিকল্পিত মাত্র, হেতু-প্রত্যয় প্রতিপন্ন (cause-and-effect relation) নহে; কারণ তাহা হইলে একই বস্তুতে, অথবা বস্তুর অভাবস্থলেও, নানা প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ বিকল্প স্বীকার করিতে হয়।[২] কিন্তু একই বস্তুতে বা তাহার অভাব বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বিবিধ বিকল্প কখনই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে সমস্তই কল্পনা মাত্র। সূত্রেও সেই জন্য কথিত হইয়াছে,—"হে সুভূতি, বালকেরা এবং জনসাধারণ (পৃথগ্‌জনাঃ) যেরূপ মনে করিয়া থাকে "ধর্ম"সকল বাস্তবিক সেরূপ নহে।" এতদ্দ্বারা পরিকল্পিত স্বভাব ব্যাকৃত হইল। তাহার পর পরতন্ত্র স্বভাব (relative existence) বুঝাইবার জন্য (বসুবন্ধু) বলিতেছেন :—

পরতন্ত্রস্বভাবস্তু বিকল্পঃ প্রত্যয়োদ্ভবঃ।

১। 'আলয়বিজ্ঞান' ঠিক কি তাহা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এত কথা সত্ত্বেও কিন্তু আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইল না।

২। এখানে মুদ্রিত গ্রন্থে বাক্যের যেরূপ ছেদ আছে তাহা হইতে কোন অর্থ হয় না।—লক্ষ্য করিতে হইবে যে অভাবকেও ভাবরূপে স্বীকার করা হইল।

যাহার স্বভাব অপর কোন বস্তুর অধীন তাহাই পরতন্ত্রস্বভাব। "বিশেষ কারণ হইতে উদ্ভূত" (প্রত্যয়োদ্ভব) বলায় বুঝাইতেছে এই পারতন্ত্র্য কিরূপে সাধিত হয়।

এইবার পরিনিষ্পন্ন (absolute) ভাব বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে :—

নিষ্পন্নস্তস্য পূর্বেন সদা রহিততা তু যা॥ ২১॥

অর্থাৎ, "পূর্বগামী কোন কিছুর সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই তাহাই পরিনিষ্পন্ন (absolute)"। পরিকল্পিত বস্তুর বিষয়ে গ্রাহ্যগ্রাহক ভাব কল্পনা করা হইয়া থাকে, যদিও তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব নাই। এই গ্রাহ্যগ্রাহক সম্বন্ধরূপ পারতন্ত্র্য হইতে যাহা চিরকালই সর্বতোভাবে স্বাধীন তাহাই "পরিনিষ্পন্ন"। পরবর্তী কারিকায় "পরিনিষ্পন্ন" বস্তুর অনির্বচনীয়ত্বের কথা বলা হইতেছে :—

অতএব স নৈবান্যো নানন্যঃ পরতন্ত্রতঃ।

"সেই জন্যই পরিনিষ্পন্ন ভাব পরতন্ত্র ভাব হইতে পৃথকও নয় অনন্যও নয়।" পরিকল্পিত স্বভাব পরতন্ত্র স্বভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইলেই পরিনিষ্পন্ন স্বভাবের উৎপত্তি হয়।[১] এই সম্পূর্ণ পার্থক্য (রহিততা) রূপ "ধর্মতা" (thisness ?) ধর্ম হইতে পৃথকও হইতে পারে না অভিন্নও হইতে পারে না। কারণ পরতন্ত্র ভাবের ধর্মতাই হইল পরিনিষ্পন্ন ভাব, সুতরাং পরিনিষ্পন্ন ভাব পরতন্ত্র ভাব হইতে পৃথকও নয় অভিন্নও নয়। যদি পরিনিষ্পন্ন ভাব পরতন্ত্র ভাব হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হয় তবে আর ইহা পরিকল্পনাশূন্য হইতে পারে না (কারণ সম্পূর্ণ পার্থক্যও একটি বিশেষ সম্বন্ধ)। পরিনিষ্পন্ন ভাব ও পরতন্ত্র ভাব অভিন্নও হইতে পারে না, কারণ পরিনিষ্পন্ন ভাবের আলম্বন বিশুদ্ধ, তাহা পরতন্ত্র ভাবের ন্যায় "ক্লেশ"দুষ্ট হইতে পারে না। আর একথাও বলা যায় না যে পরতন্ত্র ভাবও ক্লেশাত্মক না হইতে পারে, কারণ তাহা হইলে পরতন্ত্র ও পরিনিষ্পন্নের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না।—সেই জন্যই পরিনিষ্পন্ন ভাব

অনিত্যতাদিবদ্বাচ্যঃ।

অর্থাৎ, অনিত্যতাদি যেরূপ ইহাও নহে উহাও নহে, পরিনিষ্পন্ন ভাবও তদ্রূপ। অনিত্যতা, দুঃখতা ও অনাত্মতা সংস্কারাদি হইতে ভিন্নও নহে অভিন্নও নহে।

১। পরিকল্পিতেন স্বভাবেন পরতন্ত্রস্য সদা রহিততা পরিনিষ্পন্নঃ।

অনিত্যতা যদি সংস্কার হইতে পৃথক্ হয় তবে সংস্কার নিত্য হইয়া পড়িবে; আবার অনিত্যতা যদি সংস্কারাদি হইতে অভিন্ন হয় তবে সংস্কার অনিত্যতা বশতঃ আপনার স্বভাবই (existence) হারাইয়া ফেলিবে।

এখন প্রশ্ন, পরিনিষ্পন্ন ভাব যদি গ্রাহ্যগ্রাহক-ভাববিরহিত পরতন্ত্র ভাবই হয় তবে তাহার অনুভবই বা হয় কি করিয়া, আর অনুভব না হইলে তাহা স্বীকারই বা করা যায় কিরূপে? ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে:—

নাদৃষ্টেঽস্মিন্ স দৃশ্যতে॥ ২২॥

অর্থাৎ পরিনিষ্পন্ন স্বভাব দৃষ্ট না হইলে পরতন্ত্র স্বভাবও দৃষ্ট হয় না। নির্বিকল্প ও লোকোত্তরজ্ঞানদৃশ্য (transcendental) পরিনিষ্পন্ন স্বভাব দৃষ্ট না হইলে[১] পরতন্ত্র ভাবও জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে না, কারণ পরতন্ত্র ভাব পরিনিষ্পন্ন ভাবেরই পৃষ্ঠলব্ধ শুদ্ধ লৌকিক জ্ঞানের অধিগম্য (তৎপৃষ্ঠলব্ধশুদ্ধ-লৌকিকজ্ঞানগম্যত্বাৎ)।[২] সুতরাং পরিনিষ্পন্ন ভাব অদৃষ্ট থাকিলে পরতন্ত্র ভাব দৃষ্ট হইতে পারে না। আর লোকোত্তর জ্ঞানের পৃষ্ঠলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই যে পরতন্ত্র ভাব দৃশ্য হইতে পারে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ নির্বিকল্প-প্রবেশা ধারণীতে[৩] কথিত হইয়াছে,—"তৎপৃষ্ঠলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ মায়া, মরীচিকা, স্বপ্ন, প্রতিধ্বনি এবং জলে পতিত চন্দ্রের ছায়ার মত সমস্ত "ধর্ম"কে সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে।" এখানে পরতন্ত্র ভাবের ধর্মাবলী সম্বন্ধেই এই কথা বলা হইয়াছে। আর পরিনিষ্পন্ন ভাব আকাশেরই মত সম্পূর্ণরূপে বৈচিত্র্যশূন্য[৪], এবং ইহার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে,—"মানুষ নির্বিকল্প জ্ঞানের দ্বারা যখন দেখে তখন সর্বধর্মই তাহার নিকট আকাশের ন্যায় সমতা বিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয় (আকাশসমতায়াং সর্বধর্মান্ পশ্যতি), যেহেতু তখন সমস্ত পরতন্ত্র ধর্মের মধ্যেও তথতা (such-ness) ভিন্ন আর কিছু পরিদৃষ্ট হয় না।

দ্রব্য মাত্রেই যদি পরতন্ত্র ভাব হয় তবে সূত্রে কেন বলা হইয়াছে যে

১। 'অদৃষ্ট' কথাটি স্থিরমতি 'অপ্রতিবিদ্ধ' (unpenetrated) ও 'অসাক্ষাৎকৃত' (unrecognised) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

২। 'জ্ঞানগম্যত্বাৎ'এর পরের ছেদটি ছাপার ভুল।

৩। বৌদ্ধ দার্শনিকদের নিকটেও শাস্ত্রবচন যুক্তির অতীত; ধারণীও আগমের অন্তর্গত।

৪। 'একরস' কথাটি ঠিক এই অর্থে বেদান্তেও ব্যবহৃত হইয়াছে।

সকল ধর্ম নিঃস্বভাব, অনুৎপন্ন এবং অনিরুদ্ধ? তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কারণ ঃ—

ত্রিবিধস্য স্বভাবস্য ত্রিবিধাং নিঃস্বভাবতাং।
সংধায় সর্বধর্মাণাং দেশিতা নিঃস্বভাবতা ॥ ২৩ ॥

এই তিন প্রকারের নিঃস্বভাবতা হইল, বিশিষ্ট লক্ষণ না থাকার জন্য যাহা নিঃস্বভাব (লক্ষণ-নিঃস্বভাবতা), উৎপত্তিহীনতার জন্য যাহা নিঃস্বভাব (উৎপত্তি-নিঃস্বভাবতা), এবং পারমার্থিক অর্থে যাহা নিঃস্বভাব (পরমার্থনিঃস্বভাবতা)। ধর্মসকল পরিকল্পিত (subjective), পরতন্ত্র (relative), অথবা পরিনিষ্পন্ন (absolute)। এখন এই ধর্মত্রয়ের কোন্‌টির কোন্ প্রকার নিঃস্বভাবতা তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

প্রথমো লক্ষণেনৈব নিঃস্বভাবোঽপরঃ পুনঃ।
স্বয়ংভাব এতস্যেত্যপরা নিঃস্বভাবতা ॥ ২৪ ॥
ধর্মাণাং পরমার্থশ্চ স যতস্তথতাপি সঃ।

প্রথম, অর্থাৎ পরিকল্পিত স্বভাব, আপনার সংজ্ঞাবশতঃই নিঃস্বভাব, কারণ তাহার লক্ষণই উৎপ্রেক্ষিত (fictitious); যেমন বেদনার লক্ষণ হইলে অনুভব, স্বয়ং বেদনা নহে। সুতরাং লক্ষণে স্বরূপের অভাব থাকায় বেদনাদি স্বরূপতঃ আকাশ-কুসুমের ন্যায় নিঃস্বভাব।—এইখানে বৌদ্ধদিগের সহিত নৈয়ায়িকদিগের বিবাদের একটি প্রধান কারণ স্থিরমতি অতি অল্প কথায় ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়া গেলেন। নৈয়ায়িকগণ পরতঃপ্রামাণ্যবাদী, তাঁহাদের মতে লক্ষণ দ্বারা সাধ্যনির্ণয় করা সমীচীন পন্থা। কিন্তু বৌদ্ধগণ একথা মানিয়া লইতে আদৌ প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলিবেন অনুভূতি হয় বলিয়াই যে বেদনা স্বীকার করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, অনুভূতি ও বেদনা সম্পূর্ণ পৃথক্ হইতে পারে। ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অবিনাভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে; তাহা হইতে প্রমাণিত হয় না যে বেদনার লক্ষণ অনুভব। যে বস্তু যাহা সেই বস্তুর লক্ষণও তাহাই হইবে। বৌদ্ধদিগের ন্যায় বৈদান্তিকগণও পরতঃপ্রামাণ্যবাদ অস্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু বৌদ্ধগণ বেদান্তের স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ কার্য ও কারণ, সাধ্য ও হেতুর মধ্যে যে কোন সম্বন্ধই থাকিতে

পারে না, এই বিশ্বাসই হইল বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ, এবং এই বিশ্বাস বশতঃই বৌদ্ধগণ ক্ষণিকবাদী হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কারণ কোন বস্তু যদি উপর্য্যুপরি দুইটি ক্ষণকাল স্থায়ী হয় তবে প্রথম ক্ষণের বস্তু দ্বিতীয় ক্ষণের বস্তুর কারণ (বা লক্ষণ) হইয়া পড়িবে !

দ্বিতীয়, অর্থাৎ পরতন্ত্র স্বভাবের, আপন অস্তিত্বই (স্বয়ংভাব) নাই, কারণ তাহা মায়ার ন্যায় সম্পূর্ণ পৃথক্ এক হেতুর দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরতন্ত্র স্বভাবের যেরূপ প্রখ্যাতি (expression), তাহার উৎপত্তি সেইরূপ নহে ; সেইজন্য পরতন্ত্রের নিঃস্বভাবতার নাম উৎপত্তিনিঃস্বভাবতা।

তৃতীয়, লোকোত্তর (transcendental) জ্ঞানই পরম জ্ঞান, কারণ তদপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান আর নাই (নিরুত্তরত্বাৎ)। সেই জ্ঞানের বিষয়ই পরমার্থ। এই পরমার্থ আকাশের ন্যায় সর্বত্র, সর্বাবস্থায় বিমল ও অবিকৃত থাকে বলিয়াই ইহার স্বভাব পরিনিষ্পন্ন (absolute)। পরতন্ত্রাত্মক সর্বধর্মের তদ্ধর্মতা (that-ness) হইল এই পরিনিষ্পন্ন স্বভাব, সেইজন্য পরিনিষ্পন্ন স্বভাবই পরমার্থ-নিঃস্বভাবতা, যেহেতু অ-ভাবই হইল পরিনিষ্পন্নের স্ব-ভাব (পরিনিষ্পন্নস্যাভাবস্বভাবত্বাৎ)। কিন্তু পরিনিষ্পন্নকেই পরমার্থ বলিয়া অভিহিত করা যায় কি? না, তাহা যায় না ; কারিকায় বলা হইয়াছে "তথতাও পরমার্থ" (তথতাপি সঃ)। এখানে "অপি" শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে যে কেবলমাত্র তথতাই পরমার্থ নামে অভিধেয় নহে, যত প্রকার ধর্মধাতু আছে সমস্তই পরমার্থ নামে অভিধেয়। কারণ,

সর্বকালং তথাভাবাৎ,

অর্থাৎ, যেহেতু সাধারণ লোকের নিকট এবং শিক্ষার্থীর নিকট ধর্মধাতু সর্বকালেই সেইরূপই থাকে (তথৈব ভবতি)।

এখন এই "তথতা" বলিতে কি পরিনিষ্পন্নের বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা বুঝায়, না অন্য কোন বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাও আছে ?[১] ইহার উত্তর :—

সৈব বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা ॥ ২৫ ॥

১। এখানে ভাষা ঠিক ব্যাকরণসঙ্গত নয় ; ছাপার ভুল থাকিতে পারে।

অর্থাৎ "তথতা"ই বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা, কারণ তাহাই অতি বিশুদ্ধ জ্ঞান। কথিত হইয়াছে :—

নাম্নি তিষ্ঠতি তচ্চিত্তং তদা তন্মাত্রদর্শনাৎ।
নাম্নি স্থানাচ্চ বিজ্ঞপ্তাবুপালম্ভঃ প্রহীয়তে ॥
নোপলম্ভস্তদা[১] ধাতুং স্পৃশতে ভাবনান্বয়াৎ।
সর্বাবরণবিমোক্ষং বিভুত্বং লভতে তদা ॥

অর্থাৎ "বিজ্ঞপ্তি যখন কেবলমাত্র নামকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান তখনই তন্মাত্র (=essence) দর্শন সম্ভব হয়, এবং তাহার ফলে, বিজ্ঞপ্তি নামাশ্রিত হওয়ায়, সেই নামের আধারের (=স্থান) আর গ্রহণই হয় না। তখন ভাবনার (concentration) সহিত চিত্তের সম্পূর্ণ সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উপলম্ভ (cognition) আর ধাতুকে (reality) স্পর্শ করিতে পারে না; উপরন্তু সমস্ত আবরণ (obstacle) হইতে মুক্ত হইয়া তাহা তখন বিভুত্ব (universality) লাভ করিতে সমর্থ হয়।"[২]—কারিকাস্থ "বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা" বলিতে বুঝাইতেছে অভিসময় (apprehension ?)।

সমস্তই যদি কেবলমাত্র বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা হয় তবে চক্ষুকর্ণাদির দ্বারা রূপশব্দাদির গ্রহণ হয় কেন? তাহার উত্তর :—

যাবদ্বিজ্ঞপ্তিমাত্রত্বে বিজ্ঞানং নাবতিষ্ঠতি।
গ্রাহদ্বয়স্যানুশয়স্তাবন্ন বিনিবর্ততে ॥ ২৬ ॥

অর্থাৎ, "যতদিন না বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় পর্যবসিত হয় ততদিন গ্রাহ্য ও গ্রাহক রূপ গ্রাহ (illusion) দ্বয়ের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটিবে না।"

পূর্বে কথিত হইয়াছে, পূর্বকর্মের বিপাক ক্ষীণ হইয়া আসিলে কর্মবাসনা গ্রাহদ্বয়ের বাসনার সাহায্যে বিভিন্ন বিপাক বিশিষ্ট অন্য এক আলয়বিজ্ঞান উৎপন্ন করে; এখন আর তাহা হইলে সেই গ্রাহদ্বয়ের নিবৃত্তির কথা কিরূপে সঙ্গত হয়? এই প্রশ্নেরই উত্তর বর্তমান কারিকায় দেওয়া হইয়াছে। বিজ্ঞান যতদিন বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা নামে অভিহিত চিত্তধর্মতায় পরিণত না হইয়া গ্রাহ্য ও গ্রাহকের

১। ছাপা হইয়াছে—"নোপলম্ভং তদা"

২। দুঃখের বিষয় এই মূল্যবান্ কারিকাদ্বয় যে কোথা হইতে উদ্ধৃত তাহা স্থিরমতি বলিয়া যান নাই।

ভেদ স্বীকার করিয়া চলিতে থাকে, ততদিন আলয়বিজ্ঞানে সেই গ্রাহদ্বয়ের অনুশয় (reminiscence, residue) থাকিয়া যায় ; এবং তাহা হইতে পুনরায় নূতন করিয়া গ্রাহ্যগ্রাহকরূপ মায়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে (অনাগতগ্রাহদ্বয়োৎপত্তয়ে বীজমালয়বিজ্ঞানে)। যতদিন না যোগীর চিত্ত সেই অদ্বয়লক্ষণ বিজ্ঞপ্তিমাত্রে (contentless pure consciousness) সন্নিবদ্ধ হয় ততদিন গ্রাহ্যগ্রাহক রূপ মায়ার অনুশয় সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইবে না। এই অবস্থায় বস্তুর বাহ্য উপলম্ভ (perception) বিনষ্ট না হওয়ার ফলে আত্মোপলম্ভও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। তখনই লোকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তভাবে ভাবিতে আরম্ভ করে "আমি চক্ষুরাদি দ্বারা রূপাদি দেখিতেছি।"[১]

এখন আলোচিত হইবে, চিত্তধর্মতার প্রতিষ্ঠা অর্থরহিত (substanceless) চিত্তমাত্রের উপলব্ধির ফলেই সংঘটিত হয় কি না। বসুবন্ধু পরবর্তী কারিকায় তদুত্তরে বলিতেছেন তাহা হয় না :—

বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদমিত্যপি হ্যুপলম্ভতঃ।
স্থাপয়ন্নগ্রতঃ কিঞ্চিৎ তন্মাত্রে নাবতিষ্ঠতে॥ ২৭ ॥

অর্থাৎ, সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র একথা জানিয়াও লোকে কোন না কোন বিষয় উপস্থিত করিয়া তাহার মননে প্রবৃত্ত হয় ; ইহাতে কিন্তু আদৌ বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা উপলব্ধি করা হয় না।—স্থিরমতি এই কারিকার ভাষ্যে যোগাচারের নানাবিধ বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা অস্থিসংকলিক, নীলক, পৃথক ইত্যাদি।

বিষয়বুদ্ধি রূপ মায়ার বিনাশ এবং চিত্তমাত্রতার উপলব্ধি তাহা হইলে কিরূপে সম্ভব হইবে ? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—

যদা ত্বালম্বনং বিজ্ঞানং নৈবোপলভতে তদা।
স্থিতং বিজ্ঞানমাত্রত্বে গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহাৎ ॥ ২৮ ॥

অর্থাৎ, যখন আলম্বনের (object) বিজ্ঞান আর উপলব্ধ হয় না তখন বিজ্ঞান বিজ্ঞানমাত্রত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়, গ্রাহ্য বিষয়ের অভাববশতঃ তাহার গ্রহণ আর সম্ভব হয় না।—স্থিরমতি এই কারিকার ভাষ্যে একটি প্রয়োজনীয় কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিষয়ের এই অনুপলব্ধি

১। এখানে যাহা বলা হইল তাহার সমস্তই খাঁটি বেদান্তের কথা।

যদি বিষয় উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যের অভাব প্রযুক্তই হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানমাত্রতা সিদ্ধ হইবে না; জাত্যন্ধ ব্যক্তিও বিষয় দেখিতে পায় না, কিন্তু সেই জন্যই যে তাহার বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা উপলব্ধ হইয়াছে তাহা নহে। নির্বিষয় বিজ্ঞপ্তির সময় সেই বিজ্ঞপ্তি উপলব্ধি করিবার জন্য আবার নূতন বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না (বিজ্ঞানগ্রাহস্য প্রহাণং); তাহা তখন সম্পূর্ণরূপে চিত্তধর্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কারণ স্বরূপই কারিকায় বলা হইয়াছে "গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রাহাৎ",—গ্রাহ্য বিষয়ই না থাকায় তাহার গ্রহণ ঘটে না। গ্রাহ্য বিষয় থাকিলে তবেই গ্রাহকত্ব সম্ভব, নচেৎ নহে; সুতরাং গ্রাহ্য বিষয়ের অভাব বলিতে গ্রাহকের অভাবও বুঝাইয়া যাইতেছে, তদ্দারা কেবল যে গ্রহণেরই অভাব বুঝায় তাহা নহে। এইরূপেই গ্রাহ্যগ্রাহকভাবশূন্য (অনালম্ব্যালম্বক) নির্বিকল্প লোকোত্তর, সমান জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।[১]

চিত্ত যদি বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাতেই অবস্থিত হয় তবে কিরূপে তাহা বুঝা যায় (কথং ব্যপদিশ্যতে)? তাহারই উত্তরে বলা হইতেছে ঃ—

> অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ।
> আশ্রয়স্য পরাবৃত্তির্দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ ॥ ২৯ ॥
> স এবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।
> সুখো বিমুক্তিকায়োঽসৌ ধর্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ ॥ ৩০ ॥

এই কারিকা দুইটিতে দেখান হইতেছে কিরূপে দর্শনমার্গ অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় সুপ্রতিষ্ঠিত যোগী উত্তরোত্তর অবস্থা অতিক্রম করিয়া শেষে আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিয়া থাকেন। তখন আর গ্রাহকবুদ্ধি বা গ্রাহ্যার্থের উপলব্ধি না থাকায় যোগী হইয়া পড়েন "অচিত্ত" এবং "অনুপলম্ভ"। সেই যোগীর জ্ঞান তখন পার্থিব জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ (অনুচিত), কারণ তদনুযায়ী কার্য পৃথিবীতে ঘটে না (সমুদাচারাভাবাৎ); তাহা সম্পূর্ণ নির্বিকল্প (undiscriminating) ও লোকোত্তর (transcendental)। এই নির্বিকল্প জ্ঞানের অব্যবহিত আশ্রয়ের (substratum) যে পরাবৃত্তি (reversion into pure consciousness) ঘটিয়া থাকে তাহাই বুঝাইবার জন্য কারিকায় বলা হইয়াছে "আশ্রয়স্য পরাবৃত্তিঃ"। এই আশ্রয় হইল আলয়বিজ্ঞান, যাহার মধ্যে

১। এ সমস্ত বেদান্তের কথা।

সর্বপ্রকার বিজ্ঞানের বীজ নিহিত আছে। এই আলয়বিজ্ঞানের পরাবৃত্তি বলিতে বুঝায়, দৌষ্ঠুল্য, বিপাকদ্বয় ও বাসনার আকারে যাহা পরিণত হইয়াছে তাহারই কর্মণ্যতা (activity), ধর্মকায় ও অদ্বয়জ্ঞানে পরিণতি।[১] কিসের প্রহাণ (annihilation) ঘটিলে সেই আশ্রয়ের পরাবৃত্তি (reversion) ঘটিয়া থাকে? তাহারই উত্তরে কারিকায় বলা হইয়াছে—"দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ"। ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ এই দুই প্রকার দৌষ্ঠুল্য (impurity) বুঝাইবার জন্যই "দ্বিধা" বলা হইয়াছে। আশ্রয়ের অকর্মণ্যতার নামই দৌষ্ঠুল্য এবং তাহাই ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণের বীজ। শ্রাবকগণের মধ্যেও যে দৌষ্ঠুল্য আছে তাহার বিনাশও হইল আশ্রয়ের পরাবৃত্তি; সেই জন্যই কারিকায় বিমুক্তিকায়ের[২] উল্লেখ করা হইয়াছে। এইরূপে বোধিসত্ত্বের মধ্যে যে দৌষ্ঠুল্য আছে তাহার বিনাশও হইল আশ্রয়ের পরাবৃত্তি; সেইজন্যই কারিকায় বলা হইয়াছে "ধর্মাখ্যোঽপি মহামুনেঃ"[৩]। আবরণদ্বয়ের প্রত্যেকটি অনুযায়ী একটি উচ্চতর (উত্তর) ও একটি উচ্চতম (নিরুত্তর) আশ্রয়পরাবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। এতদ্বিষয়ে একটি গাথাও আছে:—

জ্ঞেয়মাদানবিজ্ঞানং দ্বয়াবরণলক্ষণং।
সর্ববীজং ক্লেশবীজং বদ্ধস্তত্র দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥

অর্থাৎ, আদানবিজ্ঞানের[৪] লক্ষণ দুই প্রকার, জ্ঞেয়াবরণ ও ক্লেশাবরণ; ইহারই মধ্যে ক্লেশের বীজ ও সর্ব আবরণের বীজ এই উভয়ই নিহিত আছে[৫]।

গাথায় "উভয়ই" বলিতে বুঝাইতেছে—শ্রাবক ও বোধিসত্ত্ব। শ্রাবককে কেবলমাত্র ক্লেশবীজ হইতে মুক্ত হইতে হইবে, কিন্তু বোধিসত্ত্বের প্রয়োজন ক্লেশবীজ ও জ্ঞেয়বীজ এই উভয় হইতেই মুক্ত হওয়া। এই উভয় প্রকারের বীজ উৎখাত হইল তখন সর্বজ্ঞতা লাভ ঘটিয়া থাকে।

১। এ স্থানটি অস্পষ্ট:—তস্য পরাবৃত্তির্যা দৌষ্ঠুল্যবিপাকদ্বয়বাসনাভাবেন নির্বৃত্তৌ (ছাপা হইয়াছে 'নিবৃত্তৌ') সত্যাং কর্মণ্যতাধর্মকায়াদ্বয়জ্ঞানভাবেন পরাবৃত্তিঃ।

২। বিমুক্তিকায়=নির্বাণ।

৩। এখানে কারিকার সহিত ভাষ্যের অসাদৃশ্য রহিয়াছে; কারণ কারিকায় আছে 'ধর্মাখ্যোঽয়ং'। 'ধর্মাখ্য,' অর্থাৎ 'ধর্মাখ্যকায়' অর্থাৎ 'ধর্মকায়'।

৪। একথাটির প্রকৃত অর্থ কি? গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণের বিজ্ঞান?

৫। ছন্দের অনুরোধে অধ্যাপক লেভি "দ্বয়োর্দ্বয়োঃ" পাঠ করিয়াছেন, যদিও পুঁথিতে আছে কেবল 'দ্বয়োঃ'। পুঁথির পাঠে ছন্দ না থাকিলেও অর্থসাধুত্ব হয় বলিয়া তদনুযায়ী অনুবাদ করিয়াছি।

কারিকায় বলা হইয়াছে, "স এবানাস্রবো ধাতুঃ", অর্থাৎ যাহা হইতে পূর্বকথিত আশ্রয়পরাবৃত্তি (reversion of the substratum) ঘটিয়া থাকে তাহা সর্বপ্রকার আস্রবসংস্পর্শ বিরহিত। সর্বপ্রকার দৌষ্ঠুল্য হইতে মুক্ত হওয়ায় তাহা আস্রববিনির্গত, এই জন্যই ইহাকে অনাস্রব বলা হইয়াছে। ইহাই এই আর্যধর্মের ভিত্তি, সেই জন্যই ইহা ধাতু নামে অভিহিত হইয়াছে,—এখানে ধাতু শব্দের অর্থ হেতু। ইহা অচিন্ত্য, কারণ ইহা তর্কের অগোচর; প্রত্যেককেই ইহা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করিতে হয়, এবং ইহার কোন দৃষ্টান্তও নাই। ইহা কুশল, কারণ ইহার আলম্বন বিশুদ্ধ, এবং ইহা ক্ষেমঙ্কর ও অনাস্রবধর্মযুক্ত। ইহা ধ্রুব, কারণ অক্ষয়তা প্রযুক্ত ইহা নিত্য। ইহা সুখ, কারণ ইহা নিত্য। যাহা অনিত্য তাহাই দুঃখময়, কিন্তু ইহা নিত্য; সুতরাং ইহা সুখ। ইহার দ্বারাই ক্লেশাবরণ দূরীভূত হয়, সুতরাং ইহাই শ্রাবকদিগের বিমুক্তিকায় (অর্থাৎ, নির্বাণ)। ইহারই লক্ষণ আশ্রয়পরাবৃত্তি, এবং ইহাই ধর্মকায় নামে কথিত। কারিকায় "মহামুনেঃ" বলা হইয়াছে, কারণ ভূমিপারমিতাদির ধ্যান দ্বারা ক্লেশাবরণ ও জ্ঞেয়াবরণ অপনীত হইলে বিজ্ঞানের আশ্রয়ের যখন পরাবৃত্তি ঘটে, তখন তাহাকেই বলে মহামুনির ধর্মকায় (নির্বাণ)। এবং যেহেতু ইহা কখনও সংসার পরিত্যাগ করিয়া যায় না,[১] এবং যেহেতু ইহার দ্বারা উপসংক্লিষ্ট (penetrated, impinged) না হইলে সর্বধর্মই অনন্ত ও বিভুত্বশালী হইয়া পড়ে, সেই হেতুও ইহাকে বলে ধর্মকায়। ইহাকে কারিকায় মহামুনির ধর্মকায় বলা হইয়াছে, তাহার কারণ ইহাই পরমমুনির ধর্মবিশিষ্ট হওয়াতে বুদ্ধ, ভগবান্ বা মহামুনি।—স্থিরমতির এই দীর্ঘ ও দুরূহ আলোচনার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে পরমজ্ঞান হইতে লোকোত্তর দৃষ্টি ও তাহা হইতে পরিশেষে নির্বাণলাভ সম্ভব হয় তাহা স্থিরমতি কেবল লক্ষণ দ্বারা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কোথাও স্পষ্টভাবে অভিহিত করেন নাই,—হয়ত তাহা অনির্বাচ্য বলিয়াই। এই লক্ষণটি আশ্রয়পরাবৃত্তি, অর্থাৎ বিষয়বিজ্ঞানের আশ্রয়েরও বিজ্ঞানমাত্রে পরিণতি।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

১। Levi'র পাঠ "সংসারপরিত্যাগাৎ"। কিন্তু মহাযানী নির্বাণ সংসারের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারে না। উপরন্ত Leviই দেখাইয়াছেন যে "সংসারাপরিত্যাগাৎ" পাঠও আছে।

খেয়াঘাট

সন্ধ্যার পূর্বে হৃদয়ের খেয়া নৌকা ছেড়ে গিয়েচে। জোয়ার সুরুর মুখে তার যাওয়া। কতক্ষণ যে তাকে এই খেয়াঘাটে বসে কাটাতে হবে—সেই ভাবনায় হৃদয় বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লো।

ঘাট থেকে কিছুদূরে যাত্রীদের বসবার জন্যে একটি টিনের চালা—সেখানে আলো একটা টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলছে। বিশ্রাম করবার জন্যে হৃদয় সেইদিকে পা চালিয়ে দিলে।

হৃদয় দূর থেকে দেখছিল, জনকয়েক লোক টিনের চালাটার মধ্যে বসে জটলা ক'রচে—তাদের হাল্‌কা হাসির হর্‌রাও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল কিন্তু কাছে এসে হৃদয় দেখলে, যেন কোন যাদুমন্ত্রের বলে এই কিছুক্ষণ আগের জাগ্রত লোকগুলো মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে—কারুর আবার নাকও ডাকচে। এ কোন রাজ্যে এসে পড়্‌লো সে।

ব্যাপারটা বুঝল হৃদয়—জেগে ঘুমালে জাগানো যায় না। অগত্যা হৃদয় বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো এবং মুসাফিরখানার চারদিকটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। পশ্চিম দিকের একাংশ জুড়ে ছোট্ট একটি দোকান—সেটিকে আপ্রাণ সাজাবার চেষ্টা। গোটাকয়েক সাদা বোতলে জল ভর্ত্তি ক'রে শুক্‌নো চাঁপা ফুল গোঁজা, বিড়ির বাণ্ডিলগুলো যেখানে—সেখানে রঙীন কাগজের ঝাল্‌র ঝুলচে, এক কোণে শুকনো একগাছি মালা ঝোলান একখানা বিবর্ণ ছবি—ছবিতে হুঁকো হাতে এক সুন্দরী কালো কস্তাপেড়ে সাড়ী পরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে—মৃগ-নয়নে ভাববিহ্বলতা। দোকানের সুমুখে শায়িত যাত্রীর দল। উত্তরের কোণ ঘেঁষে একটা বিরাট পুঁটলির পাশে ছিন্ন মলিন ফতুয়া পরা একটি লোক তামাক খাওয়া শেষ ক'রে হুঁকোটা রেখে শোবার যোগাড় ক'রছে। আরব্য উপন্যাসের দেশ—কাছে গেলে হয়ত দেখবে, প্রাণহীন একটা মূর্ত্তি। যাই হোক—ওখানে হয়ত একটু বসবার যায়গা হবে। কিন্তু হৃদয় সেইদিকে এগোতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে শূন্য স্থান পূর্ণ হ'য়ে গেল। লোকটির পাশের বিরাট পুঁটলি থেকে দুখানা বাউটি বাজু পরা হাত আচম্‌কা বেরিয়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে ধরাশায়ী

ক'রে দিলে। তারপর পুঁটলির ভেতর থেকে গর্জ্জন শোনা গেল। ধরাশায়ী রুগ্ন লোকটি ব'ললে, তুই বড় ব্যস্ত হোস্—ওই তোর এক মহাদোষ হিমি।

পুঁটুলি নড়ে চড়ে স্থির হ'লো।

হতাশ হৃদয় থমকে দাঁড়ালো। সে আর কোনো রকমেই দাঁড়াতে পারছিল না। একে সে স্থূলোদর, তার ওপরে নতুন বাইক শিখে অবাধ্য সাইকেলের হাতলটা বাগে আনতে সারা পথ তাকে কম পরিশ্রম ক'রতে হয়নি—আবার পল্লীর অসমতল বিশ্রী পথ। চব্বিশটি মাইল পথ সব সময়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আসতে হ'য়েচে। সে আর দাঁড়াতে পারছিল না। এদিকে আবার বাইরে নতুন শিশির—ডাক্তার ব'লে অসুখ তাকে ভয় না ক'রতেও পারে।

যাকে সে পথপ্রদর্শক ও সাথী হিসেবে এনেছিল সেই প্রৌঢ় বাঞ্ছারাম হৃদয়ের পেছনে বাইক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৃদু কণ্ঠে অপরাধীর মতো সে ব'ললে, বাবু, অনেকক্ষণ আপনাকে বসে থাকতে হবে।

—তা তো হবেই। তোর জন্যেই এমনটা হ'লো। রাস্তায় না দেরি হ'লে সন্ধ্যার খেয়াটা পেয়ে যেতাম—দিব্যি চলে যেতাম।

—ডাক্তারবাবু, আপনি না হয় ফের ফিরে চলুন। বাবুকে গিয়ে আমি বলবো কি ?

হৃদয় রাগের মাথায় প্রথমটা ধমক দিয়ে উঠল, তারপর প্রৌঢ়র সপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে কোমল কণ্ঠে বিদায় দিলে—বখসিস্ দিলে একটা টাকা। বাঞ্ছারাম বাইকটা ঠেলে অন্ধকার পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

হৃদয় ফিরে দাঁড়াতেই মুসাফিরখানার এক পাশে সাজান-গোছান দোকানটির মধ্যে যে তরুণীটি এতক্ষণ নীরবে হাতের কাজ ক'রে যাচ্ছিল আর মুখ টিপে টিপে হাসছিল সে হৃদয়কে ডেকে ব'ললে, বাবু, আপনি দোকানের ভেতর উঠে আসুন। তারপর শায়িত লোকগুলিকে কটাক্ষ ক'রে ব'ললে, আর একটু পরে কে কোথায় যাবে সব তার ঠিক নেই—মিথ্যে এক ভদ্রলোককে কষ্ট দেওয়া। আসুন বাবু আপনি দোকানে উঠে।

হৃদয় অগত্যা দোকানের ভেতর একটা ময়লা বেঞ্চির ওপরে শ্রান্তির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বসে পড়লো।

মেয়েটি জিজ্ঞেস ক'রলে, বাবু, আপনি কিছু খাবেন কি ?

নিজের মর্য্যাদা বজায় রেখে হৃদয় গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললে, উপবাস দিতে তো ইচ্ছে নেই—কিন্তু কি খাওয়ার আছে তোমার ?

—চিঁড়ে ভেজে দিচ্ছি—দুধও পাওয়া যাবে।

—বেশ। একটু পরে খাবো।

মেয়েটি শুনেছিল, বাঞ্ছারাম হৃদয়কে 'ডাক্তারবাবু' বলে ডেকেছিল—তাই জিজ্ঞেস ক'রলে, আপনি এদিকে কি রোগী দেখতে এসেছিলেন ?

—না, এক বন্ধুর বিয়েতে নেমতন্নে এসেছিলুম।

ইতিমধ্যে ঘুমন্ত যাত্রীর দল পিট্ পিট্ ক'রে হৃদয়কে লক্ষ্য ক'রছিল। তারপর কেউ হাই তুলে তুড়ি দিয়ে, কেউ আড়মোড়া ভেঙ্গে এপাশ ওপাশ ক'রে একে একে উঠে ব'সলো এবং হাঁ ক'রে নবাগত হৃদয়ের সাজ-পোষাকের জাঁক-জমকের দিকে চেয়ে রইলো। অধিকতর গম্ভীর হ'য়ে হৃদয় অন্য দিকে মুখ ফেরালে।

এই সময়ে একটি অল্প বয়সী ছোকরা দোকানের সুমুখে এসে মেয়েটিকে উদ্দেশ ক'রে ব'ললে, কুসুম দি' একটা বিড়ি দাও না।

কুসুম সাশ্চর্য্যে ব'ললে, তারপর—তারক যে রে। ঘরের সব ভালো তো ? কোথায় যাচ্ছিস্ ?

তারক কুসুমের বাপের বাড়ীর দেশের লোক। কুসুমের উত্তরে ব'ললে, বিশু খুড়োর সঙ্গে খাটতে যাচ্ছি।

—ফিরবি কবে ?

—এই মাস চার-পাঁচ পরে—সেই ফের চাষের সময়।

এদের প্রায় সকলেই দেশের চাষ-আবাদ সেরে বিদেশে খাটতে যাচ্ছে।

তারক বিড়ি ধরিয়ে তার নিজের জায়গায় গিয়ে ব'সলে। কুসুম হৃদয়কে জিজ্ঞেস ক'রলে, ডাক্তারবাবু, চা যদি খান তো তৈরী ক'রে দিতে পারি।

হৃদয় খুসী হ'য়ে ব'ললে, এক কাপ পেলে বেশ হ'তো।

কুসুম চা তৈরী ক'রতে উঠে গেল। ওপাশের তামাকখোর রুগ্ন লোকটি এই সময়ে উঠে এল তামাক কিনতে। কুসুম ব'ললে, থামো, বাবুর চাটা তৈরী ক'রে দিয়েই যাচ্ছি।

—ও তোমার অনেক দেরী হবে। আগে আমাকেই বিদায় ক'রে দাও না।

—এই যাই। পয়সাটা রেখে যাও না ওইখানে। ডাক্তারবাবু বসে আছেন কতক্ষণ…

কুসুম চায়ের জল বসাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। তামাকখোর লোকটি আর দাঁড়ালো না—হৃদয়ের দিকে একটা অহেতুক বিষাক্ত দৃষ্টি হেনে রাগ ক'রে চলে গেল। এতে কিন্তু হৃদয় গৌরব এবং পুলক দুটিই উপভোগ ক'রলে। তার জন্য কুসুমের বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রদর্শন তাকে এই দরিদ্র শ্রমিকদলের মধ্যে একটা দুষ্প্রাপ্য বস্তুর মতো ক'রে তুললে। হৃদয় নড়ে চড়ে গম্ভীর হ'য়ে বসলো। ভাবটা : দেখ, আমি কি। হৃদয় কৃপার চোখে তাকালো অন্য যাত্রীগুলির দিকে।

এই সময়ে একটি ছোট্ট ছেলে দোকানের পাশের একটা বন্ধ দরজা খুলে কুসুমের দিকে এগিয়ে গেল—মৃদু কণ্ঠে ব'ললে, ক্ষিধে পাচ্ছে মা।

কুসুম তাড়া দিয়ে তাকে ব'ললে, চলে এলি যে…যা যা, পরে দেবো খেতে। যা…

ছেলেটি কুসুমের। দোকানের পেছনের একাংশে এদের বাসগৃহ। কুসুম যে গরীব—তা হৃদয় বুঝেছিল। সামান্য আয়োজনের মাঝখানে এই তরুণীটি: একটি পরিপূর্ণ প্রীতির স্পর্শ হৃদয়কে এই অল্প ক্ষণের জন্যে বড় বেশী বশীভূত ক'রে ফেলেছিল। হৃদয়ের প্রতি কুসুমের সশ্রদ্ধ আচরণ বড় ভালো লাগছিল তার—বিশেষ ক'রে যখন কতকগুলো চাষা তার দিকে সশ্রদ্ধভাবে তাকিয়ে আছে। ওদের মাঝখানে হৃদয়ের স্থান যে অনেক উঁচুতে—ওদের অবহেলা ক'রে কুসুম যে তার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাচরণ ক'রে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েচে এইটে ভেবে হৃদয় এই অচেনা অজানা শান্ত সভ্য মেয়েটির সঙ্গে একটা হৃদ্যতা জমাবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। কলাই করা লোহার বাটিতে চা পান শেষ ক'রে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে.হৃদয় একটু হেসে ব'ললে, বাঁচলাম।

কুসুম তরল কণ্ঠে জিজ্ঞেস ক'রলে, রাস্তায় আসতে খুব কষ্ট হ'য়েছিল বোধ করি ?

—সে আর ব'লো না। আসবার সময়ে যা কষ্ট পেয়েচি। সে এক কুরুক্ষেত্র…

হৃদয়ের ওই কুরুক্ষেত্রের কাহিনীতে কুসুমের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কিন্তু

হাতের কাছে আলাপের বিশেষ কিছু পথ না দেখে হৃদয় ডাক্তার কেমন ক'রে বন্ধুর নেমন্তন্ন রক্ষে ক'রতে এসে অশেষ কষ্ট ভোগ ক'রেছিল তারই আদ্যন্ত বর্ণনা সুরু ক'রলে শেষে :

প্রথমত, কোনো রকম যান-বাহনাদির সুবিধে না থাকায় বন্ধুর উপদেশে নতুন বাইক শেখবার তোড়-জোড়—দুর্ভোগের একশেষ। তারপর যদিও সে নিজে কোনো রকমে চড়তে শিখলে, তবু বাঞ্ছারামকে কোনো রকমে পেছনের কেরিয়ারে চড়ানো শেখাতে পারলে না—অথচ পথ প্রদর্শক হিসেবে তাকে না নিলে নয়। বাইক চড়্‌বার সখও তার ষোল আনা। তার ভাইপো যখন ব'লেছিল, কাকা, তুমি তো চড়তে পারোনা—আমিই না হয় ডাক্তার বাবুর সঙ্গে যাই, তখন বাঞ্ছারাম ব'লেছিল চটে, কবে টপ্‌ ক'রে মরে যাবো—আমাদের কপালে ওসব কি আর হবে। কিন্তু কেরিয়ারের উপরে দাঁড়িয়েই সে কাঁপতে সুরু করে—ডাক্তারকে সপ্রেমে জড়িয়ে ধরে, ফলে ধরাশায়ী হয় ডাক্তার। পরে উঠে গায়ের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বাঞ্ছারামকে ডাক্তার ধমক দিলে সে কাঁচু-মাচু হ'য়ে উত্তর দেয়, বাপ-দাদার জন্মে কোনো দিন নাই—নীচের দিকে চাইলেই কেমন বুকটা ধড়াস্‌ ক'রে ওঠে বাবু।

হৃদয়ের মুখে গল্প শুনে কুসুম খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হাসে—যাত্রীদলও।

...যাই হোক বাঞ্ছারামকে ধরাধরি ক'রে পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলে। সে যখন ভরসা ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে তখন আর সময় নষ্ট না ক'রে হৃদয় রওয়ানা দিলে। বিপদ তবু কাটেনি। পথের মাঝখানে বাঞ্ছারাম বললে, বাবু—আমার মাথা ঘুরচে, গা বমি বমি ক'রচে, আমারে নামিয়ে ছ্যান।

অগত্যা হৃদয় গতিবেগ কমিয়ে বললে, তবে নেমে পড়।

—ওটা তো শেখাননি বাবু।

—আ আহাম্মক, লাফ দিয়ে নেমে পড়' না।

ধমক খেয়ে লাফ দিলে বাঞ্ছারাম—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়কেও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির শরণ নিতে হ'লো।

তারপর আবার সমস্যা—জনশূন্য পথে বাঞ্ছারামকে আবার কেরিয়ারে তুলে দেয় কে! অগত্যা হৃদয় পাশাপাশি একটা বাবলা গাছে বাইক ঠেকিয়ে বললে, বাঞ্ছারাম গাছ ধরে পেছনে উঠতে পারবে তো?

—আজ্ঞে তা পারবো।

কিন্তু সে তা পারলে না। হৃদয় বাইক নিয়ে এগিয়ে গেল; কিন্তু বাঞ্ছারাম গাছের ডাল ধরে ঝুলে আছে—বাবু, আমি রয়ে গেনু···বাবু···

হৃদয় বাইক থেকে নেমে ধমক দেয়, আমি ব'ললুম, আমাকে শক্ত ক'রে ধর—না উনি ধরে রইলেন গাছের ডাল। ঝুলচিস্ কেন—লাফিয়ে পড় না।

—আজ্ঞে নীচে কাঁটা—একটু ধরতে হবে।

শেষকালে আবার গ্রামে ঢুকে তুজন লোক যোগাড় ক'রে বাঞ্ছারামকে পেছনে চড়ানো হ'লো।

গল্প বেশ জমেচে। হালকা হাসির হর্‌রায় নির্জ্জন খেয়াঘাটের জমাট নীরবতা ভেঙে চুর্ মার্ হ'য়ে যাচ্চে। কুসুম হাসচে, যাত্রীর দল হাসচে, হৃদয় নিজেও হাসচে। এত হাসির মাঝখানে ওপাশের উত্তর কোণে গায়ের চাদর ফেলে পুঁটলি আকার ত্যাগ ক'রে বিশালকায় হিমি অপ্রসন্ন মুখে উঠে ব'সলো এবং তামাকখোর পনেরো বছরের সহচর রুগ্ন শ্রীনিবাসকে ঠ্যালা দিয়ে ব'ললে, বলি অতো হাসি কিসের ?

মুহূর্ত্তে শ্রীনিবাসের হাসি গেল থেমে—ভয়ে ভয়ে হিমির দিকে তাকিয়ে তামাক সাজাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। অস্পষ্ট কণ্ঠে ব'ললে, ওই তোর বড় দোষ—কারুর আনন্দ দেখতে পারিস নে।

কে একজন শ্রীনিবাসকে উদ্দেশ্য ক'রে ব'ললে, তামুক সেজে একাই খাচ্ছ দাদা—দাও না ইদিকে তু এক টান।

কেন ? শ্রীনিবাস গম্ভীর কণ্ঠে ব'ললে, পয়সা ফেল—তামুক খাও। বিনি পয়সায়···উঁ হুঁ।···

শ্রীনিবাসের কথায় লোকটি বোধ হয় একটু অপমানিত হ'লো। ব'ললে, কেন, পয়সা কি নেই নাকি ভাবচ ? আচ্ছা, দিচ্ছি তামুক।···

লোকটি তামাক কিনতে উঠে গেল।

শ্রীনিবাস হেঁকে ব'ললে, যে যে খেতে চাও—এই বেলা তামুক দাও সব গো।···

একটি ছোকরা এক কোণে খুঁটিতে ঠেস্ দিয়ে বহুক্ষণ ধরে কুসুমের দিকে চেয়েছিল—চটুল পরিহাস্যময়ী কুসুমকে দেখতে বড় ভালো লাগছিল তার।

তার এই দৃষ্টিবিলাসের মাঝখানে কেবলই মনে হচ্ছিল, কুসুমকে কিছু দিতে পারলে সে একেবারে কৃতার্থ হ'য়ে যায়। কিন্তু কিই বা সে দেবে—কোন অছিলায় দেবে। যাই হোক, তামাক কেনার সুযোগ সে ছাড়লে না—উঠে গিয়ে একেবারে চার পয়সার তামাক কিনে ফেল্‌লে। ব'ললে, তামুক অতো দিও না—অতো কি হবে।

—চার পয়সার তো ?

—হ্যাঁ—তা অতো কি হবে। অর্থাৎ এই তামাক কেনার হক্ দামের মধ্যে খানিকটা তার যেন বেহকের দান থাকে।

এবার আশে-পাশের তরুণগুলিও উঠলে ক্ষেপে ; হাঁ, চোখের সুমুখে একটা চক্‌চকে আনি ঘুরিয়ে কুসুমের হাতে গুঁজে দিলে ও—আবার হাস্‌লে কেমন ভাবে। অকারণে মনে মনে ধমক্ দিয়ে উঠ্‌লো তারা—বটে, তাদের পয়সা নেই !

মুহূর্ত্তে দোকানের সামনের সাজানো তামাকের তালটা শেষ হ'তে চললো প্রায়—শ্রীনিবাসের তামাকের গাড়ু ভর্ত্তি। কুসুম সকলের সঙ্গেই একটু হাস্য বিনিময় ক'রে একটু-আধটু কুশল প্রশ্ন ক'রচে। তাই দেখে ও কোণে হিমির মুখে ক্ষণে ক্ষণে একটা কুটিল হাসি তার পুরু ঠোঁটে লহর দিয়ে উঠ্‌চে।

হঠাৎ হৃদয় ডাক্তারের মনে হ'লো, কুসুম তাকে অবহেলা ক'রে ওই ছোটলোক শ্রমিকগুলোকে খাতির ক'রচে বেশী। নিজের নষ্ট মর্য্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ক'রবার জন্যে আর কিছু না পেয়ে তার সাইকেল শেখার ইতিহাসটা জোর ক'রে টানা-টানি সুরু করলে, ব'ললে, শালার এই বাইক জিনিষটা ভারী বেয়াড়া—বুঝলে কুসুম। চালাতে চালাতে ভাবচি—ওদিকে ডোবা, কিছুতেই যাবো না ওদিকে, কিন্তু ঠিক সেইখানে এক সময়ে দেখি, গিয়ে পৌঁছেচি।

হৃদয়ের রহস্য মাঠে মারা গেল—কুসুম খদ্দের বিদেয় ক'রতে ব্যস্ত-—ডাক্তারের দিকে নজর দেওয়ার তার সময় নেই। রসিকতা ক'রতে গিয়ে যদি রসিকজনের হাসির বদলে করুণ সহানুভূতি মেলে তাহ'লে তার বাড়া আর দুর্ভোগ নেই। এখানে তা-ও জুটলো না হৃদয়ের।

বাইকের গল্প আর টানা চলে না। হৃদয় ফের বললে, আমার চিঁড়েটা ভেজে দাও না এবার—খাই।

কুসুম খদ্দের বিদেয় ক'রতে ক'রতে ব'ললে, এই দিই বাবু, এদের বিদেয় ক'রেই আপনাকে দেবো।

হৃদয়ের মুখ হ'লো কালো এবং অধিকতর গম্ভীর। সে অলস ভাবে দেখতে লাগলো—শ্রীনিবাস সকলকে তামাক সরবরাহ ক'রচে। হুঁকো ও কল্কেয় দড়ি বেঁধে ছেড়ে দিয়েচে—দড়ির এক প্রান্ত তার কোমরে জড়ানো; বেহাত হবার উপায় নেই। হিসেবী মানুষ শ্রীনিবাস। আর কিছু না হোক—হিমির সঙ্গে পনেরো বছর থেকে এই জ্ঞানটা হ'য়েচে তার।

তামাকের তালটা শেষ ক'রে প্রতিযোগী যুবকের দল হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে দিব্যি ঠাণ্ডা রাত্রে দইয়ের সরবৎ খেতে সুরু ক'রলে—গরমটা সকলকেই এক যোগে আক্রমণ ক'রলে বোধ হয়। তাদের ঠাণ্ডা ক'রবার জন্যে কুসুম রইলো ব্যস্ত—হৃদয়ের চিঁড়ে ভাজার কথা ভুলে গেল বোধ হয়; ফলে সে-ও হ'লো গরম।

কুসুম কয়েকজনকে ঠাণ্ডা ক'রে ব'ললে, চিনি যে আর নেই।···

নেই!···একজন ছোকরা সেই রাতে অন্ধকারে ছুটলো বসন্তিয়ার বাজারে চিনি আনতে। কুসুমকে এরা কোনো রকমে সাহায্য ক'রতে পারলে কৃতার্থ হ'য়ে যায়—ঊর্দ্ধতন চোদ্দ পুরুষ বর্ত্তে যায় যেন।

একটি ছোকরা ব'ললে, আপাতক একটা পয়সার বিড়িই দাও—চিনি ততক্ষণ আসুক। কিছু কিনতেই হবে তাদের—নইলে বাঁচোয়া নেই।

বিড়ির বাণ্ডিলগুলো বিক্রী হ'তে সুরু হ'লো।

কুসুম সলজ্জ হেসে ব'ললে, এ তোমরা আরম্ভ ক'রলে কি গো? ওই··· এই সিকিটা কে দিলে গো—ফেরৎ পয়সা নিলে না যে···

দোকানের সুমুখ থেকে ভিড় একে একে ভেঙে গেল—ফেরৎ পয়সা কেউ নিলে না। কুসুম বোকার মতো ফিরে তাকালো হৃদয়ের দিকে—হৃদয়ের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। কুসুম মুখ কালো ক'রে বার বার বৃথাই ফেরৎ পয়সা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ ক'রতে লাগলো।

ওদিকে শ্রীনিবাস বেওয়ারিশ এই পয়সাটা নিজের ব'লে আনবার জন্যে উঠেছিল—হিমি গর্জ্জন ক'রে ব'ললে, যাচ্ছো কোথায়?

—তামুক খেতে আর ভালো লাগে না, একটা পয়সার বিড়ি আনি। এই

ব'লে সে হিমির ভয়ঙ্কর মুখের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো। তারপর আর সাহস হ'লো না—বসে পড়লো।

হৃদয়ের অপমান চূড়ান্ত। শ্রমিকদলের মাঝখানে যতো উঁচুতে উঠেছিল সে—ততো নীচুতে আবার গিয়েচে নেমে। তবু চিঁ চিঁ ক'রে ব'ললে, চিঁড়ে না হয় এখন থাক কুসুম। আর এক কাপ চা খাওয়াতে পারো ?

—দিই বাবু। এদের তাল সামলানো কি একা মেয়েমানুষের কম্ম। ব'লে কুসুম চায়ের জল চড়িয়ে দিলে। ব'ললে, আর কোনো উপায় নেই—নইলে দোকান তুলে দিতাম।

হুঁঃ—হৃদয় মনে মনে হাস্‌লো।

কিন্তু কুসুম যখন তাকে একটা সিগ্রেট দিয়ে ব'ললে, "এইটে ততক্ষণ টানুন ডাক্তারবাবু"—কুসুমের প্রতি সব বিরূপতা কোথায় গেল ভেসে। বাস্তবিকই তার দিকে কুসুমের একটা বিশিষ্ট দৃষ্টি আছে—অপমান বোধটা একটু কাটলো হৃদয়ের। হৃদয় জিজ্ঞেস ক'রলে, এরা কি তোমার সব চেনা কুসুম ?

এমন সময় যে ছোকরাটি বসন্তিয়ার বাজারে চিনি আনতে গিয়েছিল সে ফিরে এলো অনেকখানি চিনি নিয়ে। কুসুম তার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হৃদয়ের কথার জবাব দিলে, না বাবু, এমনি মুখ চেনা। ফি বছর এই দিক দিয়ে এরা খাটতে যায়—চেনার মধ্যে এই।

যে ছোকরাটি চিনির ঠোঙা নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল তাকে ডেকে কুসুম ব'ললে, চিনি তোমাকে আনতে ব'ললে কে ? কত দাম—নিয়ে যাও বাপু।

ছোকরাটি স্মিত মুখে ব'ললে, আচ্ছা সে হবে পরে—দামের জন্যে অতো তাড়াতাড়ি কি ! ছোকরাটি বিজয়ীর মতো নিজের জায়গায় গিয়ে ব'সলে।

হৃদয়ের মুখের দিকে আর তাকাতে পারলে না কুসুম—অপমানে মুখ তার কালো হ'য়ে উঠলো। ছোকরা প্রতিযোগী ক্রেতার দল দোকানের সুমুখে আবার ভিড় ক'রেছে—কুসুম তাদের নীরবে বিদায় ক'রতে লাগলো।

চায়ের জল টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটচে—সেদিকে বোধ হয় কুসুমের খেয়াল নেই। করুণামণ্ডিত গাম্ভীর্য্যে সে খদ্দের বিদেয় ক'রতে ব্যস্ত। হৃদয়ের অপমান বোধটা আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। হৃদয় ভাবতে লাগলো, সে একজন ভদ্রলোক, একজন রীতিমতো ডাক্তার—কতকগুলো তুচ্ছ চাষার মাঝখানে কুসুম

যেন তাকে ইচ্ছে ক'রে অপমান ক'রচে, অবহেলা ক'রচে। হৃদ্…হৃদয় অপমানে মুখ কালো ক'রে হিংসাকুটিল চোখে দোকানের সুমুখে ভিড় করা ছোকরাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। কুসুমই এদের মাতিয়েছে, কুসুমের কাছে এরাই বড়—ভালো দোকান পেতেছে কুসুম।

এই সময়ে তারক উঠে এসে ব'ললে, কুসুমদি'—মুড়ি দুটো পয়সার।

উত্তরে কুসুম তারকের দিকে অবাক হ'য়ে তাকালো। এই তারক—তার চেয়ে কতো ছোট…সে-ও কিনা ওই নির্লজ্জ প্রতিযোগীদের দলে। দোকানের ভেতর থেকে, সুমুখের অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে তার নিরুপায় নারী দেহটা নিয়ে ছুটে পালাতে ইচ্ছে হ'লো।

তারকের বয়স হ'য়েচে—কুসুমের এই ভাবান্তরের অর্থটা বুঝতে পারলে বোধহয়। সলজ্জে তাড়াতাড়ি তাই ব'ললে, কখন সেই রাত আড়াই পহরে খেয়া—ক্ষিদে লেগে গিয়েচে।

কুসুম অসহায় পশুর মতো তার দিকে তাকালো—তারপর মুখ নীচু ক'রে ব'ললে, ওই বেঞ্চির নীচে বাটি আছে নিয়ে আয়—দুধ দি'চ্ছি।

কুসুমের এই ভাবান্তরে হৃদয় ভাবলে, দেশের একটা পরিচিত লোকের সুমুখে স্বরূপটা প্রকাশ হ'য়ে পড়লো ব'লে লজ্জা পেয়েচে বোধহয় কুসুম। তাই তার ক্ষুধার্ত্ত ছেলেকে 'যা যা' ক'রে সরিয়ে দিয়েছিল কুসুম। বিপুল ঘৃণায় ভাবতে লাগলো হৃদয়—এই কুসুমকেই সে কিনা ব'লেছিলো ভালো মেয়ে। দৃষ্টিতে বিপুল ঘৃণা ঢেলে কুসুমের দিকে তাকিয়ে রইলো হৃদয়।

কুসুম তখন ঘর্ম্মাক্ত, সঙ্কুচিত দেহে ক্রেতার দল বিদায় ক'রচে।

তারকের পর প্রতিযোগী ক্ষুধার্ত্ত তরুণের দল কুসুমের মুড়ি ও বাতাসার টিন মুহূর্ত্তে দিলে খালি করে। তারপর দোকানে এমন কিছুই রইলো না যাতে এই উদ্দাম যুবকগুলি কুসুমের সঙ্গে একটুক্ষণের জন্যেও ঘনিষ্ঠ হ'তে পারে, দুটো কথা কইবার সাধ মেটাতে পারে। দুর্ভাগা তারা।

কুসুম এবার হৃদয়ের চায়ের জলের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, ওমা, সব জল যে মরে গেছে! আপনি কি দেখেন নি ডাক্তারবাবু! আপনি ততক্ষণ আর একটা সিগ্রেট খান—চায়ের জলটা আবার চড়িয়ে দিই।

কুসুমের এই চটুল কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো হৃদয়। বাজারের সস্তা

মেয়ে মানুষ একটা তার সঙ্গে এমনি ভাবে কথা কইচে। এতগুলো লোকের সুমুখে, চাষার সুমুখে ঘোরতর অপমান বোধ ক'রলে হৃদয়। এদের সুমুখে কুসুমের মতো মেয়ে তার সঙ্গে কথা কইতে সাহস করে—হৃদয়ের অসহ্য হ'য়ে উঠলো। দোকানের ভেতরে সে আর বসে থাকতে পারলে না—মর্য্যাদাবোধ ঠেলে নিয়ে গেল তাকে বাইরে।

অবাক হ'য়ে কুসুম বোকার মতো পেছনে ডেকে ব'ললে, চা খাবেন না ডাক্তারবাবু? জল গরম হ'য়ে গেল প্রায়।

হৃদয় নিরুত্তরে নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। কুসুম যে কি জাতের —হৃদয়ের তা ভালো ভাবেই বোধগম্য হ'য়েচে। কুসুমের একটা বিশ্রী কদর্য্য মূর্ত্তি বার বার তার চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো। আঃ, সে কিনা ওর হাতে আবার পরম পরিতৃপ্ত হ'য়ে চা খেয়েচে!

হৃদয় নদীর দিকে মুখ ক'রে একটা অশ্বত্থ গাছের তলায় গিয়ে ব'সলো। খালের মুখটায় স্রোতের জল বাধা পেয়ে ছল্ ছল্ ক'রে উঠচে। কালো কালো নৌকা কয়েকটা খালের মুখে ভিড় ক'রে আছে···উদ্দাম বাতাসে ঝাউ গাছের অবিশ্রাম গোঙানি, নীড়াশ্রয়ী ঘুমন্ত পাখীর দল মাঝে মাঝে শব্দ ক'রে ডানা ঝাপটিয়ে উঠ্চে। চারদিকে কেমন একটা শূন্যতাভরা অপরিচিত আবহাওয়া —এর মাঝখানে কোথাকার কে এক কুসুম হৃদয়ের মনের সমস্ত শান্তি দিচ্ছে নষ্ট ক'রে।

একটা নৌকায় চঞ্চলতা জেগেছে। দাঁড়ি-মাঝিদের নিদ্রাজড়িত কণ্ঠস্বর ···তাদের বৈঠা আর লগি ফেলার শব্দ দূর থেকে ভেসে আসচে। জোয়ার এলো নাকি! হৃদয় চঞ্চল হ'য়ে উঠলো।

ও সমুদ্রের চরের খেয়া···সমুদ্র চরের খেয়া গো···

সমুদ্র চরের খেয়ার ডাক দূর দিগন্তে ক্ষীণ হ'য়ে মিলিয়ে গেল। যাত্রীর দল সকলরবে তাড়াহুড়ো ক'রে নৌকায় গিয়ে উঠলো। হৃদয় মুখ ফিরিয়ে দেখলে, মুসারিফখানা জনহীন—কুসুমের দোকানের আলো নিভে গিয়েচে। হৃদয় আড়মোড়া ভেঙে অন্ধকার মুসাফিরখানার দিকে এগিয়ে গেল। তার কখন খেয়া ছাড়বে কে জানে।

হৃদয় ব'সে পড়েচে এমন সময় কুসুমের ঘরের দরজা খুলে গেল—আলো

খানিকটা অন্ধকারে ঝক্ মক্ ক'রে হেসে উঠলো। সেই আলোয় হৃদয় দেখলে কুসুমকে, চটুল পরিহাস্যময়ী কুসুম নয়, চোখে মুখে তার কেমন এক রকম আতঙ্কের ছাপ। হৃদয় সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

কুসুম দরজার বাইরে এসে ব'ললে, ওখানে ব'সে কে গো ?

হৃদয় সাড়া দেওয়ার কোনো প্রয়োজন বোধ ক'রলে না। কিন্তু কুসুম যখন কাছে এসে তাকে চিনে ফেল্‌লে তখন হৃদয় একটা সাড়া না দিয়ে পারলে না।

কুসুম ব্যাকুল কণ্ঠে ব'ললে, ডাক্তারবাবু একবার আসুন না।

—কোথায় ? নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিলে হৃদয়।

— কত্তা হঠাৎ কেমন হ'য়ে পড়েচে যেন।

—কর্ত্তাটি কে ?

—আমার স্বামী। কুসুম গড় গড় ক'রে ব'লে চললো তার বসন্ত আক্রান্ত স্বামী প্রসন্নর মুমূর্ষু অবস্থাটা। প্রসন্ন বিকেল থেকেই তৃষ্ণায় ছট্ ফট্ ক'রছিল। কব্‌রেজের বারণ থাকায় কুসুম জল দেয়নি। তারপর কুসুম মুসাফির-খানায় যাত্রীর বেশ ভিড় দেখে আজ অনেকদিন পরে দোকান খুলেছিল সন্ধ্যের দিকে। এর মধ্যে প্রসন্নর দিকে নজর দেবার অবসয় পায়নি কুসুম। ছেলেটাকে বাপের কাছে বসিয়ে রেখেছিল—কিন্তু সে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ইত্যবসরে প্রসন্ন কখন হামাগুড়ি দিয়ে কোনো রকমে জলের কলসীর কাছে গিয়ে আকণ্ঠ জল খেয়েচে। তারপর বিছানায় আর ফিরে আসতে পারেনি—সেইখানেই অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। কুসুম হাঁপ ছেড়ে ব'ললে, সন্ধ্যে বেলা আপনাকে দেখে ভেবে-ছিনু আমার আর কোন ভয় নেই। কি হবে ডাক্তারবাবু···কুসুম কেঁদে ফেললে।

প্রসন্ন কুসুমের স্বামী—হুঁ, ছলনাময়ী কুসুম, চিনেচি তোমাকে। এক-জনকে কেন্দ্র ক'রে তোমাদের পঙ্কিল তরল জীবন দশ দিকের আবহাওয়াকে বিষাক্ত ক'রে তোলে। কুসুম, তুমি তোমার মরণাপন্ন স্বামীকে ফেলে এসে হাসো, বেচা কেনা করো, প্রলোভনের জাল পেতে বসো। চিনেচি তোমাকে। এইগুলো হৃদয়ের চেঁচিয়ে ব'লতে ইচ্ছে হ'লো—ইচ্ছে হ'লো দুটো কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিতে—কিন্তু তা সে পারলে না। নির্ব্বিকারভাবে অনাসক্ত কণ্ঠে বললে, আমি গিয়ে আর কি ক'রবো বলো—ও রোগের ওষুধ নেই।

—তবে কি করবো বলুন ডাক্তারবাবু। অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কুসুম বললে,

কথাও বলে না, তাকায় না। দোহাই আপনার ডাক্তারবাবু—বাঁচান। কুসুম খপ্ করে ডাক্তারের পা ছুটো চেপে ধরলো।

কাকে বাঁচাব কুসুম ?—হৃদয় ডাক্তার মনে মনে জিজ্ঞাসা করলে, যার সঙ্গে গৃহত্যাগ করে এসেছিলে ? কলঙ্কিনী কুসুম। একটি ছোকরার কাছ থেকে কুসুমের সমস্ত ইতিহাস সংগ্রহ করেছে হৃদয়—সেই ছোক্‌রাটি, যে বসন্তিয়ার বাজার থেকে চিনি এনে দিয়েছিল কুসুমকে। কুসুম তো তারও সঙ্গে ভালো-বাসার ছলনা করে। হৃদয় ছোকরাটিকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, খবর্দ্দার হে, ওসব মেয়ের পাল্লায় পড়ে, গরীব লোক তুমি, সর্ব্বনাশ টেনে এনো না। মরুকগে সে—হৃদয় কুসুমকে খুব ভালো করেই চিনেচে। স্বামীর শোক প্রকাশের জন্যে আদা চিবিয়ে চোখের জল বের করে যারা—কুসুম তাদেরি দলে। এই মেয়েটার সুমুখে বসে থাকতেই গা জ্বলে যাচ্ছে হৃদয়ের—আজ তার সমস্ত পবিত্রতা গিয়েচে নষ্ট হয়ে, সে কিনা কুসুমের হাতে চা খেয়েচে।

হৃদয়ের হঠাৎ মনে পড়ে গেল কুসুমের চা সিগ্রেটের দাম দেওয়া হয়নি। সে পার্স বের করে একটা টাকা ফেলে দিলে—বললে, তোমার চা ও পানের দামটা নিয়ে নিয়ো। বাকী পয়সা আর ফেরৎ দিতে হবে না।

কুসুম যেন কেমন থতোমতো খেয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে বললে, আপনি কিছু খাবেন না ডাক্তারবাবু ?

কুসুম আরও কি ব'লতে যাচ্ছিল,—হৃদয় বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে, তুমি আমাকে পেয়েচ কি—কি ভেবেচ ? ঘৃণা, অপমান ও রাগ এই তিনটা হৃদয়কে ঝড়ের বেগে ঠেলে নিয়ে গেল।

—ডাক্তারবাবু গো···পায়ে পড়ি আপনার···দেখে যান ডাক্তারবাবু···

হৃদয় ডাক্তার তখন অনেক দূরে—কিছুই শুনতে পায়নি বোধ হয়। কুসুমের আর্ত্তনাদ অন্ধকারের গহন মৌনতায় প্রতিধ্বনি তুলে কেঁপে উঠেছিল অল্পক্ষণের জন্যে আর অদূরের নিঝ্‌ঝুম অশত্থগাছের কাকগুলো ডেকে উঠেছিল একবার—হঠাৎ আর্ত্তনাদে ভয় পেয়েছিল বোধ হয় তারা।

হৃদয়ের খেয়ার ডাক এলো।

শেষ ক্ষীণ ডাকটুকু ক্রন্দনের বাতাসে মিলিয়ে গেল। খালের মুখে জোয়ারের জল ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো। হৃদয়ের নৌকা উজানের মুখে ছেড়ে দিলে।

বুড়ো মাঝি হালটা চেপে ধরে ব'ললে, হাঁরে কচি, কুসুমের কত্তা এখন কেমন আছে জেনে এসেচিস ?

কচি উত্তর দিলে, গতিক বড় খারাপ মাঝি—বাঁচবে না বোধ হয়। সাঁজ পহরে দেখে এসেচিনু।

ইমাম ব'ললে, আহা—পরসন্ন বড় শক্ত মাঝি ছিল গো।

বুড়ো মাঝি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে পুরানো দিনের কথা সুরু করে। তাতে প্রসন্ন আর কুসুমের কথাই বেশী। প্রসন্ন যখন বিয়ে করে—কুসুম তখন ছোটই। প্রসন্নর জমি ব'লতে এক ছটাক ছিল না যে ঘর তুলে। এই বৃদ্ধের পরামর্শে কুসুমকে এই মাঝির বাড়ীতে রেখে প্রসন্ন পূর্ব্বের মতো নৌকায় নৌকায় ঘুরে বেড়াত। পরে কুসুম বড় হ'লে সরকারের অনুমতি নিয়ে মুসাফিরখানার একাংশে প্রসন্ন তুললে ঘর। কবে প্রসন্ন নাকি অসুখে পড়েছিল তখন জীবিকা নির্ব্বাহের জন্যে কুসুমকে এই দোকানটি ক'রে দিয়েছিল প্রসন্ন। এই মাঝি কবে তাতে আপত্তি তুলে ব'লেছিল কুসুমকে—"মা রে, তুলে দে দোকান—পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়।" —তখন কুসুমও এতে সায় দিয়ে প্রসন্নকে বলতে সে ব'লেছিল, অনেক সইতে হবে কুসুম—আমার হাতে পড়েচিস যখন। দোকান তুলিস্‌নি—খেতে পাবিনি। প্রসন্ন আর কুসুমের দাম্পত্য জীবনের অনেক কথাই মাঝি ব'লে গেল।

হৃদয় শুনেছিল কান পেতে—মুখ চোখ হঠাৎ কেমন তার অসহায়ের মত পাণ্ডুর হ'য়ে গেল। কুসুমের সম্বন্ধে যা সে শুনেছিল—সে সব কি তবে মিথ্যে।

কিন্তু এই কথা জিজ্ঞেস ক'রতে যেতেই ইমাম আর কচি তার দিকে কট্‌ মট্‌ ক'রে তাকাল। মাঝি ব'ললে, ও কথা মুখে এনোনি বাবু। কুসুমকে আমি ছোট্টটি থাকতেই জানি।

ইমাম এই সময়ে ব'লে উঠলো, সামাল মাঝি, জাহাজমারির ঘূর্ণি দেখা যায়।

ঘূর্ণির জলোচ্ছ্বাস গহন রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ ক'রে ভেসে এলো—হালটা বিশ্রী ভাবে ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে ওঠে।

হৃদয় পেছনের দিকে ফিরে তাকায়। তার চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে প্রসন্নের মৃত্যুদৃশ্য—হতভাগা যৌবনে নিলে বিদায়—জীবনের অগাধ তৃষ্ণা

নিয়ে। জলের কলসীর ধারে কর্দ্দমাক্ত মেঝেতে তার গুটিকাচ্ছন্ন বীভৎস শরীরটা লুটোচ্ছে। আর কুসুম...

সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে উঠ্‌লো। অস্থির কণ্ঠে হৃদয় ব'ললে, আমি আজ যাবো না মাঝি—আমাকে আজ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো। খুব বখসিস্ দেবো।

মাঝি উত্তর দিলে, নদীর মুয়ানা বাবু—জুয়ারের জোর কত! আগে আবার জাহাজমারির ঘূর্ণি—ফেরানো এখন আর যায় না। এতগুলি প্রাণ নষ্ট হবে বাবু। ভুলে কিছু ছেড়ে এসেচ বুঝি বাবু?

ছেড়ে এসেচে বৈ কি—ভীষণ ভুল হ'য়েছে তার। কেমন একটা অস্বস্তিতে পাগল ক'রে তুললো তাকে।

ধীরে ধীরে ঘূর্ণির কলরোল দূরে সরে যায়...একটা নিশাচর পাখী শোঁ শোঁ শব্দ ক'রে আর্ত্তনাদ ক'রতে ক'রতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়...বৈঠার ছপ্ ছপ্ একঘেয়ে শব্দ...হালের করুণ আর্ত্তনাদ একটা অনাগত আশঙ্কাকে ঘন ক'রে তোলে। দূরবিস্তৃত জলপথ—স্তব্ধ সুদূর আকাশ, এর মাঝখানে বিরাট এক অজ্ঞাত রহস্য জগতের পুঞ্জীভূত বিরহ শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে। হৃদয়ের মনে পড়ে—সেই মুসাফিরখানা...সেই দোকান...সেই কুসুম।...অন্ধকারের বুকে চোখ রেখে সে ভাবে—আবার এদিকে কখনো আসা হবে কিনা কে জানে! দীর্ঘনিঃশ্বাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে হৃদয়—তার কানের কাছে কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে...ডাক্তার বাবু গো...

মিনতিভরা অস্ফুট কণ্ঠে হৃদয় ব'ললে আবার, ও মাঝি—শুনচো?

মাঝি শুনলো না বোধ হয়। অনন্ত অন্ধকারের মাঝখানে নৌকাখানা তর্ তর্ ক'রে এগিয়ে চল্‌লো শুধু।

শ্রীসুশীল জানা

ইউরোপে সংস্কৃতানুশীলনের সূত্রপাত ও ইউজেন বুর্ণুফ

ইউজেন বুর্ণুফ (Eugene Burnouf) বিখ্যাত ফরাসী ওরিয়েণ্টালিষ্ট বা প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। তিনি বিগত শতকের প্রথম ভাগে তাঁর নানা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রাচীন ইরাণীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আবেস্তা, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র, এবং পুরাণ প্রভৃতির গভীর আলোচনার দ্বারা তিনি প্রাচ্যতত্ত্বের আলোচনায় যে পথ প্রবর্ত্তন করেন তাই ওরিয়েণ্টালিষ্টগণ আজ পর্য্যন্ত অনুসরণ করে আসছেন। বুর্ণুফের পাণ্ডিত্যের সঠিক পরিচয় দিতে গেলে তাঁর পূর্ব্বে ইউরোপে সংস্কৃত বা আবেস্তার আলোচনা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তা জানবার দরকার।

ইউরোপে সংস্কৃত আলোচনার সূত্রপাত ঠিক কখন হয় সে সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে ইংরাজ পণ্ডিতদের চেষ্টায় ইউরোপে এ আলোচনা সুরু হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের পরামর্শে উইল্‌কিন্স নামক একজন পণ্ডিত কাশীতে পণ্ডিতদের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা ক'রে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ভাগবদ্‌গীতা ও হিতোপদেশের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রায় এই সময়েই উইলিয়ম জোন্স কলিকাতায় 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল' নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানেই সংস্কৃত আলোচনা ধারাবাহিকভাবে আরম্ভ হয়। কেরি এবং উইল্‌কিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ ১৮০৮ সালে প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর অনেক পূর্ব্বেই সংস্কৃত ভাষার আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল, তার নূতন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পঁ (Pons) নামক একজন ফরাসী ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষ হতে দেশে যে চিঠি লেখেন তা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই চিঠিতে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিস্তৃত পরিচয় দেন এবং সে সাহিত্যের বেদ, দর্শন, ন্যায় ব্যাকরণ, অলঙ্কার, অভিধান, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাখার উল্লেখ করেন। প্রত্যেক শাখা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তা সে যুগের যে কোন জ্ঞান-পিপাসুকে উদ্বুদ্ধ করতে পারত। উপরন্তু তিনি সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সব চাইতে সম্পদশালী

ভাষা (la plus riche langue du monde) বলে উল্লেখ করেন। উইলিয়ম জোন্‌স ভারতবর্ষে আসবার সময় এ চিঠি দেখতে পান এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন।

পঁ সংস্কৃত সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে শুধু চিঠি লিখেই যে ক্ষান্ত ছিলেন তা নয়। তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণও রচনা করেছিলেন। এই ব্যাকরণের পুঁথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ব্যাকরণ লিখিত হয়েছিল ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে এবং লাতিন ভাষায়—

Grammatica Sanscritica cui adjonctum est Dictionarium Sanscriticum *Amarakocha* inscriptum.

অর্থাৎ "সংস্কৃত ব্যাকরণ ও তৎসঙ্গে লিখিত সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ"। এই ব্যাকরণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত—(১) বর্ণমালা, (২) সর্ব্বনাম, (৩) শব্দরূপ, (৪) ধাতুরূপ, (৫) ধাতুকোষ (অসম্পূর্ণ)। এ ছাড়া চাণক্যসার-সংগ্রহের শ্লোক ও লাতিন অনুবাদসহ অমরকোষ এ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। পরিশেষে গণপাঠ ও বোপদেবের কাব্যকামধেনু রয়েছে। পঁ এ গ্রন্থ রচনা করেন চন্দননগরে এবং সেই কারণে তিনি দেবনাগরীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা অক্ষর ব্যবহার করেছেন। তাঁর এ ব্যাকরণ ক্রমদীশ্বরের সংক্ষিপ্তসার হতে রচিত এ কথা তিনি নিজেই বলেছেন।

এই ব্যাকরণ যে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষা আলোচনায় সহায়তা করেনি একথা মনে করবার কোন কারণ নাই। ইউরোপে ধারাবাহিকভাবে সংস্কৃত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয় সর্ব্বাগ্রে পারিসে। কলেজ দ' ফ্রাঁসে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার জন্য অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়। আর প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন শেজি (Chezy)। শেজি এ পদে নিযুক্ত হবার পূর্ব্বেই সংস্কৃত আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। এ কার্য্যে তাঁর একমাত্র পথ প্রদর্শক ছিল—পঁ-এর ব্যাকরণ।

শেজি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু নানা ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল বলে তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে 'ওরিয়েন্টালিষ্ট' হিসাবে সরকারী দপ্তরে কাজ করবার অনুমতি পান। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী ওরিয়েন্টালিষ্টের পদ পান ও Bibliotheque Nationale বা রাজকীয়

পুস্তকাগারে মিশর দেশ হতে নেপোলিয়ন যে সব পুথিপত্র আনেন সেগুলি সংরক্ষণ করবার ভার পান। এই সময়ে রাজকীয় পুস্তকালয় হতে তিনি পঁ-এর রচিত সংস্কৃত ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি বের করেন ও তার সাহায্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। ব্যক্তিগত কারণে এ শিক্ষার কথা তাঁকে অনেকদিন গোপন রাখতে হয়, কিন্তু উইলকিন্সের সংস্কৃত ব্যাকরণ বেরুতেই ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তিনি সে বইয়ের যে বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন, তা হতেই সকলে বুঝতে পারে যে তিনি ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতনবীশ। এর কয়েক বৎসর পরেই ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়ন বিতাড়িত হন, এবং প্রাচীন রাজবংশ আবার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কলেজ দ' ফ্রাঁসে (তখন নাম ছিল College Royale de France) তুটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয়। একটি হচ্ছে চীন এবং মাঞ্চু ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার জন্য, অন্যটি সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্য। প্রথম পদে নিযুক্ত হন আবেল রেমুজা (Abel Remusat), এবং দ্বিতীয় পদে শেজি। শেজির ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হয়, তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল অত্যন্ত তুঃখময় এবং সেই কারণে তিনি তাঁর অনেক রচনা প্রকাশ করতে পারেন নি। সেই জন্যই তাঁর শেষের রচনা অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুবাদের প্রথম পত্রে তিনি স্কট থেকে এক লাইন উদ্ধৃত করে মনের কথা ব্যক্ত করে যান—

That I o'erlive such woes,
Enchanteress ! is thine own.

শেজি নিজের চেষ্টায় যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন সে শিক্ষা সম্পূর্ণ ফলবতী হয় তাঁর ছাত্র বুর্ণুফের (Eugene Burnouf) হাতে। বুর্ণুফ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হতে নিজেই সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন, এবং তাঁর পিতার নির্দ্দেশক্রমেই বুর্ণুফ অন্যান্য শিক্ষা শেষ করেই শেজির নিকট সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। জার্ম্মানীতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্ত্তক লাসেন (Lassen) ছিলেন বুর্ণুফের সহপাঠী ও সহকর্ম্মী। উভয়ে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে Essai sur Pali নামক প্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পালি ভাষা সম্বন্ধে সে সময়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কোন জ্ঞানই ছিল না, সুতরাং

অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেক সহায়তা করেছিল।

বুর্ণুফের দৃষ্টি ছিল অনেক বেশী প্রখর এবং সেই কারণে তিনি প্রথম থেকেই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে সমগ্রভাবে দেখতে পেরেছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে Ecole normale নামক প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েই তিনি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির তুলনামূলক বিচার আরম্ভ করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের সেই প্রথম সূত্রপাত। বুর্ণুফের অপ্রকাশিত কাগজপত্র হতে দেখা যায় যে তিনি এই সময়েই লাতিন, গ্রীক, সংস্কৃত ও আবেস্তার ভাষার তুলনামূলক বিচার আরম্ভ করেছিলেন (les principes generaux d'une theorie philosophique du langage)।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে শোজির মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর বুর্ণুফ কলেজ দ' ফ্রাঁসে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি ইতিপূর্ব্বে ইরানীয় ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দেই এ বিষয়ে তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়--Commentaire sur le Yasna। যশ্ন হচ্ছে আবেস্তার অংশ বিশেষ। আবেস্তা ইতিপূর্ব্বেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হস্তগত হয়েছিল। ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ ভারতবর্ষ হতে আবেস্তা সংগ্রহ করে অক্‌সফোর্ডে নিয়ে আসেন, কিন্তু সে গ্রন্থ পাঠ বা আলোচনা করবার চেষ্টা কেউ করেননি। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ফরাসী আঁকতিল দুপেরোঁ এ গ্রন্থের খোঁজ পান ও ভারতবর্ষে আসবার পর আবেস্তার অন্য পুঁথিও সংগ্রহ করেন। দুপেরোঁ পার্শি পুরোহিতদের সহায়তায় আবেস্তা অনুবাদ করেন, এবং দেশে ফিরবার পর সে অনুবাদ প্রকাশ করেন। দুপেরোঁর অনুবাদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হলেও আবেস্তা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিত মহলে কৌতূহল জাগিয়ে দেয়।

আবেস্তা নিয়ে বুর্ণুফের আলোচনা ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের একটি স্মরণীয় কীর্ত্তি। দুপেরোঁ যশ্নের যে অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন বুর্ণুফ সে অনুবাদ সংশোধন করলেন, এ কার্য্যে তিনি সব চাইতে বেশী সাহায্য পেলেন যশ্নের এক প্রাচীন সংস্কৃত অনুবাদ হতে, নেরিওসেঙ্গ নামক পণ্ডিত পঞ্চদশ শতকে এ অনুবাদ করেন। কিন্তু বুর্ণুফের এর চাইতেও বেশী মৌলিক কাজ হল তাঁর টীকা টিপ্পনী। তিনি তুলনামূলক বিচারের দ্বারা প্রত্যেক শব্দের প্রকৃত অর্থ, ধাতুরূপ, ও প্রয়োগবিজ্ঞান সমস্তই নির্ণয় করলেন। তাঁর এই কাজের

দ্বারা যে ইউরোপে আবেস্তা আলোচনার পথ পরিষ্কার হল শুধু তাই নয়, তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ভিত্তি সুদৃঢ় হল।

আবেস্তার অন্যান্য অংশের আলোচনাও বুর্ণুফ আরম্ভ করেছিলেন। তিনি ১৮৪৯ হতে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আবেস্তার আর একটি প্রধান অংশ—বেন্দিদাদের আলোচনা প্রকাশ করেন। এ ছাড়া তাঁর পুঁথিপত্রের মধ্যে আবেস্তা সম্বন্ধে আরও অনেক আলোচনা পাওয়া গিয়েছে। সমস্ত আবেস্তার একটি অভিধান প্রকাশ করবার জন্য তিনি সে গ্রন্থের নানা অংশের সম্পূর্ণ শব্দসূচী প্রণয়ন করেছিলেন। শব্দসূচী সম্পূর্ণ হয়েছিল বটে, কিন্তু অভিধান তিনি শেষ করেতে পারেননি।

আবেস্তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা তাঁর হাতে প্রথম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আলোচনা কাঁচা হাতের নয়। বহুকাল সে আলোচনা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেই পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা আবেস্তার আলোচনায় অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

এর পর বুর্ণুফ সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম কাজ—ভাগবত পুরাণের ফরাসী অনুবাদ। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে যে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে অন্যান্য প্রধান গ্রন্থ থাকতে ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করতে গেলেন কেন। এর কারণ, তাঁর ছাত্র ইতালীয় পণ্ডিত গোরেজিও (Gorrezio) রামায়ণের সংস্করণ ও অনুবাদ করছিলেন ; জার্ম্মাণ পণ্ডিতদের ভিতর শ্লেগেল রোজেন (Rosen) বেদ, এবং বপ (Bopp) মহাভারতের অনুবাদ করা মনস্থ করেছিলেন। সেইজন্য আর বুর্ণুফ এ সব গ্রন্থে হাত দেননি।

বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে বুর্ণুফ যে আলোচনা আরম্ভ করেন তা এখনো আমাদের সমাদরের যোগ্য। বৌদ্ধসাহিত্যের কোন মৌলিক গ্রন্থ তখন প্রকাশিত হয়নি। নেপাল হতে হজসন অনেক পুথিপত্র সংগ্রহ করে পারিস ও লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন। চীনা বৌদ্ধসাহিত্য নিয়ে রেমুজা (Remusat), মঙ্গোলীয় নিয়ে শ্মিড্ (Schmidt) এবং তিব্বতী নিয়ে কোরোস্ (Csoma de Koros) কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন মাত্র। বুর্ণুফ হজসনের প্রেরিত পুথিপত্র অবলম্বন করে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার নাম—Introduction

a l'histoire du Buddhisme Indien. এ গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এ বই সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ হলেও তার মধ্যে বুর্ণুফের যে পাণ্ডিত্য ও দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাতে স্তম্ভিত হতে হয়। তিনি অসম্পূর্ণ পুঁথিপত্র হতেই বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে একটা ব্যাপক ধারণা করতে পেরেছিলেন, এবং সেই কারণে সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের সঙ্গে চীনা, তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, মাঞ্চু প্রভৃতি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রের যথাসম্ভব তুলনা করে সঠিক ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন। প্রায় এক শতাব্দী অতীত হতে চলেছে, ইতিমধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোচনা হয়েছে, অনেক নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রায় সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্য পণ্ডিতদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু বুর্ণুফের এ বই এখনো তার প্রয়োজনীয়তা হারায়নি। বরং অনেক বিষয়ে সে বই এখনো একমাত্র বই।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বুর্ণুফের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এখানি মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকের ফরাসী অনুবাদ—La Lotus de la Bonne Loi. সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক মহাযান বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একখানি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ। বুর্ণুফের সময় এ গ্রন্থের কোন মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। নেপাল হতে হজসনের প্রেরিত পুথি অবলম্বন করে এ অনুবাদ করা হয়। এ অনুবাদের মূল্য এতদিন পরেও কমে নাই। এ অনুবাদের শেষে বুর্ণুফ পারিভাষিক ও বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর যে সব টীকা টিপ্পনী সংযোজিত করেছিলেন তার মধ্যে যথেষ্ট মৌলিক গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব টীকা টিপ্পনী সমেত বুর্ণুফের অনুবাদ এখনো আদর্শ হিসাবে গৃহীত হতে পারে।

এ ছাড়া বুর্ণুফের কাগজপত্রের মধ্যে অনেক সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে প্রাচীন আসিরীয় শিলালেখের আলোচনা, পাণিনির ব্যাকরণের শব্দস্চী, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের লাতিন অনুবাদ। সম্পূর্ণ পালি ব্যাকরণ, অভিধানপ্পদীপিকা ও মহাবংসের লাতিন অনুবাদ, এবং নানা জাতকের অনুবাদ ও আলোচনা উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

অহিংসা

(২)

রাধাই নদীর তীর ঘেঁষিয়া একা মন্থর পদে আশ্রমের দিকে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়াই চোখ মিট মিট করে সদানন্দের, অকারণে ঘন ঘন পলক পড়ে। শান্ত নির্ব্বিকার দৃষ্টির পলকে পলকে রূপান্তর ঘটিয়া স্বাভাবিক বিষণ্ণ ক্ষোভাতুর দৃষ্টি ফিরিয়া আসিবার ঠিক একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মত। একটু গিয়াই চোখে পড়ে তাঁর নিজের আশ্রম, লতায় ঢাকা প্রাচীর দিয়া ঘেরা শণের ছাউনি দেওয়া কতকগুলি ঘর। আসন্ন সন্ধ্যার আবছা আলোয় তপোবনের সবুজ পটভূমি কালো হইয়া জমাট বাঁধিতেছে,—এদিকে নদীর ওপারে সমতল ক্ষেত গিয়া মিশিয়াছে দিগন্তে, দূরে গ্রামের কুটীরগুলিকে আকাশের বিলীয়মান জ্যোতি আর রঙের ছলনায় কুটীর বলিয়া চিনিয়াও যেন চেনা যায় না। বীভৎসই দেখাইতেছে বটে তার আশ্রমকে।

সাত বছর আগে দেশের নামে যে জেলখানায় অনেকগুলি দিন কাটাইয়াছিলেন, তার দেয়ালে ইটের উপর মাখানো ছিল মেটে লাল রঙ, মোটা শিক বসানো জানালা ছিল সবুজ, কত পুরু আর উঁচু ছিল সেখানকার বহিঃপ্রাচীর, লতা দিয়া প্রাচীর ঢাকিবার ব্যবস্থা তো সেখানে ছিল না, ঘরের উপর শণের ছাউনি দিবার ব্যবস্থা। আশ্রমকে তবু তার কেন মনে হয় জেলখানা? কয়েদী কেন মনে হয় নিজেকে?

প্রয়োজন ছাড়া বিপিন সদানন্দকে সকলের সামনে বাহির করিতে চায় না। তাকে সকলের চোখের আড়ালে রাখিবার জন্য সে ব্যাকুল। ম্যাজিকওয়ালার কালো পর্দ্দার মত স্পষ্ট আর অস্বাভাবিক ব্যবধান রচনা না করিয়া সহজ সরল উপায়ে এই কাজটা করা সে বড় কঠিন মনে করে। এ বিষয়ে তার সতর্কতারও সীমা নাই, দুশ্চিন্তারও সীমা নাই। প্রথম যৌবনে মেয়েরা যেমন বিপদে পড়ে নিজের নিজের শরীর লইয়া, বিপিনের সমস্যাও তেমনি জটিল। সকলে দেখুক

সদানন্দকে, কিন্তু যখন-তখন যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন অবস্থায় কেউ যেন তাকে না দেখে।

সদানন্দ আড়ালেই থাকেন, ধরিতে গেলে একরকম অন্তঃপুরেই। আশ্রমে যারা বাস করে তাদের জন্য ঘর তোলা হইয়াছে তফাতে, সদানন্দের বাসের ব্যবস্থা হইয়াছে নদীর কাছে খানিকটা স্থান প্রাচীর দিয়া ঘেরিয়া। সদানন্দ আপত্তি করিয়াছিলেন। প্রাচীর কেন? আশ্রমে কি প্রাচীর মানায়, সাধুসন্ন্যাসীর আশ্রমে? বিপিন যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিল, এতো সেকেলে সাধুসন্নাসীর আশ্রম নয়।

'আমার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হলে সকলে কি মনে করবে বিপিন?'

'মনে করবে কচু। তুই বিশিষ্ট মানুষ, তোর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না হলেই লোকের মন খুঁত খুঁত করবে।'

বিপিন তখনও শতকরা নব্বই ভাগ বন্ধু, সবে শিষ্য ও আশ্রমের ম্যানেজার হইয়াছে।

উঠিল প্রাচীর। লতায় পাতায় প্রাচীরকে ঢাকিয়া যতদূর সম্ভব চোখের আড়াল করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতে বিপিন কিন্তু ভুলিল না। তারপর প্রাচীরের ভিতরে গাছপালা যতদূর সম্ভব বজায় রাখিয়া বিপিন ঘর তুলিল তিনভাগে। সদর, অন্দর আর অন্তঃপুর ছাড়া সে তিনভাগের ঠিকমত আর কোন সংজ্ঞা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সদরে সকলের প্রবেশাধিকার রহিল, বিনানুমতিতে। অন্দরে ঢুকিবার ও বাস করিবার অধিকার রহিল কেবল বাছা বাছা কয়েকজনের, যারা ভক্ত ও শিষ্যের মধ্যে বিশিষ্ট অথবা যারা দূরদেশ হইতে আগত দুদিনের অতিথিদের মধ্যে বিশিষ্ট, অথবা সদানন্দ ও তার অতিথিদের সেবার জন্য যাদের দরকার। অন্তঃপুরে ঢুকিবার অধিকার রহিল কেবল সদানন্দ আর বিপিনের।

সদানন্দ আপত্তি করিয়াছিলেন। একি গোপনতা, ঢাকাঢাকির ব্যবস্থা? সাধুসন্ন্যাসীর কি এভাবে ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকা মানায়?

বিপিন যুক্তি দেখাইয়া বলিয়াছিল, সে তো আর আসলে সাধুসন্ন্যাসী নয়।

'লোকে কি ভাববে বিপিন?'

'ভাববে তোর মাথা। ভাববে, সাধুজী নির্জ্জনে অহোরাত্র সাধন ভজন করছেন।' আড়ালে বিপিন তখনও বন্ধু।

সদর আর কিছুই নয়, বড় একখানা ঘর। মেঝে লাল সিমেণ্ট করা, দেয়াল গেরুয়া রঙের,—বাদামী ভাবটা একটু প্রকট। আশ্রমের ছোট বড় সমস্ত ঘরই এই ধরণের, উপরের ছাউনী ছাড়া বাকী সব চুণস্বুরকি ইটকাঠের ব্যাপার। কিন্তু বিপিনের ভাষায় এগুলি সব কুটীর।

সদরের ঘরখানায় কতকটা বৈঠকখানার কাজ চলে, মাঝে মাঝে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ছোটখাট সভাও বসে। তবে সে সভা হয় অনেকটা ঘরোয়া মজলিসের মত, সকলে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা পায়। সদানন্দকে যেমন ব্যক্তিগত সুখছুঃখ দ্বিধাসন্দেহ নিবেদন করা চলে, তেমনি চলে নিজেদের মধ্যে ঘরোয়া আলাপ আলোচনা, এমন কি উঁচু গলায় তফাতের মানুষকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করা চলে, কেমন আছ ভায়া। শিষ্য ও ভক্তের ব্যক্তিত্বকে এখানে সদানন্দ প্রশ্রয় দেন, নদীর ধারে আটচালার নীচে এদের সঙ্গে তাঁর যে ব্যবধানটা থাকে প্রায় দেবতা ও অধঃপতিতের, এখানে সেটা হয় অবতার ও মানুষের। কত তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামান সদানন্দ, কত তুচ্ছ মানুষের কত তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের কত তুচ্ছ খবরই যে জানিতে চান। আগ্রহ দেখান না বটে, ছুঃসংবাদে বিচলিতও হন না, সুসংবাদে খুসীও হন না, তবু নির্ব্বিকার সহিষ্ণুতার সঙ্গে কান পাতিয়া সব কথা তো শোনেন, মুখ ফুটিয়া তো বলেন 'তাই নাকি' অথবা 'বেশ বেশ'।

সদর পার হইয়া আসিলে অন্দরের উঠান, ফুলের চারায় ফলের গাছে বাগানের মত। একপাশে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো ইঁদারা, জল বড় মিষ্টি আর ঠাণ্ডা। গরমের দিনে সূর্য্য যখন মাথার উপরে থাকে আর ইঁদারার নতুন সিমেণ্ট করা গোলাকার চওড়া বাঁধটা হইয়া থাকে আগুন, হামাগুড়ি দিয়া একটিবার শুধু ক্ষণেকের জন্য ভিতরে উঁকি দিলে মনে হয়, জলে ডুবিয়া মরাই বুঝি ভাল ঃ পূর্ণিমার চাঁদের আলোতেও অত নীচের জল তো দেখা যায় না, গরমের দিনে রাত্রে তাই যেভাবেই হোক মরার সাধ জাগানোর জন্য খালি গায়ে ঠাণ্ডা সিমেণ্টে গা এলাইয়া দিতে হয়,—ফুরফুরে হাওয়া থাক, অথবা দারুণ গুমোট হোক, রাশি রাশি ফুলের ঘন মিশ্রিত গন্ধে প্রথমে মন কেমন করিয়া ঘুম আসিয়া পড়ে এইটুকু যা অসুবিধা। একদিনও কি সদানন্দ পুরা একটা ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে পারিয়াছেন।

উঠানের একদিকে সদর, বাকী তিনদিকেই প্রায় ঘর—কোন ঘরের সামনে বারান্দা আছে, কোন ঘরের সামনে নাই। অন্দর পার হইয়া নদীর দিকে অন্তঃপুর। অন্তঃপুরেও উঠান আছে, তবে অন্দরের উঠানটির তুলনায় আকারে অনেক ছোট আর আগাগোড়া সিমেণ্ট করা। না আছে ফুলের চারা, না আছে ফলের গাছ, শুধু ঝকঝকে তকতকে মাজাঘসা পরিচ্ছন্নতা। এক কোণে কেবল একটা তালগাছ আকাশে মাথা তুলিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় বুঝি জীবন্ত কিছু, চিরদিনের জন্য সদানন্দের অন্তঃপুরে বন্দী হওয়ায় ব্যাকুল আগ্রহে মাথা উঁচু করিয়া বাহিরের জগতে উঁকি দিতেছে। গাছটায় ফল ধরে না, কোনদিন নাকি ধরিবেও না।

অন্তঃপুরে ঢুকিবার একটি খিড়কি পথ আছে, নদীর দিকে প্রাচীরের গায়ে বসানো ছোট একটি দরজা। ঘরের জানালা দিয়া সারাদিন সদানন্দ আজ রাধাই নদীতে জলের আবির্ভাব দেখিয়াছিলেন, তারপর খিড়কির দরজায় বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন আটচালার সভায়। এখন মন্থরপদে ফিরিয়া আসিয়া শিকলতোলা দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, বাহিরের মায়ামদপায়ী মাতালের মত ভুঁড়ির উপর দুটি হাত রাখিয়া সামনে পিছনে একটুখানি টলিতে টলিতে। বিড় বিড় করিয়া কি যে বলিতে লাগিলেন নিজের কানেই তা গেল না। নিজের কথা শুনিবার স্পৃহাও আর নাই। মনে তাঁর শান্তি নাই কেন, এত মানুষকে যিনি শান্তি বিলাইতেছেন ? এত ক্ষোভ কেন তাঁর, এমন আকস্মিক ক্রোধের সঞ্চার ? কারও তিনি ক্ষতি করেন নাই, কারও উপরে তাঁর হিংসা নাই, বিদ্বেষ নাই,—বিপিনের কাণ্ডে মাঝে মাঝে রাগও হয় ঘৃণাও জাগে বটে, কিন্তু বিপিনকে তিনি ভালই বাসেন, এ জগতে বিপিন তাঁর সবচেয়ে আপন, একমাত্র প্রাণের বন্ধু। এমন জ্বালাভরা অস্থিরতা তবে তিনি বোধ করেন কেন ? ভাবিতে ভাবিতে বাহিরের মায়ার নেশা যেন গাঢ় হইয়া আসে, আশ্রমে ঢুকিতে অনিচ্ছা বাড়িয়া যায়। শিকল খুলিয়া সদানন্দ তাই গায়ের জোরেই অন্তঃপুরে ঢুকিয়া পড়েন, সশব্দে ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দেন।

উঠানের তালগাছে ঠেস দিয়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া সদানন্দের বিরক্তির সীমা থাকে না। রাগ করিয়া বলেন, 'কে গা তুমি? কি করছ এখানে?'

'চুপ্। আমি কেউ না।'

কথাগুলি জড়ানো কিন্তু গলাটি মিষ্টি, অল্পবয়সী মেয়ে। দক্ষিণের বড় ঘরের বারান্দায় আর পশ্চিমের ছোট ঘরখানার রোয়াকে দুটি লণ্ঠন জ্বলিতেছে, মেয়েটির গায়ে আলো পড়িয়াছিল যথেষ্ট। সদানন্দ চাহিয়া দেখেন নাই, নতুবা বুঝিতে পারিতেন, মেয়েটি আশ্রমের কেউ নয়। এত কম বয়সী মেয়েও আশ্রমে কেউ থাকে না, আশ্রমের মেয়েদের বেশভূষাও এরকম নয়।

কাণ্ডটা বিপিনের বুঝিতে পারিয়া সদানন্দের বিরক্তি আরও বাড়িয়া গেল। আগে হইতে কিছু না জানাইয়া বিপিন যে কোথা হইতে এরকম এক একটি খাপছাড়া মেয়েকে আশ্রমে আনিয়া হাজির করে। গত বৈশাখের মাঝবয়সী স্ত্রীলোকটিকে ধরিলে এটি বিপিনের সাত নম্বরের ম্যাজিক। পাল্কীতে তবে মহীগড়ের রাজাসায়েব আসেন নাই, আসিয়াছেন ইনি। বৈশাখের ব্যাপারে সদানন্দ ভয়ানক রাগ করায় বিপিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আর এসব ঘটিবে না, কোনদিন নয়। কমাসের মধ্যেই বিপিন প্রতিজ্ঞার কথাটা তাহা হইলে ভুলিয়া গিয়াছে। ভুলিয়া যাওয়ার আগে একটু আভাস দেওয়াও দরকার মনে করে নাই, তাকে যে কথা দিয়াছিল সেটা মানিয়া চলা সম্ভব হইবে না। দুঃখে অপমানে নিজেকে সদানন্দের একান্ত অসহায় বলিয়া মনে হয়। বিনামূল্যে কিনিয়া বিপিন যেন তাকে ক্রীতদাস করিয়াছে। কিন্তু এবার তিনি ছাড়িবেন না, এবার একটা চরম বোঝাপড়া করিতে হইবে বিপিনের সঙ্গে।

রাগ চাপিয়া সদানন্দ বলিলেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন বাছা, ঘরে গিয়ে বোসো।'

'আমি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, তোমার কি?'

জড়ানো সুরে কথাগুলি বলিয়া গাছের আশ্রয় ছাড়িয়া সদানন্দের ঝকঝকে তকতকে সিমেন্ট করা উঠানে হিল তোলা জুতা ঠুকিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিল কাছে, খপ করিয়া ধরিয়া ফেলিল সদানন্দের হাত। হয়তো টাল সামলানোর জন্য।

—'তুমি সাধুজী, না ?'

মুখে তীব্র মদের গন্ধ। যে গন্ধে সদানন্দের চিরকাল বমি আসে। জবাব না পাইয়াও আহ্লাদে মেয়েটি যেন গলিয়া গেল, দুহাতে সদানন্দের গলা জড়াইয়া গদগদ হইয়া বলিল, 'শোন, আমি কেউ নয় বললাম না এক্ষুণি তোমাকে, তা সত্যি নয়। আমি মাধবী, মাধবীলতা—লতাটা কেটে বাদ দিয়েছি একদম।'

বলিয়া খিল খিল করিয়া মাধবীর কি হাসি! গলায় জড়ানো হাতের বাঁধন খুলিয়া সদানন্দ তাকে ঠেলিয়া দিয়া ঘরে চলিয়া গেলেন। পড়িয়া গিয়া আঘাতের ব্যথায় মাধবীলতা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

[লেখকের মন্তব্য ঃ রাধাই নদীতে যেদিন প্রথম নববর্ষার জলস্রোত আসিল, সেইদিন মাধবীলতার নাটকীয় আবির্ভাবটা খাপছাড়া ঘটনার পর্য্যায়ে পড়ে সন্দেহ নাই। মাধবীলতা যে আজ সদানন্দের আশ্রমেআসিয়া হাজির হইয়াছে, এ দোষ আর কারও নয়, তাকে যে আশ্রমে আনিয়াছে তারও নয়,দোষ আমার। কারও মন যদি খুঁত খুঁত করে, রাধাই নদীর নবজন্ম আর মাধবীলতার আবির্ভাবের মধ্যে যতদিন খুসী সময়ের ব্যবধান কল্পনা করিয়া লইতে পারেন, হয়তো কালের ব্যবধান সত্যই ছিল, কিন্তু কাহিনীর গতি সে-কালের হিসাব জানে না যে-কালের প্রয়োজন নাই, 'কিছুদিন পরে' দিয়া যে-কালকে পরম অবহেলার সঙ্গে ঠেলিয়া দেওয়া যায়। সত্য কথাটা বলি। সদানন্দের আশ্রমের বর্ণনা দিবার সময় অন্তঃপুরের উঠানে নিঃসঙ্গ তালগাছের কথাটা লেখার আগে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা দূরে থাক, মাধবীলতা বলিয়া যে কেউ আছে তাও আমি জানিতাম না। হঠাৎ মনে হইল, এরকম একটা খাপছাড়া গাছে একটি মেয়েকে ঠেস্ দিয়া দাঁড় করাইয়া দিলে তো মন্দ হয় না। বাস্, চোখের পলকে মাধবীলতার জন্ম। কিছুই ছিল না তালগাছটার তলায়,—কবে কে দা' কুড়াল কিছু একটা অস্ত্র দিয়া আঘাত করিয়াছিল গাছটার গুঁড়িতে, সেই ক্ষতের চিহ্ন, মাটি ঘেঁষিয়া কয়েকটা সরু সরু শিকড়ের ইঙ্গিত, সিমেণ্টে কখন বিপিন আনমনে পানের পিক ফেলিয়াছিল, তার প্রায় মুছিয়া যাওয়া দাগ, হাত দেড়েক তফাতে নর্দ্দমার কাছে এক বালতি জল আর একটা ঘষামাজা ঘটি,— এই সব খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত মনের ছবিতে এমন স্পষ্ট ভাবে আঁকা হইয়া গিয়াছিল

যে মাধবীলতার পা ফেলিবার কয়েক ইঞ্চি স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। তবু চাহিয়া দেখি, মাধবীলতা নিমেষের মধ্যে গাছে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, পায়ের জুতার চামড়ায় সেলাই-এর দাগ হইতে গালের চামড়ায় একটিমাত্র ছোট ব্রণের দাগটি পর্য্যন্ত আমার কাছে অস্পষ্ট রাখে নাই। এমন ভাবে যে আসে তাকে মারিয়া ফেলার মত নির্ম্মম হওয়া যায় না, আসিতে না দিয়া পারা যায় না। লেখক হিসাবে আমি আমার এ রকম অনেকগুলি চরিত্রের কাছে আগেও হার মানিয়াছি। সকল লেখককেই এ পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। কারও রেহাই নাই।]

মাধবীলতার কান্না শুনিয়া পূবের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল বিপিন আর সাহেবী পোষাক পরা একটি যুবক। দুজনে ধরাধরি করিয়া মাধবীলতাকে লইয়া গেল ঘরে। মাধবীলতা কাঁদিতে কাঁদিতে কেবলি নালিশ করিতে লাগিল, 'সাধুজী আমায় মেরেছে, ঠেলে ফেলে দিয়েছে আমায়। আমি এখানে থাকব না, আমায় নিয়ে চল।'

আট বেয়ারার পাল্কী চাপিয়া মহীগড়ের রাজা আজ আসেন নাই। আসিয়াছেন রাজপুত্র। মাধবীলতাকেও সঙ্গে আনিয়াছেন তিনিই। আনিয়াছেন পাল্কীর মধ্যে এককোণে লুকাইয়া। একেবারে অন্দরে ঢুকিয়া পাল্কী থামিয়াছে, রাজাসায়েব স্বয়ং রাণীসায়েবাকে সঙ্গে করিয়া আশ্রমে আসিলে যেখানে থামে। রাজপুত্রের গায়ে ভর দিয়া মাধবীলতা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

অন্দর তখন একরকম ফাঁকাই ছিল, তবু মহীগড়ের রাজার বদলে রাজপুত্র আর রাণীর বদলে মাধবীলতার আগমন কারও নজরে পড়িয়াছে কিনা বলা শক্ত। এ রকম অবস্থায় তাকে আশ্রমে কয়েকদিনের জন্যও রাখা সঙ্গত হইবে কিনা, বিপিন ও রাজপুত্রের মধ্যে এতক্ষণ সেই পরামর্শই চলিতেছিল। বিপিন বার বার অনুযোগ দিয়া বলিতেছিল, এ রকম প্রকাশ্যভাবে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনা সত্যই বড় অন্যায় হইয়াছে রাজপুত্রের। আগে একটা খবর যদি

সে পাঠাইত বিপিনকে, বিপিন সব ব্যবস্থা করিয়া দিত, এতটুকু হাঙ্গামাও হইত না, রাজপুত্রের ভাবনায়ও কিছু থাকিত না।

রাজপুত্রের নাম নারায়ণ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারা, মাঝে মাঝে মুখে অনাচার অত্যাচারের যে ছাপটুকু পড়ে সেটা স্থায়ী হয় না, দুদিন বিশ্রাম করিলেই মুছিয়া যায়, মুখে আবার স্বাস্থ্যের অমলিন জ্যোতি ফুটিয়া ওঠে। এখন মুখখানা উত্তেজনা ও ভয়ে অস্বাভাবিক রকম পাণ্ডুর দেখাইতেছে, চাউনি দেখিলেই টের পাওয়া যায় মানুষটা এখন বিহ্বল।

বিপিনের অনুযোগের জবাবে সেও অনেকবার বলিয়াছে, 'কি করব বলুন, এমন একগুঁয়ে বলবার নয়। সব ব্যবস্থা আমিই ঠিক করে ফেলেছিলাম, ওর জন্যেই সব ভেস্তে গেল। শেষ মুহূর্ত্তে কোথায় যাই, তাই এখানে ছুটে এলাম।'

বিপিন তখন আশ্বাস দিয়া বলিয়াছে, 'যাক্ যাক্, কি আর হবে, ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

মাধবীলতাকে শান্ত করিতে বেশী সময় লাগিল না, ছোট ঘরখানায় চৌকীর উপর বিছন ময়ূরআঁকা মাদুরে সে গুম্ খাইয়া বসিয়া রহিল। রাজপুত্র নারায়ণ তখন পূবের ঘরে আসিয়া সদানন্দকে প্রণাম করিল। সদানন্দ কোনদিন কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করেন না, বিড়বিড় করিয়া মুখে একটা আওয়াজ করেন মাত্র। আজ তাও করিলেন না।

ঘরের আলোটা সদানন্দ কমাইয়া দিয়াছিলেন, বিপিন বাড়াইয়া দিল। দেখা গেল, নারায়ণের মুখের পাংশু বিবর্ণভাবটা বড় বেশী রকম স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সদানন্দকে সে কোনদিনই বিশেষ খাতির করে না, ভয় ভক্তি করার দরকারও কোনদিন বোধ করে নাই। আজ তার সবটুকু তেজ আর বেপরোয়াভাব উবিয়া গিয়াছে।

বিপিন নিবেদন করিল, 'রাজাসাহেব আসেননি প্রভু। নারাণবাবু একটি নিরাশ্রয় মেয়েকে আশ্রমে ভর্ত্তি করে দিতে এনেছেন। মেয়েটির কেউ নেই প্রভু।'

'থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। আর তোমরা যাও বিপিন।'

'আসনে বসবেন প্রভু?'

'যেতে বললাম যাও না বিপিন, আমায় একটু একা থাকতে দাও।'

বিপিনের মুখ দেখিয়া রাগ বোঝা যায় না, কেবল তার কপালে কয়েকটা রেখার সৃষ্টি হয় আর চোখের পলক পড়া অনিয়মিত হইয়া যায়। নারায়ণকে সঙ্গে করিয়া বিপিন ঘর হইতে চলিয়া গেল। ঘণ্টা দুই পরে সে যখন আবার ঘরে আসিল, সদানন্দ ঘুমের ভাণ করিয়া খটের উপর গদির বিছানায় পড়িয়া আছেন। গায়ে ঠেলা দিয়াও তার ঘুম ভাঙ্গাইতে না পারিয়া চাপা গলায় তাকে একটা কুৎসিত গাল দিয়া বিপিন চলিয়া গেল। সদানন্দের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, সেবার ব্যবস্থাটাও আজ একটু বিশেষ রকমের হইয়াছে, কাছাকাছি একটা গ্রাম হইতে মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে কে যেন আজ নানারকম সুখাদ্য পাঠাইয়া দিয়াছে আশ্রমে। বিপিনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভয়ে না খাইয়াই আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে সদানন্দ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ঘুম ভাঙ্গিল খুব ভোরে, ভাল করিয়া তখনও চারিদিক আলো হয় নাই। পাশ না ফিরিয়াই বোঝা গেল কে যেন পিঠের সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে। মশারি ফেলিতে সদানন্দের মনে ছিল না, কে যেন মশারি ফেলিয়া সযত্নে গুঁজিয়া দিয়াছে। উঠিয়া বসিয়া সদানন্দ এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। মাধবী-লতার শুইবার ভঙ্গিটি মনোরম নয়, তাছাড়া তার নিজের দেহের উপর মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত তার নিজেরই ছটফটানির ঝড় বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু এদিকে সদানন্দও প্রায় একযুগ হইল সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া পিঠের সঙ্গে মেশা কুণ্ডলীপাকানো পুঁটুলীর মত নারীদেহ চাহিয়া দেখেন নাই। হঠাৎ চোখ ফিরাইতে পারিলেন না।

তাছাড়া বিপিন যে মাধবীলতাকে আশ্রমে আনিয়াছে এ অপমানের জ্বালা আছে, প্রতিকার নাই, প্রতিকারহীন অপমানের আছে শুধু প্রতিশোধের কামনা। বিপিন যে কতদূর ছোটলোক এই চিন্তার ছেদ দিয়া দিয়া ছাড়া ছাড়া ভাবে সদানন্দ ভাবিতে থাকেন, আহা, মেঘলা ভোরে মেয়েটি শীতে কেমন জড়সড় হইয়া গিয়াছে ছাখো। গরমে নিজের দেহ যে ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে এটা সদানন্দের খেয়ালও হয় না। শীতের জন্যই মাধবীলতার এমন অদ্ভুত শোয়ার ভঙ্গি, এই অকাট্য যুক্তির কাছে গরমের অনুভূতি হার মানে। এইভাবে মাধবীলতাকে দেখিতে দেখিতে মনের আকাশ-পাতাল আলো-অন্ধকার কি ভাবে

যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হইয়া কোথায় মিলাইয়া গেল, অতীত হইতে ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত হওয়ার বদলে সময় বর্ত্তমানকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে আবর্ত্ত রচনা করিতে লাগিল, মনটা বিদ্রোহ করিয়া বসিল সদানন্দের, একবার চাহিলেন রুদ্ধ দরজার দিকে, একবার চাহিলেন জানালা দিয়া খানিক তফাতে রাধাই নদীর দিকে, তারপরে দুহাত বাড়াইয়া পুতুলের মত মাধবীলতাকে তুলিয়া লইলেন বুকে।

তখন অবশ্য মাধবীলতার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না। পুতুলটি যেন অন্য কেউ এমনিভাবে কৌতূহলী চোখ মেলিয়া মহাপুরুষ নামে বিখ্যাত প্রৌঢ়বয়সী দৈত্যটির পুতুল খেলার মুখভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

৫।ঘ

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

গতবারের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্মের উচ্চচূড়ায় আরোহণ করিতে হইলে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিতে হয়।

ধর্মের প্রথম সোপান বহুদেবের উপাসনা,—দ্বিতীয় সোপান সকাম ঈশ্বরোপাসনা—তৃতীয় সোপান নিষ্কাম ঈশ্বরোপাসনা (বা বৈষ্ণবধর্ম) অথবা জ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা। ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা।—কৃষ্ণচরিত্র

দেবোপাসনারও সোপান-পরম্পরা আছে। ঐ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছিলেন—

ধর্মের প্রথম সোপান, "শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক্ সামগ্রী" এই বোধ। "জড়ে চৈতন্য-আরোপ" ধর্মের দ্বিতীয় সোপান। এই সকল মহাশক্তিযুক্ত মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদক পদার্থ যদি চৈতন্য-বিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশীভূত, ইহা আদিম মানুষ মনে করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্বত্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সর্বনাশ হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্মের তৃতীয় সোপান।

বঙ্কিমচন্দ্র বহু দেবের উপাসনাকে ধর্মের প্রথম সোপান বলিলেন। এ কথা ঠিক্—কিন্তু দেবতা কি? দেবতত্ত্ব লইয়া প্রচুর মতভেদ আছে। দেব দেবীর কি মানুষের মত স্বতন্ত্র স্বাধীন অস্তিত্ব আছে অথবা তাঁহারা ভগবানের গুণ বা বিভুতির সাকার প্রতীক মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' দেবতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে পায় নাই।

সম্প্রতি সুসাহিত্যিক শ্রীসজনীকান্ত দাস 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম' ইতি শীর্ষক যে অভিভাষণ শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসবে পাঠ করেন তাহাতে তিনি 'হিন্দুধর্ম ও দেবতত্ত্ব' নামক বঙ্কিমচন্দ্রের এক অসম্পূর্ণ অপ্রকাশিত

গ্রন্থের সন্ধান দিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। সজনী বাবুর অভিভাষণে প্রকাশ ঐ গ্রন্থ মোট ১৭ অধ্যায়ে বিভক্ত।

বিভাগগুলি এইরূপ ;—১। হিন্দুধর্ম, ২ ও ৩। বেদ, ৪। বেদের দেবতা, ৫। ইন্দ্র, ৬। কোন পথে যাইতেছি, ৭। বরুণাদি, ৮। সবিতা ও গায়ত্রী, ৯। বৈদিক দেবতা, ১০। দেবতত্ত্ব, ১১। দ্যাবা-পৃথিবী, ১২। চৈতন্যবাদ, ১৩। উপাসনা, ১৪। হিন্দু কি জড়োপাসক? ১৫। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা, ১৬। বেদের ঈশ্বরবাদ, ১৭। হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই।

সজনী বাবুর পরিচয়ে জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্র ঐ অপ্রকাশিত গ্রন্থে অগ্নি প্রভৃতি বেদোক্ত তেত্রিশ জন দেবতা লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন এবং তেত্রিশ কিরূপে তেত্রিশ কোটি হইল তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে হিন্দুর বৈদিকতত্ত্ব ত্রিবিধ (১) দেবতাতত্ত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ত্ব, ও (৩) আত্মতত্ত্ব। দেবতাতত্ত্ব প্রধানতঃ সংহিতায়; আত্মতত্ত্ব উপনিষদে; ঈশ্বর তত্ত্ব উভয়ে।

ঐ অপ্রকাশিত গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

বৈদিক ধর্মের তিন অবস্থা—(১) প্রথম, দেবোপাসনা অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য-আরোপ এবং তাহার উপাসনা (২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা (৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বৈদিক ধর্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপে বিরাজমান। এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ধর্ম, এবং ধর্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা—ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়।

ধর্মতত্ত্বে ও কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এ সকল কথার সম্প্রসারণ করিয়াছেন এবং দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার যাহা বক্তব্য তাহারও বিবৃতি দিয়াছেন।

দেবতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত বুঝিতে হইলে তাঁহার পূর্ববর্তীগণের মতামত জানা আবশ্যক। রাজা রামমোহন রায়ের মতে, দেবতারা 'are allegorical representations of the attributes of the Supreme

Being', অর্থাৎ ঈশ্বরের গুণাবলীর রূপক-নেপথ্য*। স্বামী দয়ানন্দ বলিতেন, ইন্দ্র অগ্নি বরুণ সোম প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা একেশ্বর পরমেশ্বরেরই নামান্তর মাত্র—'So many forms of speech to indicate the One Reality —these names denote Iswara in His various aspects'। অধ্যাপক মোক্ষমূলারের মতে দেবতারা প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের কল্পিত ব্যক্তিত্বারোপ মাত্র—

Personifications of the powers of Nature, manifesting in physical and atmospheric phenomena. †

বঙ্কিমযুগে এই মতই শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত ছিল এবং দেখা যায় মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্র এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন।

সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অভিন্নশরীর গৌরদাস বাবাজির প্রমুখাৎ আমরা শুনিতে পাই—

ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা নাই। যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই যেমন পালন করেন ও ধ্বংস করেন, তিনিই আবার বৃষ্টি করেন, তিনিই দাহ করেন, তিনিই ঝড়-বাতাস করেন, তিনিই আলো করেন, তিনিই অন্ধকার করেন। যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই সর্ব দেবতা। তবে যেমন আমাদের বুঝিবার সৌকর্যার্থ, এক জলকে কোথাও নদী বলি, কোথাও সমুদ্র বলি, কোথাও বলি বিল, কোথাও পুকুর বলি, কোথাও ডোবা বলি, কোথাও গোষ্পদ বলি,—তেমনি উপাসনার জন্য কখন ইন্দ্র, কখন অগ্নি, কখন ব্রহ্মা, কখন তাঁহাকে বিষ্ণু ইত্যাদি নানা নাম দিই।

বাবাজি আরও বলিতেছেন :—

যাঁহাদের আমরা দেবতা বলি, তাঁহারা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ

* The Veda having, in the first instance, personified all the powers and attributes of the Deity and also the celestial bodies and natural elements, does, in conformity with this idea of personification, treat of them in the subsequent passages, as if they were real beings, ascribing to them birth, animation, senses and accidents as well as liability to annihilation.

† 'He (the Vedic Aryan) gives names to all the powers of Nature, and after he has called the fire—Agni, the sun-light—Indra, the storms—Maruts, the dawn—Ushas, they all seemed to grow naturally into beings like himself. He invokes them, he praises them, he worships them.

নির্বাহ করেন। সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি, তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন; বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ু-দেবতা, পবন-শক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহারশক্তির নাম রুদ্রাণী।

দেবতা কি শরীরী না অশরীরী? বঙ্কিমচন্দ্র বলেন অশরীরী। প্রশ্ন উঠিবে—যদি অশরীরী—তবে মূর্তি গড়িয়া তাঁহার উপাসনা কেন? উত্তরে বাবাজি ওরফে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

উপাসনার জন্য উপাস্যের স্বরূপ চিন্তা চাই, নহিলে মনোনিবেশ হয় না। ধর রুদ্রদেবতা—নিরাকার বিশ্বব্যাপী রুদ্রের স্বরূপ চিন্তা করিবে কিরূপে? যে জ্ঞানী ধ্যানী সে হয় ত' পারে। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই—সে কি উপাসনা হইতে বিরত থাকিবে? তাহা উচিত নয়। যাহার জ্ঞান নাই, সে যেরূপে রুদ্রকে চিন্তা করিতে পারে সেরূপ করিয়া উপাসনা করিবে। এ সব স্থলে রূপ কল্পনা করিয়া চিন্তা করা সহজ। * * নচেৎ রুদ্রের কোন রূপ নাই।

যদি প্রশ্ন কর—রুদ্রের শক্তি ত' রুদ্রেই আছে, তবে শিব দুর্গা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গড়িয়া পূজা করি কেন? বাবাজি উত্তরে বলেন—

তোমাকে ভাবিলেই তোমার শক্তি জানিলাম না। অগ্নিতে যে কখন হাত দেয় নাই, সে অগ্নি দেখিলেই বুঝিতে পারে না যে, অগ্নিতে হাত পুড়িয়া যাইবে। পাঁজা পুড়িতেছে দেখিয়া যে আর কখন অগ্নি দেখে নাই, সে বুঝিতে পারে না যে আগুণের আলো করিবার শক্তি আছে। অতএব শক্তি এবং শক্তির আলোচনা পৃথক্ করিয়া না করিলে শক্তিকে বুঝিতে পারিবে না। রুদ্রও নিরাকার, রুদ্রের শক্তিও নিরাকার। যে অজ্ঞান এবং নিরাকারের স্বরূপ চিন্তায় অক্ষম, তাহাকে উপাসনার্থ উভয়েরই রূপ কল্পনা করিতে হয়।

'কৃষ্ণচরিত্রে' কৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞ নিষেধ ও গিরিযজ্ঞ প্রচার-প্রসঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই বলিয়াছেন ঃ—

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্রশব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করেন কে? যিনি সর্বকর্তা, সর্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,—বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত-প্রকৃতি, তাঁহার গুণসকল অনন্ত, কার্য অনন্ত, শক্তিসকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে। এরূপ শক্তিসকলের বিকাশ-

স্থূল জড়জগতে বড় জাজ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎসাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এইজন্য প্রাচীন আর্যগণ তাঁহার জগৎ-প্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়া সূর্যে, সর্বাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার সর্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, এবং তদ্রূপে অন্যান্য জড়পদার্থে তাঁহার আরাধনা করিতেন। ইন্দ্রে এইরূপ তাঁহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন।

ঈশ্বর এক—এ কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি—এক এব মহেশ্বরঃ। তিনি শুধু এক নন—তিনি অ-দ্বিতীয়, কেবল Unit নন, Unique—একমেবা-দ্বিতীয়ং। কিন্তু মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে যে বিরাট্ ব্যবধান, সেই অন্তরাল যে জনশূন্য (untenanted, empty of living beings)—এরূপ মনে করিবার কি সঙ্গত যুক্তি আছে।* বরং অধ্যাপক হাক্স্লির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলা উচিত—'Without stepping beyond the analogy of that which is known, it is easy to people the cosmos with entities in ascending scale, until we reach something practically indistinguishable from omnipotence, omnipresence and omniscience—(Essays upon Some Controverted Questions, page 36). এই সকল 'Entities in ascending scales'-ই আমাদের পরিচিত দেব-দেবী, খৃষ্টানের Angels, Arch-angels, পারসিকের ফেরেস্তা ইত্যাদি।

*এ প্রসঙ্গে Bulwer Lytton-এর একটি উক্তি আমাদের প্রণিধানযোগ্য :—Reasoning then by evident analogy,—if not a leaf, if not a drop of water, but is, no less than yonder star, a habitable and breathing world * * common sense would suffice to teach that the circumfluent infinite which you call space—the boundless impalpable which divides earth from the moon and stars—is filled also with its correspondent and appropriate life. Is it not a visible absurdity to suppose that being is crowded upon every leaf and yet absent from the immensities of space ? * * The microscope shews you the creatures on the leaf ; no mechanical tube is yet invented to discover the nobler and more gifted things that hover in the illimitable air.

—Zanoni, Book IV. Chap IV

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। একথা খুব ঠিক। জগৎতত্ত্ব বুঝিতে হইলে বিশ্বের পশ্চাতে একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণের অনুসন্ধান করিতে হয়। ঐ কারণই বেদান্তের ব্রহ্ম, আস্তিকের ঈশ্বর, হার্বার্ট্ স্পেন্সরের "Inscrutable Power in Nature"। কিন্তু দেবদেবীর অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে বিশ্বের অনেক সমস্যার সমাধান করিতে পারা যায় না। ১৯০৬ সালে প্রকাশিত আমার 'Philosophy of the Gods—Deva-tatwa' নামক ইংরাজি গ্রন্থে আমি এ বিষয়ের যথোচিত আলোচনা করিয়াছি—এস্থলে ইঙ্গিত মাত্র করিলাম।

এ প্রসঙ্গে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইতে হইবে যে, দেবদেবী থাকিলেও তাঁহারা আমাদের উপাস্য হওয়া উচিত নয়—কারণ, গীতার কথায় বলি

দেবান্ দেবব্রতা যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি – ৭।২৩

এ সম্পর্কে আমার ঐ 'দেবতত্ত্ব'গ্রন্থে আমি এইরূপ লিখিয়াছি :—

Are we then to worship the Devas? By no means. Iswara, the Supreme Being, is the only true object of worship and if ignoring or losing sight of Him, our worship should be confined to the Devas, we shall miss attaining the highest good. Of course we may use the Devas as stepping stones in the path of spiritual progress and if unable, with our finite minds, to conceive or worship the Supreme God, we may step by step rise up to His height by the stair-way of these subordinate Gods.

উপাসনা ও উপাস্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে। পাঠক তাহা হইতে নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরই মূল ও মুখ্যতত্ত্ব। " 'গড' বলি, 'আল্লা' বলি, 'ব্রহ্ম' বলি—সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ, জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী—সেই বৈষ্ণব।" সেই জন্য 'বৈষ্ণব' গৌরদাস বাবাজি বলিতেছেন :—

"ভগবান্‌কে দুইভাবে চিন্তা করা যায়। যখন তাঁহাকে অব্যক্ত, অচিন্ত্য, নির্গুণ এবং

সর্বজগতের আধার বলিয়া চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম ব্রহ্ম, বা পরব্রহ্ম, বা পরমাত্মা। আর যখন তাঁহাকে ব্যক্ত, উপাস্য, সেইজন্য চিন্তনীয়, সগুণ এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্তা স্বরূপ চিন্তা করি, তখন তাঁহার নাম সাধারণ কথায় ঈশ্বর, বেদে প্রজাপতি, পুরাণেতিহাসে বিষ্ণু বা শিব। আর যখন এককালীন তাঁহার উভয়বিধ লক্ষণ চিন্তা করিতে পারি, অর্থাৎ যখন তিনি আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ স্বরূপে উদিত হন, তখন তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণ।"

এ জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের সোপান নির্দেশ করিতে বলিলেন—'ধর্মের চরম কৃষ্ণোপাসনা'।

আজ এই পর্যন্ত। ধর্মতত্ত্বের অন্যান্য কথা আগামীতে বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতপথে*

মিস ডেরেক জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার জন্যে কি আমরা কিছুই করতে পারি না ?"

"আমার তো মনে হয় না পারো, আর আমি ছাই নিজেও কিছু করতে পারি বোধ হচ্ছে না তো।"

"কিন্তু এরকম ভাবে কথা বলা তোমার একেবারে বারণ ; তুমি আশ্চর্য্য মেয়ে বটে।"

গদগদ হ'য়ে একসঙ্গে অনেকে ব'লে উঠল, "সত্যি !"

নতুন একটা প্রসঙ্গ তুলে মৃদু স্বরে রণি বলল, "আমার দাশকে কিন্তু বিশ্বাস করা চলে--সে ঠিক আছে।"

মেজর ক্যালেণ্ডার প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "বিশ্বাসযোগ্য ওদের একজনও নয়।"

"না, সত্যি, দাশ বিশ্বাসযোগ্য।"

"তার মানে তুমি বলতে চাও সেও আসামীকে সাজা দেবার চাইতে খালাস দিতে আরো ভয় পায় ; কেননা তাহলে ওর চাকরিটি যাবে"—একটু হেসে লেস্‌লি সাহেব এই উক্তি করলেন।

রণি অবশ্য ঠিক তা বলতে চায়নি। নিজের অধস্তন কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে ওর এমনি সব ধারণা ছিল যাদের বলা চলে 'রঙীন'—ওদের চাকরির এই ছিল একটা গৌরবের বিষয়। ঠিক বিলেতের 'পাবলিক স্কুল'-শিক্ষিত ছাত্রদের মতন সৎসাহস দাশেরও ছিল রণি চাচ্ছিল এই কথা বলতে। রণি বুঝিয়ে বলল যে একদিক থেকে দেখতে গেলে একজন ভারতবাসীর হাতে যে এই

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেইজন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলেই তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—পঃ সঃ

মোকদ্দমার বিচারভার পড়েছে তা ভালোই, কেননা, আসামীর সাজা হওয়া যখন অনিবার্য্য, তা ভারতবাসীর হাতে হওয়াই ভালো, তাহলে এই নিয়ে গণ্ডগোল হবে পরে কম। এই কথাটা ওকে এমন পেয়ে বসল যে ওর মন থেকে এডেলা প্রায় লোপ পেল।

মিসেস টার্টন চটেমটে বললেন, "লাটপত্নী লেডি মেলানবির কাছে যে আমি দরখাস্ত করেছিলাম যাতে এই মোকদ্দমার ভার পড়ে একজন ইংরেজের হাতে—আপনি তাহলে তার অনুমোদন করেন না। থাক্—ওর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না,—আমি তো ওরকম যা তা ক'রেই থাকি।"

"আমি তা' বলিনি…"

"আচ্ছা, বেশ। আমি শুধু বলছি যে কৈফিয়ৎটৈফিয়ৎ কিছু দিতে হবে না।"

ওঁকে খুসি করার জন্য লেসলি সাহেব বললেন, "ঐ শূয়োরগুলোর একটা কিছু অভিযোগ পেলেই হোলো।"

মেজর সাহেব সায় দিয়ে বললেন, "শূয়োরই বটে—আরো কি জানেন? তবে বলি, শুনুন। সত্যি কথা বলতে এই ব্যাপারটি যা ঘটেছে খুবই ভালো বলতে হবে—অবিশ্যি এর জন্যে আমাদের যে অনর্থ ভোগ হয়েছে তা বাদে। এবারে বাছারা চিঁচিঁ করবেন, আর ওঁদের চিঁচিঁ করাটা দরকার হয়ে পড়েছিল। যাহোক, হাঁসপাতালে ওদের প্রাণে ভয় ঢুকিয়েছি—ঈশ্বরের ভয়। আমাদের ঐ সেরা রাজভক্ত বলে যিনি খ্যাত, তাঁর নাতিমশায়ের অবস্থাটা একবার দেখবার মতন বটে।" এই ব'লে নুরুদ্দিন বেচারার বর্ত্তমান চেহারার বর্ণনা করতে করতে মেজর সাহেব পাষণ্ডের মতন খিলখিলিয়ে হেসে উঠলেন। "কি মুখশ্রীই না হয়েছে! উপরের পাঁচটি আর নিচের দুটি দাঁত ফাঁক, তার ওপর নাকের ডগাটিও লোপ পেয়েছে।…বুড়ো পান্নালাল কাল ওর সামনে আয়না এনে ধরতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কি ওর কান্না!…আমি তো হেসেই খুন, আপনারা থাকলে আপনাদেরও দম ফেটে হাসি পেত। ওতো ছিল ঐ কালা কাফ্রিদেরই একজন, এখন বিষিয়ে উঠেছে ওর সমস্ত শরীরটা—চুলোয় যাক্, মরুকগে—ছোকরা নিশ্চয় ভারি বদমাইস ছিল…।"

পাঁজরে গুঁতো খেয়ে মেজর সাহেব একটু থেমেই আবার বললেন, "আমার

ভূতপূর্ব্ব সহকারীটিকে যদি এরকম কাটাকুটি করতে পারতাম তো হোতো ভালো ; যাই বলো, এদের উপযুক্ত সাজা কিছুতেই হয় না।”

টার্টন-গিন্নি তাঁর কর্ত্তার মনে অস্বস্তি উৎপাদন ক'রে উৎসাহে ব'লে উঠলেন, “যাহোক, এতক্ষণে তবু একটু বুদ্ধিমানের মতন কথা শোনা গেল।”

“আমি তো তাই বলি, এরকম একটা ব্যাপারের পর কিছুতেই আর নিষ্ঠুরতা হতে পারে না।”

“যা বল্‌লেন, আর পুরুষদের বলি যে এই কথা যেন তাঁরা মনে রাখেন। পুরুষরা সব দুর্ব্বলচিত্ত। একজন ইংরেজ মেয়ে চোখে পড়ামাত্র এখান থেকে আরম্ভ ক'রে ঐসব গুহা পর্য্যন্ত ওরা হামাগুড়ি দিয়ে চলবে, কেউ ওদের সঙ্গে কথা বলবে না, সবাই ওদের গায়ে থুথু দেবে, একেবারে মাটির সঙ্গে ওদের গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে—উচিত হোলো তাই। তা না ক'রে আমরা ওদের কি আদরই না করেছি—ব্রিজপার্টি আর হ্যানো আর ত্যানো।”

এই ব'লে টার্টন-গিন্নি থামলেন। রাগের তাতে তিনি এমনি তেতে উঠেছিলেন যে তাঁর শরীর ঠাণ্ডা করার জন্যে এক গেলাস লেবুর সরবতের দরকার হোলো, তাতে চুমুক দেবার অবসরেও তিনি বলে চললেন, “দুর্ব্বল মন ওদের—অতি দুর্ব্বল।” মিস কেষ্টেডের এই ব্যাপারে এমনি সব বড় বড় সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, মিস্ কেষ্টেডের চাইতে তাদের গুরুত্ব এত বেশি যে সকলে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল তাঁর কথা।

একটু পরে মামলার তলব হোলো।

সাহেব মেমেদের আগে আগে গেল একসার চেয়ার, কেননা আদালতে তাঁদের উপযুক্ত কদর হওয়াটা ছিল এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়। চাপরাশিরা সব কিছু ঠিক ঠাক করার পর তাঁরা এম্‌নি নাক উঁচু ক'রে জরাজীর্ণ আদালত ঘরে ঢুকলেন যেন তাঁরা কোনো গ্রাম্য জেলার এক দোকান ঘরে ঢুকছেন। কালেক্টার সাহেব বসবার সময়ে হাকিমিচালে কি এক রসিকতা করাতে তাঁর দলবলের মুখে হাসি দেখা গেল। এদেশী লোক যারা ছিল কালেক্টার সাহেবের কথা তাদের কান পর্য্যন্ত পৌঁছায়নি, তারা ভাবল বুঝি নতুন একটা কিছু অত্যাচারের জল্পনা কল্পনা চলেছে, নইলে সাহেব মহলে অত হাসির ধুম কেন হবে।

আদালত ঘরে ছিল লোকে লোকারণ্য আর অবশ্য প্রচণ্ড গরম। এই ভিড়ের মধ্যে সব প্রথম এডেলার চোখে পড়ল যে লোকটি সব চাইতে দীন, এই মামলার সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগ তার ছিল না—তার কাজ শুধু পাখা টানা। ঘরের পিছন দিকে, মাঝামাঝি জায়গায়, উঁচু একটা মঞ্চের ওপর লোকটি ছিল ব'সে। সুষ্ঠু দেহ, পরণে কাপড় চোপড় প্রায় নাই বললেও হয়, ঘরে ঢুকতেই এডেলার দৃষ্টি পড়ল এই লোকটির ওপর, আর ওর মনে হোলো সব কিছুর পরিচালন-ভার রয়েছে এরই হাতে। এমন এক শক্তি আর শ্রী ছিল ওর দেহে, যা এদেশের খুব নিচু জাতের লোকের মধ্যেও কখনো কখনো মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে দেখা যায়। এই অদ্ভুত দেশের অধিবাসীরা যখন নামতে নামতে প্রায় মাটির কাছাকাছি পৌঁছায়, আর সবাই যখন তাদের আখ্যা দেয় অস্পৃশ্য, তখন স্রষ্টার মনে পড়ে যায় অন্যত্র দৈহিক সৌষ্ঠব কি সম্পূর্ণভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তখন তিনি সৃষ্টি করেন এমনি এক দেবতা—খুব বেশি নয়, এখানে সেখানে এক আধটি—সমাজকে শুধু এই কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে যে প্রচলিত শ্রেণীস্তরবিভাগের থোড়াই তোয়াক্কা তিনি রাখেন। এই লোকটির বৈশিষ্ট্য যে-কোনো জায়গায় চোখে পড়ত—চন্দ্রপুরের রোগা রোগা পা আর শীর্ণ বুকওয়ালা লোকেদের মাঝখানে ওকে মনে হচ্ছিল স্বর্গের দেবতা। কিন্তু তবু ও ছিল একেবারে সহুরে, সহরের আস্তাকুঁড়েই ও মানুষ, আর সহরের আবর্জ্জনাস্তূপের ওপরই ওর জীবনের হবে শেষ। পাখার দড়িটা একবার ও টানছে আর একবার ঢিলে দিচ্ছে। অমনি ঝলকে ঝলকে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে সবার ওপর দিয়ে; কিন্তু ওর নিজের গায়ে লাগছে না তার কণামাত্র—দেখলেই মনে হয় সবার থেকে ও আলাদা, এ যেন পুরুষের রূপে মূর্ত্ত দৈব, মানুষের আত্মা মন্থন করা যেন ওর ব্যবসা। ঠিক এর উলটো দিকে আর একটি মঞ্চের উপর বসেছিলেন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ছোটোখাটো দেহ, দেখলেই মনে হয় শিক্ষিত, নিজের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ আর বিবেকী। পাখাওয়ালার অবশ্য এসব বালাই ছিল না; ও যে একটা জীব এই জ্ঞানই ওর ছিল কিনা সন্দেহ, আর আজকের দিনে আদালত ঘরে যে কেন অন্যদিনের চাইতে বেশি লোক তাও ও অণুমাত্র বোঝেনি—বেশি লোক যে হয়েছে সে খেয়ালই বোধ হয় ওর হয়নি, এমনকি ওর টানে যে একটা পাখা চলছে তাও ও জানত না,

শুধু এইটুকু বুঝত যে ওর হাতের দড়িটা ও টানছে। এই পাখাটানা কুলির আত্মসমাহিত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে এমন কিছু ছিল যা মুগ্ধ করেছিল ইংল্যাণ্ড থেকে আগত মধ্যশ্রেণীভুক্ত ঐ মেয়েটিকে—ওর মনে মনে ধিক্কার হোলো নিজের কষ্টের সঙ্কীর্ণতার কথা ভেবে। কি গুণে ও এই ঘরশুদ্ধ লোক জড় করেছিল? ওর মতামত আর সহরতলীর যে দেবতা সেই মতামতের উপরে নিজের মাহাত্ম্যের ছাপ দিয়ে দিতেন—কি অধিকারে তাঁরা পৃথিবীতে এতখানি গুরুত্বের দাবী করতেন, কি অধিকারেই বা তাঁরা নিজেদের অভিহিত করতেন সভ্যতার আখ্যায়? মিসেস মূর—ও একবার চারিদিক তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু মিসেস মুর তখন বহুদূরে সমুদ্রে ভাসছেন—এদেশে আসার পথে, মিসেস মূর যখন ওরকম অদ্ভুত আর রুক্ষমেজাজ হয়ে ওঠেননি, তখন তাঁর সঙ্গে এই ধরণের কথা আলোচনা করা চলত।

মিসেস মূরের কথা ভাবতে ভাবতে এডেলার কানে এল একটা অস্পষ্ট আওয়াজ, ক্রমে তা স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। ঐ ঐতিহাসিক মোকদ্দমা ওদিকে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। পুলিশ-সাহেব ফরিয়াদির পক্ষের সওয়াল সুরু করেছিলেন।

মিষ্টার ম্যাকব্রাইডের লক্ষ্য ছিল যেমন তেমন ক'রে তাঁর বক্তব্য বলা—কানে শুনতে তা ভালো লাগুক চাই না লাগুক; বাগ্মিতা ফাগ্মিতার ধার তিনি ধারতেন না। ওসব রেখেছিলেন তিনি আসামী-পক্ষের জন্যে। ওসবের প্রয়োজন ওদেরই হবে। ওঁর ছিল ভাবটা মোটামুটি এই: 'লোকটা যে দোষী তা কে না জানে, তবে কিনা ওকে আন্দামানে পাঠানোর আগে আমাকে তা একবার সকলকে শুনিয়ে ব'লে দিতে হচ্ছে।' নীতিবোধের বা করুণরসের উদ্রেকের চেষ্টা ওঁর বিন্দুমাত্র ছিল না। ওঁর ধরণধারণে ছিল ভারি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব—আর একেবারে তা ইচ্ছাকৃত। ক্রমে তারা তা বুঝতে পারল, আর একদল তাতে গেল একেবারে ক্ষেপে। বন ভোজনের ইতিবৃত্ত উনি বলতে সুরু করলেন ইনিয়ে বিনিয়ে। গভর্ণমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এক পার্টি দেন, সেখানে আসামীর সঙ্গে মিস কেষ্টেডের প্রথম দেখা আর সেইখানেই নাকি তাঁর সম্বন্ধে আসামীর কু-অভিপ্রায়ের সূচনা। লোকটি অত্যন্ত অসচ্চরিত্র, গ্রেপ্তারের সময় ওর কাছে যে-সব কাগজপত্র পাওয়া গেছে তাতেই তার প্রমাণ,

তাছাড়া ওর সহকর্ম্মী ডাক্তার পান্নালাল এই সম্বন্ধে খবর দিতে পারবেন এবং স্বয়ং মেজর ক্যালেণ্ডারও নাকি স্বাক্ষ্য দেবেন।

—এতদূর ব'লে ম্যাকব্রাইড সাহেব একটু থামলেন। ওঁর আদৌ ইচ্ছা ছিল না এই মোকদ্দমার মধ্যে নোঙরা কোনো প্রসঙ্গের অবতারণা, কিন্তু কি করেন, ওঁর প্রিয় গবেষণার বিষয় ছিল, 'ওরিয়েণ্ট্যাল প্যাথলজি' অর্থাৎ প্রাচ্য দেশবাসীদের দেহমনের বিকৃতি, ভদ্রলোক কিছুতেই আর এই বিষয়ের আকর্ষণ সামলাতে পারলেন না। সুতরাং উনি চশমা খুললেন, কেননা চশমা না খুলে গভীর কোনো তত্ত্বের ব্যাখ্যা উনি করতে পারতেন না, এবং অতঃপর অত্যন্ত বিমর্ষ দৃষ্টিতে এদেশী শ্রোতৃবর্গের দিকে একবার তাকিয়ে মন্তব্য করলেন যে কালা আদমিদের কাছে সাদা চামড়ার আকর্ষণ খুব বেশি, কিন্তু এই আকর্ষণ শুধু একতরফা—এ নিয়ে কোনো ক্ষোভের বা নিন্দার কারণ নাই। কেননা এ হোলো নিছক বৈজ্ঞানিক তথ্য, যে-কোনো নিরপেক্ষ গবেষক এতে সায় দেবেন।

"ভদ্রমহিলার চেহারা ভদ্রলোকের চেয়ে অতটা কুৎসিত হ'লেও ?"

কে যে এই কথা বলল বোঝা গেল না, মনে হোলো ঘরের ছাদ থেকে এই প্রশ্ন এল।

এই প্রথম বিচারকার্য্যে বাধা পড়ল। ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবলেন তাঁর কর্ত্তব্য প্রশ্নকর্ত্তাকে তিরস্কার করা। হুকুম হোলো, "উসকো বাহার্ কর্ দেও।" অমনি এক কনষ্টেবল গিয়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটি লোককে ধ'রে আদালত থেকে বের ক'রে দিল—বলা বাহুল্য, খুব মোলায়েমভাবে নয়। ম্যাকব্রাইড সাহেব আবার চশমা এঁটে সওয়ালে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু এই মন্তব্যে মিস কেষ্টেডের মনে জাগল অশান্তি। বেচারির দেহ কাঁপছিল—'কুৎসিত', এই নিন্দার গ্লানিতে।

'এডেলা, তোমার কি অস্থির বোধ হচ্ছে'—মিস ডেরেক জিজ্ঞাসা করলেন। সস্নেহ ক্রোধের সঙ্গে তিনি মিস কেষ্টেডের পরিচর্য্যা করছিলেন।

"অস্থির ছাড়া স্থির তো কোনো সময়েই বোধ হয় না, ন্যান্সি। আমি ঠিক কাটিয়ে দেব—কিন্তু একেবারে অসহ্য !"

এই নিয়ে একটা কাণ্ড বাধল—তাকে এই মোকদ্দমার আদিকাণ্ড বলা যেতে

পারে। কেননা এমনতর কাণ্ড পরে আরো ঘটেছিল। এডেলার বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ঘিরে একটা জটলার সৃষ্টি করলেন আর মেজর ক্যালেণ্ডার উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন, "আমার রোগীর জন্যে এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা চাই। মঞ্চের উপর ওঁর জন্যে জায়গা নাই কেন? এখানে একটুও হাওয়া পাচ্ছেন না।"

মিষ্টার দাস একটু যেন বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লেন, "মিস কেষ্টেডের জন্যে এখানে একটা চেয়ারে জায়গা দিতে পারি—যেহেতু তাঁর শরীরের অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক নয়।"

চাপরাশিরা চেয়ার এনে হাজির করল—একটি নয়, অনেকগুলি। দলবল সব শুদ্ধ গিয়ে এডেলার সঙ্গে মঞ্চের উপর চেপে বসল। সাহেবদের মধ্যে শুধু ফিলডিং রইলেন নিচে হল-ঘরে।

টার্টন-গিন্নি বেশ ঠেসে ব'সে বললেন, "এবার ঠিক হয়েছে।"

মেজর সাহেব সায় দিয়ে মন্তব্য করলেন, "এরকম ব্যবস্থা হওয়ার খুবই দরকার ছিল—একাধিক কারণে।"

মনে মনে ম্যাজিষ্ট্রেট বুঝলেন তাঁর কর্ত্তব্য এই মন্তব্যকারীকে তিরস্কার করা, কিন্তু তাঁর সাহসে কুলোল না।

ক্যালেণ্ডার ম্যাজিষ্ট্রেটের মনের ভাব ধরতে পেরে উচ্চকণ্ঠে হাকিমি চালে আদেশ করলেন, "ঠিক হচ্ছে, ম্যাকব্রাইড, তুমি আবার তোমার বক্তব্য সুরু করো। একটু বাধা দিতে হয়েছিল—কিছু মনে কোরো না।"

পুলিশ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা ঠিক আছ তো?"

"আমাদের একরকম চ'লে যাচ্ছে—ভাবনা নাই।"

কালেকটার সাহেব পিঠ-চাপড়ানো সুরে বললেন, "মিষ্টার দাশ, আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যান,—আমরা তো আর আপনাকে বাধা দিতে আসিনি।" সত্যি কথা বলতে ওঁরা বাধা দিতে তত আসেননি, যত এসেছিলেন মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করতে।

ফরিয়াদি পক্ষের সওয়ালের সময় মিস্ কেষ্টেড আদালত-ঘরের চারিদিক তাকিয়ে দেখছিলেন—প্রথমটা একটু ভয়ে ভয়ে, যেন চোখ ধেঁধে যেতে পারে এই আশঙ্কা ছিল। পাখা টানবার লোকটির ডাইনে আর বাঁয়ে আধ-চেনা অনেক মুখ ওঁর চোখে পড়ল। ভারতবর্ষ দেখার ওঁর মূঢ় প্রয়াসের ভগ্নস্তূপ ওঁর

আসনের নিচে হয়েছিল জড়—ব্রিজ পার্টিতে যাদের সঙ্গে দেখা তারা, যে-ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী গাড়ি পাঠাননি, যে-বৃদ্ধ গাড়ি দেবার জন্যে উৎসুক ছিলেন, বহু চাকর, গ্রামের লোক, কর্ম্মচারীর দল আর স্বয়ং আসামী। লোকটি কাছেই ছিল ব'সে—ছোটখাটো বলিষ্ঠ ছিপছিপে চেহারা, কালো চুল, আর সুকোমল হাত। দেখে ওঁর মনে বিশেষ কোনো ভাব হোলো না। ওঁদের শেষ দেখার পর লোকটি ওঁর কাছে হ'য়ে উঠেছিল একেবারে সয়তানির অবতার। কিন্তু এখন মনে হোলো ঠিক বরাবরকার মতন—অল্প পরিচিত একটি লোকমাত্র। বিশেষত্ববর্জ্জিত যৎসামান্য লোক, হাড়ের মতন খটখটে, আর যদিও অপরাধী তবু দেখলে মনে হয় না যে পাপের আবহাওয়া ওকে ঘিরে রয়েছে। "লোকটা অপরাধীই হবে—কিন্তু আমার কি ভুল হতে পারে?" এডেলার মনে এই প্রশ্ন জাগল। কিন্তু এ কথা ও অনুভব করত শুধু বুদ্ধি দিয়ে, মিসেস্ মূর চ'লে যাবার পর থেকে এই কথা ওর বিবেককে আর বিচলিত করেনি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

দেশ-বিদেশ

মিষ্টার চেম্বারলেনের রাজধানী-পরিভ্রমণ-নীতি ইয়োরোপের অন্তরাষ্ট্রিক অবস্থার কতটা উন্নতিসাধন করেছে তার বিচার সময়সাপেক্ষ। কিন্তু আপাততঃ এ-কথা বোধহয় স্বীকার্য্য যে তাঁর মুসোলিনি-সম্ভাষণের ফল বর্ত্তমান অসন্তোষজনক পরিস্থিতির লক্ষণগুলিকে আরও পরিস্ফুট করে দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করেনি। শান্তিস্থাপন ত দূরের কথা, ইয়োরোপ এখন ক্রমশঃই দু'টি বিরোধী দলে আকৃষ্ট হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। স্পেনকে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স ফ্যাশিজমের অনমনীয় অভিসন্ধির যূপকাষ্ঠে বলিদান দিয়েছে। মুসোলিনি বলেছেন যে ফ্রাঙ্কোকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই স্পেন সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত দাবী দাওয়া চুকে যাবে, এবং ভূমধ্যসাগরের বর্ত্তমান ব্যবস্থা অটুট থাকবে। অতএব মিষ্টার চেম্বারলেন মুসোলিনিকে ছাড়পত্র দিয়েছেন যে স্পেন সম্পর্কে ফ্যাশিষ্ট বিশ্বাসহনন বা নৃশংসতা নিরুদ্বেগে অব্যাহত ভাবে চলতে পারে। বার্সেলোনা-পতন নিরীহ জনতার রক্তে অভিষিক্ত হয়নি বলে, কোন নরমেধযজ্ঞের বীভৎস বর্ব্বরতায় ফ্যাশিজমের বিজয় অনুষ্ঠিত হয়নি বলে চেম্বারলেন ব্রিটিশ নির-পেক্ষতা নীতির সাফল্যে গৌরবান্বিত বোধ করছেন। যুদ্ধের নৃশংস দুর্নীতির বা যুদ্ধের ধ্বংসলীলার বীভৎসতা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত বিবেক ও মানুষিকতার কোন স্থান পররাষ্ট্রনীতিতে নেই। কিন্তু এরকম জঘন্য মূল্য দিয়েও ইঙ্গ-ফ্যাশিষ্ট মৈত্রী কতটা অগ্রসর হল? মুসোলিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন যে ফ্যাশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি নির্দ্ধারিত হবে রোম-বার্লিন চক্রের দ্বারা। তার উত্তরে চেম্বার-লেন বলেছেন যে ইংলণ্ড ফ্রান্সের দিকে। ইঙ্গ-ইতালীয় মৈত্রী এর বেশী আর অগ্রসর হয়নি। যদি চেম্বারলেন-নীতির সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তাহলে ফ্যাশিজমের বিরাট ক্ষুধার মুখে সর্ব্বস্ব ধরে দিয়ে নির্ব্বিরোধিতা কিনতে হয়। তারও একটা স্বার্থকতা থাকত যদি তাতে একটা চিরস্থায়ী শান্তির বন্দোবস্ত হ'ত। কিন্তু ফ্যাশিজম্ শান্তি নয়। এবং যে কোন সভ্য দেশের পলিসি সংস্কৃতি ও সভ্যতার সম্বন্ধে উদাসীন সে দেশের অস্তিত্বেরই কোন অর্থ নেই।

অতএব যুক্তিবিচারে বর্ত্তমান ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি অসিদ্ধ। চেম্বালেনের সমস্ত উক্তিই হল শূন্যগর্ভ এবং নিছক কথার বাঁধুনি।

ইংলণ্ডের এই অর্থহীন ও মেরুদণ্ডহীন পলিসির সাহায্য নিয়ে হিটলার ক্রমশঃই সারাটা মধ্য ইয়োরোপকে রোম-বার্লিন গণ্ডির অন্তর্ভুক্ত করছেন। ম্যুনিকে চেম্বারলেন যার সূচনা করেছিলেন তারই অপ্রতিহত বিকাশ হচ্ছে। সারা ইয়োরোপ জার্ম্মান অভিসন্ধির ভয়ে তটস্থ হয়ে রয়েছে। সুইটসারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় মন দিয়েছে। সমস্ত দেশেই যুদ্ধের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। চেম্বারলেনের আন্তরিক বা কপট বিশ্বাস সত্ত্বেও হিটলার এবং মুসোলিনি যুদ্ধের পথেই চলেছেন। তাঁরা পরস্পরকে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উপনিবেশ লাভে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত। নাৎসি রাষ্ট্রের ষষ্ঠতম জন্মদিন উপলক্ষে হিটলার যে বক্তৃতা করেছেন তার নরম সুর অনেকের মনেই কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু বস্তুত আশার বাণী হিটলার কিছুই দেননি। জার্ম্মানির আভ্যন্তরিক অবস্থা সঙ্কটাপন্ন এবং জার্ম্মান জনসাধারণ শান্তিপ্রিয় ও যুদ্ধবিরোধী। হিটলারের 'যুদ্ধং দেহি' গর্জ্জন এবং অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি জার্ম্মানরা আর খুসী মনে বরদাস্ত করছে না। হিটলারকে তাই তাঁর বক্তৃতাতে স্পষ্ট করে শান্তির কথা বলতে হয়েছে। কিন্তু জার্ম্মানি এবং ইটালী উভয়েরই অর্থনৈতিক অবস্থা এত অসামাল হয়ে পড়ছে যে ডিরেক্টরদ্বয় শীঘ্রই যুদ্ধের চরম ঝুঁকি নিতে বাধ্য হবেন। উপনিবেশ লাভের জন্য নূতন করে জার্ম্মানিকে 'উপনিবেশ চেতন' করার বিপুল আয়োজন চলেছে। ইতালীকে সশস্ত্র সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি আবার ঘোষণা করা হয়েছে। ইতালীকে সাহায্য করার নামে যদি জার্ম্মানি বলের দ্বারা উপনিবেশ লাভের এবং নূতন দেশ জয়ের চেষ্টা করে তাতে হিটলারের প্রকাশিত নীতির বিরুদ্ধে যাওয়া হবে না। সবই হিটলারের বাক্যবিন্যাশের কৌশল। নাৎসিজম্ আন্তর্জ্জাতিক নীতিধর্ম্মকে কূট বাক্যবিন্যাসের কোঠায় পর্য্যবসিত করেছে। হিটলার যে দীর্ঘকালব্যাপী শান্তির আশ্বাস দিয়েছেন তা যেমনি ভুয়ো তেমনি ভীতিপ্রদ।

ফ্যাশিষ্টদের নিজেদের মধ্যে যে অন্তরের মিল আছে তা নয়। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাদের একই স্বার্থ হওয়াতে তাদের মৈত্রী সংস্থাপিত হয়েছে। একটা আপাতদৃশ্য মিলের সুযোগ নিয়ে হিটলার এবং মুসোলিনি 'bluff, bayonet

and blackmail' নীতি অনুসরণ করে গণতন্ত্রগুলির কাছ থেকে নিজেদের দাবী পূরণের প্রয়াস করেছেন ও করছেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এ অবধি এই ভীতি প্রদর্শনের ফলে যতদূর সম্ভব মুখ বাঁচিয়ে ফ্যাশিজমের উদরপূরণ করেছে। এইটা প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্যই চেম্বারলেন অত জোর গলায় নিজের শান্তিসংরক্ষণ কীর্ত্তি জাহির করছেন। ফ্যাশিজম্ গণতন্ত্রীদের কাছ থেকে আরও 'স্বার্থত্যাগ' প্রত্যাশা করে। চেম্বারলেন এবং দালাদিয়ে যদি আরও 'স্বার্থত্যাগ' করতে না সমর্থ হন তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য্য। মুসোলিনি এবং হিটলার এই ব'লে চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছেন।

এধারে মার্কিনদেশ ক্রমশঃই নিরপেক্ষতা ছেড়ে ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং মার্কিন-জার্ম্মান সম্বন্ধ শত্রুতায় পরিণত হচ্ছে। কিন্তু শান্তি-রক্ষকদের মুস্কিল হয়েছে যে তাঁরা ইয়োরোপে ফ্যাশিজমের পরাজয় এবং পতন সঙ্ঘটনে রাজি নন। যদি সোভিয়েট রাষ্ট্রকে বিধ্বস্ত করার প্রশ্ন হত তা'হলে দ্বিধার কোন কারণই থাকত না। বস্তুতঃ কম্যুনিজমকে বিধ্বস্ত করার জন্যই ইংলণ্ড ফ্যাশিজমের সঙ্গে মিতালি করেছে। কিন্তু ফ্যাশিজমের সঙ্গে মৈত্রী সংস্থাপনে যে ইংলণ্ডের শেষ অবধি ক্ষতিই হবে তা উপলব্ধি করার মত দূরদৃষ্টি মিষ্টার চেম্বারলেনের নেই এবং সেইজন্য ইংলণ্ড কেবল প্রাত্যহিক কাজ চলা গোছ পলিসি অনুসরণ করে চলেছে, তাও স্পষ্টভাবে নয়। মোট কথা চেম্বারলেন ও তাঁর সাকরেদদের চরম সিদ্ধান্ত করার দায়িত্ব নেবার মত সাহস নেই। তাই ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য হল দ্বিধা এবং সঙ্কোচ।

ফ্রান্সের পররাষ্ট্রনীতি যে খুব প্রশংসনীয় তা নয়। তবে ফ্রান্সের অবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুণ তাকে বোধহয় খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না। ফ্রান্স শত্রুপরিবৃত এবং ইংলণ্ডের সাহায্যই তার একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়। তাই ইংলণ্ডের অনুসরণ করতে ফ্রান্সকে বাধ্য হতে হয়। ফ্রান্স সর্ব্বদাই জার্ম্মান-বিভীষিকায় ভীত। ভীত হবার যথেষ্ট কারণও আছে। ফ্রান্স তাই পূর্ব্ব ইয়োরোপের সঙ্গে সমস্ত মৈত্রীর বন্ধন ছিন্ন করেছে, এই আশায় যে জার্ম্মানি পূর্ব্বদিকে অপ্রতিহত আত্মপ্রসারের সুযোগ পেয়ে পশ্চিম ইয়োরোপকে শান্তি দেবে। যাই হোক, এই ভ্রান্ত নীতির জন্য প্রধানতঃ ইংলণ্ডই দায়ী। জার্ম্মানি এবং ইটালী বোধহয় দু'জনকেই বাজিমাৎ করেছে।

রাষ্ট্রপতিত্বে সুভাষবাবুর পুনর্নির্ব্বাচন বামমার্গের বিজয় বলে ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে "বাম মার্গ" ও "দক্ষিণ মার্গ" শব্দের কোন সার্থকতা এখন নেই। বাম মার্গ বলে কোন দল এখনও পরিণতবয়স্ক হয়নি। রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের আসল অর্থ ধরতে হবে বর্ত্তমান ওয়ার্কিং কমিটিতে প্রতিনিধিদের অনাস্থা প্রকাশ। বল্লভজি প্রমুখ নেতারা প্রচার করেছেন যে ফেডারেশানের প্রশ্ন রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বের আসল কারণ হতে পারে না। কিন্তু নির্ব্বাচনের ফলে বোঝা যাচ্ছে যে কংগ্রেসের জনসাধারণের অধিকাংশের ভয় ছিল যে উক্ত নেতারা ফেডেরেশান সম্বন্ধে মিটমাট করবেন। যাই হোক, সুভাষবাবুর এমন কিছু সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ হয়নি যাতে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে যে ফেডেরেশান সম্বন্ধে কংগ্রেস কোন অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করবে। কিন্তু পাছে তথাকথিত দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণে বামপন্থীদের পলিসি কার্য্যকরী হবার সুযোগ না পায় এবং তার ভ্রান্তি ও অসারত্ব না প্রকাশ করে, তাই গান্ধীজী নিজের পরাজয় স্বীকার করে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করতে মানা করেছেন। গান্ধীজী যদি তাঁর মতবিরুদ্ধ কোন জিনিষের অসারতা প্রকাশ করতে চান তিনি ঠিক এই উপায়ই অবলম্বন করেন। কংগ্রেসের সকলেই যে ফেডেরেশান-বিরোধী এ কথা সত্য কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের বিরুদ্ধতায় লঘু-গুরুত্বের প্রশ্ন আছে। জনসাধারণের পক্ষে এইটাই আশ্বস্তকর যে সকলেই বলছেন যে কংগ্রেসে দলবিভক্তি হয়নি এবং কংগ্রেসের সরকারী প্রোগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ কেউ করবে না। কারণ আগামী বৎসর আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। ব্রিটিশ সরকার ফেডেরেশান প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সমস্ত আয়োজনই করছে এবং বড় লাটসাহেব স্বয়ং দক্ষিণের দেশীয় রাজ্যসমূহে সফরে বেরিয়েছিলেন। আসন্ন সঙ্ঘর্ষের ফলাফলের উপর আমাদের অব্যবহিত ভবিষ্যতের ইতিহাস নির্ভর করছে।

সুভাষবাবুর নির্ব্বাচনের ফল আমাদের অন্যতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটির উপর কেমন হবে তাও চিন্তনীয় বিষয়। জিন্না সাহেব ও সুভাষবাবুর কথাবার্ত্তায় সাম্প্রদায়িক ব্যাপারের কোন সমাধানই গতবারে হয়নি। অবশ্য তার জন্য সুভাষবাবুকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যায় না। কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির নির্দ্দেশেই কথাবার্ত্তা চলেছিল। নূতন কার্য্যকরী সমিতি হলেও এ বিষয় কতটা

সাফল্য আসবে তা সন্দেহজনক। মুসলিম লীগের সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও কংগ্রেস মুসলিম জনতার উপর ক্রমশঃই পক্ষ বিস্তার করতে সমর্থ হচ্ছে এবং মধ্য শ্রেণীর নিকটও কিছু কিছু সাহায্য পাচ্ছে। অতএব তথাকথিত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব কংগ্রেসের তেমন কোন ক্ষতি করতে পারছে না। কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম জনতার সংস্রব ত্যাগ করার কথা অচিন্তনীয়। এবং সেই দাবী ভিত্তি করে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ দূর করার চেষ্টা কখন মীমাংসার দিকে যাবে না। যাই হোক ফেডেরেশান সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই।

দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব এবং সর্দ্দার বল্লভভাই পাটেল যে আপোষ স্থাপন করেছিলেন রাজকোটের কর্ত্তৃপক্ষেরা তার ফলাফলের সম্ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করে এখন তার নূতন ব্যাখ্যা দিতে চান। মহাত্মাজী এর জন্য রাজকোটের ইংরাজ প্রধান মন্ত্রিকে দায়ী করছেন। ভারত সরকারও এই দ্বন্দ্বে যোগদান করেছেন। দেশীয় রাজ্য-গুলি বোধহয় ক্রমশঃই ভারত সরকারের শরণাপন্ন হবেন। মাইকেল ওডায়ারও কিছুদিন আগে ভারত সরকারকে দেশীয় রাজ্যসমূহকে কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে বলেছেন। সাম্রাজ্যবাদপ্রসূত এই অতি অবাঞ্ছনীয় দলের লোকদের পরামর্শ কখনই রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের কথা হতে পারে না।

শোনা যায় যে অনেক দেশীর রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা বৃটিশ ভারতের থেকে প্রগতিশীল। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে তারা বোধহয় অতিদূর থেকে প্রভুর অনুসরণ করে। কয়েকটি হয়ত ব্যতিক্রম থাকতে পারে। এতদিনের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আজ ১৯৩৯ সালে যদি রাজারা আর একটু সহজ বুদ্ধির পরিচয় না দেন তাহলে একথা বোধ হয় ধরে নেওয়া ভ্রম হবে না যে তাঁদের দিন আগতপ্রায়। অবশ্য সম্পত্তি ও শক্তিমত্তা চিরকালই সহজবুদ্ধিশূন্য এবং অন্ধ।

শ্রীপ্রবীরচন্দ্র বসু মল্লিক

কবিতাগুচ্ছ

প্রার্থনা

(১)

কুমার-কে

পশ্চিমে দূর রাহুর কোটরে গত
জ্যৈষ্ঠের পোড়া দিন।
সূর্য তোমার কোমল শরীরে যতো
ঢেলে গেছে তার ঋণ।

অঙ্কের সীমা আঁধার দ্রাঘিমা ক্ষীণ
দিগ্‌বলয়ের মতো।
দিগ্‌বধূদের বাষ্পে গোধূলি লীন,
দৃষ্টি শূন্যাহত।

মৌন কাকলী, বিরাট তেপান্তর
বিরাট, বর্ণহীন।
আজকে তোমার পৃথিবী অবান্তর,
আকাশ যে সঙ্গীন।

ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত!
সে কোন্ মেরুতে চলেছ, নীলকমল!
বলো কি তোমার ব্রত?

সাগরসেঁচানো কড়ির পাহাড়ে চুনি
ডালিমের লালে লীন?
প্রবালচূড়ায় পারিজাত চাও, শুনি,
তাই কি ওড়াও দিন?

হৈমবতীর চোখের মুক্তা জোড়া
করবে হস্তগত ?
শুধ্‌বে বলো সে কার নাচিকেত ঋণ ;
হে কুমার তথাগত ?

চলেছে উধাও নক্ষত্রেরা যতো
তড়িতে পক্ষ লীন।
পিছু পিছু যাও, ধূলায় ওষ্ঠাগত,
পক্ষীরাজ তুহিন।

পশ্চিমে দূর তেপান্তরের পারে
গত জ্যৈষ্ঠের দিন।
সূর্য তোমার শরীরে দীপ্ত, আর
আলেয়া ঈর্ষ্যাহীন।

(২)

কাজলার জন্য

বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের মড়কে
বর্ষভোগ্য রুক্ষ শাপ চৈতালির গড্ডলচড়কে
আজো দেখি ঋষ্টি বর্ষে। বৈশাখের অজবন্ধু মেষে
কর্কটক্রান্তির পাপ ক্লান্তিহীন দুর্বাসার শ্লেষে
তাপমানে আজো জাতিস্মর। বজ্রপাণি উদাসীন,
স্বয়ম্বশ অমরার শীতকল্র ফরাসে আসীন!
দয়াহীন ইরম্মদ! ইন্দ্র হৈম কুলিশকঠিন
অন্যমনে গিয়েছে কি ভুলি'! হায় হে পিতৃপ্রতিম
হে কালের অধীশ্বর! দানধর্মে দম্য তব রাগ!
হিরণ্ময় হে আদিত্য! সম্বরো সম্বরো পুরোভাগ!

হে পূষণ ! বধো বৃত্রে বধো শীঘ্র বিশ্বলোপ হয় ;
দম্ভোলি নিক্ষেপি' বধো, গ্রীষ্মের পৈশুন্য নাহি সয়।
কালিদাসী স্বর্ণযুগ জীয়াইয়া আতাম্র সহরে
কদম্ব আম্রের বনে মেঘদূতে বৃষ্টি যেন ঝরে,
সন্ধ্যাকাশ ঢাকি' কালবৈশাখীর নবধারাজলে
গলিত পিচের পথে, নীপবনে, ছায়াবীথিতলে ॥

শ্রীবিষ্ণু দে

শতাব্দী

সন্ধ্যায় নদীর জল প্রশান্ত, সুদূর-প্রসারিত,
কলের নিঃশ্বাস-ধ্বনি থেমে গেছে সোনালী বিকালে।
ফিরিল শ্রমিকদল একে-একে অবসন্ন দেহে,
ধাতব কাঠিন্য এলো নদীজলে, তরঙ্গে-তরঙ্গে।
ঘুমন্ত জেটির বুকে স্তব্ধ হ'লো সব কোলাহল,
দিনের স্মৃতির পরে অন্ধকার নামিল অতল।

কোথায় হারালো পথ সমুদ্রের যাযাবর পাখী !
ক্ষীণ দৃষ্টি ফিরে আসে আঁধার প্রাচীরে পেয়ে বাধা।
কলের কঠিন চক্রে হ'লো শেষ কতো-যে জীবন,
সঞ্চিত চিম্‌নির ধূমে বদ্ধ হ'লো পৃথিবীর শ্বাস।
ঘুমন্ত জেটির বুক, প্রাণহীন, শবের মতন।
শতাব্দীর হিংস্র চক্ষু তা'রই পরে জ্ব'লিতেছে লাল।

হরপ্রসাদ মিত্র

আরম্ভ

প্রান্তরে কোনো আলেয়া কোথাও গিয়েছে নিভে—
অস্থির দিন এসেছে নাকি ?
স্বপ্ন-শহর চূর্ণ তারায় ছিটিয়ে দিয়ে
রৌদ্রের ডাক হঠাৎ বুঝি।
বেলায় বেলায় ধারালো সময় আসে ;
ষ্টীলের কুঠিতে কঠোর পরিক্রমা ;
নগণ্য রাত তন্দ্রায় গেলো মুছে ;
আশু ইতিহাস শিথিল-স্মৃতি।

পিছনে ছড়ানো ভঙ্গুর ভিড় জমাট বাঁধে,
মিছিল মিলেছে জনস্রোতে ;
ঘনিষ্ঠ মন দ্রুত মুহূর্তে অনাবৃত,
ফাটলে ফাটলে ছায়ারা ডোবে।
আবিষ্কারের চমক লেগেছে সবে—
নাবিকের চোখে দ্বীপের সীমানা ভাসে,
পায়ের তলায় দ্রুততম হ'ল যেন
বহুদিনকার উধাও গতি।

ভাগ্যের সীমা খড়্গের মতো আসন্ন কি ?
প্রস্তুতি, মানি, সমুদ্ধত ;
তীক্ষ্ণ বাঁশীতে সুর কেটে গেছে সকাল বেলা—
রোদের ফালিতে হাড়ের গুঁড়ো।
সংহত বেগ ঘন সঙ্কটে চাপা ;
উড়ন্ত ধুলো কালো মেঘ হ'বে নাকি ?
নিশুতি চাঁদের মমতা তো নেই মনে,
অন্তরালে দিনের সুরু।

অরুণকুমার মিত্র

পুস্তক-পরিচয়

Unforgotten Years—by Logan Pearsall Smith
(Constable & Co Ltd).

গ্রন্থকার একজন সাহিত্যসেবী। তাঁর জন্ম আমেরিকায়, কিন্তু গত ত্রিশ বৎসর যাবত তিনি ইংলণ্ডেই বাস কর্‌ছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর আত্মজীবনী।

আত্মজীবনীতে যাঁরা বৈচিত্র্য অন্বেষণ করেন, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁদের আশা পূর্ণ করতে পারবে বলে মনে হয় না। গ্রন্থকারের জীবন বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। তাঁর মাতাপিতা কোয়েকার্ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয় এই ধর্মভাবময় পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে ও শিক্ষার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয় আমেরিকার একটি কোয়েকার স্কুল ও ছোট একটি কোয়েকার কলেজে এবং পরিশেষে হার্ভার্ডে। তারপর তিনি প্রবেশ করেন তাঁর পিতার কাঁচের ব্যবসায়ে। কিন্তু এ কাজ তাঁর বেশী দিন ধাতে সইল না। মাতার সাহায্যে পিতার কাছ থেকে চিরজীবনের জন্য একটি এ্যান্নুইটি (বাৎসরিক বৃত্তি) আদায় করে তিনি এলেন অক্সফোর্ডে। অক্সফোর্ডে পড়াশুনা শেষ করে, কিছুদিন প্যারিসে শিল্প কলার চর্চ্চা করলেন। এই সময় থেকে তাঁর গ্রন্থকার-জীবনের সূত্রপাত হয়। তাঁর সাসেক্স বাস, হস্তলিখিত চিঠিপত্রাদির অন্বেষণ এবং জাহাজে ভ্রমণ প্রভৃতির বৃত্তান্ত দিয়ে বইখানি শেষ করা হয়েছে।

উপরে বইখানির সংক্ষেপে যে পরিচয় দেওয়া হ'ল তা থেকে মনে হতে পারে যে বইখানি নিতান্ত সাধারণ গোছের, একেবারে নীরস। বাস্তবিকপক্ষে এরূপ ধারণা খুবই ভ্রান্ত হবে। আত্মজীবনী হিসেবে, মোটের উপর বইখানিকে খুব উঁচু জায়গা না দেওয়া যেতে পারলেও, সকলকেই, বোধ হয়, স্বীকার করতে হবে যে বইখানি বেশ সুখপাঠ্য। এর প্রথম এবং প্রধান কারণ গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গী। তাঁর স্বচ্ছ, সাবলীল গদ্য, তাঁর ঘটনা-সন্নিবেশ-চাতুর্য্য পাঠককে

কেবল মাত্র সূক্ষ্ম সহজ ঘাত প্রতিঘাতে ঘটনা নাটকের শক্তি সঞ্চয় করেছে। চরিত্রসংখ্যা অল্প ব'লে সংক্ষিপ্তসার দেওয়া সুবিধা হলো।

নিঃসন্তান কোয়েন-দম্পতি লণ্ডনের বিশেষ সৌখীন অঞ্চলে বাস করে। উভয়েই স্বল্প ভাষী ও সঙ্গকুণ্ঠ। গৃহকর্ত্রী আনার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ঔপন্যাসিকা সেণ্ট কোয়েন্টিন ও যুবক প্রণয়ী এডি ব্যতীত আর কারও সে সংসারে গতিবিধি বড় একটা ছিল না। ঘটনাবিরল দাম্পত্য জীবনটি যখন অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে কর্ত্তা টমাস-এর বৈমাত্রেয় ভগ্নী পর্সিয়ার মাতৃবিয়োগ হলো। পরলোকগত পিতার অনুরোধ স্মরণ করে টমাস আশ্রয়হীনা বালিকাকে আহ্বান করলো। আনা অনিবার্য্য উপদ্রবটিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকার করে নিলো কারণ অন্য উপায় ছিল না। সে মার্জ্জিত রমণী, পরাজয়কেও 'ষ্টাইল' দিতে জানে।—স্বহস্তে গুছিয়ে দিলে ঘরটি।

পর্সিয়া টমাস-এর চেয়ে অনেক ছোট। আজীবন বিদেশে হোটেলে হোটেলে কাটিয়ে সে যথারীতি মানুষ হয়ে উঠতে পারেনি। তার মাও ছিলেন আনাড়ী ভালমানুষ। টমাস-এর পিতা তাঁকে শেষ বয়সে বিবাহ করেন বাধ্য হয়ে, যখন শুনলেন সন্তান আগত। তারপর লজ্জায় সঙ্কোচে আর কতকটা নূতন সংস্কারের টানে দেশে ফেরেননি।

পর্সিয়া এলো এক বছরের মত অস্থায়ী ভাবে। তার পিতার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা ছিল সে ভ্রাতার সংসারে অন্ততঃ কিছুকাল থেকে শিক্ষা পায়। বেচারী নিরীহ ভালমানুষ, নির্ব্বিরোধ, মিষ্টভাষী। আনার সংসারে কোন বিকার উপস্থিত হলো না। মেজার ব্রাট্ নামক এক সরলচিত্ত ভদ্রব্যক্তি ও সহপাঠী লিলিয়ান এই দুই জনের সঙ্গে সে কিছু কিছু মিশেছে কিন্তু প্রাণ খুলে কথা বলা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ।

কিছুদিন পরে সহসা বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়ে গেলো। আনা দৈবাৎ আবিষ্কার করে বসলো যে মেয়েটি ডায়েরী লেখে এবং তার অবর্ত্তমানে সে তাই নিয়মিত ভাবে গোপনে পড়তে লাগলো।

আনা এই সরল বালিকার স্বচ্ছ দর্পণে আপন প্রতিমূর্ত্তি দেখে মর্ম্মাহত হয়ে গেলো, শুধু নিজের নয়, ঔপন্যাসিক বন্ধুবরের, টমাসের উদ্‌গীর্ণ কথা ও ভাব-ভঙ্গীর সরল বর্ণনা তার একান্ত শ্লাঘার বিষয় ভব্যতাকে যেন সরোলে ব্যঙ্গ ক'রে

চল্লো। অব্যক্ত ভর্ৎসনা কটুক্তির চেয়ে রূঢ়তর বাজে।—সহজ প্রশ্ন—'ওরা যা অন্তর দিয়ে চায় না, মুখে কেন বলে, যা চায় প্রকাশ করে না কেন'?—আনাকে অস্থির কোরে তুললো। সে বন্ধু সেণ্ট-কোয়েন্টিন-এর কাছে দুঃখের কথা জ্ঞাপন ক'রে তারও বাক্যের চটুলতা স্তব্ধ করে দিলে।

এদিকে এডি মেয়েটির সারল্যে আকৃষ্ট হয়ে প্রেমের অভিনয় সুরু ক'রে আর এক প্রকারের গণ্ডগোল সৃষ্টি কোরে বসলো। পর্সিয়া তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস ক'রে আত্মসমর্পণ করলো। টমাস উৎকণ্ঠিত হয়েও মনে মনে হাসলো কারণ তার স্ত্রীর মুখ ফুটে কিছু বলবার জো রইলো না—তারই প্রিয় পাত্র এডি।

গোপন ঈর্ষায় পীড়িতা আনা স্বামীকে নিয়ে গেলো বিদেশ ভ্রমণে। পর্সিয়া প্রেরিত হলো আনার পুরাতন গভার্নেস-এর সংসারে, সমুদ্রতীরে। লণ্ডনের প্রাণহীণ সৌখীনতার চেয়ে এখানকার লোকেদের প্রগল্ভ চটুলতা অধিকতর দুর্ব্বোধ্য ও পীড়াদায়ক ব'লে প্রতিভাত হলো বালিকার চিত্তে। সে এডিকে আহ্বান করলো দুদিনের জন্য এবং ফলে হলো হিতে বিপরীত। এই সকল চালাক চতুর লোকদের সাহায্যে তার প্রণয়ীর আচরণ এতই দুর্জ্জেয় হয়ে উঠলো যে সে প্রশ্নবাণে তাকে উত্ত্যক্ত কোরে তুললে।

লণ্ডনে ফিরে আসতে ঔপন্যাসিক ভদ্রলোকটি একটি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাকে ব'লে ফেল্লেন যে আনা তার ডায়েরী পড়েছে। ক্রোধে দুঃখে ব্যাকুল হয়ে সে এডির কাছে ছুটে গেলো। সান্ত্বনা সেখানে মিললো না জুটলো ভর্ৎসনা। সেখান থেকে সোজা গিয়ে উঠলো সে মেজার বাট্-এর হোটেলে। ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে কোয়েন পরিবারকে করলেন টেলিফোন। পর্সিয়ার বিদ্রোহ টমাসের কাছে অভাবনীয় ব্যাপার। সে স্ত্রীর বৈঠকে প্রবেশ ক'রে রূঢ়ভাবে প্রশ্ন করলে। আনা চোখা চোখা উত্তর দিলে কিন্তু কলহ হলো না। ভৃত্য পাচকের শ্রবণ সান্নিধ্যে ভব্যতার মুখাবরণ খসতো না ; তা ছাড়া ঔপন্যাসিক বন্ধুবরও উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে তিনজনের সুদীর্ঘ তর্কের পর পরিচারিকা পাঠানো হলো।

গ্রন্থের শেষ এইরূপ ছন্নছাড়া ভাবে হয়েছে। নামকরণে বলা হয়েছে হৃদয়ের মৃত্যু কিন্তু সেরূপ চমকপ্রদ কোন ঘটনা ঘটেনি। হৃদয় আঘাত খেয়ে নিস্তেজ হয়েছে। ক্রমে আরও ক্ষীণতর হতে পর্সিয়াকে শত্রু শিবিরে দেখা যাবে সন্দেহ নাই। আপাততঃ কুসুমে কীট প্রবেশ করলো মাত্র। সর্ব্বশেষে বৃদ্ধা

পরিচারিকা ম্যাচেট-এর স্বগত উক্তি আছে অনেকখানি। কাচ পালিসের চাকচিক্যে হর্ম্মটির মধ্যে পুরাতনের ছায়া পড়বার উপায় ছিল না কিন্তু এই বৃদ্ধাটি নিভৃতে বহন করে চলেছিল সাবেকী আমলের স্মৃতিসম্ভার। পর্সিয়াকে পেয়ে সে হৃদয়ের দ্বার ঈষৎ উন্মোচন ক'রেই বন্ধ ক'রে দিয়েছিল এডির আগমনে, তারপর যখন অন্যান্য সকলের ঘাত প্রতিঘাতে উত্থিত ঝটিকা উপস্থিত ব্যবস্থাকে শঙ্কাকুল ক'রে তুললো সে রইলো পরিপূর্ণভাবে নির্লিপ্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এই চরিত্রটি অবান্তর কিন্তু পরে হৃদয়াঙ্গম হয় যে তার উপস্থিতি একটি বড় জিনিষ ইঙ্গিত করে—ইঙ্গিত করে যে একটি সামান্য বালিকার হৃদয়ের পীড়া মনস্তাপের ব্যাপার হলেও মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বার মত কিছু নয়। অর্থাৎ জীবনের ধারা প্রতিরোধ করা অসম্ভব এবং কালের প্রবাহে সব কিছুই ধুয়ে মুছে যাবে।

উপরোক্ত চুম্বক হতে গ্রন্থখানির মহত্ত্ব উপলব্ধি হবে না কারণ এর প্রকৃতি নাটকের মত। খরধার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে এবং ক্রিয়ার অনুপাতে প্রতিক্রিয়া এত সূক্ষ্ম যে অনেক স্থানে ভাষার পরিবর্ত্তে সঙ্কেত প্রযুক্ত হয়েছে। এই কারণেই সংশয় উপস্থিত হয় গ্রন্থখানিকে 'ট্রাজেডী' কিংবা 'আইরণিক কমেডী' আখ্যা দেবো।

বস্তুতঃ অনভিজ্ঞের অভিজ্ঞতা লাভ করা এতই নিত্যনৈমিত্তিক মামুলী ব্যাপার যে তা একটি সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠা ব্যাপী পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় হতে পারে ভাবলেই কমেডীর কথা মনে আসে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর হাতের কায়দা ভেল্কিবাজির সামিল। উপস্থিত ক্ষেত্রে পাঠকের হৃদয় বিগলিত হয় যেহেতু চরিত্রগুলি সকলেই আনাড়ী—ঘটনার অভাবিত পরিবর্ত্তনে প্রতিপদে প্রপীড়িত। বেচারী পর্সিয়ার অবস্থা কাহিল কারণ সে সর্ব্বাপেক্ষা অপটু। বোধ করি স্বাভাবিক অপটুতার একটি নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে।

গ্রন্থখানিকে একাধিকবার প্রণিধান না করলে সম্যক গুণাবলী উপলব্ধি হওয়া কঠিন কারণ ঘটনার সঞ্চারণ এত কৌতূহলোদ্দীপক যে ইতস্ততঃ সন্নিবিষ্ট মনোহর দৃশ্য বর্ণনা, প্রজ্ঞাসম্পন্ন আপ্ত বাক্য, দিন পঞ্জিকার সরস ছিন্নপত্র ইত্যাদি অনেক কিছু প্রথমে উপেক্ষিত হয়ে যায়। ভাষার ভঙ্গিমা সতেজ ও আড়ম্বরশূন্য ব'লেই ভাবের সূক্ষ্মতার প্রতি সচেতন থাকতে হয়।

এডির চরিত্রটি বিশ্লেষণযোগ্য। সে বেচারী সরল বালিকাটিকে গ্রাস ক'রে ফেলে উদ্‌গার ক'রতে পারলে বাঁচে। নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি কথোপকথন হতে বোঝা যাবে যে সে পর্সিয়া অপেক্ষা কিছু কম অনুকম্পার যোগ্য নয়।

এডি পর্সিয়ার নিমন্ত্রণে সমূদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে। পূর্ব্বরাত্রে সকলে সদলবলে গিয়েছিলো ছায়াচিত্র দর্শনে।—উপস্থিত প্রণয়ী যুগল ফাঁক পেয়ে একটি পরিত্যক্ত প্রাসাদের শূন্যগর্ভে প্রবেশ করেছে।—বাহিরে ঝড়োহাওয়া।

এডি বল্লে, বাড়ীটা ঝড়ে পড়ে গেলে বেশ হয়—

সত্যি পড়তে পারে নাকি—ঐ যে গীর্জ্জের ঘণ্টা বন্ধ হলো।

হ্যাঁ তোমার এখন গীর্জ্জেতে থাকা উচিত ছিলো।

গত রবিবারে গিয়েছিলাম—যাওয়া না যাওয়াতে কিবা এসে যায়।

তবে গত রবিবার গিয়েছিলে কেন—। আচ্ছা আজ সকাল থেকে এমন কেন করছো তুমি।—কেমন যেন করছো—

কি করছি?

ভাল ক'রেই জানো—কিন্তু কেন?

তুমি ডাফ্‌নের হাত ধরেছিলে?

কখন, কোথায়?

সিনেমায়—

ওঃ—তা দেখো, আমি ধীরে সুস্থে ভাব জমাতে পারি না—হ্যাঁ আমি লক্ষ্য করেছিলাম—তুমি কেমন ক'রে যেন চাইলে—

তার মানে তুমি যখন হাসলে তখনও তার হাত ধ'রে ছিলে—

এডি একটু ভেবে স্বীকার করলে 'হ্যাঁ, ধরেছিলাম—কিন্তু তুমি কি সেজন্যে দুঃখিত হয়েছে? কাল যখন কেটে পড়লে ভাবলাম বুঝি সকাল সকাল শুতে গেলে।—সত্যি কথা বলতে কি, আমার স্বভাবই এমনি, আমি স্পর্শ করতে ভালবাসি—

কিন্তু আমি ত ছিলাম—

তুমি ছিলে বটে—আমার কিন্তু খেয়াল—

আচ্ছা তুমি সেই সমুদ্রের ধারে বালির চড়ার ওপর বল্লে কখন কি ক'রে বসো তার ঠিক নাই—এ কি তাই?

আর তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ডায়েরীতে লিখে ফেল্লে বুঝি—তোমাকে বলিনি আমার কথা লিখবে না ?

না না, ডায়েরীতে লিখলাম কই, এই ত সবে কাল সন্ধ্যের সময় বল্লে—

যাক্, কি ক'রে বসির যা অর্থ করছো—সে অর্থে বলিনি—অত ভারী কথা নয়—আমি নতুন কিছু ভেবে বলিনি—

কিন্তু আমার কাছে নতুন ঠেকলো।

তা আর আমি কি করতে পারি বলো—তুমি যা তাই—

সিনেমাতে ডিকি সিগারেট ধরাবার আগেই তোমার হাসির ধরণ দেখে বুঝেছিলাম একটা কিছু হচ্ছে—

দেখ, তোমার বয়সের পক্ষে তুমি একেবারে স্নায়ুবিকারগ্রস্ত—

আমি নেহাৎ ছোট্ট নই ; তুমিই না সেদিন বিয়ে করবে বলেছিলে—

তুমি এতটুকু ছোট্ট মেয়ে ব'লেই ভরসা ক'রে বলেছিলাম।

তার মানে আমি এত হেয় যে কি বল্লে না বল্লে তাতে কিছু এসে গেলো না।

ভেবেছিলাম তুমিই একমাত্র লোক যে আমার প্রকৃতির ভুল অর্থ করবে না—এখন দেখছি অন্য সাধারণ মেয়ের মত তুমিও আমার কথাগুলো জোড়া তাড়া দিয়ে এমন একটা আমি খাড়া করছো যা আমি নই।

কিন্তু তুমি ডাফনের হাত ধরলে কেন ?

ঘনিষ্ঠতা করতে ইচ্ছে হলো—

আমি ত' ছিলাম।

এডি অন্যমনস্কভাবে বল্লে 'চলো যাই—'

কিন্তু আমি কি বল্লাম কানে গেলো—

এডি সামলে নিয়ে খুব নরম করে বল্লে 'আমি যথার্থ দুঃখিত—খেয়ালের বশে মজা করছিলাম—সত্যি ভাবিনি তুমি লক্ষ্য করবে কিম্বা লক্ষ্য করলেও মনে রাখবে—এখন খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু এতো তুচ্ছ ব্যাপার, তুমি না হয় ডাফনেকে জিজ্ঞাসা করো—'

না, তাকে জিজ্ঞাসা করবো না—

তবে আমি বলছি মেনে নাও—

এরা সবাই ভেবেছিল তুমি আমারই বন্ধু—কত যে গর্ব্ব বোধ করছিলাম—

তোমার জন্যেই ত' সব কাজ ফেলে এত দূরে এসেছি—তুমি জানো আমি তোমাকে কত ভালবাসি—সামান্য অর্থহীন ব্যাপারের জন্যে আনন্দ মাটি—

অর্থহীন নয়—

দেখো তোমার কাছে ছাড়া আমি কখনও স্বরূপ প্রকাশ করি না—এদের কাছে যে আচরণ করি তার মধ্যে সত্য নেই। এরা যা চায় তাই করি। তুমি জানো তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ কতখানি গভীর—

আধ সেকেণ্ড-এর মত এডি তার হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশ অবারিত করে পর্সিয়ার চোখের ভিতর চাইলো—এই প্রথম, পর্সিয়া তার চোখ ফিরিয়ে নিলো। বল্লে—

কিন্তু একটু আগে যে বল্লে আমি এত ছোট মেয়ে আমাকে কি বলো না বলো তাতে কিছু এসে যায় না—

আমি যখন আবলতাবল বকি তার কোন মানে হয় না—

বিয়ের কথাটা আবলতাবল না বললেই হতো—

পাগল না কি ? তুমি বিয়ে করতে যাবে কেন ?

সমুদ্রতীরে যখন বলেছিলে তোমাকে আমার ভয় ক'রে চলা উচিত—তাও কী আবলতাবল কথা—

বাবা—কী স্মরণশক্তি

কেন সবে কাল সন্ধ্যেবেলা ত' বল্লে—

হবে, তখন তাই মনে হচ্ছিলো—

সত্যি তোমার মনে পড়ছে না

দোহাই তোমার এমন ক'রে চেপে ধরো না—লোকেরা যা ভাবে তাই কি বলে ? যারা সেকথা জাহির করে তারা প্রবঞ্চক—আমি দুষ্ট হতে পারি কিন্তু প্রতারক নই।

তুমি তাহলে কেমন ক'রে বল যে অমুক কথাটা যথার্থ বিবেচনা ক'রে বলছো,—মনের ভাব তো হামেসাই বদলাচ্ছে—

এবার এডি অস্থির হয়ে মুখ হতে সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরা ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে হাসি টেনে বল্লে "আমি যা তাইতে তোমার অভ্যস্ত হতেই হবে—

আমি এমন সব কাজ করে বসতে পারি যার জন্যে তোমার মনে ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে কিন্তু উপায় নেই। অনেক আশা করেছিলাম তুমি আমার জীবনে একমাত্র ভালবাসার পাত্রী হবে যাকে আত্মপরিচয় দিতে হবে না—যে আমাকে আবিষ্কার ক'রে নিজেই বুঝে নেবে। দেখছি তা হবার নয়। ইতিমধ্যেই একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় পৌঁছে গেছি—আর না—

অগ্রসররত এডির জামার হাত আঁকড়ে ধ'রে পর্সিয়া কাতরভাবে ব'লে উঠলো "ওগো দাঁড়াও একটু—তোমার মনে কষ্ট দেওয়ার চেয়ে যে আমার মরাই ভাল। কথা দিচ্ছি, ঘৃণা আমি কোন কিছুকে করবো না—সব কিছুতে সময়ে অভ্যস্ত হয়ে যাব—আমি বোকা তাই বুঝি না—

এডি সংক্ষেপে বল্লে 'বেশ বুঝেছি, কোন কালেই তুমি বুঝবে না—

কিন্তু আমি চেষ্টা করবো—

দোহাই তোমার এখন চেঁচিও না—একটা লোকের ভুল ভাঙলো তাই কি চেঁচামেচি ক'রে বাড়ী ফেলতে হবে মাথায়—

ভুল ভাঙা আমি চাই না—

বেশ ভাঙেনি তাহলে—

* * * *

তারপর বেশীদিনের কথা নয় পর্সিয়া পর পর দুটি ঘা খেয়েছে। প্রথম নম্বর সে শুনেছে যে আনা তার ডায়েরী পড়েছে, তারপর কদিন যেন এডির সঙ্গে আনার মাখামাখিটা বাড়াবাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার সন্দেহ হয়েছে যে তাকে নিয়ে রহস্য ঠাট্টা চলছে—

সে যখন আর সহ্য করতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্তের মত এডির কাছে গেলো—এডি তাকে বল্লে—আনার ডায়েরী পড়া কখনই উচিত হয়নি কিন্তু তুমিই বা ওরকম করে ফেলে রাখতে কেন ? এখন ভাবছি ভাগ্যিস আমার কথা লিখতে মানা করেছিলাম—

পর্সিয়া রুদ্ধশ্বাসে বোল্লে 'ও এই জন্যে লিখতে মানা করেছিলে—এখন তার মানে—বুঝেছি—

তার মানে ?

রাগ করো না—তুমিই কি আনাকে আমার ডায়েরীর কথা বলেছিলে—

আমি কেন বলতে যাব ?

এই রহস্য ক'রে—তুমি যেমন সব সময়ে ক'রে থাকো—

না আমি বলিনি, সেই আমাকে বলেছে—

তা হলে আমি যখন তোমাকে বললাম তুমি জানতে—

জানতাম বইকি—কিন্তু এই ডায়েরী নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার কি আছে ? অবশ্য সরল সত্যকথা ভাল জিনিষ কিন্তু তাতে নতুনত্ব কি আছে ? সাধারণ মেয়েরা ত' আকছার ডায়েরী রেখে থাকে—

তবে কেন মিছামিছি ভাণ দেখিয়েছিলে যে আমার ডায়েরী তোমার কাছে দামী জিনিষ—

তুমি আপন মনে বকে গেলে আমার ভাল লাগে তাই—

আমি তাইতে তোমার কথা লিখেছি

ও গড্, আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বিশ্বাস করা যায়—

আমার প্রতি ভাল ব্যবহার করাতে লজ্জার কি আছে ?

তোমার আমার মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ আনা জানতে পারে আমি চাই না—

রোরুদ্যমান পর্সিয়াকে পথচারীদের দৃষ্টিপথ থেকে তুলে নিয়ে এডি আপন ফ্ল্যাটে নিয়ে গেলো—

একটু সামলে নিয়ে পর্সিয়া প্রশ্ন করলো—আমাদের সেই জঙ্গলে বেড়াতে যাওয়ার গল্প আনার কাছে করেছো ?

কথায় কথায় করেছি হয়তো—

আর সেখানেই আমি তোমাকে প্রথম চুমু খেয়েছি

এডি বল্লে 'দেখো, আমি আর পেরে উঠছি না—সত্যি এসব ব্যাপারকে যথার্থ মর্য্যাদা দিতে আমি পারি না। তোমার আমার জন্যে ত' নতুন কোন জগৎ সৃষ্টি হবে না। চারিদিকে সব কিছু ক্ষয় হয়ে চ'লেছে, মর্য্যাদা হারাচ্ছে আর তুমি আমি তার মধ্যে তাজা থাকবো তাই বা কেমন করে হয়—'

আমরা ত' সব কিছুই বদলে দিতে পারি—

আমরা দুজনে কি করতে পারি—

আসল কথা তুমি কিছু করতে চাও না—তুমি শুধু খেলা চাও—আচ্ছা তোমার আর আনার মধ্যে এত যে কথাবার্তা হয়—কি বিষয়—

কেমন ক'রে বলি, তুমি যে বড় ছেলেমানুষ পর্সিয়া—এই ধরো তোমার বিষয়—

আমাকে চেনবার আগেও ত' তোমাদের ভাব ছিলো—তুমি কি তাকে ভালবাসো—

এখন যা প্রশ্ন করছো তার অর্থ তুমি নিজেই জানো না—

এইটুকু জানি তুমি আমার কাছ থেকে তফাতে থাকো—

জানো যদি প্রশ্ন করো কেন ?

ভাবছি হয়ত' বুঝিয়ে দেবে যে আমি ভুল করছি—

আচ্ছা বেশ, আমি সত্যিই আনার প্রণয়ী।—কেন বিশ্বাস হয় না—কী হয়েছে বসো বসো—

আমাদের মধ্যে আর কোন সম্বন্ধ রইলো না— ?

রাগ করলে ? তুমি যদি আরও বড় হতে, আরও বুঝতে শিখতে বড় ভাল হতো—আমি হয়ত নৃশংস রাক্ষস—কিন্তু কেমন করে জানবো ? তোমার পূর্ব্বে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু কেউ ত' বলেনি—তারা সকলেই জেনে শুনে এসেছে কি পেতে পারে।—তোমার মত অন্যায় আশা পোষণ করেনি ত'। তুমি চাও প্রত্যেকটি ব্যবহার হবে হয় ভাল না হয় মন্দ,—মাঝামাঝির সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই। কি ভয়ঙ্কর—পাগল করে দাও—

সমালোচনার স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে বিস্তারিত বাক্যমালা উদ্ধৃত করা অনুচিত কিন্তু আমাকে বাধ্য হয়ে নিয়ম লঙ্ঘন করতে হলো। দৃষ্টান্ত না দিয়ে সরল ব্যক্তির নিষ্ঠুরতা ব্যক্ত করা কঠিন। আমরা সরল বলতে দুর্ব্বলকে বুঝি। তাদের দ্বারা সবলের প্রতি কেমন ক'রে অত্যাচার হতে পারে সহজে ধারণায় প্রবেশ করে না, যেহেতু আমাদের বিচারবুদ্ধি কতকগুলি প্রচলিত নীতির দ্বারা প্রভাবিত ; অধিকন্তু স্থূল চক্ষের অগোচরে যা ঘটে তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে আসে না।

গ্রন্থকর্ত্রী এমন একটি উচ্চ নির্লিপ্তলোক হতে দৃষ্টি নত করেছেন যেখানে মানুষকল্পিত ভাল মন্দ বিচার হচ্ছে অবান্তর। ভাল মন্দ নির্ব্বিশেষে মনুষ্য প্রকৃতি হচ্ছে সাতিশয় কৌতূহলপ্রদ। সেইজন্য বেদনার সঞ্চার হয়েছে উভয়মুখী। পর্সিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রপীড়িত হয়েও আনা, সেণ্ট-কোয়েন্টিন, এডি,

ডাফনে, ডিকি প্রভৃতির আত্মম্ভরিতা প্রতিহত করে এসেছে নির্দ্দয়ভাবে। উপন্যাসখানির ট্রাজেডী সেইখানে।

যথার্থ সরল ব্যক্তি বেদনা পায়—পরিবেশন করে আরও বেশী। তার একাগ্রতা, বাঞ্ছিতের প্রতি বেপরোয়া অভিযান কত যত্নরচিত উদ্যান পদদলিত করে দিয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই, অথচ সমাজের তথাকথিত নিরপেক্ষ বিচারক সাহিত্যিকেরা তার প্রতিপক্ষে কথা বলবার সাহস রাখেন না। এলিজাবেথ বোয়েন এই প্রথাগত নিয়মটিকে অবজ্ঞা ক'রে অনেকখানি আড়ষ্টতা মুক্ত করেছেন।

উপন্যাসখানিতে মধ্যবিত্ত সমাজের অবনতি ও কৃত্রিমতা যেরূপ ভীষণভাবে পরিস্ফুট হয়েছে মনে হয় গ্রন্থকর্ত্তৃ বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থার আমূল সংশোধন কামনা করেন ; কে না করে ? কিন্তু যে মূল দ্বন্দ্বটি হচ্ছে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় তার অবশ্রান্তি নেই কারণ সে হচ্ছে মহাকাল সৃষ্টির যা রহস্য তার প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

On the Frontier—by W. H. Auden and Christopher Isherwood (Faber).

The Trial of a Judge, a tragic statement—by Stephen Spender (Faber).

অডেন এবং ইসারউডের এ পর্য্যন্ত তিনটি নাটক প্রকাশিত হলো। তিনটির কথা মনে রাখলে মোটামুটি কয়েকটি সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পারি, এবং সেগুলো স্পেণ্ডরের নাটকটি সম্বন্ধেও প্রযুজ্য। এঁরা যখন কোনো বুর্জোয়া চরিত্র নিয়ে লেখেন তখনই সত্যিকার শক্তিমত্তার পরিচয় দেন, তখন এঁদের নাটকীয় দখল সম্বন্ধে গুরুতর কোনো সন্দেহ আসে না, মনে হয় শক্ত মাটির উপরেই এঁরা আছেন। কিন্তু যখনই কোনো সাম্যবাদীর জীবন, ভবিষ্যৎ আশা ইত্যাদি এঁরা লিপিবদ্ধ করেন তখনই প্রচার-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি সত্যিকার অভিযোগ আনা চলে তাদের সম্মুখীন হন। ইচ্ছাপূরণের

অনাবশ্যক চেষ্টা, মেরুদণ্ডহীন আদর্শবাদ (বিশেষভাবে স্পেণ্ডরের) ইত্যাদি দোষ তখনই প্রখর হয়ে ওঠে। স্থানবিশেষে মানসিক অশান্তির বর্ণনায় এঁরা সিদ্ধহস্ত কিন্তু যাকে জিদ্ literature of struggle নামে অভিহিত করেছেন তাতে এঁদের পারদর্শিতা নামমাত্র। মাল্‌রোর দুটি বিখ্যাত উপন্যাসের সঙ্গে এঁদের লেখার তুলনা করলে কথাটা সহজবোধ্য হয়। মাল্‌রোর অসাধারণ শক্তি ইচ্ছাপূরণের সস্তা চেষ্টায় উত্তেজিত নয়, ভবিষ্যতের নূতন পৃথিবীতে সমস্ত গোলমালের অবসান হবে এ সব কথা জোর গলায় ভালো ভাষায় প্রচার না করলেও তাঁর পুস্তকপাঠ পাঠকের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে না। কিন্তু On the Frontier কিম্বা Trial of a Judge-এর ভবিষ্যৎব্যঞ্জক কবিতা পড়লে সে ধরণের পৌরুষের সাক্ষাৎ মেলে না। বোধ হয়, ইংলণ্ডের এতদিনকার সফল সাম্রাজ্যবাদ তার কারণ। Ascent of F 6-এর পেটি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি Mr and Mrs A সাহিত্য হিসেবে On the Frontierএর Eric এবং Annaর চেয়ে ভালোভাবে উতরেছে। এরিক্ ও আনাকে রোমিও জুলিয়েটের আধুনিক সংস্করণ বলে ঠেকে। শেষ দৃশ্যে মৃত্যুর পর তাদের আবির্ভাব এবং কথোপকথন মধুর হলেও নিষ্ফল সান্ত্বনালাভের চেষ্টামাত্র। কোনো মহৎ নাটকে এ সান্ত্বনালাভের প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না।

তাছাড়া অডেন এবং ইসারউডের নাটকীয় কায়দা সম্বন্ধে দু এক জায়গায় আপত্তি করা চলে। কয়েকটি দৃশ্যে দুদেশের দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন পরিবারের জীবনী একসঙ্গে অথচ বিচ্ছিন্নভাবেই দেখানো হয়েছে। তার মাঝে হঠাৎ এদেশের এরিক্ অন্যদেশের আনাকে দেখতে পাবার ভঙ্গী যখন করে তখন সেটা বিসদৃশ ঠেকে। একটি convention-এর সুযোগ একভাবেই নেওয়া উচিত। সিনেমার পন্থার সঙ্গে টেলিপ্যাথি, টেলিভিজন্ সবকটাই একত্রে মেশানো শক্তিমান নাট্যকারের পক্ষে অন্যায়। এ নাটকে লীডার এবং ভ্যালেরিয়ানের চরিত্রসৃষ্টি কয়েক হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

স্পেণ্ডরের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে আমার বরাবর সন্দেহ আছে। Trial of a Judge-এর অধিকাংশ স্থান তাঁর অতিরিক্ত কাব্যিপনার চেষ্টা দুষ্ট করেছে। কোনো একটি ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তখনকার প্রয়োজনীয় গণ্ডী মনে রাখার অবশ্য-কর্তব্যটা ভুলে গিয়ে সমস্ত বিশ্বসংসারের চিন্তা করতে সুরু করেন,

এবং সানন্দে ভবিষ্যতের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তিনি আসলে শেলীর মতো স্বপ্নবিলাসী, বিপ্লবী-সাহিত্যের পৌরুষ তাঁর মেরুদণ্ডে নেই। The poetry is in the pity,—এটা বোধহয় তাঁর মূলমন্ত্র, কিন্তু তিনি কখনো এ মন্ত্রকে ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা সেটা বিচার্য্য। ভাষার ব্যবহারে স্পেণ্ডর সতর্ক নন ; খুঁটিনাটি, সঠিক, স্থানোপযোগী শব্দের প্রয়োগে যে অন্তর্নিহিত শক্তি আসে অধিকাংশ সময়ই তিনি তার ধার ধারেন না, ভাসাভাসা মোটামুটি প্রকাশের দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। এ বিষয়ে স্পেণ্ডর সুইনবর্ণপন্থী। উপমার সাহায্যে বর্ণনার ঝোঁকটা তাঁর মুদ্রাদোষ।

নাটকটি সাজাতে স্পেণ্ডর মাঝে মাঝে যে কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। নাৎসি জার্মানীর নূতন আদর্শের পটভূমিকায় তিনি সভ্যতার সঙ্কটের চিত্র এঁকেছেন। ইউরোপ যে উদ্যত ধ্বংসের আজ সম্মুখীন, তা শুধু অর্থনৈতিক নয়, নৈতিক। এই মানসিক ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়েছিল গত মহাযুদ্ধের সময়। সে সময়কার নিষ্ঠুরতা আজ ফ্যাশিষ্ট্‌দের মজ্জাগত, এবং যে লিবেরল আদর্শ মহাযুদ্ধের পরেও টিঁকে ছিলো আজ তার নাভিশ্বাস উপস্থিত। নাৎসি সভ্যতায় সত্যাসত্যের দাম নেই, এতোদিন ধরে যে আদর্শ কাজে না চালালেও লোকে মুখে মানতো, গলিত ধনতন্ত্রের শেষ পৃষ্ঠপোষকেরা তার পরোয়া করেন না। বিচারকের চরিত্রে স্পেণ্ডর খুব সম্ভব নিজের মতোই একটি বুর্জোয়া লিবেরলের সমস্যা বর্ণনা করেছেন, এবং প্রমাণ করেছেন যে সমস্যাটি আজ ব্যক্তিগত নয়, বিশ্বজনীন। যুদ্ধ ও মনস্তত্ত্বের উপরে গ্লোভারের বিখ্যাত বইটির সাহায্য স্পেণ্ডর সচেতন ভাবেই নিয়েছেন। নাটকের চেয়ে Trial of a Judge কবিতা বলেই বেশী মনে হয়, এবং সেটা কাব্যনাট্যের বেলায় খুবসম্ভব দূষনীয়। কয়েকটি দৃশ্যে স্পেণ্ডর সত্যিকার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, এবং সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্ত্তনে যদি তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে উপযুক্ত সংহতি আসে তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্যনাট্য রচনা করতে পারবেন। এ নাটকটিকে tragic statement বলা চলে না, যদি ষ্টেট্‌মেণ্ট বলতে কলিংউড্‌ যা বলেছেন তাই বুঝি।

সমর সেন

Parliamentary Government in England : A Commentary—By Harold J. Laski (Allen & Unwin) 12s. 6d.

নিয়মতন্ত্রের উদ্ভাবনা ইংরাজদের জাতীয় জীবনের এক বিরাট কীর্ত্তি হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগে দেখা যায় এর প্রস্তুতি, সতেরো শতকে এল তার প্রতিষ্ঠা, তারপর গত আড়াই শ' বছরে এই বিধান পরিণতি লাভ করেছে। নিয়মতন্ত্রের গোড়ার কথা হ'ল এই যে রাষ্ট্রের চালকশক্তি অর্থাৎ এক্‌সিকিউটিভ্ নানারূপ বিধিবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ফলে তার স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ ; সেইসঙ্গে জনমতের প্রতীক হিসাবে জাতীয় প্রতিনিধিসভাই পরিণামে দেশের ভাগ্য-বিধাতা রূপে স্বীকৃত হয়। ইংল্যাণ্ডে এই কন্‌ষ্টিটিউশনাল্ শাসনের শুধু উৎপত্তি হয়নি, এর পূর্ণ সাফল্য দেখতে হলেও এই দিকেই চোখ পড়ে। বিরাট রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমেরিকাতে পার্লামেণ্টীয় শাসনপদ্ধতি তার যথার্থ রূপানুসারে গড়ে' ওঠেনি ; ফ্রান্সে তার দেড়শ' বছরের ইতিহাস নানা বাধা-বিপর্য্যয়ে বার বার ব্যাহত হয়েছে ; আর ইটালি, জার্মানি ও রাশিয়ায় নিয়মতন্ত্র গড়ে' উঠতে না উঠতে ভেঙ্গে পড়েছে বলা চলে।

ইংল্যাণ্ডে নিয়মতন্ত্রের উদ্ভাবনা ও সাফল্যের কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে অনেকে জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের আশ্রয় নিয়েছেন। জাতীয় চরিত্রের মূলরূপ যুগে যুগে অপরিবর্ত্তিত না থাকলে অবশ্য এর ধারণা অর্থহীন হয়ে পড়ে। অথচ অধ্যাপক ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয়দের চোখে সতেরো শতকের ইংরাজ ও উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজ-জাতির বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বস্তুতঃ জাতীয় চরিত্রের ধারণার সাহায্যে, ইতিহাসের গতির বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্য সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিশেষ কোন যুগোপযোগী সাদৃশ্যের সম্যক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না ; জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পৃথক অস্তিত্ব থাকলে তা' ইতিহাসের অন্যতম উপাদানমাত্র, ঐতিহাসিক গতির নিয়ন্ত্রক শক্তির পদে তাকে উন্নীত করা চলে না। ঠিক তেমনই আবার সমগ্র সমাজের বিবর্ত্তন-ধারার দিকনির্ণয় সম্পূর্ণ আকস্মিক ব'লে স্বীকার করাও কঠিন—কারণ তাহলে ইতিহাস চর্চ্চা অর্থহীন পণ্ডশ্রমে পরিণত হ'তে বাধ্য। মহাপুরুষ বা ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যকলাপ তাই ইতিহাসের অঙ্গ হ'লেও তাকেই সামাজিক

পরিবর্ত্তনের মূল প্রেরণারূপে মেনে নিলে ন্যায্যতঃ মানুষের ইতিবৃত্ত আকস্মিক ঘটনামালার সমষ্টি কিম্বা দৈবের লীলায় পর্য্যবসিত হয়।

প্রায় একশত বৎসর আগে মার্ক্স ও এঙ্গেলস্ ইতিহাসের যে বাস্তব-ব্যাখার প্রচার করেছিলেন তাতে শ্রেণীর উত্থান পতন ও বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধই সামাজিক জীবনের কেন্দ্রীয় শক্তির মর্য্যাদা পেয়েছিল। প্রতি যুগের পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতি মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-আর্থিক সম্বন্ধ গড়ে' তোলে তারই বাহ্যিক রূপ প্রতিফলিত হয় সমাজের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে। সেই শ্রেণীসম্বন্ধই মানুষের সকল সামাজিক চিন্তা ও কর্ম্মের মূল নিয়ন্তা, অন্য সকল শক্তি মূল-ধারার সমর্থক বা প্রতিবন্ধক হিসাবে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে মাত্র। এদিকে ডায়ালেক্‌টিকের মূল বিশ্বাস অনুসারে কোন শ্রেণীই চিরস্থায়ী নয়। আর্থিক সম্বন্ধ, সুতরাং শ্রেণীসম্বন্ধেরও মধ্যে, পরিবর্ত্তনের একটা ঝোঁক স্বভাবতঃই অন্তর্নিহিত থাকে; তাই সামাজিক প্রগতির মূল উৎস এইখানেই খুঁজতে হবে।

অর্দ্ধশতাব্দী ধরে বুদ্ধিবাদী পণ্ডিতেরা মার্ক্সের মতামত বারবার খণ্ডন করেছেন অথচ এই মতবাদ ধীরে ধীরে বর্ত্তমান যুগের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। তাই অমার্ক্সীয় মহলের চিন্তার মধ্যেও এর প্রতিধ্বনি বারবার পাওয়া যায়। আজকের দিনের সাধারণ ঐতিহাসিকও মেনে নেন যে ফিউডাল্ ইয়োরোপে যারা নগণ্য ছিল, মধ্যযুগের শেষের দিকে সেই বুর্জ্জোয়া বা মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয় আরম্ভ হ'ল; নূতন নূতন আবিষ্কারের অভিযান, রেনেসাঁসের নবীন দৃষ্টিভঙ্গী, রেফর্মেশনের নতুন পরিকল্পনা ছড়িয়ে পড়ার মূলে রয়েছে এরই প্রেরণা। তারপর মার্কেন্টাইল যুগের প্রতিপত্তির সোপান বেয়ে উনিশ শতকের যন্ত্রবিপ্লবে বুর্জোয়া সভ্যতা চরমে পৌঁছল। পৃথিবীময় ব্যাপ্তি লাভের পর আজ তার ক্ষয়োন্মুখ অবস্থার কথাও সকলের মনে ছায়া ফেলে। এই পরিবর্ত্তনধারার মূল যে আর্থিক সম্বন্ধের ক্রমবিকাশ একথাও আজ বহুস্বীকৃত। বুর্জোয়া-শ্রেণীর বিবর্ত্তনের সঙ্গে যে প্রোলেটেরিয়াট বা বিত্তহীন শ্রমিকশ্রেণীর অভ্যুদয় ও প্রসার ডায়ালেক্‌টিকের অঙ্গাঙ্গি যোগে যুক্ত এই বিশ্বাসও এখন বিস্তার লাভ করেছে।

অধ্যাপক ল্যাস্কি এখন নিজেকে মার্ক্সপন্থী বলেন কি না জানি না, কিন্তু

কিছুদিন থেকে তাঁর লেখায় এই দৃষ্টিভঙ্গী অতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং ইয়োরোপীয় উদারমতবাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর বইদুখানি এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্টীয় শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সাম্প্রতিক আলোচনাও প্রতি পৃষ্ঠায় মার্ক্সের প্রভাব পরিস্ফুট করছে। অধ্যাপক ল্যাস্কির পক্ষে এটা কিছুমাত্র অগৌরবের কথা নয়, কারণ চিন্তার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের দাবীর প্রকৃতিগত কোন মাহাত্ম্য নেই। পক্ষান্তরে লেখার সরস প্রসাদগুণে এবং বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয়ে তাঁর বর্ত্তমান গ্রন্থ উপভোগ্য এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে অসংখ্য পাঠকের মনে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী আলোকপাত করবার সুযোগ পেয়েছে এই পুস্তকের মধ্যে। কোন লেখকের পক্ষে এই সাফল্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। ইংলণ্ডের সুবিদিত নিয়মতন্ত্রের উৎপত্তির হেতু, তার দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণ এবং তার বর্ত্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য চিন্তাশীল লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। এসম্বন্ধে অধ্যাপক ল্যাস্কির এই গ্রন্থের সমকক্ষ কোন আলোচনা না থাকাতে তাঁর বইখানিকে অবশ্যপাঠ্য বল্‌লে কিছুমাত্র অন্যায় হবে না।

আর্থিক সম্বন্ধের যে-রূপকে ধনতন্ত্র আখ্যা দেওয়া হয় তার ভিত্তি সুদৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে যে মধ্যশ্রেণীর জয়যাত্রা আরম্ভ হ'ল, নিয়মতন্ত্রকে তারই অন্যতম আদর্শ হিসাবে গণ্য করা যায়। রাষ্ট্রশক্তিকে অভিজাত ফিউডাল্ শ্রেণীর প্রতিভূ তথা-কথিত অবাধ-রাজতন্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার করাই ছিল নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য। মধ্যযুগের নানা অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের পুঞ্জীভূত ফল হিসাবে ইংল্যাণ্ডই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধনতন্ত্রের প্রগতির পথে অগ্রণী। তাই নিয়মতন্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা ইংরাজ জাতির পক্ষেই স্বাভাবিক হয়েছিল। সতেরো শতকে বহুবর্ষ-ব্যাপী প্রকাশ্য দ্বন্দ্বের পর রাজশক্তি সেদেশে শৃঙ্খলিত হয়ে পড়ে। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে নূতন ব্যবস্থার বিজয় ঘোষিত হ'ল। তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আড়াই শতাব্দী ইংরাজ নিয়মতন্ত্র অব্যাহত থেকেছে। মধ্যশ্রেণীর প্রতিপত্তির সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতন্ত্রের স্ফূর্ত্তিলাভ এবং উদার মতবাদের বিস্তার শুধু ইংল্যাণ্ড কেন, প্রতিদেশের ইতিহাসেই উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রশক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে না পারলে ব্যবসা বাণিজ্যের পথে নানা বাধা বিঘ্নের উৎপত্তি হতে পারে, স্বেচ্ছাচারী শাসন অভিজাত সমাজের আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হবে, ধনতন্ত্র

গঠনের কাজে দেশের শাসকদের যথাযোগ্য সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও একটা আশ্বাস থাকা প্রয়োজন। নিয়মতন্ত্র ও উদারনীতির উৎপত্তি ও প্রসারের মূলে ছিল এইজাতীয় প্রেরণা। কিন্তু পরিবর্ত্তনের অমোঘ নিয়ম অনুসারে ধনতন্ত্র বহুদিন কখনও এক অবস্থায় থাকতে পারে নি। তাই প্রথমে আঠারো শতকের উদার-নীতি পরিবর্ত্তিত হ'ল উনিশ শতাব্দীর গণতন্ত্রে। তারপর জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য-বাদের আওতার মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্র তার পূর্ণ বিস্তার লাভ করবার পর তার ভাগ্যে দুর্দ্দিন ও সঙ্কোচনের সময় উপস্থিত হয়েছে। এখন ধনিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার খাতিরেই তাই উদার-গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ হবার ব্যাখ্যাও খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

কিন্তু ঐতিহাসিক প্রগতি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। নিয়মতন্ত্রের অভ্যুত্থানের পথে ইংল্যাণ্ড অগ্রণী হলেও, তার ক্ষয়োন্মুখ অবস্থায় পরিবর্ত্তনের ঢেউ ইংল্যাণ্ডে প্রথম প্রবল হ'ল না। অর্থাৎ অন্যদেশের তুলনায় ব্রিটিশ রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি অনেক বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। ল্যাস্কির প্রধান বক্তব্য এই যে তার মূল কারণ ইংরাজ চরিত্রের সদ্‌গুণাবলী নয়, এর হেতু খুঁজতে হবে ইংরাজ জাতির নানা আর্থিক সুবিধার মধ্যে। এক কথায় ব্রিটিশ ধনতন্ত্র সুদৃঢ় হ'তে পেরেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য; ইংরাজ মধ্যশ্রেণী সে-সাম্রাজ্য গড়ে তুলবার সুযোগ পেয়েছিল প্রধানতঃ এই কারণে যে মধ্যযুগ থেকে নানা অবস্থার ভিতরে তারা যে শক্তি, সম্পদ ও সামর্থ্য অর্জ্জন করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিদের ততখানি সুযোগ জোটেনি। তার্কিকেরা হয়ত বল্‌বেন যে তার মানেই হ'ল যে ইংরাজদের সাফল্য আকস্মিক কিন্তু যুক্তিশাস্ত্র অনুসারে শুধু ক্ষণস্থায়ী ও অপ্রত্যাশিত কোন হেতুকেই আকস্মিক বলা চলে। ইংরাজ ধনতন্ত্রের অগ্রগতি নানা ঘটনাপরম্পরার ফল, তাকে তাই আকস্মিক বলা অসম্ভব। অন্যদিকে জাতীয় সদগুণ সুযোগ না থাকলে অপ্রকাশিতই থেকে যায় এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্য অপরিবর্ত্তিত থাকা সত্ত্বেও ইতিহাসের উত্থান-পতনের ধারা লোপ পায় না।

ল্যাস্কির মতে সুতরাং ইংল্যাণ্ডে নিয়মতন্ত্রের সাফল্যের প্রধান কারণ হ'ল সেদেশে আর্থিক সুবিধা। সত্তর বছর আগে প্রসিদ্ধ লেখক বেজট্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে পার্লামেণ্টীয় শাসন-পদ্ধতির কৃতকার্য্যতার কারণ অনুসন্ধান করেছিলেন।

তিনি তখনই বলেছিলেন যে এ প্রথা সাফল্য লাভ করতে হ'লে সমাজের মূলগত সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণের একমত হওয়া প্রয়োজন ; সেই ঐক্য না থাকলে অধিক সংখ্যকের কোন সাময়িক ইচ্ছাকে অল্পসংখ্যকেরা কখনও মেনে চলতে পারে না, অথচ পার্লামেণ্টীয় শাসনের অর্থই হ'ল জনমতের নির্দ্দেশ অনুসরণ। ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে বেজটের পরিকল্পিত ঐক্য হচ্ছে আসলে ইংরাজজাতির পক্ষে ধনতন্ত্রকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ; এই আনুগত্য আবার ইংল্যাণ্ডের বিশেষ আর্থিক সুবিধা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। তাই পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতির বাঞ্ছিত মূল ঐক্য এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ধনতন্ত্রের অবাধ প্রতিপত্তি ও অপ্রতিহত সাফল্যের প্রতিফলন মাত্র।

বেজট্‌ অবশ্য একথাও বলেছিলেন যে পার্লামেণ্ট্‌ সার্থক হয়ে উঠেছে ইংরাজদের বিরুদ্ধ মত সহ্য করবার অভ্যাসের জন্যও, ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে এ সহনশীলতা বস্তুতঃ আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারার সৌভাগ্যের উপর নির্ভর করে। দেশের বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রদ্ধার ভাবের কথাও বেজট্‌ উল্লেখ করেছিলেন ; কিন্তু সে শ্রদ্ধাও অনেকখানি নির্ভর করে আর্থিক সমৃদ্ধির উপর। ল্যাস্কি তাই সবিস্তারে দেখিয়েছেন যে সতেরো শতকের পর থেকে ধনতন্ত্রকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করাই ইংরাজ জাতির পার্লামেণ্টারি বিধান অনুসরণের প্রকৃত প্রেরণা।

পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতির বাহ্যিক প্রকাশের এক প্রধান অঙ্গ হল দল বা পার্টির দ্বন্দ্ব। ইংল্যাণ্ড্‌ আড়াই শ বছর ধরে কখনো উদারপন্থী কখনও বা রক্ষণশীল দল কর্ত্তৃক শাসিত হয়ে এসেছে ; নানা বিষয়ে এই দুই দলের মতভেদ ও তীব্র বাদানুবাদ রাষ্ট্রিক ইতিহাসের পাতা জর্জ্জরিত করে রেখেছে। ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে এত প্রভেদ ও মতান্তর সত্ত্বেও এত দিন ধরে' উভয় দলের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য থাকাতেই নিয়মতন্ত্র ইংলণ্ডে অবিচলিত থেকেছে। সে-ঐক্য অবশ্য ধনতন্ত্রকে স্বীকার, সমাজের আর্থিক ভিত্তি সম্বন্ধে কোন মতভেদ এতদিন মাথা তুলে দাঁড়ায়নি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের প্রয়োগ ও দাবী নিয়ে মতের পার্থক্য দেখা দিলেও, সামাজিক গড়নের মূলসূত্র নিয়ে প্রশ্ন না ওঠাতেই বেজট্‌বর্ণিত ঐক্য ইংরাজ নিয়মতন্ত্রের সাফল্য সূচিত করেছে।

পার্লামেণ্টীয় শাসন-পদ্ধতির আধুনিক সমস্যা ও সঙ্কট নিয়ে কিছুদিন থেকে

অনেকেই মাথা ঘামিয়েছেন। কারো কারো মতে পার্লামেন্টের যন্ত্রের নানা দোষ দেখা গেছে, তার জন্যই এ পদ্ধতি দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে এবং জনসাধারণও ক্রমে এর প্রতি বীতশ্রদ্ধা হচ্ছে। গত শতকে এ প্রথার যে-জয়ধ্বনি পৃথিবী মুখরিত করেছিল আজ তার অবসান নাকি এই দুর্ব্বলতার জন্যই। অধ্যাপক ল্যাস্কি এ-গ্রন্থের অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে পার্লামেন্টারি শাসন-যন্ত্রের কোন দুর্ব্বলতা এর প্রতিপত্তি হ্রাসের কারণ নয়। আসলে বেজট্ যে ঐক্যকে এ-পদ্ধতির সাফল্যের মূল কারণ বলে নির্দ্দেশ করেছিলেন আজ ঘটনাচক্রে সে-ঐক্যে ভাঙ্গন ধরেছে। পৃথিবী আজ আবার এক যুগসন্ধিতে পৌঁছেছে বলেই দেশের পর দেশে পার্লামেণ্টীয় শাসনযন্ত্র বিকল হয়ে পড়েছে। ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে আপেক্ষিক আর্থিক সুবিধার জন্য। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত সঙ্কট সে দেশেও পৌঁছেছে বলে' নিময়তন্ত্রও পরিবর্ত্তনের যুগে সঙ্কটাপন্ন হ'তে বাধ্য। পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতির প্রকৃত সমস্যা ও বিপদ এইখানে।

শুধু তাই নয়, নিময়তন্ত্রেরও এক স্বাভাবিক গতি আছে। উদারনীতিতে এর উৎপত্তি, গণতন্ত্রে এর ন্যায্য পরিণতি। প্রকৃত গণতন্ত্রে জনসাধারণ নিজেদের মঙ্গল অনুসন্ধান করতে বাধ্য। দেশের অধিকাংশ শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভূত কিম্বা তার সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়লে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনিকদের স্বার্থ-হানির সম্ভাবনা আসে। বেজট্ অবস্থাপন্ন লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন দরিদ্রের মঙ্গলসাধন করে' দেশের জনসাধারণকে তৃপ্ত রাখতে; তাহলে নিয়মতন্ত্রও সুস্থ থাকতে পারবে বলে' তাঁর বিশ্বাস ছিল। উনিশ শতকে ধনতন্ত্রের প্রসারের সময় এ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়েছিল, অন্যদেশের তুলনায় ইংল্যাণ্ডে বেশী দিন ধরে' এ-নীতি চালানোও ছিল সম্ভব। কিন্তু সংকোচনের সময় ধনতন্ত্র এত ভার বইতে পারে না। তাই গণতন্ত্রে উদ্দীপ্ত জনসারণের কামনা এবং আর্থিক সমস্যায় প্রপীড়িত ধনিকদের স্বার্থসন্ধানের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠতে বাধ্য। জার্মানি আর ইটালিতে এর ফল হয়েছে ফাশিজ্‌মের প্রকোপে নিময়তন্ত্রের পতন। ফ্রান্সেও অনুরূপ সমস্যা দেখা গিয়েছে। ল্যাস্কি বিশ্বাস করেন যে ইংল্যাণ্ডেও সে-সংগ্রাম সুরু হয়েছে।

বার্ণার্ড শ লিখেছিলেন যে সোশ্যালিজ্‌মের উদয়ে এক রুদ্ধ প্রশ্ন মূর্ত্ত হয়েছে।

সে-প্রশ্ন অবশ্য সমাজের ভবিষ্যৎ গড়নের স্বরূপ সম্বন্ধে। ফাশিষ্ট্দের চাপ সে-প্রশ্নকে চাপবার চেষ্টা মাত্র। শত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ইংরাজ সমাজ আজ এ-প্রশ্নে আলোড়িত ও মথিত হচ্ছে। ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে আজকের দিনের মতভেদের তুলনায় হুইগ্-টোরির আবাহমান দ্বন্দ্ব ছেলেখেলা মাত্র। তাই যুদ্ধান্তে ইংল্যাণ্ডের লিবারেল্ ও কন্সার্ভেটিভ্ দল প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে এক হয়ে' একই ধনিকদলে পরিণত হচ্ছে। তাদের বিরোধ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে, তাদের আপত্তি সোশ্যালিজ্মের আগমনে।

ল্যাস্কি বল্ছেন যে মুলগত ঐক্য ভেঙ্গে পড়াতেই নিয়মতন্ত্রের সঙ্কট ঘনিয়ে এসেছে। ব্রিটিশ লেবার্ পার্টির অবশ্য এখনও বিশ্বাস যে তারা দেশের অধিকসংখ্যক ভোট সংগ্রহ করতে পারলেই নির্ব্বিবাদে নূতন সমাজ গড়ে তুল্তে পারবে পার্লামেন্টারি যন্ত্রের সাহায্যেই। কিন্তু সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সে-ভরসাকে ক্ষীণ করেই রেখেছে। এমন কি ইংল্যাণ্ডেও ১৯১৪ সালে কার্সনের নেতৃত্বে অনেকে সবলে হোমরুলকে বাধা দিতে উদ্যত হয়েছিল। সোশ্যালিজ্মের মতন সমাজের বিরাট ও আমূল পরিবর্ত্তনকে কি ধনিকেরা নির্ব্বাচনের পরমুহূর্ত্তে মাথা পেতে মেনে নেবে? ল্যাস্কি ধনিকশ্রেণীর নানা অস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রোপাগাণ্ডার কথা ছেড়ে দিলেও থাকে হাউস্ অব্ লর্ড্সের ক্ষমতা—প্রতিনিধিসভা কমন্সের নির্দ্ধারিত বিধিবিধান লর্ড্স্-সভা দুবছর মুলতবী রাখতে পারে। এর ফলে সমাজের সংস্কার অর্দ্ধপথে স্থগিত কিম্বা পঙ্গু হয়ে পড়া সম্ভব। লেবার্-পার্টি যদি লর্ড্স্-সভা উঠিয়ে দেবার আইন করে, তাহলে বর্ত্তমান ব্যবস্থার শেষ রক্ষক হিসাবে রাজশক্তি হয়ত পথ আটকে দাঁড়াবে। এছাড়াও রয়েছে ধনিকদের হাতে আর্থিক আতঙ্ক সৃষ্টি করবার ক্ষমতা। ১৯৩১-এ ইংরাজ শ্রমিকদলের পরাজয় অনেকখানি এই অস্ত্রের সাহায্যেই হয়েছিল—সম্প্রতি ফ্রান্সে পপুলার্-ফ্রন্টের পতন এইভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। রবার্ট্ ওয়েন্ প্রভৃতি ইউটোপিয়ান্ সোশ্যালিষ্ট্রা বিশ্বাস করতেন যে ধনিকদের আন্তরিক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই নূতন সমাজ গড়ে' তোলা যাবে। ব্রিটিশ লেবার-পার্টির এখনও অনেকটা সে-বিশ্বাস থেকে গেছে। এ-ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করাই অধ্যাপক ল্যাস্কির গ্রন্থখানির প্রধান লক্ষ্য।

শ্রীসুশোভন সরকার

The Political and Social Doctrine of Communism—by R. Palme Dutt. (The Hogarth Press).

ফ্যাশিজম্-কে যারা বর্ব্বরতা ব'লে মনে করেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার কমু্যনিজম্-এর নাম শুনলেই আসন্ন প্রলয়ের রক্ত-মেঘ দেখে প্রমাদ গণেন। শান্তিবাদী রাসেল্-এর স্থিতপ্রজ্ঞ শিষ্যের অভাব কোন দেশেই নেই ; তাঁদের মতে, ফ্যাশিজম্ খারাপ বটে, কিন্তু কম্যুনিজম্-ই বা কোন কারণে গ্রহণযোগ্য ? রক্তগঙ্গার প্লাবনের ভিতর দিয়ে কখনো কি নূতন সমাজের উদ্ভব হতে পারে ? মরীচিকা, কম্যুনিষ্টরা শুধু মরীচিকার দিকে ছুটেছে। এই সব এবং এই জাতীয় আরো সব প্রশ্নের উত্তর আলোচ্য পুস্তিকায় পাওয়া যাবে। 'ভূমিকা' বাদ দিলে 'কম্যুনিজম্ অথবা বর্ব্বরতা', 'কম্যুনিজম্-এর লক্ষ্য', 'শক্তির সমস্যা' ও 'বর্ত্তমান কম্যুনিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি'—এই চারটি পরিচ্ছেদে বইখানিকে ভাগ করা হয়েছে। গ্রন্থকার রজনী পাম দত্ত সাম্যবাদী মহলে একাধিক কারণে সুপরিচিত। সেইজন্য সাম্যবাদ সম্পর্কে তাঁর এই বক্তব্যের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। ভারের দিক দিয়ে কম হ'লেও পুস্তকখানি যেমন ধারালো, তেমনি জোরালো ; আমাদের সাধারণ নিস্তরঙ্গ জীবনে আবর্ত্তের সৃষ্টি করতে পারবে। লেখক কম্যুনিজম্ সম্পর্কে পাঠককে যে-ভাবে সাবধান করেছেন, তা প্রথমেই উদ্ধৃত করছি : 'It would be better that readers should turn away from Communism rather than that they should give it a kind of sentimental support which is not ready to face the hard realities of struggle against a barbarous and ruthless ruling class. Only before they turn away, let them be quite sure of the world to which they are turning, the world of fascism, imperialist wars and colonial slavery, whose wholesale massacres and destruction are a thousand times greater than the entire record of the proletarian revolution,'

পুরাতন ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি আজ টলে উঠেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারছেন যে, অর্থ-নীতিক, সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটা বিপর্য্যয় ঘটতে বসেছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের হারও পূর্ব্বের তুলনায় অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ত্তমান উৎপাদন-পদ্ধতির দ্বারা যে পৃথিবীর জন সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি লোকের উপযোগী

খাদ্য-বস্তু তৈরী হ'তে পারে, সে-কথা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজের অধীন না হওয়া পর্য্যন্ত তা কিছুতেই সম্ভব হ'য়ে উঠবে না। যুক্ত রাষ্ট্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে ব'লেই ফাশিষ্ট শক্তিপুঙ্গ তাকে ধ্বংস করার জন্য অস্ত্র শান দিচ্ছে। আসন্ন যুদ্ধ যে বিগত মহাসমরকে ছাড়িয়া যাবে, তা আজ আর কার অজানা আছে? বর্ত্তমান সমাজের সামঞ্জস্যহীন বিধিবিধানের বিরুদ্ধে শ্রমিকদল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। নানা দেশের শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গণশক্তি অমিত বিক্রমে জেগে উঠেছে। সেই কারণে পুঁজিবাদীদের দল তাদের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। শ্রমিক আন্দোলনকে বিনষ্ট করবার জন্য তাদের চেষ্টা ও চক্রান্তের ত্রুটি নেই। তাই লেখক বলেছেন: 'This present world situation makes extremely urgent the fight of the rising collective humanity of the future, represented to-day by the organized working-class movement and its conscious expression, Communism, to conquer rapidly in order to end this decay and destruction before it shall have done further irreparable damage, to establish world order, organize social production and save and carry forward human culture. This is the simplest meaning of Communism and its task to-day.'

গত মহাযুদ্ধেই দেখা গেছে, ধনতন্ত্রের আয়ু নিঃশেষিত; সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার সময় সন্নিকট। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে শক্তি ও সংহতির অভাববশতই তা কার্য্যে পরিণত হয়নি। কেবলমাত্র রাশ্যাতে শ্রমিক-দল কম্যুনিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি অনুসারে পুঁজিবাদীদের উচ্ছেদ ক'রে স্বায়ত্তশাসন স্থাপিত করেছে। তাদের এই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখবার আছে। আজ যখন শোষক সম্প্রদায় দলবদ্ধ হ'য়ে নিজেদের মুনাফার হার বৃদ্ধি এবং কায়েমী স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সর্ব্বহারাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার ক'রেও তৃপ্ত হ'চ্ছে না, তখন তাদের এই দানবীয় বুভুক্ষার মূলোচ্ছেদ করবার জন্য সকলের সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার। শ্রেণীহীন সমাজপ্রতিষ্ঠাই কম্যুনিষ্টদের কাম্য। শোষণ যেখানে নেই, সেখানেই লেনিনের ভাষায় "Life will assert itself."

শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

স্বপ্ন-কামনা—শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত ; শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগ।

কাশবনের কন্যা—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় ; প্রিমিয়ার পাবলিশিং হাউস।

কাব্যগুচ্ছ—শ্রীকুমুদনাথ দাস ; বুক কোম্পানী।

ত্রিশঙ্কু-মদন—শ্রীমণীন্দ্র রায় ; শ্রীহর্ষ পুস্তক বিভাগ।

চারখানি-ই কবিতার বই। প্রথম বই স্বপ্ন-কামনার একাধিক কবিতা ইতঃপূর্ব্বে যখন বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল, তখনই প'ড়েছি। গ্রন্থাকারে সেগুলি প্রকাশিত হওয়ায় দ্বিতীয়বার পড়বার সুযোগ পাওয়া গেল। বই-এর প্রথমাংশে শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশের একটি সুলিখিত ভূমিকা আছে।

কিরণশঙ্কর গদ্য-কবিতা লেখেন এবং ছন্দোবদ্ধ কবিতাতেও তাঁর হাত আছে, যদিও এই বই-এর অন্তর্গত শেষোক্ত শ্রেণীর রচনায় মাঝে-মাঝে ছন্দঃপতন পীড়াকর ভাবেই প্রকট হ'য়েছে। প্রায় সব কবিতাগুলিই কবির প্রিয়া অথবা নিজের কথা নিয়েই লেখা এবং স্বভাবতঃই আত্মলীন। সংযত, পরিমিত এবং রসঘন রচনা আমাদের মনকে যেমন নাড়া দিতে পারে, এমন আর কিছুতেই না। বর্ত্তমান লেখকের একাধিক রচনায় এই পরিমিতির অভাব দেখা গেল,—যে কারণে, কয়েকটি কবিতা, (অন্যথা যেগুলি উচ্চাঙ্গের হ'তে পারতো,) তরল হ'য়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কোকিল', 'হাজার বছর আগে' প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। তথাপি, নবীন লেখকের রচনায় নানা ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্বপ্ন-কামনায় কাব্যের প্রতিশ্রুতি আছে। 'হে ললিতা'···, 'অধ্যায়', 'রহস্য' প্রভৃতি কবিতাগুলি আমার বিশেষ ভালো লেগেছে।

দ্বিতীয় বই 'কাশবনের কন্যা' পল্লীগাথা। এক কৃষক-দম্পতীর কাহিনী অবলম্বন ক'রে এটি রচিত হ'য়েছে। সরল গ্রাম্য জীবনের পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা আছে। বাঙ্গলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে কবি জসীমউদ্দীন পল্লীগাথা লিখে খ্যাতিলাভ ক'রেছেন। তাঁর প্রবর্ত্তিত পথে আরও অনেকে এই জাতীয় কাব্যরচনার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব রচনায় গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে লেখকের পয়িচয়ের অভাব-ই স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। আমার মনে হয়, মননের প্রাধান্যেই কাব্য তার সংজ্ঞা লাভ করে। এই মনন যেখানে দুর্ব্বল, সেখানে কাব্যও দুর্ব্বল এবং এই অক্ষমতা পূরণ করার সামর্থ্য আখ্যানভাগেরও নেই, আঙ্গিকেরও নেই। কারণ মননহীন আখ্যান সোনার

পাথরবাটির মতোই অলীক, এবং অসার আঙ্গিকের নমুনা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই এতোদিনে তথাকথিত গদ্য-কবিতার গড্ডলিকাপ্রবাহে-ই পেয়েছেন। আমাদের দেশে অধুনা যে-সব পল্লীগাথা প্রকাশিত হয়, তা'র মধ্যে আখ্যানটাই অতি স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে এবং সে আখ্যানও দুর্ব্বল। এই জন্য এই শ্রেণীর রচনা আমি অনেক সময় প'ড়তে পারি না। তীব্র ভাবপ্রবণতায় এগুলি পীড়াকর। জসীমউদ্দীনের রচনায় অবশ্য আমরা অনেক স্থলে এর ব্যতিক্রম দেখেছি। জীবনের সহজ এবং বলিষ্ঠ প্রকাশও সেখানে দুর্লভ নয়। শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের বর্ত্তমান বইখানি পল্লীগাথা রচনায় লেখকের প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে প্রশংসার-ই যোগ্য। তবে তাঁর পরবর্ত্তী রচনা আরও বলিষ্ঠ এবং আরও সংযত হওয়া আবশ্যক। বইখানির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ চমৎকার।

তৃতীয় বই কাব্যগুচ্ছের লেখক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ দাস ইতঃপূর্ব্বে "Rabindranath—his mind and art", বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি ইতিহাস, এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ ক'রেছেন। তাঁর বর্ত্তমান গ্রন্থে নানা ভাবের নানা কবিতা স্থান পেয়েছে। আঙ্গিকের দিক দিয়ে এগুলি নতুন না হ'লেও, এই বই থেকে একটি যুগ-সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া ছন্দে যে কুমুদনাথের হাত আছে, এ বই থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্থ বই 'ত্রিশঙ্কু-মদন'-এর অন্তর্গত অধিকাংশ কবিতাই আধুনিক ধরণে লেখা। শক্তিশালী কবি বিষ্ণুদের প্রভাব এই বই-এর একাধিক কবিতায় দেখা গেল। বিষ্ণুবাবুর অতি পরিমিত, সংযত এবং জমাট রচনারীতির দিকে লেখকের ঝোঁক আছে—এটি অবশ্য আনন্দের বিষয়। শব্দচয়ন-ব্যাপারে মণীন্দ্রবাবুর আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। 'বৃথা ফিরে চাও অমন অবুঝ পারা' (নির্ব্বন্ধ), 'তুমি হারা মোর মূর্য শবে' (স্বর্গ হইতে বিদায়), 'সার ছাড়া সবি ঝটাপট গেছে ঝ'রে' (শিবির), 'আজ কী কখনো হেলাফেলা করা যায়' (শিবির) প্রভৃতি পংক্তিতে আধুনিক রুচিসম্পন্ন পাঠকের মন নিঃসন্দেহে বাধা পায়। এই বই-এর 'চাঁদ', 'রাত্রি' এবং আরও ক'একটি কবিতা আমার ভালো লেগেছে।

হরপ্রসাদ মিত্র

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুলভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত

পরিচয়—চৈত্র, ১৩৪৫

বিষয়-সূচী

পুস্তক-পরিচয়

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৪৫

দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র

[৫।৬]

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব

বিগত কয়েক মাসের 'পরিচয়ে' বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক অবদান ধর্মতত্ত্বের আমরা যে আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্মের সারাৎসার অনুশীলন—অর্থাৎ, অধ্যাপক সীলির ভাষায়, the substance of Religion is Culture*। উহাতে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র বিলাতি অনুশীলন-তত্ত্বের অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছিলেন মাত্র। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর মুখ দিয়া এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন ঃ—

শিষ্য। এ যে বিলাতি Doctrine of culture.

গুরু। Culture বিলাতি জিনিষ নহে—উহা হিন্দু ধর্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা ? Culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিষটা খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। দ্বিজাতির চতুরাশ্রম কি মনে কর ?

শিষ্য। System of Culture ?

গুরু। এমন, যে তোমার Mathew Arnold প্রভৃতি বিলাতি অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কিনা সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে,

* ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন, প্রথম অধ্যায়।

সমস্ত ব্রত নিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি এই তত্ত্ব কখন তোমায় বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমদ্ভাগবদগীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

'ধর্মতত্ত্বে'র অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন যে, মনুষ্যত্ব ও অনুশীলনধর্ম যাহা তিনি ঐ গ্রন্থে ব্যাখ্যাত করিয়াছেন, তাহা ঐ গীতোক্ত ধর্মেরই নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

এ কথা অস্বীকার করি না যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বে'র স্থানে স্থানে বিলাতি অনুশীলন-তত্ত্বের প্রতিধ্বনি আছে ; কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে, দুইটি মর্মান্তিক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচারিত ধর্মতত্ত্ব বিলাতি অনুশীলনতত্ত্ব হইতে বিভিন্ন। 'ধর্মতত্ত্বে'র প্রথম অধ্যায়ে দেখি গুরুকে শিষ্য বলিতেছেন— 'আমি যতদূর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলন-তত্ত্ব নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্ম অনুশীলনের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধহয়।' উত্তরে গুরু বলিতেছেন :—

'এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতি অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত অথবা উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরমভক্ত, তাঁহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর পাদপদ্মেই সমর্পিত।

অধিকন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, বিলাতি অনুশীলন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ মাত্র—ভারতীয় অনুশীলন তত্ত্বের উদ্দেশ্য মুক্তি—যাহাতে সুখের পরাকাষ্ঠা, 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য'। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—'অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ'। মোক্ষ কি ? 'মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাব-প্রাপ্তি' —গীতায় ভগবান্ যাহাকে 'মম সাধর্ম্যম্ আগত' (similitude of God) বলিয়াছেন—খৃষ্টানেরা যাহাকে 'Deification'—'Be ye perfect as your Father-in-Heaven is perfect'—বলেন।* বিলাতি অনুশীলনতত্ত্বে একথার বিন্দুবিসর্গ নাই। বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলিয়াছেন, মুক্তি পূর্ণ মনুষ্যত্ব। অন্যত্র তাঁহার নিজের উক্তি এই—'ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ভক্তি।' অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নাই ও অনুশীলন নাই।

* এই মহোচ্চ অবস্থা (exalted condition) কিরূপ—পরবর্তী 'বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার ধর্ম' প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

ধর্মের পূর্ণ প্রকৃতি জ্ঞানে পাওয়া বড় দুষ্কর। বোধি-বর্জিত বুদ্ধিমাত্র-সার পাশ্চাত্য অনুশীলনবাদী সে প্রকৃতি জানিবে কিরূপে? এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন—

যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে যাক্, শাক্যসিংহ, যিশুখৃষ্ট, কি চৈতন্য, তাঁহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশী দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, 'ধর্মের সার Culture—কর্ষণ—মানববৃত্তির উৎকর্ষণই ধর্ম।' অঙ্কুরের দৃষ্টান্ত দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয় বুঝাইয়াছেন—

অঙ্কুরের পরিণাম মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর এই প্রকাণ্ড বৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষ-শরীরের পোষণ জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতি বিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই, ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর সুবৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশুর কথা বলিলে, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্বগুণযুক্ত, সর্বসুখসম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

অবশ্য, এক জন্মের কর্ষণে অনুশীলন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তবে আমাদের ভরসা এই যে কর্ষণের ফল একেবারে বিলুপ্ত হয় না। কারণ,

'এ জন্মের অনুশীলনের যে শুভ ফল, তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং একথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্" ইত্যাদি—গীতা, ৬।৪৩

আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তর' গ্রন্থে প্রাচ্যমতে জীবের ক্রমবিকাশ (evolution) বুঝাইতে, আমি এ কথা আর একটু বিশদ করিয়াছি।

"জীব প্রথমে স্থাবররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্রমবিকাশের ফলে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয়। জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হইয়া পাদপ রাজ্য (Vegetable Kingdom) অতিক্রম করতঃ প্রথমে সে সরীসৃপের দেহ ধারণ করে। ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের ফলে সে সরীসৃপ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু দেহে প্রবেশ করে। পশু রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বহুজন্ম অতিবাহিত করিয়া অবশেষে জীব মনুষ্যদেহ ধারণের উপযোগী হয়। মানবের মধ্যেও প্রথম অসভ্য তাহার পর অর্দ্ধ সভ্য, তাহার পর সভ্য, চরমে সুসভ্য মানুষরূপে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু সেখানেও তাহার ক্রমবিকাশ শেষ হয় না। মানুষ ক্রমে অতি-মানুষ হয়। মানবতার সীমা অতিক্রম করিয়া জীব অবশেষে জীবন্মুক্ত হয়। ইহাই ক্রমবিকাশের শেষ সোপান।

অতএব দেখা যাইতেছে, প্রাচ্য বিবর্ত্তনবাদের সহিত জন্মান্তর ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত। জীব বহু বহুবার জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। প্রত্যেক জন্মে সে উন্নতি করিবার যে সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা প্রায়ই সে দুই এক পা অগ্রসর হইয়া থাকে, কখনও বা দু'এক পদ পিছাইয়াও আইসে। প্রত্যেক জন্মের সংস্কার জীবের মধ্যে সুরক্ষিত হয় এবং পরজন্মে সে সেই সংস্কারের সুবিধা ভোগ করে।"

অর্থাৎ 'জীব এই জগতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেক জন্মে সে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাহা প্রজ্ঞা ও সামর্থ্যে রূপান্তরিত হয়। অতএব, প্রত্যেক জন্মই তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের এক একটি সোপান-স্থানীয়। সে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া চরমে নিজের গম্যস্থানে উপনীত হয়। এই গম্যস্থান পূর্ণতা-সিদ্ধি।'

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—ধর্মের সার কর্ষণ। কিসের কর্ষণ? 'প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত বীজের কর্ষণ।'

মম যোনির্মহদ্-ব্রহ্ম তস্মিন্ বীজং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

(মহদ্-ব্রহ্ম = প্রকৃতি)

প্রকৃতি-ক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হয়, বিবর্ত্তনের ফলে তাহা অঙ্কুরিত, পল্লবিত,

বিটপিত, পুষ্পিত ও ফলিত হইয়া চরমে মহা-মহীরুহ-রূপে আত্মপ্রকাশ করে*—

বৃক্ষইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠতি একঃ—উপনিষৎ

এই যে প্রকৃতি-ক্ষেত্রে উপ্ত বীজ, যাহা কর্ষণের চরম ফলে একদিন মহা-মহীরুহে বিকশিত হইবে—ঐ বীজ ব্রহ্ম-মোক্ষিত বীজ। সেইজন্য উহাকে ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ, (যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রাঃ বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচরন্তি সহস্রশঃ), ব্রহ্ম-সিন্ধুর বিন্দু—এক কথায় ব্রহ্ম-খণ্ড (Divine fragment) বলা হয়—অংশো নানাব্যপদেশাৎ (ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩)

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

আমরা দেখিয়াছি, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন ও প্রেমঘন—'the glorious Trinity of Power, Wisdom and Love'—সন্ধিনী, সংবিৎ, ও হ্লাদিনী শক্তির (খৃষ্টানী ভাষায় Life, Light and Love-এর) বিস্ফূর্জিত মূর্তি। জীব যখন ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি ('God made Man in His Own image'—Bible), তখন জীবের অভ্যন্তরেও নিশ্চয়ই ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব, ঐ প্রতাপ-প্রজ্ঞা-প্রেম বিস্ফূর্ত না হইলেও অব্যক্তভাবে বিদ্যমান আছে—

সত্যম্ অজ্ঞানম্ অনন্তংচেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী, ৩।২৮

জীবে ও ব্রহ্মে এই ভেদ যে, ব্রহ্মে যাহা পূর্ণ-বিকশিত, জীবে তাহা বীজাবস্থ। সেইজন্য ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক—

অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।১।২২

জন্ম জন্মান্তর-কৃত কর্ষণ দ্বারা জীবের ঐ অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাব ব্যক্ত হইতে ব্যক্ততর হয়, ঐ প্রচ্ছন্ন সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী শক্তির

---

* The individual is born many many times on earth, gradually transmuting the experiences gained in each life into wisdom and faculty, so that each incarnation represents for him a growth in mental and moral capacity, and takes him one step near his goal—the perfecting of his being.

—Stevenson Howell in Theosophic Review for January 1925 P. 32.

প্রস্ফুরণ হয়, ঐ অস্পষ্ট প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম বিস্ফূর্জিত হয়। ইহারই নাম ক্রমবিকাশ* (Evolution—E = out and volve = to roll—প্রচ্ছন্নের বহিঃ-প্রকাশ, অব্যক্তের বক্তীভবন)। যে জীবে ঐ প্রতাপ প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব মহোজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্মের সারূপ্যসিদ্ধ, তিনিই মুক্ত। এই তত্ত্বের উপদেশ করিয়া বাইবেল বলিয়াছেন—He is sown in weakness so that he may be raised in power.† মাতার কুক্ষিতে যেমন কলল বা সন্তানবীজ ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়, প্রকৃতির ক্ষেত্রে উপ্ত ঐ জীব-বীজও 'sown in weakness' হইয়া চরমে 'raised in power' হয়। সেইজন্য জীবকে বলা হয়—'Logos in gestation', 'God in the making' ; যে জীব 'raised in power', যিনি সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়াছেন, এক কথায় যিনি জীবন্মুক্ত—তিনিই 'Made God', তিনিই ব্রহ্মস্বারূপ্য-সিদ্ধ। তিনিই বেদান্তের মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিতে পারেন—সোহং, অহং ব্রহ্মাস্মি—ক্রাইষ্টের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন, 'I and my Father are One'। সেইজন্য বলা হইয়াছে, অজর অমর অক্ষর জীবের যে ভবিষ্যৎ নিয়তি, তাঁহার যে ভাবী মহিমা-গরিমা—তাহা ইয়ত্তার অতীত। "The Soul of Man is eternal and its future is the future of a thing whose splendour has no limit.' (The Idyll of the White Lotus)। ইহাই 'ধর্মতত্ত্ব——অনুশীলনের সার কথা।'

আমরা দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে মনুষ্যের সমস্ত বৃত্তিগুলির (অনুশীলন দ্বারা) সম্যক্ স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই ধর্মের লক্ষ্য—তাঁহার মতে তিনিই আদর্শ মনুষ্য যাঁহার সকল বৃত্তি সম্যক্ স্ফূর্ত, পরিণত ও পরস্পর সমঞ্জস। এই অবস্থাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব—ইহাই মোক্ষ।

---

* 'Evolution is a growth from within—an unfolding of potentialities which are unexhaustible'. So it said—All powers and capacities lie latent within, pre-existent—awaiting the right conditions for their manifestation.

† The evolution of man as man consists in the gradual manifestation of those three aspects (সৎ, চিৎ ও আনন্দ), their development from latency into activity—Dr Annie Besant.

এই মতের প্রতি ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া অধুনা স্বর্গগত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় তাঁহার ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছিলেন :—

বঙ্কিম বাবুর মতে বৃত্তি সকলের পূর্ণ স্ফূর্তি ও পরিণতিতে আমাদের পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। * * এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বথা সঙ্গত নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষেত্রের দিক্ হইতেই জীবকে দেখিয়াছেন—ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মার দিক্ হইতে তাহাকে দেখিতে চেষ্টা করেন নাই। * * আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ-লাভ দ্বারা জীবের অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধি কাহাকে বলে তাহা বঙ্কিম বাবু বুঝান নাই। এ জন্য বঙ্কিম বাবুর উপদিষ্ট অনুশীলন ধর্ম লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে।

এ সমালোচনা আমার নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র যে বৃত্তি সকলের স্ফূর্তি ও পরিণতির কথা বলিয়াছেন, ঐ বৃত্তি ত ক্ষেত্রের নহে—ক্ষেত্রজ্ঞের। কারণ, আমরা দেখিয়াছি ক্ষেত্রজ্ঞ জীবই সকল শক্তির উৎস। তা' ছাড়া আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অনুশীলনের সম্পুর্ণতায় যে মোক্ষ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সে মোক্ষ ঈশ্বরের সারূপ্যসিদ্ধি—"ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত স্বভাবপ্রাপ্তি"। তাই বলিতেছিলাম দেবেন্দ্রবিজয় বাবুর সমালোচনা এ ক্ষেত্রে সমীচীন হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে আমার দুই একটা ক্ষুদ্র বক্তব্য আছে। তাহা বলিয়া এ আলোচনা সমাপ্ত করি। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, চেষ্টা করিলে সকলেই ধার্মিক হইতে পারে। এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি বলিতে চাই, 'nurture' অপেক্ষা 'nature' বলবৎ। মালী যতই 'কর্ষণ' করুক না, আমড়া গাছে কোন দিন আম ফলাইতে পারিবেনা। অনুশীলন কোনদিন গাধা পিটিয়া ঘোড়া করিতে পারিবে না;—যে ঘোড়া হইয়া জন্মিয়াছে—সহিস 'ডলাই-মলাই' করিয়া তাহাকেই সবল ও সুশ্রী করিতে পারে। এখানেই স্বভাবের কথা উঠে। গীতার কথায় বলিতে হয়—প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি। তবে যাঁহারা আমার মত জন্মান্তর স্বীকার করেন, (বঙ্কিমচন্দ্রও জন্মান্তর মানিতেন), তাঁহারা বলিতে দ্বিধা করিবেন না যে, জন্মের পর জন্ম আন্তরিক পৌরুষ ও প্রযত্ন প্রয়োগ দ্বারা ঐ স্বভাবের পরিবর্তন করা যায়। ঐরূপে একদিন গাধা ঘোড়া হইতে পারে—কিতব সাধু হইতে পারে। এ প্রসঙ্গে 'স্ব-ধর্মে'র কথা উঠে, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে কথা উঠাইয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' এবং অর্জ্জুনকে স্ব-ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্তি দিয়াছেন।

স্বধর্মম্ অপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুম্ অর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শোয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে।

—গীতা, ২।৩১

ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অর্জ্জুন মোহবশে সেই স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইতেছিলেন, তাই বিশ্বগুরুর এই উপদেশ। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণ-চরিত্রে' লিখিয়াছেন—

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরমধর্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজী নাম Justice ; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম patriotism। উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্মপালন।

স্বধর্ম কি? সঙ্কীর্ণ অর্থে যাহাকে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম' বলে, তাহাই যে স্বধর্ম—এ কথা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলিয়াছেন—স্বধর্ম-শব্দ ব্যাপকার্থে গীতায় প্রযুক্ত হইয়াছে—কারণ, গীতার উপদেশ সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ নহে, সার্বভৌম। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—'ইহ জীবনে যে, যে কর্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাই তাহার স্বধর্ম।'

পুনশ্চ,—শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্মই লোকের অনুকূল। যিনি স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য হইতে পারেন তিনিই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু পরধর্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয়—এমন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন এমন দেখা যায় না। (গীতাভাষ্য ২১০-১ পৃষ্ঠা)

আমি কিন্তু গীতায় প্রযুক্ত 'স্বধর্ম' শব্দ আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করি। স্বধর্ম অর্থে 'স্ব-ভাব'-নিয়ত কর্ম।

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

—গীতা, ১৮।৪৭

'সম্যক্ অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে বিগুণ স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। কেন না,—স্বভাব-নিয়ত কর্ম করিয়া কেহ কখন কিল্বিষভাগী হয় না।'

স্বভাব-নিয়ত কর্ম কি? স্ব-ভাব অর্থে স্ব স্ব প্রকৃতি। সকল মানুষের প্রকৃতি এক নয়—কেহ সত্ত্ব-প্রধান 'ব্রাহ্মণ'-প্রকৃতি; কেহ সত্ত্বরজঃ-প্রধান 'ক্ষত্রিয়'-প্রকৃতি; কেহ রজঃপ্রধান 'বৈশ্য'-প্রকৃতি আর কেহ তমঃ-প্রধান 'শূদ্র'-প্রকৃতি।* পৃথিবীর সর্বত্র এই চতুর্বিধ প্রকৃতির লোক আছে—কি ভারতে কি অন্য দেশে। যে 'ব্রাহ্মণ'-প্রকৃতি, সর্বদেশে তাঁহার স্বধর্ম পালন, যে 'ক্ষত্রিয়'-প্রকৃতি, তাঁহার স্বধর্ম রক্ষণ, যে 'বৈশ্য'-প্রকৃতি, তাঁহার স্বধর্ম ধারণ এবং যে 'শূদ্র'-প্রকৃতি, তাঁহার স্বধর্ম সেবন। অতএব ঐ চতুর্বিধ প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোকের চতুর্বিধ ধর্ম—কেহ পালক ও শিক্ষক, কেহ শাসক ও রক্ষক, কেহ পোষক ও ধারক এবং কেহ শ্রমিক ও সেবক। এই তত্ত্বই গীতাকার গীতায় বুঝাইয়াছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টম্ গুণ কর্ম বিভাগশঃ—৪।১৩

—এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই কথার বিস্তার করিয়া কাহার কি স্বধর্ম বা স্ব-ভাব-নিয়ত কর্ম, তাহার নির্দেশ করিয়াছেন—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ১৮।৪১

* এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতাভাষ্যে'র অন্যত্র এইরূপ লিখিয়াছেন—

জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধর্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না—কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম স্থানীয় করেন, কেহ কর্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম স্বরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মন্ শব্দ ব্রহ্মণ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে ও বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কর্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহির্বিষয়ই কর্মের বিষয়। সেই বহির্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হউক, অথবা সবই হৌক, মানুষের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। যাহারা উৎপাদন করে তাহারা কৃষি ধর্মী; যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধর্মী; এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধ ধর্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র,—একথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

বঙ্কিমচন্দ্র গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চাতুর্বর্ণের বাহির। তাহাদের কি স্বধর্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম বিহিত করেন নাই? ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবদ্‌ধর্ম এমন অনুদার নহে।"

ঠিক কথা। প্রত্যেক মানুষেরই স্বধর্ম আছে, এবং কেহই চতুর্বর্ণের বাহিরে নহে—কি আর্য কি ম্লেচ্ছ। সেই স্বধর্ম তাহার স্বভাব-নিয়ত কর্ম—যে স্বভাব জন্ম জন্মান্তরের ভাবনা বাসনা ও চেষ্টনার পুঞ্জীভূত সংস্কার বহন করিয়া ইহজন্মে তাহার 'প্রকৃতি'রূপে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অতএব স্ব স্ব প্রকৃতির অনুসারেই প্রত্যেক জীবের 'স্বধর্ম'।

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও গুরুতর কথা আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্মসাধনে সকল মানুষের পক্ষে একই ব্যবস্থা—অনুশীলন দ্বারা বৃত্তিসমূহের সমুচিত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য। ইহা কতদূর সম্ভব বা সঙ্গত?

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, জীবে জীবে একটা অনাদিসিদ্ধ স্বারসিক বৈশিষ্ট্য (inborn temperamental difference) আছে—ঐ বৈশিষ্ট্য মৌলিক, বিধাতৃ-বিহিত, অনপনেয়। কেহ স্বভাবতঃ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ আনুষ্ঠানিক, কেহ ধ্যানরসিক, কেহ কলাবিৎ (কবি চিত্রকর ভাস্কর সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী)। এসম্বন্ধে আমার 'কর্মবাদ ও জন্মান্তরে' আমি এইরূপ লিখিয়াছিঃ—

যেমন সূর্যের শুভ্র জ্যোতিঃ কাচের দুলের (prism-এর) মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইলে 'সপ্ত সপ্তি'তে, seven prismatic colours-এ প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতি মায়া-উপাধির মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইয়া সপ্ত শ্রেণীর জীবে প্রকাশিত হয়েন। ইহাদিগকে Rays বা Archetypes বলে। এই সপ্ত শ্রেণীর নাম যথাক্রমে—Philosophical, Scientific, Artistic, Devotional, Mystic, Ceremonial and Heroic। এই সপ্ত শ্রেণী বা Typeকে বিধাতার 'প্রকল্প' বলা যাইতে পারে।*

এভাবে দেখিলে—বৃত্তিসমূহের স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য নয়, প্রত্যেক জীবের পক্ষে

* এই সপ্ত শ্রেণীকে থিয়সফিতে 'the Seven Rays' বলা হয়—First Ray, Second Ray, Third Ray ইত্যাদি।

স্বীয় 'প্রকল্প'-সিদ্ধিই (Achieving the Archetype) পরম পুরুষার্থ—ইহাই তাহার 'perfecting of his being'। এই মর্মে শ্রীযুক্ত জিনরাজ দাস লিখিয়াছেন ঃ—

Man's purpose in life at his present stage is neither to be happy or miserable but to achieve his archetype.

মানুষের মধ্যে যে গোলাপ, সে নিজ গোলাপত্ব বর্জন করিয়া লিলি হইবার চেষ্টা করিবে না অথবা লিলি গোলাপ হইবার চেষ্টা করিবে না—অথবা যুগপৎ গোলাপত্ব ও লিলিত্ব অর্জন করিবার জন্য ব্যগ্র হইবে না। 'কাট'-গোলাপের উচিত 'বসরাই' গোলাপ হইবার চেষ্টা করা, অল্প-গন্ধ লিলির উচিত গন্ধরাজে বিকশিত হইবার চেষ্টা করা। ঐরূপ হইতে পারিলেই তাহার পক্ষে 'প্রকল্প'-সিদ্ধি হইল।

কথাটা আর একভাবে বলা যায়—আমি অন্যত্র সেই ভাবে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা জানি, জীব একধারে কর্তা, ভোক্তা ও জ্ঞাতা। জীবনের অভ্যন্তর হইতে ত্রিবিধ শক্তি—কর্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—যুগপৎ উৎসারিত হইতে দেখা যায়। কর্মশক্তি=Power of Action, যাহার প্রকাশ চেষ্টনায় (Conation) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে সন্ধিনীশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রতাপ বা Power); ইচ্ছাশক্তি=Power of Desire, যাহার প্রকাশ কামনায় (Emotion) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে হ্লাদিনী শক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রেম বা Love); এবং জ্ঞান-শক্তি=Power of Thought যাহার প্রকাশ ভাবনায় (Cognition) এবং যাহা উচ্চতর গ্রামে সংবিৎশক্তি (যে শক্তির ব্যঞ্জনা প্রজ্ঞা বা Wisdom)।

যাঁহাদের কর্মশক্তি বেশ স্ফূর্ত আমরা তাঁহাদিগকে 'বীর' বলি—ইহারা Hero-type—যেমন জুলিয়স্ সিজার, শিবাজী, নেপোলিয়ন প্রভৃতি। কোন বাধাই ইহাদের বিমুখ করিতে পারে না—বিঘ্ন বিপত্তি ইঁহাদের ক্রিয়াশক্তিতে ইন্ধন সঞ্চার করে মাত্র। ক্রিয়াশক্তির নিম্ন গ্রামে যে শক্তির আভাস—সেই সন্ধিনী শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি বৈবস্বত মনু, নর নারায়ণ ঋষি এবং চরম পরম ভগবান্ সনৎকুমার—উপনিষদে যাঁহাকে 'স্কন্দ' বলা হইয়াছে—যিনি সমস্ত শৌর্যবীর্যের সাকার মূর্তি।

যাঁহাদের ইচ্ছা শক্তি বেশ স্ফূর্ত—আমরা তাঁহাদিগকে 'পীর' বলি—ইঁহারা Saint-type—যেমন বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস, রঘুনাথ, Suso, Meister Eckhart, মীরাবাঈ, করমেতি, মীনাক্ষী, সেণ্ট্ টেরেজা, সেণ্ট্ ক্যাথারিণ প্রভৃতি। ইঁহারা অধম কামকে উত্তম প্রেমে উত্তোলিত করেন, ইঁহারা 'God is love' এই মহান্ সত্য অনুভূতি দ্বারা জীবনে সফল করেন। ইঁহাদের নিকট ভগবান্ 'রসো বৈ সঃ', Dolche Amore (Sweetet love), দয়িত, বনিত, মাসুক (Beloved), পিতম্ (প্রিয়তম)—প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। ইচ্ছাশক্তির নিম্নগ্রামে যে শক্তির আভাস সেই হ্লাদিনীশক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি নারদ, মৈত্রেয়দেব, শ্রীচৈতন্য, ক্রাইষ্ট্ এবং চরম পরম মহাভাবময়ী শ্রীরাধা—যাঁহাতে মানবীয় প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত যিনি হ্লাদিনীরসের ঘনীভূত রূপ।

যাঁহাদের জ্ঞানশক্তি বেশ স্ফূর্ত আমরা তাঁহাদিগকে 'ধীর' বলি। ইঁহারা Sage-type—যেমন শঙ্কর, হেগেল্, প্লেটো, ডারউইন, নিউটন্, আর্য্যভট্ট, সুশ্রুত প্রভৃতি। জ্ঞানশক্তির বিকাশে ইঁহাদের বুদ্ধি অত্যুচ্চে উঠিয়াছে এবং জগতে দর্শন-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইঁহারা যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। জ্ঞানশক্তির নিম্ন গ্রামে যে শক্তির আভাস—সেই সম্বিৎ শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি ব্যাসদেব, যাজ্ঞবল্ক্য, পিথাগোরাস, জারুথুস্ত এবং চরম পরম বুদ্ধদেব—যিনি সম্বোধিসিদ্ধ—যাঁহাতে বিজ্ঞান প্রজ্ঞানে পরিণত—যাঁহাতে সম্বিৎ-শক্তি অতিম্নী-প্রাপ্ত।

অতএব আমরা দেখিলাম জীবোত্তমেরা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—বীর, ধীর ও পীর—The Hero, The Sage, The Saint,*—কর্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত।

এই ত্রিবিধ সাধকের অনুসারে সাধনারও ত্রৈবিধ্য—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও

---

* এই তিন শ্রেণীর সহিত আমরা পূর্বে যে সপ্ত সপ্তির (Seven Rays-এর) কথা বলিলাম তাহার সম্বন্ধ কি? একথা আমি আমার 'God as Love' প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

The Hero, as we know, belongs to the 1st ray—the ray of power and to the 7th, the ceremonial. The sage is temperamentally either a philosopher or a scientist and so belongs to the 2nd and the 3rd ray. And the saint, who is artistic, mystical, devotional, is affiliated to the 4th, 5th and 6th rays.

ভক্তিযোগ*। এ সম্পর্কে আমি আমার ঐ 'God as Love'-প্রবন্ধে এইরূপ লিখিয়াছি—

Now, God being a Trinity with the triple aspects of *Power*, *Wisdom* and *Bliss.*—Man, who is made in His image, is also triune. The sparks, emanated from the Divine Flame, (spoken of in Theosophy as Monads) are essentially *Sat*, *Chit* and *Ananda* and their destiny is, sooner or later, to be fanned into flames—fully evolving their latent potentialities of *Power*, *Wisdom* and *Love*—until they, Gods in the becoming, actually become Gods. To achieve this destiny, and in order that the unfoldment may be harmonious and not lop-sided, Man has appropriately evolved a threefold technique of approach to God—the three well-known paths of *Action*, *Intellection* and *Devotion*—*Karma*, *Jnanam* and *Bhakti*, to be trodden successively, if not simultaneously—the first being mainly the line of approach for the heroic temperament, the second for the philosophic and the third for the devotional—the three archetypes being the *Hero*, the *Sage* and the *Saint*.

যে যুক্ত-ত্রিবেণী রচনার কথা বলিলাম, ভগবদগীতা তাহার প্রয়াগ-ক্ষেত্র—আগামীবারে সে কথার আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

* এই ত্রিধারা আরম্ভে ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইলেও অবসানে সম্মিলিত হইয়া এক অপূর্ব ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনা করে।

অহিংসা

[লেখকের মন্তব্য : ভাবিয়া দেখিলাম, গল্পের মধ্যে ইঙ্গিতে পরিস্ফুট করিয়া তোলার পরিবর্ত্তে মাধবীলতা সম্বন্ধে সদানন্দের আবিষ্কার ও মনোভাব পরিবর্ত্তনের কথাটা আমার বলিয়া দেওয়াই ভাল। সংক্ষেপে বলাও হইবে, নীরস অশ্লীলতার ঝাঁঝও এড়ানো চলিবে। সদানন্দের ধারণা হইয়াছিল, মেয়েটি ভাল নয়। মাধবীলতার প্রতিবাদহীন আত্মদান এই ধারণাকে সমর্থনও করিত। কিন্তু সদানন্দ জানিতে পারিলেন, মাধবীলতা কুমারী।

একটা কথা স্পষ্ট বলিয়া রাখি। মাধবীলতা ভাল কি মন্দ এটা তার প্রমাণ দিবার চেষ্টা নয়, আমার মতামতের কথা বলিতেছি না। সদানন্দের ধারণার কথা হইতেছে। আমার মন্তব্য হইতে মাধবীলতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হিসাবে বড় জোর এইটুকু অনুমান করিয়া লইবার অনুমতি দিতে পারি যে, পুরুষ সম্বন্ধে মাধবীলতার অভিজ্ঞতা ছিল না। নয় তো অবসাদে যতই কাবু হইয়া পড়ুক, চাঁদ-হারাণো মাঝরাত্রির অন্ধকারে অচেনা অজানা যায়গায় আনাচে কানাচে যত ভয়ই জমা থাক, বিপিন আর নারায়ণের চেয়ে বিখ্যাত সাধু সদানন্দকে যতই নিরাপদ মনে হোক, সদানন্দের শয্যায় গিয়া সদানন্দের পিঠ ঘেঁষিয়া শুইয়া পড়িবার মধ্যে কোন যুক্তি থাকে না। মশারি ফেলিয়া দিলে যে মশা কামড়াইবে না এ জ্ঞানটা তো মাধবীলতার বেশ টনটনে ছিল।]

আশ্রমের খানিক তফাতে নদীর ধারে একটা মোটা কাঠের গুঁড়িতে সদানন্দ মাঝে মাঝে বসিয়া থাকেন। সেইখানে বিপিন তাঁকে আবিষ্কার করিল। তখনও সূর্য্য আকাশে বেশী উঁচুতে ওঠে নাই। নদীর জল রাতারাতি আরও বাড়িয়াছে, ঘোলাটে জলের স্রোতে এখনও অনেক জঞ্জাল ভাসিয়া যাইতেছে, শুকনো নদীতে অনেকগুলি মাস ধরিয়া যেসব আবর্জ্জনা জমা হইয়াছিল। একটা মরা কুকুরও ভাসিয়া গেল, কাছাকাছি ছোট একটি আবর্ত্তে কয়েকবার পাক খাইয়া। বড় আপশোষ হইতেছিল সদানন্দের, অনুতাপ মিশ্রিত গ্লানি-বোধ। তবু শরীর মন যেন হাল্কা হইয়া গিয়াছে। করুণা ও মমতার ব্যথায় হৃদয় ভারাক্রান্ত, তবু আনন্দের একটা অক্ষয় প্রলেপ পড়িয়াছে, মৃদু ও মধুর।

ব্যাপারটা সদানন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অন্যায়ের শাস্তি ও পুরস্কার কি এমনিভাবে একসঙ্গে আসে ?

বিপিন পাশে বসিতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিপিন বোঝা-পড়া করিতে আসে নাই, ভাব করিতে আসিয়াছে। এ কাজটা বিপিন ভাল পারে না, বন্ধুত্বের ফাটল ঝালাই করার কৌশল তার জানা নাই। রাজপুত্রের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া সদানন্দের ঘরে মাধবীলতার রাত কাটানো লইয়া একটু পরিহাস করিতে যায়, তারপর সদানন্দের মুখ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলে, 'বড় ছেলেমানুষ তুই, রাগিস কেন ? তুই ছাড়া আর কারও ঘরে ওকে থাকতে দিতাম ? তোর কাছে ছিল বলেই নারাণবাবুরও ভাবনা হয়নি, আমারও ভাবনা হয়নি।'

এতবড় তোষামোদেও সদানন্দ খুসী হইল না দেখিয়া বিপিন মনে মনে রাগিয়া গেল। বিপিন রাগিলেই সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে সেটা টের পায়, দুজনের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য ঘনিষ্ঠতা আছে তাদের, একটা অতীন্দ্রিয় যোগাযোগ আছে, বোধ হয় ইন্দ্রিয়ের যখন বিকাশ হইতে থাকে সেই শৈশব হইতে পরস্পরকে তারা ভালবাসিয়া আর ঘৃণা করিয়া আসিতেছে, এইজন্য। কতবার ছাড়াছাড়ি হইয়াছে জীবনে কিন্তু এ জগতে নূতন আর একটি বন্ধুও তারা খুঁজিয়া পায় নাই। ছাড়াছাড়ি যখন হইয়াছে, অপর জন মরিয়া আছে না বাঁচিয়া আছে এ খবরও যখন তারা দীর্ঘকাল পায় নাই, কারও মন এতটুকু খারাপ হয় নাই, আবার যখন দেখা হইয়াছে তখনও হয় নাই আনন্দ। কয়েকটা দিনরাত্রি কেবল তখন একসঙ্গে কাটিয়া গিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে মসগুল হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলিয়া আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া থাকিয়া।

সদানন্দ ঘাড়ে একটা হাত রাখিবামাত্র বিপিন ঘাড় ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকায়, একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় বিপিনের এই ভাবপ্রবণতা, তার ক্রোধে অভিমানের এতখানি ভেজাল।

'তুই যা ভবছিস তা ঠিক নয় সদা, মেয়েটা সত্যি ভাল। ওকে না জানিয়ে নারাণবাবু চলে গেছে বলে সেই থেকে খালি কাঁদছে।'

'নারাণ আর আসবে না ?'

'আসবে,--ওবেলা, নয় তো কাল সকালে। চার পাঁচদিনের মধ্যে একটা ব্যবস্থা করে মাধবীকে নিয়ে চলে যাবে, এ'কটা দিন একটু রয়ে সয়ে কাটিয়ে দে সদা, দোহাই তোর। আর কেউ হলে কি আশ্রমে উঠতে দিতাম? রাজা সায়েবের ছেলে, দুদিন পরে নিজে সব কিছুর মালিক হবে, ওকে তো চটান যায় না, তুই বল, যায়?'

সদানন্দ গম্ভীরমুখে বলিলেন, 'বড়লোকের পা চাটা আর টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটবার জন্য কি আশ্রম করেছিলি বিপিন? তা হলে ব্যবসা করলেই হত?'

বিপিন তর্ক করিল না, হাত জোড় করিয়া হাসিয়া বলিল, 'এ ব্যবসা মন্দ কি প্রভু?'

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'তামাসা রাখ, ভাল লাগে না। দিন দিন তুই যে কি ব্যাপার করে তুলছিস বুঝতে পারি না বিপিন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আশ্রম করা হয়েছিল সব চুলোয় গেছে, তোর খালি টাকা টাকা টাকা! টাকা ছাড়া কিছু হয় না বলেছিলি, টাকা তো অনেক হয়েছে, আবার কেন? এবার আসল কাজে মন দে না ভাই—এসব ছেড়ে দে। আর টাকাই যদি তোর বড় হয়, তুই থাক তোর আশ্রম নিয়ে, আমি চলে যাই। দিন দিন আমার মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমার আর সয় না।'

নালিশটা নতুন নয়, সদানন্দের বলিবার সকরুণ ভঙ্গিতে বিপিন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। একটু ভাবিয়া সে একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল জোরে, যতদূর সম্ভব মর্ম্মাহত হওয়ার ভঙ্গিতে বলিতে লাগিল, 'টাকা? টাকা দিয়ে আমি করব কি? তুই কি ভাবিস টাকার লোভে আমি টাকা রোজগারের ফন্দি আঁটি? কতবার তোকে বলেছি সদা, তুই বুঝবি না কিছুতে, টাকা ছাড়া কিছু হয় না। কত লোক আশ্রমে এসে থাকতে চায়, থাকবার ঘর নেই, ঘর তুলবার টাকা নেই। দক্ষিণের আম বাগানটা কিনে ফেলা দরকার, টাকা আছে কিনবার? এবার যদি নারাণবাবু কিনে ছ্যান। তুই আদর্শ জানিস সদা, কিসে কি হয় জানিস না। বড় কাজ করতে চাইলেই কি করা যায়? করতে জানা চাই। ভেবে ছ্যাখ, এই যে আশ্রমটা হয়েছে, এতগুলি লোক আশ্রমে বাস করছে, দলে দলে লোক এসে তোর উপদেশ শুনে যাচ্ছে, আমি ফন্দি না আঁটলে এটুকুও কি

হত ? রাস্তায় রাস্তায় চীৎকার করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও কেউ তোর কথা শুনতো না। ভাল উদ্দেশ্যে দুটো মিথ্যে কথা, একটু ভড়ং এসবে দোষ হয় না। নারাণবাবু একটা মেয়েকে বের করে এনেছে তো আমাদের কি ? আমরা আশ্রমে উঠতে দিলেও বের করে আনত মেয়েটাকে, না দিলেও বের করে আনত। আমরা শুধু এই সুযোগে আশ্রমের একটু উন্নতি করে নিচ্ছি। এসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাস নি, তোর কাজ তুই করে যা আমার কাজ আমি করে যাই, একদিন দেখবি আমাদের এই আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে।'

বিপিনের এত বড় বক্তৃতার জবাবে সদানন্দ শুধু বলিলেন, 'আশ্রমের নাম সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবার জন্য আমার তো ঘুম আসছে না।'

'ঘুম তোর খুব আসে, মোষের মত ঘুমোস সারারাত। তোর মত শুয়ে বসে আরামে দিন কাটাতে পারলে আমারও ঘুম আসত।'—বলিয়া বিপিন রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

খানিক পরে সদানন্দও ভিতরে গেলেন। ছোট ঘরের চৌকীতে সেই ময়ূর-আঁকা মাদুরে মাধবীলতা চুপ করিয়া বসিয়াছিল। বিপিন বোধ হয় তাকে চা আর খাবার আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু সে খায় নাই। কথা বলিতে গিয়া প্রথমে সদানন্দের গলায় শব্দ আটকাইয়া গেল, তারপর এমন কথা বলিলেন যার কোন মানে হয় না।

'এখানে একা বসে আছ ?'

একটু ইতস্ততঃ করিয়া চৌকীতেই একপাশে বসিলেন। মুখখানা তার অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ও ম্লান হইয়া গিয়াছে। মাধবীলতা একবার চোখ তুলিয়া চাহিল, সরিয়াও বসিল না, কথাও বলিল না। সদানন্দের ইচ্ছা হইতেছিল অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দেন আর কিছুক্ষণের জন্য তাঁর আঙ্গুলগুলি হইয়া যায় পাখীর পালকের চেয়ে কোমল।

'খাবার খাওনি কেন ?'

'খিদে পায় নি।'

'কাল রাত্রে খেয়েছিলে কিছু ?'

মাধবী মাথা নাড়িল।

'তা হলে খেয়ে নাও কিছু। চা'টা বোধ হয় জুড়িয়ে গেছে, গরম করে দিতে বলব ?'

'না, কিছু খাব না। বমি হয়ে যাবে।' মাধবীলতা যেন একটু বিস্ময়ের সঙ্গে সদানন্দের মুখের ভাব দেখিতে থাকে, সদানন্দের মনে হয় তুচ্ছ খাওয়ার কথা লইয়া এত বেশী মাথা ঘামানোর জন্য বিরক্ত হইয়া চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে ভর্ৎসনা করিতেছে। সদানন্দ কাঠের পুতুলের মত বসিয়া রহিলেন। মাধবীলতাকে তাঁর কি বলার আছে ? ভাবিতে গিয়া হঠাৎ মনে পড়িল, একটা কথা বলা যায়, মাধবীলতার ভুলের কথা।

'এমন কাজ কেন করলে মাধবী, কেন বাড়ী ছেড়ে এলে ? ছদিন পরে নারায়ণ যখন তোমাকে ফেলে পালাবে কি করবে তখন তুমি ? সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে ফেলেছ নিজের, একটু ভুলের জন্য। এমন ছেলেমানুষী করে !'

শুনিতে শুনিতে মাধবীলতার ছ'চোখ জ্বল্ জ্বল্ করিতে থাকে, মুখ আরক্ত হইয়া যায়। ইতিমধ্যে সে কখন স্নান করিয়াছে, ভাল করিয়া মোছা হয় নাই বলিয়া চুল এখনও ভেজা। ভেজা চুলের জলপটি থাকা সত্ত্বেও এমন মাথা গরম হইয়া যায় মাধবীলতার যে প্রথমে সে খাবারের প্লেট আর চায়ের কাপটা সদানন্দেকে ছুঁড়িয়া মারে, তারপর বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আঁচড়াইয়া সদানন্দের মুখে রক্ত বাহির করিয়া দেয়। তারপর সদানন্দের কোলে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

এই ধরণের কাণ্ড সদানন্দ আরও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এক যুগেরও বেশী আগে আরেকজনকে এমনিভাবে শান্ত ও সংযত অবস্থা হইতে চোখের পলকে উন্মাদিনীতে পরিণত হইয়া যাইতে দেখিতেন মাঝে মাঝে। তবে সে এভাবে খাবারের প্লেট, চায়ের কাপ ছুঁড়িয়া মারিত না, কোলে মুখ গুঁজিয়া এভাবে কাঁদিতও না, দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া নিজেকে আহত করিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইত। হঠাৎ সদানন্দের মনে হইল, এতক্ষণে যেন বাস্তব জগতে নামিয়া আসিলেন, এতক্ষণে বোঝা গেল ব্যাপারখানা কি। হাত বাড়াইয়া র‍্যাক হইতে একটি গেরুয়া

কাপড় টানিয়া আনিয়া মুখে আঁচড়ের রক্ত আর গায়ে লাগা চা ও খাবার খানিক মুছিয়া ফেলিলেন। মাধবীলতার গায়ে মাথায় পাখীর পালকের মত কোমল আঙ্গুল বুলাইবার সাধটা এখন মেটানো যায়, কিন্তু ও ধরণের কবিত্বপূর্ণ সাধ আর সদানন্দের নাই। মাধবীলতার পিঠে একখানা হাত রাখিয়া তিনি তাকে কাঁদিতে দিলেন। কাঁচা রক্তমাংসে গড়া এতটুকু একটা কোমল মেয়ে, এত কাণ্ডের পর ওকে কাঁদিতে না দিলে চলিবে কেন? কান্না কমিয়া আসে, মাধবী মুখ তোলে না, আরও জোরে সদানন্দকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। বাপ মার আশ্রয় ছাড়িয়া সে আসিয়াছে কিনা কে জানে, বাপ মা তার আছেন কিনা তাও সদানন্দের জানা নাই, তবু এটুকু সদানন্দ অনুমান করিতে পারেন, তাঁরই মত একজনের আশ্রয় ছাড়িয়াই মাধবীলতা আসিয়াছে। হয়তো সে ছিল নির্ম্মম, স্নেহ তার কাছে মাধবীলতা পায় নাই, শুধু নির্য্যাতন সহিয়াছে, হয়তো সে ছিল পরম স্নেহবান, তার আদরে জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য গলিয়া গিয়া মাধবীলতার জীবন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সেই ছিল একমাত্র আশ্রয়, আর কারও কথা মাধবীলতা জানে না। প্রেমিক? এতটুকু মেয়ে, কুমারী মেয়ে, সে প্রেমের কি জানে, প্রেমিকের দাম তার কাছে কতটুকু? খেলার সাথী হিসাবে শুধু তার প্রয়োজন হয় একটু, না হইলেও চলে, একটু মন কেমন করার মধ্যেই সে অভাবের পূরণ হয়।

'মুখ তোলো মাধবী, উঠে বোসো। ভয় নেই, আমি সব ঠিক করে দেব।'

মাধবী উঠিয়া বসিল। আঁচলে ভাল করিয়া চোখ মুছিবার পর তার মুখ দেখিয়া কে বলিবে এইমাত্র সে ক্ষেপিয়া গিয়াছিল!

'আশ্রমে অনেক মেয়ে থাকে, চল তোমাকে তাদের কাছে দিয়ে আসি।'

মাধবীলতা সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চলুন।'

সদানন্দ একটু হাসিয়া বলিলেন, 'আগে মুখ ধুয়ে কাপড়টা বদলে এসো, গালে তোমার সন্দেশ লেগে আছে, কাপড়ে চা ভর্ত্তি।'

মুখ ধুইয়া কাপড় বদলাইয়া মাধবী প্রস্তুত হইলে সদানন্দ তাকে সঙ্গে

করিয়া খিড়কি পথেই বাহির হইলেন। বিপিন বোধ হয় সদরের দিকে কোথাও আছে, তার সামনে পড়িবার ইচ্ছা ছিল না। গোলমাল বিপিন করিবেই, তবে সেটা এখন মাধবীলতার সামনে না ঘটাই ভাল। আশ্রমের দুটি অংশের মধ্যে পায়ে পায়ে দু'তিনটি আঁকা বাঁকা সরু পথ আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে। আর কোন পথ নাই। মাধবীলতা যেন বেশ উৎসাহের সঙ্গেই জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতে থাকে, তপোবনের শোভা দেখিয়া সে যেন খুসী হইয়াছে, ভিজা মাটিতে পা ফেলিয়া হাঁটিতে যেন আরাম লাগে। বলা মাত্র সে যে তাঁর সঙ্গে নূতন একটা আশ্রয়ে যাইতে রাজী হইয়া যাইবে, এটা সদানন্দের কাছে আশ্চর্য্য ঠেকে নাই। এখন তাঁর ভাবনা, ঝোঁকের মাথায় রাজী হইয়া গেলেও শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমে সে থাকিতে চাহিবে কি না। হয়তো নারায়ণ আসিয়া ডাকিলে তার মনে হইবে, আশ্রমে থাকিয়া জীবনটা নষ্ট করার বদলে তার সঙ্গে চলিয়া যাওয়াই ভাল।

তখনও আশ্রমের সকলের ধ্যানধারণা সাধনভজন শেষ হয় নাই। গুরুদেবের পদার্পণে অনেকেরই কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ হইয়া গেল বটে, কয়েকজন আরও বেশী আসন কামড়াইয়া চোখ বুজিয়া রহিল। গুরুদেব খোঁজ করিয়া জানিবেন, সকলে ইতিমধ্যেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়ছে কিন্তু তারা ধ্যান ধারণায় এখনও মশগুল, গুরুদেবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত টের পায় না এমন আত্মহারা। জানিয়া গুরুদেব নিশ্চয় খুসী হইবেন, ভাবিবেন, এরাই তাঁর খাঁটি শিষ্য। আশ্রমে এরকম অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ জন সাতেক অন্ধ ভক্ত বাস করে, অন্য সকলে তুলনায় এদের ভক্তির বাড়াবাড়িতে সদানন্দকে মাঝে মাঝে রীতিমত বিব্রত হইতে হয়। দুজন বিধবা মহিলা আছেন এইরকম, কি যেন একটা সম্পর্কও আছে দুজনের মধ্যে, পিসী ভাইঝির সম্পর্কের মত। একজনের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, শুষ্ক শীর্ণ চেহারা, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজ। বৌরা সকলে ধীরে ধীরে খোলস ছাড়িয়া একে একে অবাধ্য হইতে আরম্ভ করায় এবং ছেলেরা সকলে একজোট হইয়া বৌদের পক্ষ নেওয়ায়, ছেলে বৌ নাতি নাতনীতে ভরা প্রকাণ্ড সংসার ছাড়িয়া আশ্রমে আসিয়া ডেরা বাঁধিয়াছেন।

অপরজনের বয়স কম, বছর ত্রিশেক হইবে। গোলগাল ফর্সা রসালো

চেহারা, হঠাৎ অপদস্থ হইলে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয়, সব সময় মুখে সেইরকম একটা সকাতর লজ্জার ভাব ফুটিয়া থাকে। সংসারত্যাগী বয়স্কা মহিলাটির সঙ্গে সে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাকে অনুকরণ করিয়া চলে। ঘুম হইতে ওঠে একই সময়ে, স্নান ও জপতপ সারে একই সময় ধরিয়া, আহার করে একই খাদ্য,—পরিমাণটা পর্য্যন্ত সমান রাখিতে চেষ্টা করে।

বয়স্কা মহিলাটি অন্য সব অনুকরণে সায় দেন, গোলমাল করেন কেবল খাদ্যের পরিমাণটা লইয়া। বলেন, মরণ তোমার! আমি অম্বুলে রুগী, যা দাঁতে কাটি তাতেই বুক জ্বলে, আমার সাথে পাল্লা দিয়ে খেলে তুই বাঁচবি কেন শুনি? নে, দুধটুকু গিলে ফ্যাল্ দিকি ঢক করে।

অপরজন মিনতি করিয়া বলে, 'বমি হয়ে যাবে পিসীমা—অত দুধ খেলে নিশ্চয় বমি করে ফেলব।'

দুধ তাকে খাইতে হয়, সমস্তটাই। খানিক পরে একটা খোঁচাও খাইতে হয়, কৈ লো রত্নী, বমি হয়ে যাবে বলে? বাঁচতে সাধ না থাকে বিষ খেয়ে মরবি যা, নয়তো গলায় দড়ি দে—না খেয়ে শুকিয়ে মরা চলবে না বাবু আমার কাছে।

এর নাম রত্নাবলী। পিসীমা কখনও ডাকেন রত্নী, কখনও বলেন রতন। পিসীমার নাম উমা। সদানন্দ ছাড়া এজগতে তার নাম ধরিয়া ডাকিবার আর কেউ নাই,—একজন ছিলেন, মাঝে মাঝে নাম ধরিয়া ডাকিতেন, মস্ত সংসারটা গড়িয়া দিয়া তিনি অনেকদিন আগে বিদায় লইয়াছেন, উমা যে সংসার ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছেন, ছেলে বৌ নাতি নাতনীতে বিরাট ভরা সংসার।

মাধবীলতাকে সদানন্দ এদের কাছে জমা করিয়া দিলেন। বলিলেন 'মেয়েটি আজ আশ্রমে ভর্ত্তি হল, মেয়েটির কেউ নেই উমা।'

রত্নাবলী খুসী হইয়া উঠিল, উমা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাধবীলতার দিকে চাহিতে লাগিলেন। বোঝা গেল, আশ্রমে হঠাৎ এই বয়সী একটি মেয়ের আবির্ভাবে তার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হইতেছে, সদানন্দের কাছে যেগুলি মুখে উচ্চারণ করিবার সাহস তার নাই।

ঘরের সম্মুখে কার্পেটের আসন পাতিয়া সদানন্দকে বসিতে দেওয়া হইয়াছিল। কোলের উপর ডান হাতের তালুতে বাঁ হাতের তালু রাখিয়া মেরুদণ্ড সিধা করিয়া দেবতার মত সদানন্দ বসিয়াছেন, আনন্দ বেদনার অতীত ধীর স্থির বিকারহীন একস্তূপ মূর্ত্তিমান শক্তির মত—সংহত ও সচেতন। সোজা উমার মুখের দিকে চাহিয়া বজ্র-গম্ভীর ধমকের আওয়াজে সদানন্দ বলিলেন, 'তুমি কি ভাবছ উমা ?'

আর কি ভাবছ উমা, ধূলায় গড়া ভঙ্গুর পুতুলের মত উমা চুরমার হইয়া গিয়াছেন। পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া উমা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতে থাকেন, মুমূর্ষু জন্তুর মত জীর্ণশীর্ণ দেহটা থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। গুরুদেবের সম্বন্ধে অন্যায় কথা মনে আসিয়াছে, গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে তাহা জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, একি আকস্মিক সর্ব্বনাশের সূচনা !

রত্নাবলীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছে, আশ্রমবাসী আরও যে কয়জন নরনারী ইতিমধ্যে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল তাদের মুখও বিবর্ণ। মাধবীলতা সভয় বিস্ময়ে একবার ভূলুণ্ঠিতা উমার দিকে, একবার সদানন্দের মুখের দিকে চাহিতে থাকে। মানুষের উপর যে মানুষের এতখানি প্রভাব থাকে, একটিমাত্র ধমকে যে কেহ উমার বয়সী নারীকে পায়ের নীচে লুটাইয়া দিতে পারে, মধেবীলতার তা জানা ছিল না। তার নিজের বুকের মধ্যেও ঢিপ্ ঢিপ্ করিতেছে দেখিয়া সে আরও অবাক হইয়া গেল।

সদানন্দ মৃদুস্বরে বলিলেন, 'উঠে বোসো উমা।'

উমা উঠিয়া বসিলে তেমনি মৃদু ও শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, 'মনকে সংযত রেখো। মন হল ঘরের মত, ধূলো-বালি এসে জমা হয়, ঝাঁট দিয়ে সে সব সর্ব্বদা সাফ করে নিতে হয়, নইলে ঘর যেমন আবর্জ্জনায় ভরে ওঠে, মনও তেমনি কুচিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।'

উমা মাথা নীচু করিয়া শুনিয়া যান। সদানন্দের সাংঘাতিক নির্ম্মমতার এই প্রকাশ্য অভিব্যক্তি মাধবীলতাকে ভীত ও সকাতর করিয়া তোলে। যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই পাথরের মূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া সকলে সদানন্দের কথা শুনিতেছিল, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া মাধবীলতা মেঝেতেই বসিয়া পড়িল।

তখন সদানন্দ প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, 'মেয়েটি তোমাদের কাছে থাকবে উমা, তোমরা ওকে দেখাশোনা কোরো। বোসো তোমরা,—আর সকলে কোথায় ?'

একজন শিষ্য তাড়াতাড়ি আশ্রমের সকলকে ডাকিয়া আনিতে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রমের সকলে উমা ও রত্নাবলীর কুটীরের সম্মুখে আসিয়া জমা হইল, আসনে বসিয়া যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছিল সেও। ঈশ্বরকে ডাকার চেয়ে গুরুদেবের ডাক বড়।

ক্রমশঃ

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজ

চার জন অন্ধ একটা পোষা হাতীর কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে বচসা হচ্ছে—হাতী কি রকম জানোয়ার? একজন হাতীর শুঁড় ছুঁয়েছিল; সে বলছে যে হাতী মোটা সাপের মতন। আর এক জন হাতীর কান ধরেছিল; তার সিদ্ধান্ত যে হাতী কুলোর মত। তৃতীয় অন্ধটি হাতীর পা স্পর্শ করেছিল; তার বিচারে হাতী ছোট থামের মত। চতুর্থ অন্ধটি হাতীর লেজ নিয়ে নাড়া চাড়া করেছিল; সে জোর গলায় বলছে, "না রে না, হাতী দড়ির মত।" খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে একটি চক্ষুষ্মান্ লোক অন্ধদের বিবাদ শুনে হাস্‌ছে।

প্রত্যেক অন্ধের উক্তিতে সত্য আংশিক ভাবে সূচিত হয়েছে কারণ হাতীর একটা অঙ্গ ছোট থামের মত, আর একটা অঙ্গ কুলোর মত। কিন্তু আংশিক সত্য বেদান্তের মায়ার মত—পুরো সত্যও নয়, পুরো মিথ্যাও নয়। চক্ষুষ্মান্ লোক বস্তুর বাহ্যিক আকৃতি দেখতে পায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কে অন্ধ বলা বড় দুষ্কর হয়ে পড়ে। জাপানীদের জাপানীরা ভাল বোঝে না চীনেরা ভাল বোঝে? জাপানীদের একটা দিক্ আছে যা' জাপানীরাই ভাল বোঝে। তাদের আর একটা দিক্ আছে যা' চীনেরা এখন ভাল রকম বুঝছে।

হিন্দু সমাজের ভেতরে যাঁরা আছেন, তাঁরা একটা দিক্ দেখেছেন। হিন্দু সমাজের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা আর একটা দিক্ দেখেছেন। উভয় শ্রেণীর দ্রষ্টাই অন্ধ, উভয়েরই মতামত আংশিক সত্য। হিন্দু অন্ধ কারণ তিনি হিন্দুর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আশু বিশ্বাসী এবং তিনি হিন্দু সমাজের উৎকৃষ্টতা বিনা বিচারে মেনে নিতে রাজী। অহিন্দু অন্ধ কারণ তিনি সব সময় হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্মকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন না। হিন্দু সবটা দেখতে পাচ্ছেন না কারণ তিনি ভেতরে আছেন। অহিন্দু সবটা দেখতে পাচ্ছেন না কারণ তিনি বাইরে আছেন। তবে খাঁটি সত্য কোথায় এবং কার কাছে প্রকাশিত হয়েছে? হিন্দু ও অহিন্দুর মতামত একত্র করলে কি পুরো সত্য পাওয়া যাবে? এ সব প্রশ্নের সমাধান করা খুব সোজা নয়। "কোঽদ্ধা বেদ কইহ প্রবোচৎ" অর্থাৎ "কে

জানে ও কে বলতে পারে" এ-জাতীয় প্রশ্নের পরিণতি সংশয়বাদে। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে হিন্দু ও অহিন্দু উভয়েরই মত আংশিক সত্য হিসাবে পাশাপাশি থাক্‌বে যেহেতু এ দুরকম মতই প্রণিধানযোগ্য।

অনেক হিন্দুই ভাবেন যে বিশ্বজগৎ হিন্দুর সমাজব্যবস্থা দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছে এবং হিন্দু সমাজের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরা হিন্দু সমাজে স্থান পাবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে রয়েছেন। হিন্দুদের সভা সমিতিতে একথাও মাঝে মাঝে বলা হয় যে প্রতীচ্য দেশের লোকেরা খৃষ্টধর্ম্মে আস্থা হারিয়ে হিন্দুধর্ম্মের মুক্তির বাণী শোনবার জন্য কান পেতে আছে। যাঁরা এসব বুলি আওড়ান, তাঁরা পশ্চিম দেশের চিন্তাধারার সঠিক খোঁজ রাখেন কিনা সে বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ থাক্‌তে পারে। তবে একথা মেনে নেওয়া যেতে পারে যে অনেক হিন্দুই এসব অকৃত্রিমভাবে বিশ্বাস করেন। তাঁদের বিশ্বাসে ভেজাল নেই। অহিন্দুদের মধ্যে যাঁরা রসিক প্রকৃতির লোক, তাঁদের কাছে এ জিনিষটা বেশ উপভোগ্য ব'লেই বোধ হয়। বিনা পয়সায় যদি প্রহসন শোনা বা দেখা যায়, তা' হ'লে ক্ষতি কি ?

"বাইরে থেকে সমালোচনা করলে হিন্দু সমাজকে আঘাত করাই হবে কিন্তু এতে সমাজের সংশোধন হবে না" এই মামুলি গৎ ভাবপ্রবণ লোকদের মুখে শোভা পায়। যে সমাজ জাগ্রত সমাজ, যে সমাজে লোকদের বুকের পাটা আছে, সে সমাজে এরকম কথা শোনা যায় না। আমূল সমালোচনা সর্ব্বদা বাইরে থেকে আসে। ভেতরে দাঁড়িয়ে কোন সম্প্রদায়কে নিষ্ঠুরভাবে সমালোচনা করতে কেউ সাহস করেন না। যদি কেউ তা' করেন, তা' হ'লে তিনি তৎক্ষণাৎ সমাজচ্যুত হন্‌। নৈয়ায়িক চূড়ামণি উদয়নাচার্য্য লিখেছেন যে যাঁরা সমাজচ্যুত হন্‌, তাঁরাই বৌদ্ধ হন্‌। প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে তীব্র আমূল সমালোচকের স্থান হিন্দু সমাজে নেই। কিন্তু যাঁরা চিন্তাশীল, তাঁরা বাইরের সমালোচনাকে হয়তো একেবারে অগ্রাহ্য করেন না। তাঁরা সমাজের ভেতরে দাঁড়িয়ে বাইরের সমালোচনায় কর্ণপাত করেন এবং সেই সমালোচনার যাথার্থ্য উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেন।

সক্রেটিসের শিষ্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আপনি যে রিপাবলিকের

কথা বলেছেন্, সেটা কোথায় ? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না”। তার উত্তরে সক্রেটিস্ বলেছিলেন, “আমার এই রিপাব্লিকের খসড়া স্বর্গে নিহিত আছে।” গ্রীক্ ঋষির শিষ্য যেমন রিপাব্লিক সম্বন্ধে সন্ধিহান ছিলেন, তেমনি অহিন্দুও হিন্দু সমাজের সত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ ক'রে থাকেন। এরকম সমাজের অস্তিত্ব মর্ত্ত্যে নেই—স্বর্গেও থাকা একেবারে অসম্ভব। সমাজ বলতে সভ্য জগতে যে জিনিষটা বোঝায়, ঠিক সে জিনিষটা হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুদের মধ্যে আছে water-tight compartments—তাঁদের আছে আড্ডা। বিংশ শতাব্দীর এই তৃতীর দশকে যদি কোন লোক ডায়োজিনিসের মত লণ্ঠন হাতে ক'রে হিন্দু সমাজের খোঁজে বের হয়, তাহলে সে দেখবে কায়স্থ সমাজ, ব্রাহ্মণ সমাজ, বৈদ্য সমাজ ইত্যাদি। হিন্দু সমাজ ব'লে কোন বস্তু তার চোখে পড়বে না। এ সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায় শুধু বক্তার বক্তৃতায় ও লেখকের লেখায়। যে লোকসমষ্টিতে পরস্পরের মধ্যে বিবাহ, ভোজন ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে আদানপ্রদানের সম্ভাবনা নেই, সেই লোকসমষ্টিকে সমাজ বলা চলে না। আর আধুনিক ডায়োজিনিস দেখতে পাবে যে জায়গায় জায়গায় বুড়োর দল ও জায়গায় জায়গায় ছোকরার দল “এ বামুন, ও কায়েৎ” ভুলে গিয়ে জটলা পাকিয়ে খুব আস্ফালন ক'রে রাজা মারছে উজির মারছে। এ ব্যাপারে বুড়োদের তেজ ছোঁড়াদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজের সত্তা মায়িক। একথাটি বিদেশীরা খুব ভাল বোঝে এবং তারা এই ছিদ্রের সুযোগ গ্রহণ করতে সর্ব্বদা উৎসুক। যদি ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান দেশ না হয়ে বৌদ্ধ, মুসলমান কিংবা খৃষ্টান হ'তো, তা' হলে' ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির মার্গ এতটা দুর্গম হ'তো না। এ জন্যই ভারতের স্বাধীনতা পথে একটা বড় অন্তরায় হচ্ছে এই তথাকথিত হিন্দু সমাজ। হিন্দু সমাজ বাস্তবিক পক্ষে বিদেশী শাসকসম্প্রদায়ের পরম সুহৃদ। শতধা বিভক্ত হিন্দু সমাজ জাতীয়তার পথে কণ্টকস্বরূপ। এই সমাজের বৈষম্যমূলক বিষাক্ত সংক্রামক হাওয়া ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সমাজগুলিকে কলুষিত করতে পারে। এর ফলে ভারতবর্ষ একটি বিরাট পরস্পরবিরোধী ও অসংলগ্ন গোষ্ঠীসমূহে পরিণত হ'তে পারে। এই পরিস্থিতির আবির্ভাব যথাসময়ে নিবারণ করা প্রত্যেক জাতীয়তাবাদীর কর্ত্তব্য। অস্বাস্থ্যকর বায়ুর সঞ্চালন উদ্ভবস্থলেই

নিবারণ করা যেতে পারে। অসবর্ণ বিবাহ ও বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান বিস্তৃতভাবে প্রচলিত না হ'লে, ভারতে জাতিগঠন অসম্ভব হবে। এ দুটি বিষয়ে ষাট সত্তর বছর ধরে ভারতের অহিন্দু সমাজগুলি জাতীয়তার কাঠামো তৈরী ক'রে আসছে। প্রাচীন স্মৃতিকারদের বিবাহবিধি দরকার মাফিক বদলাতে হবে। বর্ণসংকরের বিভীষিকায় জাতীয়তাবাদী ভারত ভীত হবে না। মনে রাখ্‌তে হবে যে জাতীয়তাবাদের মাঙ্গলিক বার্ত্তা প্রাচীন লেখকেরা শোনেননি। তাই তাঁরা জাতিগঠনের চেয়ে জাতিবিভাগের দিকে বেশী ঝুঁকেছিলেন। আধুনিক গীতাকার বলবেন "সংকরঃ শ্রেয়সে চৈব সংকরঃ শঙ্করায় চ"

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম জাতীয়তাবাদের সহায়ক না পরিপন্থী? সাধারণ হিন্দুর বিচারে এ সংশয় যুক্তিসংগত নয় কারণ তিনি ভাবেন যে হিন্দুয়ানি ও জাতীয়তা এক জিনিষ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষ তো প্রাচীন যুগের আর্য্যাবর্ত্ত নয়। আধুনিক ভারতবর্ষে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, পার্শী আছে, খৃষ্টান আছে, কোল আছে, ভীল আছে। যে চিন্তাপ্রণালী ও কার্য্যপদ্ধতির দ্বারা এই সম্প্রদায়গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা যেতে পারে, তাকেই জাতীয়তাবাদ বলবো। ঐক্য যে শুধু রাজনৈতিক হবে তা' নয়, কৃষ্টিগত ঐক্যও চাই। কৃষ্টিগত অনৈক্যের দরুণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গরমিল দেখা যাবে। প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ঔদ্ধত্য কমতে হবে, প্রত্যেক সম্প্রদায়কে খানিকটা ছাড়তে হবে। হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম জাতীয়তাবাদের সমর্থন করে না বিরোধিতা করে? প্রশ্নটি তোলবার তাৎপর্য্য আছে। আধুনিক ভারতে, যে অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার সঙ্গে হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম খাপ খাবে কি না?

জাতীয়তাবাদ বেশী দিনের পুরানো নয়। পাশ্চাত্য দেশে renaissance-এর পর থেকে এর উৎপত্তি সুরু হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লাম যে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে, তার প্রমাণ সুদূর প্রাচ্যে পাওয়া যায়। চীন দেশে এই তিনটি ধর্ম্মই প্রচলিত আছে। এই তিনটি ধর্ম্মই বিদেশী ধর্ম্ম অর্থাৎ চীনেদের কাছে বিদেশী ধর্ম্ম। জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম পাশাপাশি রয়েছে। জাপানীদের কাছে এই দুটি ধর্ম্মই বিদেশী ধর্ম্ম। চীনে ও জাপানে কয়েক শ' বছর ধরে অনেক লেখকই বৌদ্ধ ও খৃষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ

করেছেন কারণ এ দুটি ধর্ম্মই বিদেশী ধর্ম্ম। চীনের নিজস্ব কংফুশিয়ান নীতি ও জাপানের নিজস্ব শিন্টোধর্ম্ম থাকা সত্ত্বেও খৃষ্টধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম জাতীয়তাবাদের সহায়তা করেছে। চীনের জাতীয় আন্দোলন সুরু করলে সে দেশের খৃষ্টানরা ; জাপানেও নব যুগের বার্ত্তা নিয়ে এল উদীয়মান সূর্য্যের দেশের খৃষ্টভক্তরা। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম্মবিজ্ঞানের শিক্ষক পরমসৌগত অধ্যাপক অনাসখি তাঁর "জাপানী ধর্ম্মের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে খৃষ্টধর্ম্মের দান কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করেছেন।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের একটি কৃষ্টিগত সমস্যা আছে। মুসলমান-বিরোধী শিবাজী যেমন ভারতবাসী ; হিন্দু-বিরোধী আওরেঙ্গজেবও ঠিক তেমন ভারতবাসী। উভয়েরই স্থান ও সার্থকতা আছে। ভারতের ইতিহাস ভারতের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস শুধু হিন্দুয়ানির ইতিহাস নয়। গুপ্তবংশের হিন্দুরাজা যেমন স্মরণীয় ; মুসলমান বংশের আক্‌বরও ঠিক তেমনি স্মরণীয়। তথা-কথিত বৈদিক কৃষ্টির প্রচারক দয়ানন্দ সরস্বতী যেমন ভারতসন্তান, ঠিক্ তেমনি বিগ্রহধ্বংসকারী কালাপাহাড়ও ভারতমাতার সন্তান। দয়ানন্দ বলেন যে ভারতের কল্যাণ সাধিত হবে যদি তাঁর স্বকপোলকল্পিত বৈদিক কৃষ্টি ভারতে অনুষ্ঠিত হয় এবং অহিন্দু ধর্ম্মগুলি ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়। কালাপাহাড় মনে করেন যে ভারতের মঙ্গলসাধন অসম্ভব হবে যদি ভেদমূলক ও হানিকর হিন্দুধর্ম্ম দেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত না হয়। দয়ানন্দ ও কালাপাহাড় উভয়েই ভারতেতিহাসের দুইটি বিরুদ্ধ চিন্তাধারায় প্রতিনিধি। তবে তাঁদের মধ্যে একটা ভৌগলিক ঐক্য আছে। উভয়েরই জন্ম ভারতবর্ষে ; উভয়ই ভারতের আবহাওয়ায় লালিত ও পালিত। ভারতে জাতীয়তাবাদের সমস্যা এইখানে। এই জাতীয়তাবাদে ন্যায়শাস্ত্রের কোন স্থান নেই। এখানে law of contradiction-এর কোন মানে হয় না। এ জন্যই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদকে দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা ব'লে মনে হয়। কিন্তু এই প্রহেলিকা অগ্রাহ্য ক'রে ভারত রাজনৈতিক মুক্তির পথে অগ্রসর হ'তে পারবে না।

শুধু হিন্দু কৃষ্টি ভারতীয় কৃষ্টি নয়, অহিন্দু ও হিন্দুবিরোধী কৃষ্টিও ভারতের জিনিষ। এই ভারতের বুকের ওপর মুসলমান সভ্যতা অনেক শতাব্দী ধরে পুষ্টিলাভ করেছে। এদের সভ্যতাও ভারতীয় সভ্যতা। এই ভারতবর্ষের

দক্ষিণ ভাগে প্রায় আঠার শ' বছর ধরে একটি বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায় খৃষ্টের ভজনা করছে। যখন শঙ্করাচার্য্যের নামও ভারতবর্ষে কেউ শোনেনি, যখন রামানুজ ও চৈতন্যের অস্তিত্ব কোনও ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা কল্পনা করতে পারতেন না, তখন থেকে এই সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম্ম অনুসরণ করে আসছে। এঁদের খৃষ্টানিও ভারতের নিজস্ব। হিন্দুধর্ম্ম যদি বেদমূলক হয়, তা'হ'লে বলতে হবে যে হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি ভারতের বাইরে। ইতিহাস ও ধর্ম্মবিজ্ঞান বলে যে বেদের অনেক দেবতাই Indo-European অর্থাৎ বৈদিক দেবতত্ত্বের উৎপত্তি ভারতের বাইরে। আর্য্যরা এসেছিলেন ভারতের বাইরে থেকে। ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করলে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হিন্দুয়ানি যদি ভারতীয়ত্ব দাবি করে, তা'হ'লে মুসলমান সভ্যতা ও খৃষ্টানির দাবি একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। নৃতত্ত্ববিদেরা আদিম ও অসভ্য জাতিদের জীবন ও চিন্তাধারা সম্বন্ধেও culture শব্দটি ব্যবহার ক'রে থাকেন। ভারতের আদিম ও অসভ্য জাতিদের কৃষ্টিও ভারতীয় কৃষ্টি। বরং এরাই ভারতীয়ত্ব দাবি বেশী করতে পারে—এরা বৈদিক যুগেরও আগে থেকে ভারতবর্ষে বাস করছে। ভারতের আত্মা হিন্দু কৃষ্টিতে যেমন প্রকটিত হয়েছে, ঠিক্ তেমন হিন্দুয়ানির আতিশয্য ও বৃথাড়ম্বর সংযত ও সংকুচিত করবার জন্য ভারতের মনীষা বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও অন্যান্য হিন্দুবিরোধী কৃষ্টিতে রূপায়িত হয়েছে। অহিন্দুর দৃষ্টিতে ভারতের চিন্তাধারার মাহাত্ম্য এইখানে। যাঁরা হিন্দু কৃষ্টি ও ভারতীয় কৃষ্টি সমার্থবোধক ব'লে মনে করেন, তাঁরা একদেশদর্শী। জাতীয়তাবাদ একদেশদর্শিতার ভিত্তিতে কখনও স্থাপিত হ'তে পারে না। চীন ও জাপানের ইতিহাসে দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয়তাবাদ ও খৃষ্টধর্ম্ম চিরশত্রু নয়। এই দুয়ের মধ্যে মিট্‌মাট্‌ ও বোঝাপড়া অনায়াসেই হ'তে পারে। কিন্তু একথা ভুল্‌লে চলবে না যে আধুনিক বাংলার তথা-কথিত জাতীয়তাবাদ সত্যিকার জাতীয়তাবাদ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট হিন্দুজননায়কগণ প্রাগ্‌জাতীয় স্তরের লোক। এঁরা ছিলেন হিন্দুয়ানির প্রচারক। অবশ্য একথা বলতে চাই না যে হিন্দুয়ানি নিয়ে মেতে থাকা খুব খারাপ কাজ। হিন্দুধর্ম্মে যা' কিছু ভাল, যা' কিছু সুন্দর, তা' অহিন্দু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী সাদরে গ্রহণ করবেন। ভারতভাগ্যবিধাতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে জাতীয়তার মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। নানা সামাজিক,

কৃষ্টিগত ও ব্যক্তিগত কারণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে জাতীয়তাবাদের মূলসূত্রটি ধরা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীও এই সকল কারণে তথা-কথিত জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা এড়িয়ে চলতে পেরেছেন।

জাতীয়তাবাদীর কাছে ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। কালীঘাট যেমন পবিত্র, মুসলমানপাড়াও সেরকম পবিত্র কারণ উভয় স্থানের ভৌগলিক সত্তা ভারতবর্ষে; আর ফতেপুরসিক্রী কাশীর চেয়ে কোন অংশে কম পবিত্র নয়। অনেক হিন্দুই প্রায় আক্ষেপ করে থাকেন যে অহিন্দু জাতীয়তাবাদের দিকে ঝোঁকেন না। জাতীয়তার পবিত্র মন্ত্র অহিন্দুকে মুগ্ধ করতে পারে না। কথাটি যদি সত্য হয়, তা'হ'লে অবস্থা অতি শোচনীয় বলতে হবে। এটা ভাববার কথা বটে। কিন্তু এর অন্যতম কারণ খুঁজে বের করা সুকঠিন হবে না। বহু দিন আগে গল্প শুনেছিলাম যে একজন আনাড়ী পুরুত বিয়েবাড়ীতে পৌরহিত্য করতে গিয়ে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়েছিল। মাঝে মাঝে জাতীয়তার পবিত্র যজ্ঞে হিন্দুয়ানির সংকীর্ণ মন্ত্র পড়া হয়। সেজন্যই হয়তো অহিন্দু ভড়কে যান—অশুদ্ধ-মন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট গণ্ডির ভেতর ঢুক্‌তে সাহস করেন না। জাতীয়তায় ঘাড়ে হিন্দুয়ানির বোঝা সময় সময় চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার দরুণ জাতীয়তাবাদ ক্লান্ত ও বিগতশ্রী হয়ে পড়ে। অহিন্দুর কাছে এর মোহিনী শক্তি লোপ পায়। তিনি মা'র ডাকে মা'র গলা শুনতে পান না। অহিন্দু সাড়া দেন না। প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই। জাতীয়তাবাদের রামপ্রসাদী আক্ষেপ অহিন্দু বেশ স্পষ্ট শুনতে পান। কিন্তু সাধারণ হিন্দু এ বিষয়ে বধির।

অহিন্দুর অভিযোগ এই যে সাধারণ হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুকৃষ্টিকে ভালবাসেন কিন্তু ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শেখেননি। এই বিরাট ও বিশাল ভারত—হিন্দু ও অহিন্দুর জন্মভূমি ভারত—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও অন্যান্য অহিন্দু কৃষ্টির লীলাভূমি ভারত সাধারণ হিন্দুর কাছে ভূগোলের একটি অর্থহীন সংজ্ঞা মাত্র। অহিন্দু ভাবেন যে সাধারণ হিন্দুর কাছে ভারতবর্ষ মানে হৃষীকেশ, কামাখ্যা, কাশী, রামেশ্বর। কিন্তু জাতীয়তাবাদের একটি নির্মম ও নিষ্করুণ দিক্ আছে। যিনি জাতীয়তাবাদের এই নৈষ্ঠুর্য্য সইতে পারেন, তিনিই যথার্থ স্বাদেশিকতার সাধক। জাতীয়তাবাদ সময় সময় ধর্ম্মের মোহ ভেঙে দেয় আর কাল্পনিক ধার্ম্মিকতাকে রূঢ়ভাবে আঘাত করে। "নারদ-পঞ্চ-রাত্র"

নামক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে বলা হয়েছে যে এই ভারতবর্ষ কৃষ্ণের জন্মস্থান এবং এই ভারতবর্ষে বৃন্দাবন। এটা বৈষ্ণবের প্রাণের কথা এবং প্রাণের আবেগে যে সৌন্দর্য্য থাকে, সে সৌন্দর্য্য এতে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু জাতীয়তার সুর একটু আলাদা রকমের। যদি কোনও প্রাকৃতিক কিংবা দৈব দুর্বিপাকে এই সমস্ত তীর্থগুলি ভারতবর্ষ থেকে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয় যেমন পুরাকালে প্লেটো-কথিত আট্‌লান্টিক অন্তর্হিত হয়েছিল, তা'হ'লেও ভারত পুণ্যভূমি থেকে যাবে। যদি এই নশ্বর জগতে নশ্বরতার কঠোর বিধানে হিন্দু কৃষ্টির শেষ নিদর্শনটুক এমনকি নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, তা'হ'লেও ভারত পবিত্র ব'লে গণ্য হবে। এরকম পরিস্থিতির সম্ভাবনা সাধারণ হিন্দু নির্বিকারচিত্তে কল্পনা করতে পারেন না। জাতীয়তাবাদের অনুকম্পা-হীনতার পরিচয় এইখানে। জাতীয়তা-বাদ যতখানি পর্য্যন্ত হিন্দুয়ানির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে, ততটা পর্য্যন্তই সাধারণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের সমর্থন করেন। তার বেশী এগুতে সাহস করেন না। অহিন্দুর বিচারে সাধারণ হিন্দুর এই "কিন্তু কিন্তু" ভাব নৈরাশ্যসূচক ব'লে বোধ হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ কাপুরুষদের জন্য নয়—এর আহ্বান বীর্য্যবানেরাই শুনে থাকেন। সুখের বিষয় এই যে হিন্দু ও অহিন্দু উভয় সম্প্রদায়ে সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তা' না হ'লে কংগ্রেসের অস্তিত্ব সম্ভবপর হ'তো না। কংগ্রেস যে নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে একটা বৃহত্তর ও ক্রমশঃ বর্দ্ধমান লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কংগ্রেস্ সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত হোক, এই প্রত্যেক হিন্দু ও অহিন্দু জাতীয়তাবাদীর আন্তরিক বাসনা।

আশানন্দ নাগ

রসিকদাস

প্রাণনাথ শীল আসিয়া ধরিয়া পড়িল, 'মেজোকর্ত্তা আপনার পশ্চিমদিকের ভিটেটা ত জঙ্গলে ভরে রয়েছে, ওটা আপনার কোন কাজেই যখন আস্‌ছে না—'

মিত্তির মশাই বাধা দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "গৌরচন্দ্রিকা রেখে আসল কথাটা বল প্রাণনাথ। ওটা কি তোমাকে দিতে হবে? ছোট বউর জন্য বাড়ী তুল্‌বে নাকি ওখানে?"

প্রাণনাথও বক্রোক্তি করিতে ছাড়িল না, "না। আমার বড় বৌ, ছোট বৌ এক বাড়ীতেই শান্তিতে থাক্‌তে পারে মেজোকর্ত্তা, এ ত আর ভদ্রলোকের বড় লোকের দুই পরিবার নয়, ওরা জানে একটু টু'শব্দ করলেই মুগুরের বাড়ি পড়বে ঘাড়ে।"

ব্যক্তিগত ইঙ্গিতটুকু মিত্তির মশাই লক্ষ্য না করিবার ভাণ করিলেন। কিংবা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন হয়ত। পরলোকগতা দ্বিতীয়া পত্নীর অনেক কথাই হয়ত তাঁহার মনে ভাসিয়া উঠিল—'সে কি সত্যই কলহপ্রিয়া ছিল? বাড়ীর লোকে পাড়ার লোকে তাহাকে যা' বলিয়া ভাবিত সে কি সত্যই তাই ছিল?'

প্রাণনাথ আসল কথায় আসিয়া পড়িল, "না, আমার জন্য নয়; রসিকদাস বৈরাগীর জন্য। সে আমাকে বড় ধরাধরি করছে। পৃথিবীতে আর কেউ নেই, শুধু এক বৌ। বছর খানেক হল বিয়ে করেছে। আজ এখানে কাল ওখানে ঘু্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুঁড়ে বাঁধবার একটু জায়গার জন্য। আপনার ভিটের কোন অনিষ্ট হবে না। এক কোণায় একটু কুঁড়ে বেঁধে দুজনে পড়ে থাক্‌বে। যখন ইচ্ছে হবে তখনই তুলে দেবেন।"

মিত্তির মশাই হাসিলেন, "ভাল প্রজা জুটিয়েছ প্রাণনাথ। অবশেষে বৈরাগী?"

প্রাণনাথ বলিল, "কিন্তু লোক খুব ভাল। আপনার বাড়ীর সব কাজ করবে। একেবারে দাসানুদাস হয়ে পড়ে থাক্‌বে। আপনার ভিটের ফলফুলাদি ত বার ভূতেই লুটে খায়, ও বরং রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আর রসিকের গলা খুব মিষ্টি, সকালে বিকালে এসে হরিনাম শুনিয়ে যাবে। বলেন ত কালই আমি

তাকে আস্‌তে বলে দি। বাট্‌কেমারিতে আর এক বৈরাগীর বাড়ী এসে উঠেছে। তারা আর রাখ্‌তে চাচ্ছে না।”

মিত্তির মশাই কী ভাবিয়া সম্মত হইলেন। মিষ্টি গলার উপর লোভ তাঁহার কম ছিল না। গানের উপর তাঁহার আশৈশব অনুরাগ। চব্বিশ ঘণ্টা বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতে হয়। এক মুহূর্ত্ত অবসর মেলে না। সঙ্গীতচর্চ্চার জন্যও নয়। কিন্তু শেষরাত্রে শোনা যায় তাঁহার গলা। বাড়ীর সবাই জাগিয়া উঠিয়া উৎকর্ণ হইয়া থাকে। এই কঠিন, নিতান্ত বৈষয়িক মানুষটির মধ্যে যে একটি দুর্ব্বল কোমল, ব্যথাতুর মন লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা শুধু এই মুহূর্ত্তেই টের পাওয়া যায়। সকলের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখা জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা আর নিরাশা তাঁহার গানের মধ্য দিয়া কখন যে অজ্ঞাতসারে প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা তিনিও বোধ হয় বুঝিতে পারেন না।

প্রাণনাথ যাহা বলিয়াছিল, পরের দিনই রসিকদাস আসিয়া উপস্থিত। ঘর বাড়ী নাই, কিন্তু সংসারের আর সবই তাহার আছে। দা, কুড়াল, খোন্তা, কিছুরই তাহার অভাব নাই। তাহার তৈজসপত্রে মিত্তিরদের অন্তঃপুরের ছোট উঠানটা একেবারে ভরিয়া গিয়াছে। কর্ম্মী বটে। দুই দিনেই অতদিনের জংলা ভিটাটা একা একা পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছে। তাহার স্পর্শে ভিটাটার চেহারাই একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। যেন একখানা সাজান গুছান ফলের বাগান। মিত্তির মশাই দেখিয়া খুসি হইলেন। জায়গা দেখাইয়া দিলেন ঘর তুলিবার জন্য।

কয়েকদিনের মধ্যেই ঘর উঠাইয়া রসিকদাস বৈষ্ণবীকে লইয়া আসিল। যমুনাকে দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা অবাক হইয়া গেল। বৈরাগী বৈষ্ণবের ঘরে ত দূরের কথা, ভদ্রলোকের ঘরেও এমন সুন্দরী বউ তাহারা আর দেখে নাই। কিরণশশী, রাধির মা, প্রাণনাথের দুই বউ কোন বিষয়েই যাহারা একমত হইতে পারে না, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল যমুনা সুন্দরী বটে।

কিন্তু দেখা গেল প্রাণনাথ একটা কথা সত্য বলে নাই। রসিকদাসের গলা মিষ্টি নয়, আর গান সে বড় একটা গায় না, সপ্তাহে একদিন দুই তিন গ্রামে ভিক্ষা করিয়া আসে। আর ছয়দিন তাহার আর দেখা মেলে না। মিত্তির মশাই যমুনার কাছে খোঁজ লইয়া জানিলেন মাছ মারিতে যায়। “বৈরাগী হইয়া মাছ মারে এ ত বড় আশ্চর্য্য কথা, তোমরা কি গৃহাশ্রমে জেলে ছিলে মা?”

মুখ নিচু করিয়া মাথা নাড়িয়া যমুনা বলে, 'না, নমোশূদ্র'। মিত্তির মশাই লক্ষ্য করেন মাছ ধরিবার কোন সরঞ্জামেরই অভাব নাই রসিকদাসের ঘরে। এ কী রকম বৈরাগী ?

কিন্তু মিত্তির মশাই বেশী দিন অখুসি থাকেন না। প্রায়ই রসিকদাস নানারকমের মাছ দিয়া যায় মিত্তির বাড়ীতে। মিত্তির মশাইর মৎস্যাসক্তি গ্রামের সকলেই জানে। যত দামই হউক বাজারের সেরা মাছ তাঁহার প্রত্যেক দিন কেনা চাই-ই। খাদ্যবস্তুর মধ্যে মাছই তাঁহার সব চেয়ে প্রিয়। ভাত না হইলে তাঁহার বরং চলে কিন্তু মাছ না হইলে এক বেলাও চলে না। রসিকদাস এ তথ্যটি দুইদিনেই সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে।

মাছ ধরিতে রসিকদাসের যত ভাল লাগে, খাইতে তত ভাল লাগে না। মাছ একরকম সে খায়ই না, সর্ব্বদা মাছ লইয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার কেমন যেন একটা অপ্রবৃত্তি আসিয়া গিয়াছে। যমুনাও মাছ তত খায় না, মাছ খাইতে পারিত গুরুদাসী, তখন রসিকদাস এত ভাল করিয়া মাছ মারা শেখে নাই, সামান্য যাহা কিছু পাইত তাহার দুই একটা গুরুদাসীদের বাড়ী দিয়া আসিত। দেখিয়া কী আনন্দ কী উল্লাস হইত গুরুদাসীর।

গুরুদাসী, আজও তাহার কথা ভাবিয়া রসিকদাসের মন কেমন করিতে থাকে। আশ্চর্য্য, এখনও চোখ বুজিলে রসিকদাস পরিষ্কার দেখিতে পায় দুষ্টুমি ভরা চোখে গুরুদাসী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী, ছোটখাট তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা, তিন চার বছরের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত বায়োস্কোপের ছবির মত পরপর রসিকদাসের মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়।

বাবা মারা যাইবার পর বিধবা মা তাহাকে লইয়া মামার বাড়ী চলিয়া আসিলেন। মামারা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। ষাট সত্তর বিঘা খামার। বড় মামা দত্তদের নতুন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। কী উৎসাহ রসিকদাসের। প্রত্যেক বছর নতুন নতুন বই, নতুন নতুন খাতা। এক এক ঘণ্টায় এক এক জন মাষ্টার আসিয়া পড়াইয়া যায়। ক্লাসে প্রত্যেকবার সে ফার্ষ্ট না হয় সেকেণ্ড্ হইয়া উঠে। মুকুন্দ সিক্‌দারের সঙ্গে সে কী হার্ড কম্‌পিটিশান্। অঙ্ক ছাড়া কোন বিষয়েই মুকুন্দ তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিত না, ইতিহাস ভূগোল ইংরেজী বাংলা সব বিষয়েই সে বেশী পাইত। কিন্তু অঙ্কে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ নম্বর বেশী

পাইয়া বসিত মুকুন্দ। আর সেই জন্যই কোন কোন বার তিন চার নম্বরের জন্য মুকুন্দ ফার্ষ্ট হইয়া যাইত। সে নাকি এম-এ পাশ করিয়া কলিকাতার কোন কলেজে প্রফেসারি করিতেছে আজকাল।

গুরুদাসীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা রসিকদাসের বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। শনিবারের হাফ্‌হলিডে। তিন ঘণ্টা ক্লাস হইয়া স্কুল ছুটি হইয়া গেল। কিন্তু চাপিয়া আসিল বৃষ্টি। তাই বলিয়া ক্লাসে বসিয়া থাকা যায় না কি? বই দুইখানা আর রাফখাতাটা কোঁচার খোঁটে জড়াইয়া রসিকদাস বাহির হইয়া পড়িল। লোকাল বোর্ডের অত বড় উঁচু বাঁধা রাস্তার উপর বর্ষার জল প্রায় উঠি উঠি করিতেছে। সামনের খালটা পার হইলেই রসিকদের বাড়ী। কিন্তু কী করিয়া পার হয়? একখানা নৌকাও রসিক দেখিতে পাইতেছে না। ঘাটের দুইখানা নৌকা লইয়াই মামারা সকালে পাট কাটিতে গিয়াছে। তাহারা নিশ্চয়ই এখনও ফিরিয়া আসে নাই। আসিলেও এই বৃষ্টির মধ্যে তাহার গলা তাহারা শুনিতে পাইবে না। বৃষ্টিতে রসিকের কাপড় জামা সবই ভিজিয়া গিয়াছে। নতুন বই দুইখানারও কিছু আর অবশিষ্ট নাই। হঠাৎ রসিক লক্ষ্য করিল এই বৃষ্টির মধ্যেও একটি মেয়ে ওপারে কলার ভেলা বাহিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েটিকে পরিচিত বলিয়া মনে হইল না। বোধ হয় মণ্ডল বাড়ীর কোন আত্মীয় হইবে। নতুন আসিয়াছে। না হইলে এ পাড়ার প্রত্যেককেই ত সে চেনে। এভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আর কতক্ষণ ভেজা যায়। রসিক তাহাকে চেঁচাইয়া ডাকিল। মেয়েটি বোধ হয় তাহার ডাকার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। তৎক্ষণাৎ ভেলা লইয়া এপারে আসিল। বেশ প্রগল্‌ভা। "তুমি ও বাড়ীর কেষ্ট জ্যেঠার ভাগ্নে না? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌ছিলে তবু ডাকনি কেন এতক্ষণ? ভেবেছিলে আমি বুঝি এপারে বেয়ে আস্‌তে পার্‌ব না? মেয়ে মানুষ হলেও তোমার চেয়ে ভাল বাইতে পারি দেখেছ?"

রসিক বিস্মিত হইয়া বলিল, "আমি ত তোমাকে এর আগে কোনদিন দেখিনি? তুমি আমাকে বাইতে দেখ্‌লে কবে?"

গুরুদাসী খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল, "কাল, কাল তুমি এই খাল দিয়ে তোমাদের বড় নৌকা নিয়ে লগি ঠেলে যাচ্ছিলে না? লগি বুঝি ওভাবে বায়? আর একটু হলে ত আমাদের আমগাছের ডালে

তোমার লগি বেধে যেত। আর তুমি টুপ ক'রে পড়ে যেতে জলের মধ্যে। সাঁতার জান ?"

রসিক হাসিয়া বলিল, "না, তুমিই সব জান। কিন্তু তোমার নাম কি? এ গ্রামে কবে এসেছ, কাদের বাড়ী এসেছ ?"

গুরুদাসী একটি একটি করিয়া প্রশ্নের উত্তর দিল, "গুরুদাসী, কাল এসেছি। আমাদের নিজেদের বাড়ী এসেছি। তোমার নাম কিন্তু আমি জানি। দয়ালদাস।"

"মোটেই না। রসিকদাস।"

"যা হোক, দাস ঠিক্ আছে ত ?"

খালের পাড়েই গুরুদাসীদের বাড়ী। সে তাহাকে লইয়া গেল তাহাদের বাড়ীতে।

"আরে এ যে নিতাই মামার বাড়ী।" ঠিক, এতক্ষণে পরে রসিকদাসের সব কথা মনে পড়িল। নিতাই মামা তাহার বড় মামীর কাছে কাঁদিতেছিলেন, "একটি মাত্র মেয়ে বৌঠান, তাও তের বছর বয়সে বিধবা হয়েছে সেদিন। খবর পাঠিয়েছে ভাসুররা নিয়ে আস্‌তে। কানাই যখন বেঁচেছিল তখন একদিনও দাসীকে এখানে আন্‌তে পারতাম না। আর এখন সে মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদিনের জন্যও সেখানে তার বাস করার অধিকার নেই। যাক্ সেই ভাল, কালই আমি তাকে বাড়ী নিয়ে আস্‌ব। যে কদিন বেঁচে আছি তার ভাত কাপড়ের অভাব হবে না।"

গুরুদাসী তাকে গামছা আনিয়া দিল আর একখানা তাহার নতুন সাদা কাপড়, নিতাই কাল হাট হইতে কিনিয়া আনিয়াছে। বলিল, "বৃষ্টি থাম্‌তে এখনও অনেক দেরী রসিকদা। তুমি মাথা মুছে কাপড় ছেড়ে ফেল।"

রসিকের কেমন একটু অস্বস্তি লাগিতেছিল, বলিল, "না, আমি এখনই যাই।"

নিতাই বলিল, "বস না রসিক একটু। বৃষ্টিটা থামুক্। জলে ত আর পড়িসনি। জ্ঞাতি সম্পর্কে আমিও ত তোর মামা হই। আজই না হয় পথের ফকির, দিন মজুরি করি কিন্তু—"

রসিক লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "সেজন্য নয় রাঙা মামা,

বই দু'খানা একেবারেই ভিজে গেছে কিনা, বাড়ী গিয়ে উনানের ধারে ধরব। আজ ত আর রোদ উঠ্‌বে না।"

গুরুদাসী বলিল, "উনান বুঝি আমাদের বাড়ী আর নেই। দাও বই আমার কাছে, আমি শুকিয়ে দিচ্ছি।"

গুরুদাসী বই দু'খানা আর খাতাটা একরকম জোর করিয়াই কাড়িয়া লইয়া গেল। তারপর একটা থালায় করিয়া কিছু মুড়ি আর ঝোলা গুড় লইয়া আসিল। রসিক আপত্তি করিয়া উঠিল, "না, না, না—"

নিতাই বলিল, "খা' না রসিক, গরীব মামার বাড়ী এসেছিস্‌, আমরা ত আর—। একটা ঝুনো নারকেল ছিল না দাসী? সেটা ছুলে কুরিয়ে দে' ত মা।"

তারপর কতদিন, বৃষ্টির দিন, রৌদ্রের দিন, পরীক্ষার দিন গুরুদাসীর কলার ভেলায় সে পার হইয়াছে। রসিকদাস ইচ্ছা করিয়াই অনেকদিন আর কোন নৌকায় পার হয় নাই। স্কুল ছুটি হইয়া গেলেও সে লাইব্রেরীতে বসিয়া বসিয়া বই পড়িয়াছে। অন্য সব ছাত্রের নৌকা যখন চলিয়া গিয়াছে তখন রসিকদাস পার হইতে আসিয়াছে। গুরুদাসীও শাপ্‌লা তুলিবার জন্য এই সময়টা ঠিক বাছিয়া লইয়াছে।

একদিন গুরুদাসী বলিল, "রসিকদা, তুমি আমাকে শুধু দাসী বলে ডাক কেন, বাবার মত? পুরো নাম ধরে ডাক্‌তে পার না? আমি দাসী নাকি তোমার।"

রসিকের মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, "দাসী নয়, সেবাদাসী।"

গুরুদাসীর পাথরের মত কালো মুখখানা তাম্রাভ হইয়া উঠিল। কথাটার অর্থ সে জানে। বৈরাগীরা তারে স্ত্রীদের বলে সেবাদাসী। "ছিঃ, রসিকদা তুমি ভারি বদ্‌। তোমার সঙ্গে আমি আর কথা বল্‌ব না।"

বলিয়া ফেলিয়াই রসিক বুঝিতে পারিয়াছিল কথাটা ভাল হয় নাই, কথাটার অন্য রকম অর্থ হইতে পারে। ভয়ে পাংশু মুখে তাড়াতাড়ি বলিল, "তোর পায়ে ধরি দাসী আমি কোন রকম—" গুরুদাসী কলস্বরে হাসিয়া উঠিয়াছিল, "দাসীর বুঝি পায়ে ধরে? পায়ে ধরে গুরুর। আমাকে গুরু বলে ডাক্‌বে। এক হিসাবে আমি ত তোমার গুরুই। আমার কাছ থেকেই ত তুমি লগি বাওয়া শিখেছ।"

"মেয়েকে বুঝি গুরু বলা যায়? গুরু ত বলে পুরুষকে। গুরুর স্ত্রীলিঙ্গে কি হয় জানিস?"

"না, কী?"

"গুর্ব্বী। তোকে আমি গুর্ব্বী বলে ডাক্‌ব?"

গুরুদাসী বলিল, "দূর—"

রসিক একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে তোর নাম রইল মৎস্যগন্ধা।"

"সে আবার কী?"

"মহাভারতের একটি মেয়ের নাম। ঠিক্ তোর মত। যমুনায় মুনি ঋষিদের পারাপার করত। একদিন পরাশর মুনি—"

হঠাৎ রসিক গম্ভীর হইয়া থামিয়া গেল। গল্পের গন্ধ পাইয়া গুরুদাসী তখন উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, "থামলে কেন, তারপর পরাশর মুনি—"

রসিক আরও গম্ভীর হইয়া বলিল, "না সে ভাল গল্প না।"

গুরুদাসী পাইয়া বসিল, "তা না হোক্, বল্‌তেই হবে।"

রসিক বলিল, "না, সে আমি কিছুতেই বলতে পারব না। তুই বরং মহাভারত থেকে পড়িস।"

"আমি পড়তে পারি বুঝি? তুমি আমাকে পড়ে শোনাবে।"

"না, তা আমি পারব না।"

"তা হ'লে আমিও তোমাকে আর কোনদিন পার করতে পারব না। তোমার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক থাক্‌বে না। আর আমি বাবাকে বলে দেব তুমি আমাকে কী সব খারাপ কথা বলেছ মহাভারত থেকে।"

রসিক শঙ্কিত হইয়া বলিল, "না, না, খবরদার তোর পায়ে ধরি—"

"না, শুধু পায়ে ধরলে কুলোবে না। বল কাল মহাভারত নিয়ে আস্‌বে আমাদের বাড়ীতে দুপুর বেলায়।"

"দুপুর বেলায়? তখন ত আমার স্কুল।"

"পালিয়ে আস্‌বে। কিংবা ছুটি নিয়ে আস্‌বে। বল্‌বে পেটে ব্যথা হয়েছে।"

"কিন্তু নিতাই মামা?"

"বাবা বুঝি দিনের বেলা বাড়ী থাকে কোন দিন? সে ত রোজ সন্ধ্যার সময় ফেরে। ওপাড়া বোসেদের বাড়ী ঘরামির কাজ করে আজকাল জান না?

"আর তোর মা?"

কী একটা অজ্ঞাত উল্লাসে দুজনেরই রোমাঞ্চ হইতেছিল। গুরুদাসী বলিল, "মার অসুখ কদিন হ'ল ভয়ানক বেড়েছে। আজকাল বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তেই পারে না। সে থাক্‌বে উত্তরের ঘরে। আর আমরা পূবের ছাপরায়—" একটু থামিয়া গুরুদাসী বলিল, "মহাভারত পড়ব। আর আমাদের অত ভয়ই বা কিসের? মহাভারত ত শুনেছি খুব ভাল বই।"

রসিকদাস বলিল, "ভাল বই বই কি। না হলে স্কুলে প্রাইজ্ দেয়? আমি যে এবার ফার্ষ্ট প্রাইজ্ পেয়েছি মহাভারত, ফোর্থ্‌ক্লাসে।"

সারারাত রসিকের কেমন একটা উত্তেজনার মধ্যে কাটিল, এই আঠার বছর বয়সের মধ্যে এমন রাত্রি আর আসে নাই। একটা অস্পষ্ট অর্দ্ধপরিচিত নিগূঢ় ইঙ্গিত চুপি চুপি চোরের মত বারে বারে আসে ভীরুর মত, আর সাড়া পাইবামাত্রই দ্রুতপদে ছুটিয়া পলাইয়া যায়, তাহার পালাইবার ভঙ্গিতে আর শব্দে রসিকের বুক্ ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠে।

ভোরে এক বিন্দুও পড়া হইল না, এক একবার মনে হইতে লাগিল কাজ কি গিয়া কিন্তু এটা তাহার মনে কিছুতেই আমল পাইল না। মহাভারত পড়িবে তাহাতে দোষ কি? মহাভারত আগা গোড়া সে মামীদেরও পড়িয়া শুনাইয়াছে। সেকেণ্ড্ পিরিয়াডে ট্রান্‌শ্লেশন। থার্ডক্লাসে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ হেড মাষ্টার সুরেন বাবু ইংরাজী পড়ান। খুব ভালবাসেন তিনি রসিককে। খাতা দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "এ কী করেছ রসিক? এ ধরণের গ্রামাটিকাল মিস্‌টেক্ ত তোমার কোন দিন হয় না?" পরে মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি কোন অসুখ বিসুখ করেছে রসিক?"

রসিক বলিল, জীবনে সে প্রথম মিথ্যা কথা বলিল, "হ্যাঁ, স্যার, পেটে যেন কেমন একটা ব্যথা—"

সুরেন বাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "যাও, যাও এখনি ছুটি নিয়ে যাও। পরের ঘণ্টায় কি, সংস্কৃত? আমি পণ্ডিতমশাইকে বল্‌ব তুমি যাও। আর আগামী দিনে নেক্‌স্‌ট্ দুটো প্যাসেজ রইল।"

রসিক আসিয়া দেখে গুরুদাসী ভেলা লইয়া ঠিক যথাস্থানে অপেক্ষা করিতেছে।

প্রথম সে যুদ্ধের পর্ব্বটা পড়িল, তারপর বলিল 'আজ থাক্', কিন্তু গুরুদাসী ভুলিল না, বলিল, "কাল্‌কের পরাশরের গল্পটা পড়তেই হবে।" অগত্যা রসিক গড়গড় করিয়া পড়িয়া গেল। সবটা শুনিয়া গুরুদাসী বলিল, "কিন্তু আমার গায়ে কি মাছের গন্ধ নাকি যে আমি মৎসগন্ধা হতে যাব?"

"কিন্তু তুই মাছ খেতে ত খুব ভালবাসিস্।"

"আচ্ছা আমি আর মাছ খাব না। ব্রাহ্মণ কায়েতদের বিধবারা মাছ খায় না, আমিও আর খাব না, তাদের মত এক বেলা খাব আতপ চালের ভাত, আর একাদশী করব। কোন্‌দিন একাদশী তুমিই আমাকে পঞ্জিকা দেখে বলে দিতে পারবে। বামুন পাড়ায় আর যেতে হবে না।"

রসিক বলিল, "দূর তার দরকার কি? মাছ না খেলে চোখ খারাপ হয়। আর তুই মাছ ভালবাসিস বলেই ত আমি রবিবারে মাছ ধরতে যাই বিলে।"

"সত্যি?" গুরুদাসীর চোখের কালো তারাদুটি নাচিয়া উঠিল। রসিক বলিল, "দে মহাভারতখানা, আমি এখন যাই।"

"না থাক্ আমার কাছে। আমি ছবি দেখ্‌ব। কাল এসে আবার শুনিয়ে যাবে বাকিটা, কাল ত শনিবার, কাল সকালেই ছুটি হবে তোমার।"

গুরুদাসী বলিয়াছিল বটে মাছ ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু একবেলা মাছ ছাড়া খাইতেই তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। মাছ সে ছাড়িতে পারিল না।

ক্রমে রসিকের সঙ্কোচ কাটিয়া আসিল। কাব্যচর্চ্চা, নিয়মিত অবাধে চলিতে লাগিল। মহাভারতও শেষ হইয়া গেল। আসিল ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, আরব্য রজনী, আর তারপরে 'রমণী হৃদয় রহস্য'। আরও পরে এক বর্ষণমুখর শ্রাবণের সন্ধ্যায় রসিক সে রহস্যের সন্ধান পাইয়া গেল।

নিতাইদের বাড়ী গ্রামের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। তিন দিকে মাঠ আর একদিকে বিঘাখানেক জমি লইয়া দত্তদের বাঁশ বন। আসল গ্রাম একেবারে উত্তর দিকে। নমোশূদ্র পাড়া উত্তর পূব কোণে। নিতাইর সঙ্গে গ্রামের কোন সম্পর্ক নাই, সম্পর্ক নাই নিজেদের সমাজের সঙ্গে। তাহারা সবাই চাষ আবাদ করে, কিছু

না কিছু খামার প্রত্যেকের আছে, আর নিতাই এ পাড়ায় ও পাড়ায়, এ গ্রামে ও গ্রামে দিন মজুরি করে, ঘরামির কাজই করে বেশী, তা' ছাড়া কায়েতবাড়ী ভাত খায়। সমাজের মোড়লরা তাহা সহ্য করিতে পারে না, তাই সে প্রায় একঘরের মতই পড়িয়া ছিল। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে সে ও পাড়ায় যাইত না, ওরাও কেহ নিতাইর বাড়ী আসিত না। কিন্তু প্রধান মোড়ল নিকুঞ্জ সেদিন রাত পোহাইতে না পোহাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, নিতাই পাছে কাজে বাহির হইয়া যায়। নিতাই তামাক সাজিয়া আনিয়া বলিল, "এসো খুড়ো।" নিকুঞ্জ তীক্ষ্ণ একটু হাসিয়া বলিল, "না, তামাক থাক্, একটা কথা বল্‌তে এসেছি নিতাই। ভাত তুমি কায়েত বাড়ী কেন মেথর মুদ্দফরাসের বাড়ী খাও না, কিন্তু তাই বলে সমাজের বুকের উপর বসে এত অনাচার অবিচার—।" নিতাই অবাক হইয়া গেল, আর তাহার পরের কথাগুলি শুনিয়া একেবারে বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িল। নিকুঞ্জ যাইবার সময় বলিয়া গেল, "তুমি আমাকে যাই ভাব না, আমি তোমার বন্ধু, তোমার বাবা আমার যে উপকার করেছিলেন, আমি তা' ভুলব না, তোমার কাশী বৃন্দাবন কিছুই করতে হবে না, এখানে বসেই কাজ হাঁসিল ক'রে দেব, আমার হাতে লোক আছে, তবে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিতে হবে তাকে। তার কমে সে রাজী হবে না। আর দেরী ক'র না বাপু। শুভস্য শীঘ্রম। মরুণী বল্‌ল, এখনও তিন চার মাসের বেশী হয় নি। এর পরে কিন্তু মুস্‌কিল্ হবে। কী বল, নিতাই, তা হলে খবর পাঠাব না কি চড়ুইডাঙায় ?"

নিতাই আত্মসংবরণ করিয়া কোন রকমে বলিতে পারিল, "আচ্ছা কাল আমি তোমাকে বল্‌ব খুড়ো।"

"বল্ হারামজাদি, চুপ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না। বল্ কে সে ? রসিক ? নিশ্চয়ই রসিক। উঃ ছোঁড়াটা বড় স্কুলে পড়ে, ভেবেছিলাম ধর্ম্মে মতি আছে, উপরে বেশ শান্ত শিষ্ট ভদ্র লোক, কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই ?" এক খালুই চিংড়ী মাছ হাতে লইয়া গুরুদাসীদের রান্না ঘরের পিছনে দাঁড়াইয়া রসিক সব কথা শুনিতে পাইল। গুরুদাসীর মার বাঁ দিক্‌টা একেবারে বিছানার সাথে লাগিয়া গিয়াছে বাতব্যাধিতে। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও উঠিতে পারিল না।

অগত্যা শরীরের অর্দ্ধাংশই উত্থিত করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, "খুন ক'রে ফেল, হারামজাদিকে খুন ক'রে ফেল।"

নিতাই ধমক দিয়া বলিল, "আস্তে।" তারপর নিজেই চুপ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এই ত শেষ। তবু গুরুদাসীর সঙ্গে রসিক একবার দেখা করিয়া যাইবে। মাছের খালুই নামাইয়া রাখিয়া রসিক মৃদুভাবে সাঙ্কেতিক শব্দ করিল। তারপর ধীরে ধীরে পিছন দিয়া গিয়া পূবের ছাপরার শিকল খুলিয়া ভিতরে ঢুকিল। একটু পরে গুরুদাসীও আসিল। কিছুক্ষণ আগে সে কাঁদিতেছিল বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এখন তাহার মুখ বেশ শান্ত, ধীর। কী একটা দৃঢ় সঙ্কল্প সে করিয়া আসিয়াছে। বলিল, "যাক, ভালই হল। রান্নাঘরের পিছনে মাছের খালুই দেখেই বুঝতে পেরেছি তুমি এসেছ। ভাগ্য ভাল আমার। শেষ দেখা হয়ে গেল। আর না, এবার বিয়ে টিয়ে ক'রে গৃহস্থ হও, ভয় নেই পেত্নী হয়ে আমি তোমাদের ঘাড় মট্‌কাতে আস্‌ব না", বলিয়া আঁচলের কোণ হইতে ছোট একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, "এই আমার শেষ অবলম্বন।"

এক নিমেষের মধ্যে রসিকের কাছে সব পরিষ্কার হইয়া গেল। গুরুদাসী তাহার মার আফিমের মোড়কটা কৌশলে সরাইয়া আনিয়াছে। রসিক শিহরিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে মোড়কটা কাড়িয়া লইতে গেল। গুরুদাসী একটু সরিয়া গিয়া বলিল, "আর সর্ব্বনাশ ক'র না আমার। বল্‌লাম ত এই আমার শেষ এবং একমাত্র উপায়।"

রসিক পাগলের মত বলিল, "তা হলে আমারও।"

"তুমি তা করতে যাবে কোন্ দুঃখে? পুরুষ মানুষ, বিয়ে টিয়ে করে আবার গৃহস্থ হবে।"

রসিক অদ্ভুতভাবে হাসিল, "সে ত হবই। কিন্তু তার আগে আমাকে ওর খানিকটা দাও ত।"

ঘাড় নাড়িয়া গুরুদাসী বলিল, "উঁহু পোষাবে না। তাতে কারুরই পেট ভরবে না।"

রসিক মরিয়া হইয়া বলিল, "কিন্তু আমরা মরবই বা কেন। চল না, এখান থেকে পালিয়ে যাই, তারপরে বিয়ে করি।"

গুরুদাসী হাসিয়া বলিল, "কী করে পালাবে ? নৌকোয় ? ও, আজকাল বুঝি লগি ঠেল্‌তে শিখেছ।"

"শিখেছিই ত। তুমি রাত বারটা একটায় দাঁড়িয়ে থেক আমগাছ তলায়, আমি আস্‌ব আমাদের ছোট নৌকা নিয়ে।"

"আচ্ছা কিন্তু এখন পালাও শিগ্‌গির খিড়কি দিয়ে। বাবার ডোঙার শব্দ শুনলাম যেন।"

শুইয়া শুইয়া রসিকের অনেক কথাই মনে হইতেছিল। একমাত্র বিধবা মা। মা কি টের পাইয়াছেন ? আজ সন্ধ্যার সময় কেন বলিলেন একথা, "রসিক ক'দিন যাবত একটা কথা তোকে বল্‌ব মনে করছি, কিন্তু তোর দেখাই পাই না। আজ রাত্রে সবাই ঘুমলে একবার আসিস্ ত দক্ষিণ ঘরে আমার কাছে।" রসিক চমকিয়া উঠিয়াছে শুনিয়া। মা নিশ্চয়ই টের পাইয়াছেন। নির্জ্জনে আর কোন্ কথা তিনি বলিবেন। ছোট মামা কয়েক মাস হইল পাটের নৌকা লইয়া কলিকাতা গিয়াছে। বড় মামা সাদাসিধা শান্ত মানুষ, নিজের কাজ ছাড়া সংসারের আর কিছু বোঝেনও না, খোঁজও রাখেন না। কিন্তু তিনিও যেন এ ধরণের কী একটা ইঙ্গিত দিতেছিলেন। কী একটা কাজের অজুহাতে সে তখন এড়াইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু এভাবে ক'দিন আর এড়াইয়া চলিতে পারিবে। পালাইয়া যাওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। মা, পড়াশুনা, স্কলারশিপের জন্য প্রস্তুত হওয়া—সুরেনবাবু বলিয়াছিলেন, একটা স্পেশাল স্কলারশিপ হয়ত সে পাইতে পারে, যদি অঙ্কটা মেক্‌আপ করিতে পারে। কিন্তু না, এসবে তাহার আর অধিকার নাই। সে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা কী করিয়া সম্ভব হইল, এত অসংযম, এত বড় দুঃসাহস তার কী করিয়া হইল ? ভাবিতে ভাবিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ মনে হইল কে যেন দুয়ার ঠেলিতেছে। চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কে, গুরুদাসী ?" এবার চম্‌কাইবার পালা রসিকের মার। এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিলেন, "না, আমি। দোর খোল।"

"কী ব্যাপার ?" অন্ধকারে দিশাহারা রসিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে কম্পিত হস্তে দুয়ার খুলিয়া দিল।

"ও পাড়ার নিতাইদা আমাদের ছোট নৌকো চুরি করতে এসে ধরা পড়েছে। বড়দা বল্‌ছেন ছেড়ে দিতে কিন্তু ভোলা কিছুতেই ছাড়বে না। সে বলছে থানা পুলিশ সে করবেই। তুই দেখ্ গিয়ে যদি তাকে শান্ত করতে পারিস্। ক্ষতি ত বিশেষ কিছু হয়নি শুধু তালা ভেঙেছিল। অনর্থক কেন—" রসিক স্তব্ধ হইয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মা আর দাঁড়াইতে পারিলেন না।

কেলেঙ্কারীর আরও অনেক বাকি। ভোরে খবর আসিয়া পৌঁছিল গুরুদাসী আফিম খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। মরিবার সময় বাঁচিবার জন্য সে বড় আকুলি ব্যাকুলি করিয়াছে শোনা গেল, "মরুণী দি', আমাকে বাঁচাও তোমরা, যা' বলেছিলে তাতেই রাজি হব, আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও ডাক্তার বাবু, উঃ জ্বলে গেল।"

কিন্তু কি মরুণী দি', কি যাদব ডাক্তার কেহ তাহাকে আর বাঁচাইতে পারে নাই।

তাহার পরে অনেক কাণ্ড কেলেঙ্কারী, থানা পুলিশের টানা হেঁচড়া, ঘুষ দিয়া জেলের হাত হইতে কোন রকমে বাঁচিয়া যাওয়া, বাড়ী হইতে এক বস্ত্রে পলাইয়া নবদ্বীপে গৌরগোপাল বাবাজীর কাছে ভেক্ লওয়া, তাহার পর তাঁহার মেয়ে যমুনাকে—। রসিক কি ভাবিতে পারিয়াছিল এত সব কেলেঙ্কারীর পরও আবার সেই সংসারের আসক্তির বাঁধনে বাঁধা পড়িবে?

"কী ভাব ব'সে ব'সে? তোমাকে কোন দিনও যদি একটু হাসিমুখে দেখ্‌লাম। মাছ মারতে যাও বোধ হয় একা একা নির্ব্বিবাদে ভাববার জন্যই?" যমুনা আসিয়া সামনে দাঁড়াইয়াছে। গুরুদাসীর চেয়ে যমুনা অনেক সুন্দরী। কিন্তু আশ্চর্য্য, চোখ দুটি ঠিক গুরুদাসীর মত।

"চিংড়ী মাছ মারতে যাওয়া হচ্ছে বুঝি? বেশ, চিংড়ী মাছ সত্যিই কিন্তু মন্দ লাগে না আজকাল। গাছের একটা চাল কুমড়ও বেশ বড় হয়েছিল। কেটে অর্দ্ধেকটা দিয়েছি কর্ত্তাকে, বাড়ীতে আর অর্দ্ধেকটা আছে। কিন্তু বেশী দূর

যেও না। ধোপাদের ঘাটেই ওরা সব চিংড়ী মাছ ধর্‌ছে শুন্‌লাম। ওখানে দু' এক খেও দিয়ে যা পাও তাতেই হবে। বেশী দেরী ক'র না যেন। বেলা অনেক হয়ে গেছে। আমি ভেবেছি তুমি কখন চলে গেছ। কিন্তু এসে দেখি চুপ্‌ চাপ বসে আছ, এমন মানুষ—"

"না, বেশী দেরী হবে না, তুমি খালুইটা দাও ত।"

রসিকদাস উঠিয়া দাঁড়াইল। যমুনার আজ ইচ্ছা হইয়াছে চিংড়ী মাছ খাইবার। মেয়েরা ঠিক্‌ এইভাবে ঘুরাইয়াই কথা বলে। গুরুদাসীও এইভাবেই বলিত। এই সময়ে কোন ইচ্ছাই নাকি অপূর্ণ রাখিতে নাই। তাতে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

সম্পূর্ণ

প্রথম তোমাকে দেখেছি তোমার
বোনের বিয়ের বাসরে
নিমন্ত্রণের আসরে।
সেদিন তখনো দেখেও তোমাকে দেখিনি,
তুমি যেন ছিলে সূক্ষ্মরেখিনী
ছবির মতো ;—
পেন্সিলে-আঁকা ঝাপসা ধোঁয়াটে লাইনে
চেহারার ঠিক ভিতরদিকের
সন্ধানটুকু পাইনে।
নিজের মনের রং মেলাবার বাটিতে
চাঁপালি খড়ির মাটিতে
গোলাপি খড়ির রং হয়নি যে গোলা,
সোনালি রঙের মোড়ক হয়নি খোলা।
দিনে দিনে শেষে সময় এসেছে আগিয়ে,
তোমার ছবিতে আমারি মনের
রং যে দিয়েছি লাগিয়ে।
বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করতে এসে
আনমনা হয়ে শেষে
কেবল তোমার ছায়া
রচে দিয়ে, ভুলে ফেলে গিয়েছেন
শুরু করেননি কায়া।
যদি শেষ ক'রে দিতেন, হয়তো
হোতো সে তিলোত্তমা,
একেবারে নিরুপমা।

যত রাজ্যের যত কবি তাকে
ছন্দের ঘের দিয়ে
আপন বুলিটি শিখিয়ে করত
কাব্যের পোষা টিয়ে।
আমার মনের স্বপ্নে তোমাকে
যেমনি দিয়েছি দেহ
অমনি এখন সাহিত্যিকেরা কেহ
নাগাল পায় না তার,
আমার দৃষ্টি তোমার সৃষ্টি
হয়ে গেল একাকার।
তুমি যে কেমন আমিই কেবল জানি,
কোনো সাধারণ বাণী
লাগে না কোনোই কাজে।
কেবল তোমার নাম ধ'রে মাঝে মাঝে
অসময়ে দিই ডাক,
কোনো প্রয়োজন থাক্ বা নাই বা থাক্।
অম্‌নি তখন কাঠিতে জড়ানো উলে
হাত কেঁপে গিয়ে গুণতিতে যাও ভুলে।
কোনো কথা আর নাই কোনো অভিধানে
যার এত বড়ো মানে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

|

শব্দব্রহ্মবাদ*

Give me a sentence which no intelligence can understand. There must be a kind of life and palpitation to it, and under its words a kind of blood must circulate for ever. Thoreau.

ভারতে যত প্রকার দার্শনিক মতবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তন্মধ্যে শব্দব্রহ্মবাদ অতি প্রসিদ্ধ না হইলেও অতিশয় চিত্তগ্রাহী। ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব এই শব্দব্রহ্মবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন যে নামই হইল বস্তুর প্রকৃত সত্তা, গুণাবলী তাহাতে অধ্যস্ত হইয়াছে মাত্র, তাঁহাদের চিন্তার প্রাখর্য সহজেই অনুমেয়। কিন্তু কেবল তাহাই নহে। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন নামকে শব্দব্রহ্মবাদী মূল পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে সমস্ত নামও আবার সেই অনাদিনিধন ওঙ্কারেরই বিবিধ বিকাশ-রূপ। এই দিক দিয়া বেদান্তের সহিত শব্দব্রহ্মবাদের যোগ আছে। শব্দে দৃশ্যত্ব, স্পৃশ্যত্ব প্রভৃতি অধ্যস্ত হইয়া যেরূপে তথাকাথত 'বস্তু'র সৃষ্টি করিয়া থাকে, ওঙ্কারেও সেইরূপে বিবিধ গুণের অধ্যাসের ফলে বিবিধ শব্দের উৎপত্তি হয়,—ইহাই শব্দব্রহ্মবাদীর মূল কথা।

এত জিনিষ থাকিতে কেবল মাত্র শব্দকে বস্তুর প্রকৃত সত্তা বলিয়া মনে করিবার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর, "শব্দের" অর্থ sound নহে, name-ও নহে; ইহার প্রকৃত অর্থ idea। ভারতের সর্বপ্রাচীন শব্দব্রহ্মবাদী মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির কথা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয়ঃ—"কিরূপে জানা যায় যে শব্দ, তাহার অর্থ এবং এতদ্দ্বয়ের সম্বন্ধ নিত্য? লোকব্যবহার হইতেই তাহা জানা যায়, কারণ দেখা যায় যে লোকে বিশেষ বিশেষ "অর্থ" (thing) নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতি শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকে, কিন্তু কখনও শব্দ নির্মাণ করিতে চেষ্টা করে না। যে সকল বস্তু কার্যের ফল সেগুলি নির্মাণ করিবার জন্য কিন্তু চেষ্টা করা হইয়া থাকে; যেমন, যে-ব্যক্তির কোন কার্যোপলক্ষে ঘটের প্রয়োজন সে-ব্যক্তি কুম্ভকারের বাড়ী গিয়া বলে, 'একটি ঘট প্রস্তুত করিয়া দাও, আমার

---

* Prabodh Basu Mullick Lecture, No. 9.

তাহাতে প্রয়োজন আছে'। শব্দ ব্যবহার করিতে উৎসুক কোন ব্যক্তি কিন্তু বৈয়াকরণের নিকট গিয়া বলে না যে 'আমাকে শব্দ প্রস্তুত করিয়া দাও, আমি তাহা ব্যবহার করিব'।"* পতঞ্জলির মহাভাষ্যে এই মর্মে আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে সে-সমস্ত আলোচনা করা সম্ভব হইবে না। পতঞ্জলির প্রধান বক্তব্য এই যে ঘটাদির সহিত শব্দ সমপর্যায়ের বস্তু নহে। ঘটাদির কর্তা, প্রযোক্তা, উপাদান প্রভৃতি দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু "শব্দে"র প্রযোক্তা (মনুষ্যাদি) ও উপাদান (ধ্বনি) জানা থাকিলেও কর্তা যে কে তাহা বলা যায় না। সুতরাং শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার্য। এই শব্দ যে sound নহে তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ পতঞ্জলি অর্থের সহিত ইহার নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় যে পতঞ্জলির 'শব্দ' প্রকৃত পক্ষে Plato-র idea ভিন্ন আর কিছুই নহে। Plato ও পতঞ্জলির মতবাদের সাদৃশ্য যে কেবল উৎপত্তিক্ষেত্রেই সংনিবদ্ধ তাহা নহে, উভয় মতবাদের পরিণতিও ঘটিয়াছিল অনুরূপ পন্থায়। খৃষ্ট যাজকদের হাতে পড়িয়া Plato-র আদর্শবাদ ক্রমে ক্রমে বিকৃত হইয়া শেষে পরিণত হইয়াছিল Logos-বাদে ; ভারতেও বোধ হয় শব্দব্রহ্মবাদ হইতেই ক্রমশঃ এখানকার Logos-বাদ মীমাংসা দর্শনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। মীমাংসা দর্শনের "শব্দে"র সহিত শান্তরক্ষিতের আলোচিত শব্দব্রহ্মবাদের বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই, কারণ মীমাংসার "শব্দ" ও বৌদ্ধের বিজ্ঞানের মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ক্ষণিকত্ব ভিন্ন কোন পার্থক্য নাই,—ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। পতঞ্জলির ও শান্তরক্ষিতের শব্দব্রহ্মবাদেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ। শান্তরক্ষিত যে শব্দব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়াছেন তাহাতে "শব্দে"র অর্থ সম্পূর্ণরূপে sound হইয়া না পড়িলেও মুখ্যতঃ তাহা যে ধ্বনি মাত্র তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শব্দব্রহ্মবাদিদের কথা শান্তরক্ষিত প্রথমে সংক্ষেপে একটি কারিকাতেই বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ—

নাশোৎপাদাসমালীঢ়ং ব্রহ্ম শব্দময়ং পরম্।
যত্তস্য পরিণামোঽয়ং ভাবগ্রামঃ প্রতীয়তে ॥ ১২৮ ॥

---

* মহাভাষ্য, Chowkhamba ed., Part 1, p. 24

অর্থাৎ, পূর্বাপর বিভাগশূন্য, অনুৎপন্ন ও অবিনাশী শব্দময় ব্রহ্মেরই পরিণাম হইল রূপাদি ভাবাবলী। এ-সম্বন্ধে বচনও আছে ঃ—

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

এই শ্লোকটি যে কোথা হইতে উদ্ধৃত তাহা কমলশীল বলেন নাই। শান্তরক্ষিতের কারিকায় এই শ্লোকেরই ভাবার্থ দেওয়া হইয়াছে। তবে এখানে একটি কথা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে শব্দই বিবর্তনক্রমে অর্থরূপে জগতে ক্রিয়াশীল হয়, এবং কমলশীল ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিয়া গিয়াছেন যে শব্দ হইল ব্রহ্মেরই অবিকৃত রূপ (শব্দোঽস্যাবিপরীতং রূপম্)। কিন্তু সমস্ত শব্দের এবং সেইজন্য সমস্ত অর্থেরও, প্রকৃতি হইল প্রণব; শব্দাবলী এই প্রণবেরই বিকৃতি মাত্র—এই প্রণবই হইল বেদ। শব্দব্রহ্মকে কেবল তাঁহারাই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন যাঁহাদের চিত্ত অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-ফলের প্রতি নিবদ্ধ।

এ-বিষয়ের প্রমাণ এই। যে সকল বস্তু আর একটি বিশেষ বস্তুর একটি বিশেষ আকারের সহিত সর্বদা সম্বন্ধযুক্ত, সেই সকল বস্তু সেই বিশেষ বস্তু হইতেই উৎপন্ন (যে যদাকারানুস্যূতাস্তে তন্ময়াঃ); ঘটশরাবাদি মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন, এবং মৃত্তিকার আকৃতির সহিত ইহাদের সর্বদাই বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সেইজন্যই ঘটশরাবাদি মৃন্ময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমস্ত ভাববস্তুও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মবশতঃই বিশিষ্ট আকারের শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত; প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক পদার্থ একটি বিশিষ্ট আকারের শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট। আরও দেখা যায় যে শব্দ উচ্চারণ করিলেই পদার্থে তৎসম্বন্ধীয় প্রত্যয় জন্মিয়া থাকে। সেইজন্যই কথিত হইয়াছে ঃ—

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন বর্ততে॥

অর্থাৎ, মানুষের মনে এমন কোন প্রত্যয় জন্মিতে পারে না যাহার সহিত শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই; সকল প্রকারের জ্ঞানই শব্দদ্বারা অনুবিদ্ধ। বস্তু সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যেরূপ সেইরূপেই বস্তুর স্বভাব বিজ্ঞাত হয়; সুতরাং বস্তু যে শব্দাকারানুযায়ী হইয়া থাকে তাহা সিদ্ধ, যেহেতু মানুষের জ্ঞান সর্বদাই শব্দানুযায়ী। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে সমস্তই শব্দময়।

ইহার উত্তরে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

ইতি সংচক্ষতে যেঽপি তে বাচ্যাঃ কিমিদং নিজম্।
শব্দরূপং পরিত্যজ্য নীলাদিত্বং প্রপদ্যতে ॥ ১২৯ ॥
ন বা তথেতি যদ্যাদ্যঃ পক্ষঃ সংশ্রীয়তে তদা।
অক্ষরত্ববিয়োগঃ স্যাৎ পৌরস্ত্যাত্মবিনাশতঃ ॥ ১৩০ ॥
অথাপ্যনন্তরং পক্ষস্তত্র নীলাদিবেদনে।
অশ্রুতেরপি বিস্পষ্টং ভবেচ্ছব্দাত্মবেদনম্ ॥ ১৩১ ॥

অর্থাৎ, যাহারা এই কথা বলে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করি, শব্দব্রহ্ম আপন রূপ পরিত্যাগ করিয়া নীলাদি রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, অথবা শব্দব্রহ্ম কখনই আপন রূপ পরিত্যাগ করে না? যদি বলা যায় যে স্বরূপ পরিত্যাগ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আর শব্দকে অক্ষর বলা যায় না, কারণ তদ্দ্বারা শব্দের পূর্বরূপের বিনাশ স্বীকার করা হইল। অপর পক্ষে যদি বলা যায় যে শব্দ আত্মরূপ পরিত্যাগ না করিয়াই নীলাদি বস্তুতে পরিণত হয়, তাহা হইলে বধির ব্যক্তিও নীলাদির শাব্দিক রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে, কারণ নীলাদি বস্তু ও শব্দ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিন্ন হওয়ায় যাহাই দেখা যাইবে তাহাই শোনা যাইতেও বাধ্য।

পরবর্তী কারিকাতেও এই কথাই বুঝাইয়া বলা হইয়াছে ঃ—

যেন শব্দময়ং সর্বং মুখ্য বৃত্ত্যা ব্যবস্থিতম্।
শব্দরূপাপরিত্যাগে পরিণামানিধানতঃ ॥ ১৩২ ॥

অর্থাৎ, যেহেতু পূর্বপক্ষীর মতে সমস্তই, কেবল গৌণ ভাবে নয়, মুখ্য ভাবেও, শব্দময়, সেই হেতু শব্দরূপ পরিত্যাগ না করিলে পরিণত জগদাদির উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে আর শব্দকে অক্ষর বলা যায় না।—এখানে শান্তরক্ষিত পূর্বপক্ষীর প্রতি অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ শব্দব্রহ্মবাদী কোথাও বলেন নাই জগদাদি মুখ্য ভাবে শব্দময়, বরং স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে শব্দের বিবর্তনক্রমেই জগদাদির উৎপত্তি হইয়াছে (বিবর্ততেঽর্থভাবেন)। কিন্তু ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শান্তরক্ষিত অনুবর্তী কারিকাদ্বয়েও এই কথাই পুনরায় উত্থাপন করিয়াছেন ঃ—

অগৌণে চৈবমেকত্বে নীলাদীনাং ব্যবস্থিতে।
তৎসংবেদনবেলায়াং কথং নাস্ত্যস্য বেদনম্॥ ১৩৩॥

অর্থাৎ, শব্দের সহিত নীলাদির একত্ব যদি গৌণ না হইয়া মুখ্যই হয় তাহা হইলে নীলাদির সংবেদনকালে শব্দেরই বা অনুভূতি হয় না কেন ?

অস্যাবিত্তৌ হি নীলাদেরপি ন স্যাৎ প্রবেদনম্।
ঐকাত্ম্যাস্তিন্নধর্মত্বে ভেদোঽত্যন্তং প্রসজ্যতে॥ ১৩৪॥

অর্থাৎ, শব্দের সহিত নীলাদির একত্ব বাস্তব হইলে শব্দ শোনা না যাইলে নীলাদিও দেখা যাইবে না। অপর দিকে শব্দ ও নীলাদি যদি ভিন্নধর্মী হয় তবে তাহাদের মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধই থাকিবে না।

এ অবস্থায় কেন কোন সম্বন্ধ থাকিবে না ? তাহারই উত্তরে পরবর্তী কারিকায় বলা হইতেছে ঃ—

বিরুদ্ধধর্মসঙ্গো হি বহূনাং ভেদলক্ষণম্।
নান্যথা ব্যক্তিভেদানাং কল্পিতোঽপি ভবেদসৌ॥ ১৩৫॥

অর্থাৎ, এক হইতে বহুকে পৃথক্ করার কারণ এই যে বহুর মধ্যে যে গুণাবলীর সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একত্র কখনও সমন্বিত হইতে পারে না ; অন্যথা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও কোন পার্থক্য করা যাইবে না।— এই কারিকাটির ব্যাখ্যাচ্ছলে কমলশীল অনেক কথার অবতারণা করিয়াছেন ঃ—

একই বস্তু একই সময়ে একই ব্যক্তির দ্বারা উপলব্ধ হইবে এবং হইবে না,—ইহা কখনও সম্ভব নহে ; কারণ এরূপ স্থলে বস্তুর একত্বই আর থাকে না। আর যদি বলা যায় যে বিরুদ্ধ ধর্ম অধ্যস্ত হইলেও একত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে ঘটাদি প্রত্যেক বস্তুতে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তাহা আর সম্ভব হইবে না। কারিকায় "অপি" শব্দ ব্যবহারের দ্বারা বুঝাইতেছে, ব্রহ্মেরই যে কেবল স্বরূপভেদ হয় না তাহা নহে, কারণ ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়া থাকে যে ব্রহ্ম আপনাতে সংনিবদ্ধ থাকিলে কোন ভেদের উদ্ভব হয় না, যেহেতু ভেদ বলিতে বুঝায় বিকার। সেইজন্য, ব্রহ্ম অনাদিনিধন বলিতে বুঝায় না যে ঘটাকারেও ব্রহ্ম অনাদিনিধন ; পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্মই প্রকৃত পক্ষে অনাদিনিধন। ঘটাদির সম্বন্ধে কিন্তু দেখিতেই পাওয়া যায় যে সে সকল

বস্তুর উৎপত্তি ও লয় ঘটিতেছে এবং তাহারা নির্দিষ্ট স্থানও অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

উপরে বলা হইয়াছে, শব্দই যদি পদার্থ হয় তবে বধির ব্যক্তিও বস্তুদর্শনে তাহা শুনিতেও পাইবে ; কিন্তু ব্রহ্ম উপলব্ধির উপযোগী রূপ গ্রহণ করিলে তবে এই আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে। ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় রূপ গ্রহণ করিলে এই আপত্তি আর যুক্তিযুক্ত হইবে না। তখনও কিন্তু এই বলিয়া আপত্তি করা যাইতে পারে যে শব্দ ও নীলাদি যদি অভিন্ন হয়, তবে নীলাদি যখন পরিদৃষ্ট হইতেছে না তখন শব্দও শোনা যাইবে না। ইহার বিরুদ্ধে আর একথাও বলা চলিবে না যে "যে সকল বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ ঘটে সাধারণ ব্যক্তি কেবল সেই সকল বস্তুই দেখিতে পায়" (কারণ এক্ষেত্রে যাহা দেখা যায় না তাহা আশ্রয় করিয়াই যুক্তি উত্থাপন করা হইয়াছে, যাহা দেখা যায় তাহা আশ্রয় করিয়া নহে)।

শব্দব্রহ্মবাদী ইহার উত্তরে বৌদ্ধকে বলিতেছেন :—"আপনাদের ক্ষণিকত্ব যেমন নীলাদি হইতে পৃথক্ না হইলেও নীলাদির অনুভূতির সময়ে অনুভূত হয় না, শব্দও সেইরূপ হইতে পারে।"

বৌদ্ধ। একথা ঠিক নহে। বলা যায় না যে নীলাদির সংবেদনের সময়ে ক্ষণিকত্বের অনুভূতি হয় না ; প্রকৃত কথা এই যে, নীলাদির ক্ষণিকত্ব নির্বিকল্প চিত্তের দ্বারা গৃহীত হইলেও সম্যক্‌রূপে বিনিশ্চিত হয় না, কারণ ভ্রান্তিবশতঃ তাহাতে অন্যান্য গুণের আরোপ হইয়া থাকে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে অনুভবের দিক্ হইতে এই ক্ষণিকত্ব উপলব্ধ হইলেও বিনিশ্চয়ের দিক্ হইতে তাহা অনুপলব্ধই থাকে, এবং এ-ক্ষেত্রে প্রকৃত কোন বিরোধই নাই। শব্দব্রহ্মবাদীর পক্ষে কিন্তু বলা সম্ভব নহে যে শব্দের শ্রুতি ও অশ্রুতি একই সঙ্গে ঘটিতে পারে, কারণ তাঁহার নিকট সকল জ্ঞানই সবিকল্প। বস্তুসত্তার একাংশ উপলব্ধ হয় নাই,—এরূপ কথা তিনি বলিতে পারেন না। আরও বলা যাইতে পারে :—

যন্ন নিশ্চীয়তে রূপম্ তত্তেষাং বিষয়ঃ কথম্।

অর্থাৎ, শব্দব্রহ্মবাদী যে বলিয়াছেন নীলাদি অনুভূত হইলেও বিনিশ্চিত হয় না তাহা ঠিক্ নহে, কারণ যাহা বিনিশ্চিত হয় নাই তাহা বিচারের বিষয়ই

হইতে পারে না। আর কিঞ্চিন্মাত্র অবিকল্প জ্ঞানও যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে আর বলা চলিবে না ঃ—

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ভাবাবলীর শব্দাত্মকত্বের কোন প্রমাণ নাই। ভাবাবলীর ক্ষণিকত্ব অন্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ এবং অনুভূত হইলেও বলা হয় যে তাহা অনিশ্চিত; কিন্তু ভাবের শব্দাত্মতা কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ যে তাহা এইরূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে ?

প্রতিভাবং চ যদ্যেকঃ শব্দাত্মা ভিন্ন ইষ্যতে।
সর্বেষামেকদেশত্বমেকাকারা চ বিস্তবেৎ ॥ ১৩৬ ॥

অর্থাৎ, প্রত্যেক ভাবানুযায়ী একই শব্দাত্মা যদি বিভিন্ন হয়, তবে সমস্ত ভাববস্তু একই স্থান ও একই আকারে সমবেত বলিয়া অনুভূত হইবে। অপর দিকে ঃ—

প্রতিব্যক্তি তু ভেদেঽস্য ব্রহ্মানেকং প্রসজ্যতে।
বিভিন্নানেকভাবাত্মরূপত্বাদ্ব্যক্তিভেদবৎ ॥ ১৩৭ ॥

অর্থাৎ, প্রতি ভাববস্তু অনুযায়ী শব্দাত্মা পৃথক্ হইলে শব্দব্রহ্মের অনেকত্ব আসিয়া পড়িবে, কারণ তখন স্বীকার করিতে হইবে যে বিভিন্ন ব্যক্তির ন্যায় শব্দও বিভিন্ন ও অনেক।

নিত্যশব্দময়ত্বে চ ভাবানামপি নিত্যতা।
তদ্যৌগপদ্যতঃ সিদ্ধেঃ পরিণামো ন সঙ্গতঃ ॥ ১৩৮ ॥

অর্থাৎ, ভাবাবলী বাস্তবিক যদি শব্দময় হয়, তবে শব্দ যেহেতু নিত্য সেই হেতু ভাবাবলীও নিত্য হইবে। এবং এই শব্দময়ত্ব বশতঃ ভাববস্তুর পরিণামও সম্ভব হইবে না, কারণ পরিণাম ঘটিলে বস্তু আর শব্দাত্মক থাকিতে পারিবে না।

শব্দ ও বস্তুর যৌগপদ্যস্থলে পরিণাম যে কেন সম্ভব হয় না তাহাই বুঝাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

একরূপতিরোভাবে হ্যন্যরূপসমুদ্ভবে।
মৃদাদাবিব সংসিধ্যেৎ পরিণামস্তু নাক্রমে ॥ ১৩৯ ॥

অর্থাৎ, একটি রূপ তিরোহিত হওয়ার পর তৎস্থলে অন্য একটি রূপ সমুদ্ভূত

হইলে তবেই প্রকৃত পরিণাম ঘটে,—মৃত্তিকা যেমন আপন রূপ পরিত্যাগ করিয়া তবে অন্য পদার্থে পরিণত হয়। ক্রমানুযায়ী একটি রূপের পর আর একটি রূপ উদ্ভূত না হইলে পরিণাম কখনও সিদ্ধ হয় না।

একই শব্দব্রহ্ম ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হইয়া থাকেন,—একথা ধরিয়া লইলেও যে পরিণাম সিদ্ধ হয় না তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

তথাপি কার্যরূপেণ শব্দব্রহ্মময়ং জগৎ।
তথাপি নির্বিকারত্বাত্ততো নৈব ক্রমোদয়ঃ ॥ ১৪০ ॥

অর্থাৎ, যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে জগৎ শব্দব্রহ্মের পরিণাম রূপে শব্দময়, (শব্দের সহিত অনন্য বলিয়া নহে,)—তাহা হইলেও নিত্যতাবশতঃ শব্দ অবিকারী হওয়ায় ক্রমানুযায়ী কার্যোৎপত্তি কখনও সম্ভব হইবে না ; শব্দ স্বয়ং যখন কার্যোৎপত্তির সম্যক্ কারণ, এবং সেই কারণ যখন সর্বদাই উপস্থিত রহিয়াছে, তখন ভাবাবলী ক্রমানুযায়ী উৎপন্ন না হইয়া এক মুহূর্তে উৎপন্ন হইবে না কেন ?

অন্যান্যরূপসংভূতৌ তস্মাদেকস্বরূপতঃ।*
বিবৃত্তমর্থরূপেণ কথং নাম তদুচ্যতে ॥ ১৪১ ॥

অর্থাৎ, যদি ইহাই হয় যে, যে শব্দ কখনও স্বরূপ পরিবর্তন করে না, সেই শব্দ হইতেই অন্যান্য রূপের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে কিরূপে বলা যায় যে ভাবাবলীর বিবর্তন ঘটিয়াছে ? কারণ বিবর্তনবাদ স্বীকার করিলেই বলিতে হইবে, যাহার বিবর্তন (এখানে শব্দ), তাহার পরিবর্তনও ঘটিতেছে।

পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ আকারের শব্দের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াও অনুমান হয় যে শব্দ হইতেই জগতের উৎপত্তি। এই যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

অতদ্রূপপরাবৃত্তমৃদ্রূপত্বোপলক্ষিতঃ।
কুম্ভকোশাদিভেদেষু মৃদাত্মৈকোঽত্র কল্পতে ॥ ১৪২ ॥
নীলপীতাদিভাবানাং ন ত্বেবমুপলভ্যতে।
অশব্দাত্মপরাবৃত্তিরবীজা কল্পনাপি তৎ ॥ ১৪৩ ॥

* ছাপা হইয়াছে "অন্যোঽন্য..."।

অর্থাৎ, যে সকল বস্তু মৃদ্রূপ নহে তাহাদের সহিত তুলনা করিয়াই মৃদ্রূপ দ্রব্যের মৃদ্রূপত্ব উপলব্ধ হয়; কুম্ভ, কোশ প্রভৃতি দ্রব্যের মৃদাত্মকত্বও এইরূপেই অনুমিত হইয়া থাকে। নীল পীতাদি ভাববস্তুর পক্ষে কিন্তু প্রমাণিত হয় নাই যে তাহারা শব্দেতর কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না (অশব্দাত্মপরাবৃত্তি)। সুতরাং শব্দকেই ভাবাবলীর উৎপত্তির কারণ মনে করা কল্পনা মাত্র।—কমলশীল পঞ্জিকায় এই কারিকা দুইটির অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ—

বিবিধ ভাবাবলী পরমার্থের সহিত একই রূপে অনুগত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেক বস্তুর নিজের এমন একটি স্বভাব আছে যদ্দ্বারা তাহা সজাতীয় অপরাপর বস্তু হইতে বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। বিজাতীয় দ্রব্যাবলীর সহিত ইহাদের পার্থক্য অবলম্বন করিয়া ইহাদের যে সজাতীয়তা অনুমান করা হয় তাহা কাল্পনিক। ঘটশরাবাদি বস্তু মৃন্ময় হইলেও বাস্তবিকই পরস্পর বিভিন্ন; কিন্তু যে সকল বস্তু মৃত্তিকানির্মিত নহে তাহাদের সহিত তুলনায় ইহাদিগকে সজাতীয় মনে করা যাইতে পারে। নীলাদি বস্তুর সহিত শব্দের এই প্রকার কাল্পনিক সজাতীয়তাও কিন্তু সম্ভব নহে, কারণ নীলপীতাদির শব্দময়ত্ব অনুভূতিসিদ্ধ নহে; এবং ইহা অনুভূতিসিদ্ধ না হইলে কিরূপেই বা বলা যায় যে যাহা শব্দ নয় তাহা হইতে নীলাদি পৃথক্ এবং সেই জন্যই বস্ত্বাবলী শব্দময়? সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দব্রহ্মবাদ নিছক কল্পনামাত্র।

পূর্বে বলা হইয়াছে শব্দব্রহ্মবাদ সত্য হইলে সমস্তই একদেশীয় ও একাকার হইয়া পড়িবে (কারিকা ১৩৬)। ইহার বিরুদ্ধে কিন্তু শব্দব্রহ্মবাদী বলিতে পারেন ঃ—

অথাবিভাগমেবেদং ব্রহ্মতত্ত্বং সদা স্থিতম্।
অবিদ্যোপপ্লবাল্লোকো বিচিত্রং ত্বভিমন্যতে॥ ১৪৪॥

অর্থাৎ, এই শব্দব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে সর্বদা অবিভক্ত এবং অবিকৃতই থাকে; কিন্তু অবিদ্যার বশবর্তী হইয়া লোকে ইহার বিবিধ বৈচিত্র্য কল্পনা করিয়া থাকে।—এইখানে স্পষ্টই বেদান্তের কথা আসিয়া পড়িল। কমলশীল এই কথা বুঝাইবার জন্য দুইটি সরল শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু এ দুইটি যে কোথা হইতে গৃহীত তাহা বলেন নাই ঃ—

যথা বিশুদ্ধমাকাশং তিমিরোপপ্লুতো জনঃ।
সঙ্কীর্ণমিব মাত্রাভিশ্চিত্রাভিরভিমন্যতে॥
তথেদমমৃতং ব্রহ্ম নির্বিকারমবিদ্যয়া।
কলুষত্বমিবাপন্নং ভেদরূপং বিবর্ততঃ॥

খুব সম্ভব এই শ্লোকদ্বয় বেদান্তের ব্রহ্ম সম্বন্ধেই রচিত হইয়াছিল। ইহার উত্তরে বিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন ঃ—

তত্রাপি বেদ্যতে রূপমবিদ্যো৲প্লুতৈর্জনৈঃ।
যন্নীলাদিপ্রকারেণ ত্যাগাদানে নিবন্ধনম্॥ ১৪৫॥
তদ্রূপব্যতিরেকেণ ব্রহ্মরূপমলক্ষিতম্।
কথং ব্যুত্থিতচেতোভিরস্তিত্বেন প্রতীয়তে॥ ১৪৬॥

অর্থাৎ, অবিদ্যার বশে লোকে নীলাদি যে সকল বিভিন্ন রূপ দেখিতে পায় সেইগুলিই হইল বিষয়াবলীর ত্যাগ (exclusion) ও আদানের (inclusion) ভিত্তি; সেই সকল রূপ ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মের অপর কোন রূপ পরিলক্ষিত হয় না; এইরূপ ব্রহ্মের অস্তিত্ব জাগ্রতচিত্ত ব্যক্তি কেন স্বীকার করিবে?—শান্তরক্ষিত এখানে যাহা বলিলেন তাহা অনেকটা Plato-র বিরুদ্ধে Aristotle-এর উক্তির মত। Plato বলিয়াছিলেন যে বাস্তব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি আদর্শ আছে, এবং যে অনুপাতে বস্তু এই আদর্শের নিকটবর্তী হয় সেই অনুপাতেই বস্তু বাস্তব হইয়া উঠে। এক কথায় Plato-র মতে বাস্তব সম্পূর্ণভাবে আদর্শের অধীন। Aristotle-ও ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে ইহাই সম্পূর্ণ সত্য নহে। তিনি বলেন, বাস্তব যেরূপে আদর্শের অধীন, আদর্শও ঠিক সেইরূপেই বাস্তবের দাস, কারণ বাস্তবের বাহিরে আদর্শের কোন অস্তিত্বই নাই। শান্তরক্ষিতও এখানে এই কথাই বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, নীলাদি বাস্তব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত একটি ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ন তৎ প্রত্যক্ষতঃ সিদ্ধমবিভাগমভাসনাৎ।
নিত্যাদুৎপত্ত্যযোগেন কার্যলিঙ্গং চ তত্র ন॥ ১৪৭॥

ধর্মিসত্ত্বাপ্রসিদ্ধেস্তু ন স্বভাবঃ প্রসাধকঃ।
ন চৈতদতিরেকেণ লিঙ্গং সত্তাপ্রসাধকম্ ॥ ১৪৮ ॥

অর্থাৎ, সেই অবিভক্ত অদ্বয়লক্ষণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, কারণ অবিভক্তাবস্থায় ব্রহ্মের বিকাশরূপই নাই; এবং যেহেতু সেই ব্রহ্ম নিত্য এবং উৎপত্তিরহিত, সেইজন্য ব্রহ্মের কোন কার্যও নাই যাহা হইতে তাহার কারণস্বরূপ সেই ব্রহ্মের অনুমান সম্ভব হইবে। এখানে ব্রহ্মরূপ ধর্মীর সত্তাই এখনও অপ্রমাণিত; সুতরাং সেই ধর্মীর কোন ধর্ম অবলম্বন করিয়া তাহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু ইহা ব্যতিরিক্তও এমন কোন হেতু নাই যদ্দ্বারা ব্রহ্মের সত্তা প্রমাণ করা যাইতে পারে।—ইহার উপর টিপ্পনীতে কমলশীল নৈয়ায়িকসুলভ অনেক কূট তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নূতন কথা বিশেষ কিছু নাই।

পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে তাহারই অবতরণিকা স্বরূপ কমলশীল একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

জ্ঞানমাত্রার্থকরণেঽপ্যযোগ্যং ব্রহ্ম গম্যতাম্।
তদযোগ্যতয়া রূপং তদ্ধ্যবস্তুত্বলক্ষণম্ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিতেও ব্রহ্মের সামর্থ্য নাই, এবং সেইজন্য অবস্তুই যে ব্রহ্মের রূপ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই কথাই বুঝাইবার জন্য শান্তরক্ষিত বলিতেছেন ঃ—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ক্রমাৎ সিদ্ধং ক্রমবৎ সর্বমন্যথা।
যৌগপদ্যেন তৎকার্যং বিজ্ঞানমনুষজ্যতে ॥ ১৪৯ ॥
জ্ঞানমাত্রেঽপি নৈবাস্য শক্যরূপং ততঃ পরম্।
ভবতীতি প্রসক্তাস্য বন্ধ্যাসূনুসমানতা ॥ ১৫০ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞানের (consciousness) কার্য যে বিজ্ঞান (cognition) তাহা ক্রমানুযায়ী কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, নতুবা সর্ব বিষয়ের বিজ্ঞান একই সঙ্গে সাধিত হইয়া যাইত। ত্যাগ (exclusion) ও আদান (inclusion) ভিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞানের আর কোন শক্যরূপ নাই, সুতরাং তাহা বন্ধ্যাপুত্রের মতই অলীক।—দ্বিতীয় কারিকাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট হইলেও কমলশীলের কথা হইতে

ইহার অর্থোদ্ধার করা সম্ভব। যাহা বাস্তব কিছু সম্পাদন করিয়া থাকে তাহারই কেবল অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে (অর্থক্রিয়াকারিত্ব)। জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের কার্য কিন্তু ত্যাগ ও আদান ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহাতে নূতন কিছুর উৎপত্তি হইতেছে না। সুতরাং তাহা অলীক।

কমলশীলের এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। Bertrand Russell প্রমুখ আধুনিক দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়া থাকেন যে জ্ঞানের অর্থ শ্রেণীবিভাগ করিবার ক্ষমতা। 'আমি কোন জিনিষ জানি' বলিতে এইমাত্র বুঝায় যে ঐ বিশেষ জিনিষটি আমার মতে কতকগুলি জিনিষের সহিত সমজাতীয় এবং অপর কতকগুলি জিনিষ হইতে ভিন্নজাতীয়। বস্তু সম্বন্ধে মানুষের তথাকথিত জ্ঞান ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কমলশীল এখানে ঠিক এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তিনি যে বলিয়াছেন ত্যাগ ও আদান ভিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞানের আর কোন রূপ নাই, আমার মতে তাহার অর্থ "শ্রেণীবিভাগ করিবার ক্ষমতাই হইল জ্ঞান।" অবশ্য "ত্যাগ" ও "আদান" এখানে অন্যভাবেও অনুবাদ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে অর্থসাধুত্ব হয় বলিয়া মনে হয় না।

পূর্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন, সাধারণের বুদ্ধির অগোচর বলিয়াই যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নাই তাহা বলা যায় না; বিশুদ্ধচিত্ত যোগিগণ সেই ব্রহ্ম বাস্তবিকই উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু তাহাও যে সম্ভব নহে তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

বিশুদ্ধজ্ঞানসন্তানা যোগিনোঽপি ততো ন তৎ।
বিদন্তি ব্রহ্মণো রূপং জ্ঞানে ব্যাপৃত্য সঙ্গতেঃ॥ ১৫১॥

অর্থাৎ, বিশুদ্ধ জ্ঞানসন্ততি বিশিষ্ট যোগিগণও ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন না, কারণ তাঁহাদের পক্ষেও বিশুদ্ধ জ্ঞানটিকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত করা প্রয়োজন; কিন্তু তাহা হইলে জ্ঞানটি আর বিশুদ্ধ থাকে না। —যোগীকে যদি যোগজ জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার করিতে না হইত তবে যোগীও ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা কখনও হয় না।

ইহার উত্তরে কিন্তু আপত্তি করা যাইতে পারে যে ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহারই সাহায্যে যে যোগিগণ ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া থাকেন তাহা নহে,

কারণ ব্রহ্মের অতিরিক্ত যোগীও নাই যোগিজ্ঞানও নাই ; যোগাবস্থায় যোগী আপনারই জ্যোতির্ময় রূপে প্রকাশিত সেই ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ। তাহাই যদি হয় তবে জিজ্ঞাস্য যোগাবস্থার পূর্বে ব্রহ্মের কি রূপ ছিল ? ব্রহ্মের রূপ যদি সর্বদাই জ্যোতির্ময় হয় তবে অযোগাবস্থা আর সম্ভব হইবে না, কারণ ব্রহ্মবাদী বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম আত্মারই জ্যোতির্ময় রূপ। তাহা হইলে বিনা আয়াসেই সকলের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিয়া যাইবে, কারণ ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। আর আপনারা যদি বলেন যে স্বপ্নাদ্যবস্থায় অদ্বয়জ্ঞানও যেমন বিবিধ আকার গ্রহণ করিয়া প্রতিভাসিত হয় ব্রহ্মও সেইরূপ অশুদ্ধ বিজ্ঞানসন্ততি বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট অবিদ্যার প্রভাবে সেইরূপে প্রকাশিত হন, তবে তাহাও সম্যক্ উত্তর হইবে না। কারণ ব্রহ্মের বাহিরে এমন কোন অবিশুদ্ধ বিজ্ঞানসন্ততি থাকিতে পারে না যাহা ঐরূপ অবিশুদ্ধাকারে প্রতিভাত হইবে। আর যদি বলেন যে ব্রহ্ম আপনাতেই ঐ রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে মোক্ষ আর সম্ভব হইবে না, কারণ ব্রহ্ম যখন সর্বদাই অদ্বয়রূপে প্রকাশিত তখন নূতন এমন কোন জ্ঞানের সম্ভাবনাই নাই যাহার দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব হইতে পারে। আমরা কিন্তু বলিয়া থাকি যে বিশুদ্ধ জ্ঞানোদয়ের পর তবে মোক্ষলাভ হয়, —একথা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত।

তাহার উপর আপনাদের মতে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ কোন অবিদ্যাও থাকিতে পারে না যাহার বশে ব্রহ্ম বিবিধ বিশেষ রূপে বিকাশ লাভ করিতে পারেন। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে, ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্ যে অবিদ্যা তাহারই প্রভাবে ব্রহ্ম বিবিধরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। যদি বলা যায় যে অবিদ্যার বশেই ব্রহ্মের বিবিধরূপে বিকাশ (খ্যাতি) ঘটিয়া থাকে বলিতে বুঝায় যে ব্রহ্মই অবিদ্যাত্মক, তাহা হইলে স্বীকার করা হইল যে মোক্ষলাভ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। কারণ নিত্য ও একরূপ ব্রহ্মেই যদি অবিদ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়া থাকে তবে আত্মার অবিদ্যার অপসরণ কিরূপে সম্ভব হইবে ?

যদি স্বীকার করা যায় যে অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, তাহা হইলেও অবিদ্যা সেই নিত্য ও অনাধেয় ব্রহ্মের কোন ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে না ; সুতরাং বলা চলিবে না যে অবিদ্যার প্রভাবেই ব্রহ্ম হইতে বিবিধ রূপের বিকাশ

ঘটিতেছে। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ না থাকিলে জগৎ সংসারের উৎপত্তিই আর সম্ভব হইবে না।—শব্দব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকের মত এইরূপে খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধ এইবার বিজ্ঞানবাদের উৎকর্ষ প্রতিপাদনে উদ্যত হইলেন। এই অংশে বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান কথা আছে।

বৌদ্ধ বলিয়া চলিলেন ঃ—

আমাদের মতে কিন্তু অন্যায়রূপে কোন কিছুর প্রতি চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিবার বাসনার নামই অবিদ্যা (বিতথাভিনিবেশবাসনৈবাবিদ্যা), এবং এই বাসনাই হইল শক্তি। শক্তি বলিতে বুঝায় কারণাত্মক জ্ঞানের যাহা সার (শক্তিশ্চ কারণত্মকজ্ঞানাত্মভূতৈবেতি)। সেইজন্যই পূর্ব পূর্ব অবিদ্যাত্মক জ্ঞানই কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে, এবং অন্যায় অভিনিবেশের ফলে ইহার উত্তরোত্তর যে জ্ঞান জন্মায় তাহাকেই বলে কার্য; সুতরাং অবিদ্যাবশেই যে বিবিধ প্রকার খ্যাতি ঘটিয়া থাকে,—একথা আমাদের মতে যুক্তিসঙ্গত।* এই অবিদ্যাসকল দৌর্বল্যের তারতম্য অনুসারে (অসমর্থতরতমক্ষণোৎপাদক্রমেণ) যোগাভ্যাসের দ্বারা একে একে অপসারিত হইলে পরিশুদ্ধ জ্ঞানসন্তানের উদয় হয়, এবং তাহা হইতেই ঘটে মুক্তি। এই মতে বন্ধ ও মুক্তির ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু আপনাদের মতে এরূপ সন্তোষজনক কোন ব্যবস্থা সম্ভব নয়, কারণ আপনাদের ব্রহ্ম নিত্য ও একরূপ হওয়ায় তাহাতে একই সঙ্গে মুক্তি ও বন্ধ এই দুই অবস্থা সুসঙ্গত হইতে পারে না। উপরন্তু আপনাদের মতে ব্রহ্ম যেহেতু এক সেই হেতু একজনের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি হইয়া যাওয়া উচিত; অথচ সেই হেতুই, একজনও অমুক্ত থাকিতে কাহারও মুক্তি হইতে পারিবে না! ···সুতরাং আপনাদের এই শব্দব্রহ্মবাদ সর্বৈব মিথ্যা।

ইহাই "তত্ত্বসংগ্রহে" শব্দব্রহ্মবাদের আলোচনার সমাপ্তি। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। শান্তরক্ষিত প্রকৃতপক্ষে কোথাও শব্দব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই; তিনি প্রথমে শব্দবাদ ও শেষে ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়াই কর্তব্য শেষ করিয়াছেন।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

---

* তেন পূর্বপূর্বতঃ কারণভূতাদবিদ্যাত্মনো জ্ঞানাদুত্তরোত্তরকার্যজ্ঞানস্য বিতথাকারাভিনিবেশিন উৎপত্তেরবিদ্যাবশাত্তথাখ্যাতির্যুক্তা।

ভারতপথে*

(২৫)

অতঃপর উকিল মামুদ আলি উঠে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড রসিকতা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, মঞ্চের ওপর তাঁর মক্কেলেরও জায়গা হ'তে পারে কিনা—এ দেশের লোকেদেরও মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হয়, যদিও মেজর ক্যালেণ্ডার অবশ্য তা মনে করেন না, কেন না তিনি সরকারি হাঁসপাতালের কর্ত্তা।

মিস ডেরেক অমনি মন্তব্য করলেন, "কি সূক্ষ্ম রসিকতা, আহা, মরে যাই।"

মিষ্টার দাশ কি করেন দেখবার জন্যে রণি তাঁর মুখের দিকে তাকালো। ভদ্রলোক উত্তেজিত হ'য়ে মামুদ আলিকে খুব কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিলেন।

"মাপ করবেন—।" কলকাতা থেকে যে নামকরা ব্যারিষ্টার এসেছিলেন এবার তাঁর পালা। ভদ্রলোক খাসা দেখতে, লম্বাচওড়া দেহ, মাথার চুল আধপাকা, আর খুব ছোট ক'রে ছাঁটা। একেবারে খাস অক্‌স্‌ফোর্ডের ভঙ্গীতে উনি বললেন, "মঞ্চের ওপর অতজন সাহেব মেম থাকাতে আমাদের আপত্তি আছে। ফলে, আমাদের সাক্ষীরা ভয় পেতে পারে। ওঁদের উচিত হলঘরে নেমে আর সকলের সঙ্গে বসা। মিস কেষ্টেড অসুস্থ, উনি মঞ্চের ওপরেই থাকুন, তাতে কারও কিছু আপত্তি হ'তে পারে না; ওঁর সম্বন্ধে কখনই আমাদের সৌজন্যের কোনো ক্রুটি ঘটবে না—পুলিশ সাহেব যে-সব বৈজ্ঞানিক তথ্য ব্যাখ্যা করেছেন তা সত্ত্বেও; তবে অন্যদের সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি আছে।"

মেজর সাহেব খাপ্পা হ'য়ে বললেন, "বাজে কথা রেখে এখন রায়টা কি শোনা যাক্।"

---

* E. M. FORSTER-এর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস A PASSAGE TO INDIA আদ্যন্ত সমান উপাদেয় হইলেও আকারে এত বড় যে সম্পূর্ণ বইখানির তর্জ্জমা ধারাবাহিক ভাবেও প্রকাশযোগ্য নহে। সেই জন্য অগত্যা আমরা আখ্যায়িকার সারটুকুই নিয়মিতরূপে মুদ্রিত করিব। কিন্তু হিরণকুমার সান্যাল মহাশয় সমগ্র গ্রন্থখানিই ভাষান্তরিত করিতেছেন এবং নির্ব্বাচিত অংশের প্রকাশ 'পরিচয়ে' সমাপ্ত হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।—পঃ সঃ

নামকরা ব্যারিষ্টার মহোদয় সমীহের সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে তাকালেন।

মিষ্টার দাশ নিরুপায় হয়ে কাগজপত্রের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিলেন। তিনি বললেন—"হ্যাঁ, তা ঠিক। আমি এখানে উঠে বসবার অনুমতি দিয়েছিলাম শুধু মিস কেষ্টেডকে। তাঁর বন্ধুরা যদি দয়া ক'রে নেমে যান—।"

রণি বলে উঠল, "বেশ করেছেন, দাশ, একেবারে ঠিক।"

টার্টন-গিন্নি ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, "নেমে যেতে হবে! আস্পর্দ্ধার আর শেষ নাই!"

তাঁর কর্ত্তা চুপিচুপি বললেন, "গোলমাল কোরো না, মেরি, নেমে এস।"

"কিন্তু, আমার রোগীকে আমি একলা ছেড়ে যেতে পারি না।"

"মিষ্টার অমৃতরাও, ডাক্তার সাহেব থাকাতে আপনার আপত্তি আছে?"

"তা আছে। মঞ্চ মানেই হোলো কর্ত্তৃত্ব।"

কালেকটার সহেব হাসবার চেষ্টা ক'রে বললেন, "এক ফুট উঁচু মঞ্চ হ'লেও? তা বেশ, সবাই না হয় নেমেই পড়ো।"

মিষ্টার দাশ ভারি আশ্বস্তির সঙ্গে বললেন, "মশায়, আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি; মিষ্টার হিসলপ, আর মহিলাবৃন্দ, আপনারা সবাই আমার ধন্যবাদ জানবেন।"

অতঃপর দলবল শুদ্ধ সবাই—মায় মিস কেষ্টেড—ওঁদের ক্ষণিকের উচ্চাসন থেকে অবরোহণ করলেন। দেখতে দেখতে ওঁদের দুর্গতির কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, বাইরে লোকে এই নিয়ে চেঁচিয়ে টিটকারি দিতে লাগল। ওঁদের জন্যে যে-সব আলাদা চেয়ার আমদানি হয়েছিল সেগুলিও ওঁদের পিছন পিছন নেমে এল। মামুদ আলি রাগের চোটে একেবারে আত্মহারা হয়েছিল—এই চেয়ারগুলি সম্বন্ধেও তার আপত্তি হোলো; কার হুকুমে এগুলি এসেছিল, নবাব বাহাদুরের জন্যে একটাও দেওয়া হয়নি কেন? ইত্যাদি। ঘর শুদ্ধ লোকে নানা মন্তব্য সুরু করল, কেউ বা সাধারণ আর বিশেষ চেয়ার সম্বন্ধে, কেউ বা গালিচা সম্বন্ধে, কেউ বা এক ফুট উঁচু মঞ্চ সম্বন্ধে।

কিন্তু মিস কেষ্টেডের পক্ষে এই ছোটোখাটো অভিযানের ফল হোলো ভালোই। ঘরে যত লোক ছিল সবাইকে দেখে বেচারির মন তবু একটু হালকা

বোধ হোলো—খারাপ যা হতে পারে তা জানাই ভালো। এতক্ষণে ওঁর আশা হোলো যে মানসিক বিপর্য্যয় ওঁর ঘটবে না ; রণি আর টার্টন-গিন্নিকে এই সুখবর উনি জানালেন। কিন্তু ব্রিটিশ-জাতির সম্ভ্রমে ঘা লাগায় ওঁরা এত অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলেন যে আর কিছুতে ওঁদের মন দেওয়া সম্ভব ছিল না।

মিস কেষ্টেড যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে ফিলডিং সাহেবকে—স্বজাতিদ্রোহী ফিলডিংকে—দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু মঞ্চের ওপর থেকে আরো ভালো ক'রে ওঁকে দেখা গিয়েছিল আর তখন উনি দেখেছিলেন যে ওঁর কোলের ওপর রয়েছে এদেশী একটি ছোট ছেলে। ভদ্রলোক সব ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মিস কেষ্টেডকেও, চোখাচোখি হ'তে উনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন—যেন মিস কেষ্টেডের সঙ্গে সাক্ষাৎ দেখাশোনায় ওঁর কোনো আগ্রহই নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও আগের চাইতে ভালো বোধ করছিলেন। মঞ্চের ব্যাপারে ওঁরই হয়েছিল জয়, ফলে নিজের ওপর আস্থা ওঁর বেড়ে গিয়েছিল। এই নিরপেক্ষ বুদ্ধিমান ভদ্রলোকটি সাক্ষীদের জবানবন্দী শুনে যাচ্ছিলেন ; একথা তখনকার মতন উনি ভোলবার চেষ্টা করছিলেন যে পরে এই সাক্ষ্য অনুযায়ী রায়ও ওঁকে দিতে হবে। পুলিশ সাহেবের সওয়াল তেমনি চলছিল। মাঝে মাঝে যে এই রকম বেয়াদবি ঘটবে তা ওঁর জানা ছিল—হীনতর জাতির লক্ষণই এই। আজিজ সম্বন্ধে ঘৃণার ভাব ওঁর এতটুকু প্রকাশ পায়নি—শুধু ছিল অসীম অবজ্ঞা।

পুলিশ সাহেবের সওয়ালে কয়েকটি লোক সম্বন্ধে বিস্তৃত মন্তব্য ছিল—যথা, ফিলডিং, সেই চাকর অ্যান্টনি, নবাব বাহাদুর ; আসামী নাকি এদের ঠকিয়ে নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্যে ব্যবহার করেছিল। মিস কেষ্টেডের মনে বরাবরই মামলার এই দিকটা কেমন সন্দেহজনক মনে হয়েছিল, পুলিশকে তাই উনি বারণ করেছিলেন এ নিয়ে নাড়াচাড়া না করতে। কিন্তু ওদের চেষ্টা ছিল, যাতে আসামীর সাজা হয় খুব গুরুতর, তাই এই কথা প্রমাণ করতে ওরা চাচ্ছিল যে আসামী আগে থেকে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছিল। তা পরিষ্কার ক'রে বোঝানোর জন্যে মারাবার পাহাড়ের একটা প্ল্যান পর্য্যন্ত আদালতে হাজির করা হোলো। এতে দেখানো ছিল কোন পথে ওরা সব গিয়েছিল আর 'ছোরা পুকুর' ব'লে কোন পুকুরের ধারে ওরা আড্ডা গেড়েছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রত্নতত্ত্বে আগ্রহ দেখা গেলো। একটা গুহার নকসার ওপর লেখা ছিল—'বৌদ্ধ গুহা'।

"বৌদ্ধ নয়, আমার মনে হয় জৈন।"

মামুদ আলি, যেন একটা গোপন মন্ত্রণার কথা ফাঁশ করে দিচ্ছে, এই রকম চালে জিজ্ঞাসা করল, "কোন গুহাতে ওদের মতে আসামীর অপরাধ ঘটেছিল—বৌদ্ধ না জৈন ?"

"মারাবারের গুহাগুলি সবই জৈন।"

"বেশ, তাহলে কোন জৈন গুহায় ?"

"এসব প্রশ্ন করার সুযোগ পরে আপনি পাবেন।"

ওদের এই নিষ্ফল বোকামি দেখে ম্যাকব্রাইড সাহেব মৃদু হাসলেন। এই রকম সব প্রসঙ্গে ভারতবাসীরা একেবারে ঘায়েল হয়। আসামী যে আদবে ও অঞ্চলেই ছিল না এই কথা প্রমাণ করবার দুরাশা ওরা—অর্থাৎ আসামীর পক্ষ—যে পোষণ করত তা উনি ভালই জানতেন, আরো জানতেন যে ফিলডিং ও হামিদুল্লা কাউয়া দোলে গিয়ে এক চাঁদনি রাতে এই সমস্ত জায়গা মাপজোক ক'রে এসেছিল।

"মিষ্টার লেসলির মতে গুহাগুলি বৌদ্ধ, তাঁর মতের একটা দাম আছে, যদি কারও মতের দাম থাকে। কিন্তু গুহাগুলির আকার কি রকম তা এবার বলতে পারি ?"

অতঃপর মিস্ ডেরেকের আগমন, পাহাড়ের মাঝখানকার সেই সঙ্কীর্ণ পথ বেয়ে ওঁদের হুড়মুড়িয়ে নামা, মহিলাদ্বয়ের চন্দ্রপুরে প্রত্যাবর্ত্তন আর ফিরে এসে মিস্ কেষ্টেডের দলিলে নাম স্বাক্ষর, যে-দলিলে দূরবীণের কথা ছিল, ইত্যাদি ঘটনা উনি বর্ণনা করলেন। তারপর এল আসামীর বিরুদ্ধে সেরা সাক্ষ্য—হাতে হাতে দূরবীণ সুদ্ধ ধরা পড়া।

"আমার বর্ত্তমানে আর কিছু বলবার নাই"—এই বলে পুলিশ সাহেব তাঁর চশমা খুললেন—"এবার আমি সাক্ষীদের তলব করব। যা ঘটেছিল তা অতি পরিষ্কার; তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। আসামী লোকের চোখে খুব ধুলো দিয়ে এসেছে; আমার মনে হয় তার অবনতি ঘটে ক্রমে ক্রমে। লোকটা বেজায় ধূর্ত্ত, নিজের আসল জীবন বেমালুম চেপে রেখেছিল—ঐসব লোকের

ধারাই এই রকম—ভদ্রলোকের মুখোস প'ড়ে ও বেশ ঘুরে বেড়াত, এমন কি সরকারি চাকরি পর্য্যন্ত যোগাড় ক'রে ফেলেছিল। লোকটা একেবারে বদ, শোধরাবার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। ওর আর একজন অতিথি আরও একটি ইংরেজ মহিলার সঙ্গে ও যা ব্যবহার করেছিল তা একেবারে পশুর মত নির্ম্মম। নিজের পথ পরিষ্কার করার জন্যে তাকে চাকরবাকরদের সঙ্গে এক গুহার মধ্যে একেবারে চেপে মারার যোগাড় করেছিল। যাক—সে অন্য কথা।”

কিন্তু পুলিশ সাহেবের শেষ কথাগুলোর ফলে আর একটা তুফানের সৃষ্টি হোলো, হঠাৎ নতুন এক নাম—মিসেস মূর—একেবারে ঘূর্ণাবাত্যার মত আদালতের ওপর পড়ল ভেঙে। রাগে মামুদ আলির শিরা ফাটবার উপক্রম হয়েছিল, উন্মাদের মতন চীৎকার করে সে জিজ্ঞাসা করল, তার মক্কেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুধু একটি মেয়েকে বেইজ্জত করার নয়, তার ওপর কি আবার খুনের ? আর দ্বিতীয় ইংরেজ মহিলাটি কে ?

“তাঁকে আমরা তলব করছি না।”

“উপায় থাকলে তো করবেন, তাঁকে তো ইতিপূর্ব্বেই এদেশ থেকে সরিয়েছেন ; তিনি হলেন মিসেস মূর, আজিজ যে নির্দ্দোষ তার প্রমাণ তিনি দিতেন। তিনি ছিলেন আমাদের পক্ষে, নির্জ্জিত ভারতবাসীদের তিনি বন্ধু।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, “তাঁকে আপনারাও তো সাক্ষী মানতে পারতেন, কিন্তু যখন কোনো পক্ষই মানেনি তখন কোনো পক্ষই যেন জবানবন্দীতে তাঁর উল্লেখ না করে।”

“কি করব, ইংরেজদের এমনই ন্যায় বিচার যে তাঁকে বেমালুম চেপে রাখা হয়েছিল ; যখন তাঁর কথা জানতে পারলাম তখন আর উপায় নাই। এই তো ব্রিটিশ রাজ! পাঁচ মিনিটের জন্যেও তাঁকে পেলে আমার বন্ধুকে, আমার বন্ধুর ছেলেদের সুনাম, তিনি রক্ষা করবেন। মিষ্টার দাশ, আপনারও তো ছেলে আছে, দোহাই আপনার মিসেস মূরকে একেবারে বাতিল ক'রে দেবেন না—আপনার কথা ফিরিয়ে নিন। বলুন ওরা ওঁকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, —উঃ, মিসেস মূর···”

“যদি সত্যি মা কোথায় তা কারও জানবার দরকার থাকে তো বলতে পারি

এত দিনে তাঁর এডেন পৌছনর কথা”—রণি রুক্ষভাবে এই কথা বলল। বলাটা ওর আদবেই উচিত হয় নাই কিন্তু আসামী পক্ষের কথার তোড়ে ও গিয়েছিল ঘাবড়ে।

“আসল কথা তিনি জানতেন তাই তাঁকে ওখানে আটক করা হয়েছে।” মামুদ আলির কাণ্ডজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়েছিল; গোলমালের মধ্যে শোনা গেল ও বলছে, “আমার ভবিষ্যতের দফা রফা—যাক গে, একে একে আমাদের সবারই রফা হ'তে বসেছে।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পরামর্শ দিয়ে ওকে বললেন, “এ রকম ক'রে মামলা চালালে কি ক'রে চলবে?”

“আমি কি আসামী পক্ষ সমর্থন করছি, না আপনিই বিচার করছেন? আমরা দুজনেই ক্রীতদাস।”

“মিষ্টার মামুদ আলি, আপনাকে ইতিপূর্ব্বেই সাবধান ক'রে দিয়েছি; আবার বলছি যদি না বসেন তাহলে আমার কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করতে আমি বাধ্য হব।”

“তাই করুন, এই মামলা তো একটা প্রহসন, আমি চল্লাম”—এই ব'লে অমৃতরাওর হাতে কাগজপত্র দিয়ে মামুদ আলি গেল বেরিয়ে। যাবার সময় দরজার কাছ থেকে একবার থিয়েটারি ঢঙে কিন্তু তীব্র আবেগের সঙ্গে ও চেঁচিয়ে বলল, “আজিজ, ভাই, চল্লাম, চিরকালের মতন বিদায়।”

হট্টগোল থামল। কিন্তু মিসেস মূরের নাম ধরে ডাকা তেমনি চলছিল; এই অক্ষর কটার মানে কি যারা জানত না তারাও মন্ত্রবৎ তা বারবার আওড়াচ্ছিল। এদেশী ভাষায় ‘মিসেস মূর’ হয়ে দাঁড়ালেন ‘এস্‌মিস্ এস্‌মূর,’ রাস্তার লোকে পর্য্যন্ত তা আওড়াতে সুরু করল। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয় দেখানো, আদালত-ঘর থেকে লোক তাড়ানো—কিছুতেই ফল হোলো না। যতক্ষণ এই নামের যাদু না ফুরাল, সাধ্য ছিল না তাঁর কিছু করার।

টার্টন সাহেব বললেন, “ভাবা যায় না।”

রণি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। বিলেত রওনা হবার আগে নাকি তার মা মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে মারবারের কথা বলতেন, বিশেষ ক'রে বিকেলের দিকে, চাকরবাকর যখন বারান্দায় থাকত। ওঁর আজিজ সম্বন্ধে এই সময়কার

এলোমেলো সব কথা নিশ্চয় ছুচার আনা পয়সার লোভে ওরা মামুদ আলিকে সরবরাহ করেছে—এ দেশে এ রকম গোখুরির আর বিরাম নাই।

"ওরা এ রকম একটা কিছু করবে তা ভেবেছিলাম ; মাথাতেও খেলে।" টার্টন তাকিয়ে দেখলেন ওদের সব হাঁ-করা মুখ। স্থির ভাবে উনি বললেন, "ঠিক ধর্ম্ম নিয়ে ওরা এমনি করে, একবার আরম্ভ ক'রে আর থামতে পারে না। তোমার দাশের জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছে, বেচারি একেবারে কায়দা ক'রে উঠতে পারছে না।"

মিস ডেরেক সামনে ঝুঁকে বললেন, "মিষ্টার হিসলপ, কি বিশ্রী কাণ্ড বলুন তো, এ রকম ভাবে আপনার মাকে টেনে আনা।"

"ও হোলো একটা চাল, লেগেও গেল ঠিক। এখন বোঝা যাচ্ছে ওরা মামুদ আলিকে কেন এনেছিল—ঠিক এ রকম একটা কাণ্ড ঘটাবার আশায়। লোকটা এ বিষয়ে ওস্তাদ।" কিন্তু মুখে যতটা বলল রণির কাছে ব্যাপারটা তার চাইতে ঢের বেশি খারাপ লেগেছিল ; ওর মা যে এস্‌মিস্‌ এস্‌মূর নামে এক হিন্দু দেবীর সামিল হয়ে উঠবেন ওর কানে তা লাগছিল অসহ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

দেশ বিদেশ

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী ও জার্ম্মানির স্পেন-পলিসি সিদ্ধিলাভ করেছে। গণতন্ত্রী স্পেনের ধ্বংস এবং ফ্যাসিষ্ট শাসনের প্রতিষ্ঠা সঙ্ঘটিত হয়েছে। স্পেনে কি ধরণের শাসনব্যবস্থা হবে সে সম্বন্ধে এই শক্তি চতুষ্টয়ের কখনই মতভেদ ছিল না। ফ্যাসিষ্ট শক্তিদ্বয় যা প্রকাশ্যে এবং সক্রিয়ভাবে করেছে গণতন্ত্রী শক্তিদ্বয় প্রচ্ছন্নভাবে এবং নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা ঠিক তাই করেছে। এদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ যা ছিল বা আছে তা স্পেনের কল্যাণ নিয়ে নয়, নিজেদের নিয়ে। ফ্রাঙ্কোর অভিষেকে সেই স্বার্থের কি ব্যবস্থা হল সেইটাই বিচার্য্য। স্পেনের কি হবে তার বিচার অবান্তর, এবং সেই জন্যই বিনা সর্ত্তে ফ্রাঙ্কোর রাজ্যাধিকার স্বীকৃত হল।

কোন ব্যবস্থা যে সত্যই হল তা বলা চলে না। যা কিছু সুবিধা হল তা ফ্যাসিজমেরই। আর সব ব্যাপারেও যেমন হয়েছে মুসোলিনি এবং হিটলার নিজেদের জিদ বজায় রেখে অভীষ্ট লাভ করলেন। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের মাঝে ফ্যাসিজমের আর একটি ঘাঁটি বসল। ইংরাজেরা নাকি আশা করছেন যে ফ্রাঙ্কোর ডিক্টেটার-প্রীতিতে ভাঁটার টান ধরেছে এবং তিনি রোম-বার্লিন গণ্ডির মধ্যে আকৃষ্ট হবেন না। ইংলণ্ডে ইতিমধ্যেই ফ্রাঙ্কো "master builder" বলে অভিহিত হয়েছেন। মাল মশলা সব নিঃসন্দেহে City of London থেকেই সরবরাহ হবে। হিটলার এবং মুসোলিনি নিজেদের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করতেই এত বিব্রত যে তাঁদের পক্ষে ফ্রাঙ্কোকে রাজ্যস্থাপন কার্য্যে সাহায্য করা সম্ভব নয়। এইখানেই হল ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সুযোগ। ফ্রাঙ্কোকে প্রতিষ্ঠিত করার সর্ত্তে তারা নিজেদের দিন কিনে নিতে চায়। উপরন্তু Four Power Pact-এর সম্ভাবনা এখনও বোধ হয় মিষ্টার চেম্বারলেনের মাথার মধ্যে খেলছে। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স উভয়েই আশা করছে যে জার্ম্মানি ও ইতালীর সঙ্গে ভূমধ্যসাগর (এবং সেই সম্পর্কে স্পেন) সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করতে সমর্থ হবে। চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে ঘটনাকে পরিচালিত না করে' এমনভাবে ঘটনার পুচ্ছ অবলম্বন করেছেন যে

তাঁদের পক্ষে ঘটনামুখাপেক্ষী হওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নেই। বর্ত্তমানে তাঁদের একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় হল ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাকে রোম-বার্লিন গণ্ডির বাহিরে রাখা। যুদ্ধের সময় স্পেনের নিরপেক্ষতা যেমন মূল্যবান হবে তার শত্রুতা ততোধিক বিভীষিকাময় হবে। ফ্যাসিষ্ট স্পেন ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের দুর্ব্বলতার সম্ভাব্য উৎস হয়ে রইল। গণতন্ত্রী স্পেন যে তাদের পক্ষে সুবিধার হত একথা তারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করে। কিন্তু সোশালিষ্ট স্পেনের নিশ্চিত সাহায্য থেকে তারা ফ্যাশিষ্ট স্পেনের অনিশ্চয়তাও অধিক কামনীয় মনে করে।

স্পেনের অসমকক্ষ সঙ্ঘর্ষে গণতন্ত্রীরা যে অদ্ভুত সাহস এবং জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন বর্ত্তমানের কার্য্যতঃ আশাহীন দুরাবস্থার মধ্যেও তা নিঃশেষিত হয়নি। গণতন্ত্রী স্পেনের শেষ শক্তিটুকু বিধ্বস্ত করার জন্য ফ্রাঙ্কোকে আরও বহু বেগ পেতে হবে।

স্পেনে গণতন্ত্রীদের বিজয় সম্বন্ধে অনেকেই আশান্বিত ছিলেন। সেখানে আশাভঙ্গ হওয়াতে এখন চীন সম্বন্ধে কোন আশা পোষণ করতে তাঁদের ভরসা হচ্ছে না। কিন্তু চীন সঙ্ঘর্ষের অবস্থা স্পেনীয় অবস্থা থেকে এত পৃথক যে যে-কারণে স্পেনে বিদ্রোহীরা সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছে ঠিক সেই কারণের সাহায্যে চীনে জাপানের সাফল্যলাভের আশা কম। অস্ত্রেশস্ত্রে এবং যুদ্ধোপকরণে জাপান বহুগুণ শ্রেষ্ঠ। কিন্তু চীনের বিরাট বিস্তার এবং জনশক্তি সেই শ্রেষ্ঠতার অনেকটা অপহরণ করে নিচ্ছে। জাপানের পক্ষে চীনকে গলাধঃকরণ করা সম্ভব নয়। হয়ত শেষ অবধি জাপান দু'একটি ছোটখাট মাঞ্চুকুয়ো স্থাপন করতে পারে। তার সম্ভাবনাও যে কত বেশি তা বলাও শক্ত। যুদ্ধেতেও জাপান যে চীনকে সমভাবে পরাজিত করে আসছে তাও নয়। বর্ত্তমানে চীন সৈন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত এবং সজ্জিত হয়ে যুদ্ধে অবতরণের ব্যবস্থা করছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম জাপানের আভ্যন্তরিক অবস্থাকে অতিরিক্ত পরিমাণে ভারান্বিত করছে। চীনের পক্ষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করা যতটা সম্ভব জাপানের পক্ষে ততটা নয়। জাপানের স্থিতিক্ষমতার উপর এই যুদ্ধের দীর্ঘতা নির্ভর করছে। জাপানের জয় পরাজয় সমর সজ্জার শ্রেষ্ঠতার উপর যতটা না নির্ভর করছে তার স্থিতিক্ষমতার উপর ততটা নির্ভর করছে।

শ্রেষ্ঠতর আধুনিক সমরসজ্জা ব্যবহার করার একটা দায় আছে, তার একটা মূল্য আছে। সভ্য আধুনিক ইতালীর পক্ষে যুদ্ধ চালান যতটা কষ্টসাধ্য হয়, অসভ্য অনুন্নত হাবসীদের পক্ষে ততটা হয় না। জাপানকে যুদ্ধের ভার যতটা প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করতে হয় চীনকে ততটা হয় না। জাপান কতদিন এই ভার বহন করতে পারবে ? দ্রুতবর্দ্ধিত যুদ্ধের খরচ বহন করা জাপানী জনসাধারণের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সমগ্র জাপানি জাতি যে এই সমরের পক্ষপাতী তাও নয়। এমন কি শাসক সম্প্রদায়ের ভিতরেই এ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। সামরিক শ্রেণী এবং ধনিক শ্রেণীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ রয়েছে। জাপানের স্থিতিক্ষমতা এবং সহ্যশক্তিকে ক্ষয় করার উপযুক্ত অস্ত্র চীন অবলম্বন করেছে গেরিলা যুদ্ধে।

জাপানের এই অবস্থা বোধহয় ফ্যাসিষ্টদের সমস্ত মতলব ওলটপালট করে দিয়েছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রকে যুগপৎ পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিষ্টরা জাপানের সঙ্গে মিতালি করে। কিন্তু সম্প্রতি এই মিতালির আবেগ-উষ্ণতায় ভাঁটা পড়েছে। জাপানের শক্তির উপর নির্ভর করা হিটলার আর যুক্তিযুক্ত মনে করছেন না। যাই হোক, তা সত্ত্বেও যুদ্ধের সময় জাপানের একটা কার্য্যকারিতা থাকবে। জাপান হয়ত ফ্যাসিষ্ট-বিরোধীদের কতকটা সামরিক শক্তি সুদূর প্রাচ্যে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে আবদ্ধ রাখতে সমর্থ হবে।

রাজকোটের ব্যাপার ভারতব্যাপী সঙ্কট সঙ্ঘটিত করেছে। রাজকোটের ঠাকুর সাহেব রাজনীতিতে প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তায় আস্থাবান নন। তিনি অত্যন্ত অপরিপক্ক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা নিয়ে কংগ্রেসের সুবিজ্ঞ মহারথীদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছেন। তাঁর অপরিণামদর্শিতা এবং অবিমৃষ্যকারিতার প্রধান পরিচয় হল এইরকম হঠকারিভাবে গান্ধিজির সঙ্গে দ্বৈরথ সমরে নামা। অনশন ব্রতের রাজনৈতিক ক্ষমতা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। ঠাকুর সাহেবের পরাজয় যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

রাজকোট সঙ্কট এই ক্ষুদ্র রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারের চেয়ে অনেক

গুরুতর এবং গূঢ়তর ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট। দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন কংগ্রেসের দ্বারা সরকারীভাবে পরিচালিত নয়। ফেডেরেশান-বিরোধী আন্দোলনে এই গণ-আন্দোলনের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। কংগ্রেসের তথাকথিত বামপন্থীরা এই গণ-আন্দোলনকে ফেডেরেশন-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে চান। বস্তুতঃ দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন ফেডারেশান-বিরোধী আন্দোলনের প্রধান অংশ হওয়া উচিত। ফেডেরাল রাষ্ট্রে যদি রাজাদের প্রতিনিধিত্বের বদলে রাজ্যগুলির জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব হয় তাহলে নূতন শাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই বিফল হয়। এই ধার দিয়ে কংগ্রেসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই বিপদ উপলব্ধি করেই ব্রিটিশ সরকার কনষ্টিটিউশান সংশোধন করবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাজাদের পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা করা হবে। মোট কথা রাজারা একটা বিরাট গণ-আন্দোলনকে সামলাতে পারবেন না বলে সার্ব্বভৌম শক্তি রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে' তার ব্যবস্থা করবে। এটা খুবই সম্ভব যে ফেডেরেশান-বিরোধী সংগ্রামের ঘটনাস্থল দেশীয় রাজ্যগুলিই হবে।

রাষ্ট্রপতি-নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে ফেডেরেশান-বিরোধিতা যে একটি প্রধান প্রশ্ন ছিল তার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের উপস্থিত রাষ্ট্রনীতির প্রধান গলদ হল তার ধূমাচ্ছন্নতা। তাই নিরানুমানিক এবং নির্দ্দিষ্ট কিছু বলা শক্ত।

"দক্ষিণপন্থীরা" হয়ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ফেডেরেশানের বিরুদ্ধাচরণ করতে চান না। তাই একটা সঙ্কটের উদ্ভব করে' একটা মিটমাটের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। অথচ তাঁরা এমনভাবে সমস্ত ব্যাপারটা সঙ্ঘটিত করেছেন যে যারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ফেডেরেশান-বিরোধী তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার দোষ তাঁদের হচ্ছে না। ওয়ার্কিং কমিটির পদত্যাগ আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রপতির তথা বামপন্থীদের পথের অন্তরায় সরিয়ে নিচ্ছে। বস্তুত তাঁরা আগে থাকতেই কোন চরম আন্দোলনকে বাণচাল করতে চেষ্টা করছেন। সক্রিয় বিরুদ্ধাচরণের চেয়ে নিষ্ক্রিয়তা এবং অসহযোগিতা আরও ফলপ্রদ হ'তে পারে।

শ্রীমোহিত বসু

তিনটি কবিতা

গোধূলিসন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙা,—
সেইখানে উঁচু উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য্য গোল—রাঙা—

চুপে চুপে ডুবে যায়—জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দেখে ; সোনার বলের মত সূর্য্য আর
রূপার ডিবের মত চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরিতকী শাখাদের নিচে যেন হীরার স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মত শাদা জলের উল্লাস ;
নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মত ঃ
পুরুষ তাদের ঃ কৃতকর্ম নবীন ;
খোঁপার ভিতরে চুলে ঃ নরকের কালো মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হঙ্‌কঙের তৃণ।

যেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই ;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জ্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সঙ্কেতে
মেধাবিনী ;—দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নাই ;—এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে

ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হয়ে গেছে সব ;—বিনুনিতে নরকের কালো মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

যেই সব শেয়ালেরা

যেই সব শেয়ালেরা জন্ম জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে,—বার হয়,—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে ;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি

সেই সব হৃদযন্ত্র মানবের মত আত্মায় ঃ
তাহ'লে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিত ;—সহসা তোমারে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কাঁদিতেছে স্নায়ুর আঁধারে।

সপ্তক

এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে ;—জানিনা সে এইখানে শুয়ে আছে কিনা।
অনেক হয়েছে শোয়া ;—তারপর একদিন চ'লে গেছে কোন্ দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হ'লে যেই স্তর জেগে ওঠে আলোর আবেগে ঃ
সরোজিনী চলে গেল অতদূর ? সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মত পাখা বিনা ?
হয়তো বা মৃত্তিকার জ্যামিতিক ঢেউ আজ ? জ্যামিতির ভূত বলে ঃ
আমিতো জানিনা।

জাফরান-আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে ঃ
লুপ্ত বিড়ালের মত। শূন্য চাতুরীর মত মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

শ্রীজীবনানন্দ দাশ

সুন্‌ইয়াৎসেন ও মহাত্মা গান্ধী

চীনদেশ ব্যতীত আর কোথাও ভারতের ন্যায় অতি প্রাচীনকাল হইতে নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস পাওয়া যায় না। প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম এই দুই দেশকে সংযুক্ত করিয়াছিল। বর্ত্তমানকালে সাম্রাজ্যতন্ত্রের নিগূঢ় শোষণ ইহাদের আবার মিলিত করিয়াছে। দুই দেশেই বিদেশী বণিকের মানদণ্ড ধীরে ধীরে রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়াছে—চীন ও ভারতের বুকে আজিও সাম্রাজ্যতন্ত্রের ধ্বজা খাড়া হইয়া আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়াছিল। সেই বিদ্রোহের ভাবধারার পরিণতি হইয়াছে বিংশ শতাব্দীতে চীনের ও ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে। সাম্রাজ্যতন্ত্রের খর্পর হইতে মুক্তি লাভ করাই এই দুই দেশের মুক্তি-আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য। তাই আজ ভারতের জাতীয় মহাসভার Medical Unit-এর ভিতর দিয়া নিষ্পেষিত ভারতবাসী তাহাদের কষ্টলব্ধ অর্থ সুদূর চীনদেশে প্রেরণ করাতে চীনের সঙ্গে ভারতের মিলনপথ প্রশস্ত হইতেছে। চীনের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন সুন্‌ইয়াৎসেন, আর ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা হইতেছেন মহাত্মা গান্ধী। সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্নরূপে এই দুই নেতার কাছে দেখা দিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে হইলে মার্ক্সের ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা থাকা দরকার। সুন্‌ইয়াৎসেন নিজের মৌলিকত্ব বজায় রাখিতে গিয়া মার্ক্সের ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, আর মহাত্মা গান্ধী ভারতের বৈশিষ্ট্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে গিয়া মার্ক্সীয় মতবাদ সম্বন্ধে ধারণা গড়িবার সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তবে এই দুই নেতার ভিতর সুন্‌ইয়াৎসেনের নিকট সাম্রাজ্যবাদের যে দিকটা উদ্ভাসিত হইয়াছিল, মহাত্মা গান্ধীর কাছে তাহাও হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদের নিগূঢ় নিষ্পেষণ মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক মনকে ব্যথিত করিয়াছে মাত্র।—সাম্রাজ্যবাদের শোষণের ফলে ভারতের জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া মহাত্মা গান্ধীর দয়ার্দ্র হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই নিপীড়িত জনগণের

দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘবের জন্য মহাত্মা গান্ধী সাম্রাজ্যতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত না করিয়া জনগণকে সত্যনিষ্ঠার উপদেশ দিয়া বৈদিকযুগের কল্পিত স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া যাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদের নিগূঢ় নিষ্পেষণ সুন্‌ইয়াৎসেনের সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদের গতিধারা। সাম্রাজ্যতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত না করিলে যে জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশার মাত্রা কমিবে না, এ কথা সুন্‌ইয়াৎসেন খুব ভালো ভাবেই বুঝিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যতন্ত্রের ভস্মস্তূপের ভিতর দিয়াই যে সোশ্যালিজমের উৎপত্তি একথা সুন্‌ইয়াৎসেন উপলব্ধি করিতে না পারিলেও সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতের পরিবর্ত্তে এক অপূর্ব্ব মিলনের স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার এই স্বপ্ন চীনের মুক্তি-আন্দোলনের গতিবেগকে বন্ধ করে নাই। সাম্রাজ্যতন্ত্রের খর্পর হইতে জনগণের মুক্তি যে গণ-জাগরণ ব্যতিরেকে আসিবে না, এ কথা সুন্‌ইয়াৎসেন বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু গান্ধী বুঝেন নাই। তাই যখন চীনের মুক্তি-আন্দোলন ব্যাপক গণ-আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিল তখন সুন্‌ইয়াৎসেন অগ্রসর হইয়া সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন, আর মহাত্মা গান্ধী ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে গণ-জাগরণের বৈপ্লবিক রূপের ফলে পশ্চাদগমন করিয়া সত্যনিষ্ঠার ধুয়ার সাহায্যে সেই জাগরণকে দাবাইয়া রাখিবার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সুন্‌ইয়াৎসেনের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল মাঞ্চুশাসনতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া চীনে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, চীনের সমস্ত জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা এবং বিশ্বে শান্তি স্থাপন। চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে জরাজীর্ণ মাঞ্চুশাসনতন্ত্র ছাড়াও ফিউডালতন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র যে এক বিরাট অন্তরায়, একথা সুন্‌ইয়াৎসেন খুব ভালো ভাবেই জানিতেন। তাই ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর ফিউডালতন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার চীনা অনুচরদের বিরুদ্ধেই ছিল সুন্‌ইয়াৎসেনের অভিযান। ফিউডালতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের সাথে কোনরূপ রফা করিতে সুন্‌ইয়াৎসেন রাজী ছিলেন না। চীনের পূর্ণ স্বাধীনতা, চীনা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনেরও উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতের স্বাধীনতা—তবে এ স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেওয়া এক কঠিন ব্যাপার। নানা ভাববিপর্য্যয়ের ভিতর

দিয়া এ স্বাধীনতার রূপ আজ যে স্তরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ কথা জোর দিয়াই বলা চলে যে মহাত্মা গান্ধীর "ভারতের স্বাধীনতা" ঠিক পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা মহাত্মা গান্ধীর জীবনের আদর্শ নহে। মহাত্মা গান্ধী চান স্বাধীনতার সারমর্ম্ম। এই স্বাধীনতার সারমর্ম্মের রূপটা হইতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের কাঠামোর ভিতরই ভারত শাসনতন্ত্রের কার্য্যভার ভারতবাসীর হাতে তুলিয়া দেওয়া। সুন্‌ইয়াৎসেনের মতন ফিউডালতন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধেও মহাত্মা গান্ধীর অভিযান নয়। সুন্‌ইয়াৎসেনের মতন ভারতের সমস্ত জমিকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার কল্পনাও মহাত্মা গান্ধী করিতে পারেন না। মহাত্মা গান্ধীর অভিযান হইতেছে শুধু মাত্র রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ব্যাপারে ভারতবাসীর কতকগুলি সুবিধা আদায়ের জন্য। সুন্‌ইয়াৎসেনের কল্পিত ভবিষ্যৎ চীন, আর মহাত্মা গান্ধীর কল্পিত ভবিষ্যৎ ভারতে সুবিশাল প্রভেদ।

নিজের কল্পিত ভবিষ্যৎ চীনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য সুন্‌ইয়াৎসেনের প্রধান উপকরণ ছিল তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তিনটি আদর্শ—জাতীয়তার আদর্শ, গণতন্ত্রের আদর্শ, জীবিকাসংস্থানের আদর্শ। জাতীয়তার আদর্শ দ্বারা তিনি চীনের পাঁচটি বিভিন্ন জাতিকে এক গ্রন্থিভুক্ত করিয়া চীনকে শক্তিশালী করিতে চাহিয়াছিলেন। এই জাতীয়তার আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হইয়া চীনা জনগণ ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হইয়া উঠিয়াছে। গণতন্ত্রের আদর্শের অর্থ হইতেছে চীনা জনগণকে গণতন্ত্রের উপযোগী করিয়া তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া। রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ব্যাপারে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্য যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা তিনি শাসনতন্ত্রে রাখিয়াছিলেন। ক্যাপিটালিষ্ট ছুনিয়ায় গণতন্ত্রের রূপ দেখিয়া সুন্‌ইয়াৎসেনের মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছিল। তাই চীনের শাসনতন্ত্রে ক্যাপিটালিষ্ট ছুনিয়ার ছুর্নীতি যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে সেইদিকে সুন্‌ইয়াৎসেনের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। জীবিকা সংস্থানের আদর্শ দ্বারা তিনি চীনে শ্রেণীস্বার্থের সংঘাতের উপর যবনিকা টানিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই আদর্শের মূলে ছিল কৃষকদের ভিতর জমি বিলির ব্যবস্থা করা এবং জাতীয় শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রকর্তৃত্বের অধীনে আনিয়া শ্রমিকদের ছুঃখছুর্দ্দশার লাঘব করা—

তবে এই পথে জমিদার ও ধনিকদের স্বার্থও যাহাতে সম্পূর্ণ ব্যাহত না হয় সেইদিকেও স্নুন্‌ইয়াৎসেনের নজর ছিল। মোটকথা এই তিনটি আদর্শের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ চীনকে গড়িয়া তুলিবার যে পরিকল্পনা স্নুন্‌ইয়াৎসেন করিয়াছিলেন তাহাকে অন্ততঃ ভবিষ্যৎ সমাজ-ব্যবস্থা সংগঠনে র‍্যাডিক্যাল বুর্জ্জোয়াদের পরিকল্পনা বলা চলে।

নিজের কল্পিত ভবিষ্যৎ ভারতকে গড়িয়া তুলিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর প্রধান উপকরণ হইতেছে সত্য, অহিংসা ও চরকা। ভারত কখনও এক হইয়া নিজের শাসনকর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিতে পারে না—সাম্রাজ্যবাদীদের এই যে মিথ্যা প্রচার ইহাকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে দুনিয়ার সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়াছিল মহাত্মা গান্ধীর "সত্য"। সাম্রাজ্যবাদীদের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধেই ছিল মহাত্মা গান্ধীর "সত্যের" লড়াই। কিন্তু বর্ত্তমানে যখন ভারতের মুক্তি-আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে তখন মহাত্মা গান্ধীর "সত্য" বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার ভারতীয় অনুচরদের শোষণের আচ্ছাদন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর "অহিংসা"র উদ্দেশ্য ছিল শান্তভাবে সাম্রাজ্যতন্ত্রের অত্যাচারের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। এই "অহিংসা"র ভিতর লুক্কায়িত ছিল ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদের স্বার্থ। অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াগণ যে স্বাধীনতাকামী ছিল না, তাহা নহে—তবে সক্রিয় প্রতিরোধের পথে স্বাধীনতা আন্দোলন যে বিরাট গণআন্দোলনের রূপ ধারণ করিবে, এই ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা অহিংসাপন্থী হইয়াছিল। কিন্তু কালের গতির সাথে সাথে এই অহিংসাই বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার ভারতীয় অনুচরদের শোষণের প্রধান কলকাঠি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "অহিংসা"র নামে মহাত্মা গান্ধী আজ জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত হরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন। "চরকা"র প্রবর্ত্তনের দ্বারা মহাত্মা গান্ধী দেশকর্ম্মীদের ভিতর আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় চেতনা ফিরাইয়া আনিয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্যদিকে "চরকা"র প্রবর্ত্তনের মানে হইতেছে বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা হইতে সেই পুরাতন কুটীর শিল্পের যুগে ফিরিয়া যাওয়া। মহাত্মা গান্ধীর এই পরিকল্পনা ভারতের সদ্যজাগ্রত বুর্জ্জোয়াদের স্বার্থসংরক্ষণেরই পরিকল্পনা।

স্নুন্‌ইয়াৎসেনের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানসম্মত না হইলেও তাহার

সহিত বাস্তব জগতের সংস্পর্শ আছে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় সমাচ্ছন্ন এবং বাস্তবের সংঘাতে সে পরিকল্পনার যে রূপ আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত তাহা মহাত্মা গান্ধীর সত্যধর্ম্মের মূলেই কুঠারাঘাত করে। আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে স্নুন্‌ইয়াৎসেন চলিয়াছিলেন বিপ্লবের পথে, আর মহাত্মা গান্ধী চলিয়াছেন সংস্কারের পথে। স্নুন্‌ইয়াৎসেনের কাছে আসল জিনিষ ছিল উদ্দেশ্যটা, পথটা নয়—মহাত্মা গান্ধীর কাছে পথটা মুখ্য, উদ্দেশ্যটা গৌণ। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার নির্দ্দেশিত পথে ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভের জন্য যুগ যুগ অপেক্ষা করিতে রাজী আছেন—তাঁহার মতে তাঁহার নির্দ্দেশিত অহিংসার পথেই ভারতের স্বাধীনতা চাই, অন্য পথে নয়। কিন্তু স্নুন্‌ইয়াৎসেন চাহিতেন যে কোন পথে চীনের স্বাধীনতা, এবং ইতিহাসের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন যে ফিউডালতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের অক্টোপাস হইতে চীনের মুক্তি শুধু বিপ্লবের পথেই আসিতে পারে, অন্য পথে নয়। মহাত্মা গান্ধী ইতিহাসকে দেখিয়াছেন শুধু ঘটনাবলীর সমাবেশ হিসাবে। কিন্তু ঘটনাবলীর পিছনে কার্য্যকরী শক্তির প্রকৃত মর্ম্ম মহাত্মা গান্ধীর মন উপলব্ধি করিতে পারে নাই—তাই মহাত্মা গান্ধী ইতিহাসের পাতায় বিপ্লবের ইতিবৃত্ত দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে বিপ্লব মানবের অকল্যাণ ডাকিয়া আনে—বিপ্লবের পথ হিংসাময়। মানবের কল্যাণ আসিবে অহিংসার পথে, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের পথে, এবং যেহেতু ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন তাই ভারতের মুক্তির পথ ইতিহাসের বিপ্লবের পথে নহে—ভারতের মুক্তি আসিবে ঋষি-নির্দ্দেশিত অহিংসার পথে।—

কিন্তু নিপীড়িত বুভুক্ষু জনগণই চীনের ও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রধান শক্তি। অথচ এই দেশেই মুক্তি-সংগ্রামের প্রধান সমর্থক হইতেছে দেশীয় বুর্জোয়াগণ। চীনের মুক্তি-সংগ্রামে স্নুন্‌ইয়াৎসেন চীনা বুর্জোয়াগণের কাছ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন; কিন্তু সেইজন্য কোথাও তিনি দেশীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে জনগণের স্বার্থকে বলি দেন নাই—জনগণের স্বার্থই তাঁহার কাছে বড় কথা ছিল। তবে জনগণের সাথে বুর্জোয়াদের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহা আংশিকভাবে

সার্থকও হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধীও ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে দেশীয় বুর্জোয়াদের কাছ হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছেন; কিন্তু এই সাহায্যের বিনিময়ে গান্ধীজী দেশীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের কাছে জনগণের স্বার্থকে বলি দিয়াছেন। জনসাধারণকে ধর্ম্মের স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া মহাত্মা গান্ধী আজ বুর্জোয়াদের স্বার্থসংরক্ষণে ব্যস্ত।

চীন ও ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে লক্ষ্য করিবার প্রধান বিষয় হইতেছে গণশক্তির বিকাশ। গণশক্তির এই বিকাশ স্থন্‌ইয়াৎসেনকে করিয়াছে সাম্রাজ্য-বাদবিরোধী, আর মহাত্মা গান্ধীকে করিয়াছে ভারতীয় বুর্জোয়াদের পরিপোষক। গণশক্তির বৈপ্লবিক বিকাশ দেখিয়া স্থন্‌ইয়াৎসেন চীনের বিপ্লবান্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন আর মহাত্মা গান্ধী ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

স্থন্‌ইয়াৎসেনের জীবনের সাধনা ছিল ফিউডালতন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্রের হাত হইতে চীনের মুক্তি। চীনের এই মুক্তি-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে স্থরু হয় ১৮৯৪-৯৫ সাল হইতে স্থন্‌ইয়াৎসেনের নেতৃত্বে। স্থন্‌ইয়াৎসেন জানিতেন যে সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া চীনের মুক্তি আসিবে না। ১৮৯৪ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত এই সশস্ত্র বিপ্লবের পথে স্থন্‌ইয়াৎসেন বিশেষ করিয়া নির্ভর করিয়াছিলেন চীনা মার্চ্চেন্ট ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা ছাত্রদের উপর। ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর চীনের সর্ব্বত্র এক বিরাট গণআন্দোলনের সাড়া পড়িয়া গেল। তখন এই বিরাট গণআন্দোলনের ভিতরই স্থন্‌ইয়াৎসেন চীনের মুক্তির সন্ধান পাইলেন—মাঞ্চুশাসকের হাত হইতে রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বভার কাড়িয়া আনিয়া চীনা বুর্জোয়াদের হাতে তাহা তুলিয়া দেওয়ার ভিতর যে চীনের মুক্তি নহে এ কথা স্থন্‌ইয়াৎসেন খুব ভালো ভাবেই বুঝিলেন। স্থন্‌ইয়াৎসেন আরো বুঝিলেন যে ব্যাপক গণআন্দোলনের ভিতরই চীনের মুক্তি নিহিত এবং গণজাগরণ ও চীনা জনগণের মুক্তি ব্যতিরেকে চীনের মুক্তি আসিবে না। তাই ১৯২৪ সালে যখন বরোদিনের পরামর্শানুযায়ী তিনি চীনা বিপ্লবী পার্টি কুয়োমিনটাঙের আদ্যোপান্ত সংস্কার করেন তখন তিনি চীনা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি চীনা কম্যুনিষ্টদের কুয়োমিনটাঙের অন্তর্ভুক্ত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের সাথে হাত মিলাইয়া বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তার চীনা অনুচরদের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য

এক শক্তিশালী সম্মিলিত ফ্রন্ট সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গণশক্তির এই ঐক্য স্নুন্‌ইয়াৎসেনের আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টাতেই সম্ভব হইয়াছিল—মতদ্বৈধতা তাঁহার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ক্ষীণ করিয়া দিতে পারে নাই। কম্যুনিষ্টরাও যে চীনা জনগণের মুক্তি চায় একথা তিনি খুব ভালোভাবেই বুঝিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্টভীতি তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে নাই—গণআন্দোলনের সাথে সমান তালে পা ফেলিয়া তিনি তাই চীনের গণআন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনের সাধনা ভারতের বুকে সত্যধর্ম্মের ধ্বজা উঁচু করিয়া রাখা—ভারতের মুক্তি-আন্দোলন তাঁহার সেই সত্যধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইবার পথে একটি অঙ্গ বিশেষ। ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর উদয় ১৯১৯ সালে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণে—ভারতের জনগণ তখন বিদেশী শাসকের শোষণে জর্জ্জরিত হইয়া সহনের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বিদ্রোহের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। জনগণের এই বিদ্রোহের ভাব ভারতের জাতীয় মহাসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মহাত্মা গান্ধী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সুরু করিয়া দিয়া জনগণের এই বিদ্রোহের ভাবধারার বিকাশের পথ করিয়া দেন। এই আন্দোলনের বিশেষত্ব ছিল সত্য, অহিংসা ও চরকা। ইহার সাহায্যে শেষ পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধী প্রকৃতপক্ষে জনগণের বিপ্লবান্দোলনের গতিরোধ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর গণ্ডীবদ্ধ করিয়া গণআন্দোলনের অবাধ প্রসারের পথ মহাত্মা গান্ধী বন্ধ করিয়া দিলেন। চৌরিচৌরার পর মহাত্মা গান্ধী গণশক্তির বৈপ্লবিক রূপ দেখিয়া রাজনীতি হইতে কিছুদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণআন্দোলন আবার ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করিল ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনে। এবারও মহাত্মা গান্ধী শেষ পর্য্যন্ত গণআন্দোলনকে সঙ্কুচিত করিতে ব্রতী হইলেন। গণআন্দোলন বৈপ্লবিক মূর্ত্তি ধারণ করিলে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার শিষ্যবর্গ ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদের কল্যাণার্থে মাঝদরিয়ায় আইন অমান্য আন্দোলনের যবনিকা টানিয়া দিয়া ভারতের জাতীয় মহাসভাকে গণআন্দোলনকে দাবাইয়া দিবার কার্য্যে নিয়োগ করিলেন। এর পর গণশক্তি তাহার স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থীদের দিকে হেলিয়া পড়িল। জাতীয়তাবাদী বামপন্থী ও কম্যুনিষ্টদের

নেতৃত্বে স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণআন্দোলন বিদেশী সাম্রাজ্যতন্ত্র আর তাহার ভারতীয় অনুচর-দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ভারতের বুকে এক অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবের সূচনা করিল। তখন মহাত্মাজী প্রথমে হরিজন-আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া এবং পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রদত্ত নূতন শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব কায়েমী করিয়া জনগণকে ভুলাইবার নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন। অন্যদিকে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির মারফতে কংগ্রেসের ভিতর অহিংস আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার অজুহাতে বামপন্থী ও কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে হিংসা প্রচারের অভিযোগ আনিয়া তাহাদিগকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কারের এবং কংগ্রেসী প্রদেশগুলির ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া বামপন্থী ও কম্যুনিষ্টদের সাম্রাজ্যতন্ত্রের খর্পরে ফেলিয়া দিবার নব নব পন্থা উদ্ভাবনও তাঁহার সমর্থন লাভ করিয়াছে।

চীনের মুক্তি আন্দোলনে এরকম কোন দৃষ্টান্ত নাই। স্বতঃস্ফূর্ত্ত গণআন্দোলনকে বৈপ্লবিক রূপ দিবার চেষ্টাই সুন্‌ইয়াৎসেন করিয়াছিলেন আর মহাত্মা গান্ধী তাহাকে পথভ্রষ্ট করিয়া ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। চীনের মুক্তি-আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সুন্‌ইয়াৎসেন কম্যুনিষ্টদের কুয়োমিনটাঙের অন্তর্ভুক্ত করিয়া এক সম্মিলিত ফ্রন্ট করিয়া চীনের মুক্তি-আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী গণআন্দোলনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন এবং ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদের স্বার্থ-রক্ষার্থে বামপন্থী ও কম্যুনিষ্টদের অহিংসা ও সত্যধর্ম্মের দোহাই দিয়া কংগ্রেস হইতে বাহির করিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছেন। সুন্‌ইয়াৎসেন চীনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের অবরুদ্ধ বিপ্লবীশক্তিকে জাগ্রত করিয়াছিলেন—মহাত্মা গান্ধী অহিংসা ও সত্যনিষ্ঠার ধূয়া তুলিয়া ভারতীয় জনগণের ধর্ম্মান্ধতার ইন্ধন জোগাইয়া তাহাদের জাগ্রত শক্তিকে খর্ব্ব করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন।

সুন্‌ইয়াৎসেনের কর্ম্মপন্থার প্রধান অঙ্গ ছিল গণস্বার্থের সংরক্ষণ। চীনের কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সুন্‌ইয়াৎসেন চাহিয়াছিলেন সমস্ত জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া কৃষকদের ভিতর বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিতে এবং ক্যাপিটালিষ্টদের কাছ হইতে দেশের প্রধান শিল্পগুলিকে রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া শ্রমিকদের অনুকূলে আইনকানুন করিয়া তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে। যদিও সুন্‌ইয়াৎসেনের এই কর্ম্মপন্থা অনেকটা "ইউটোপিয়ান"

ধরণের তবুও, মহাত্মা গান্ধীর কর্ম্মপন্থা হইতে এ অনেক প্রগতিশীল। ভারতের সমস্ত জমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়া কৃষকদের ভিতর বিলি ব্যবস্থা করিয়া দিবার কল্পনাও মহাত্মা গান্ধী করিতে পারেন না। অন্যদিকে শ্রমিক-স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়া ভারতীয় ক্যাপিটালিষ্টদের স্বার্থই মহাত্মা গান্ধী দেখিতেছেন। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী শ্রমিকদের দাবী দাওয়া আদায় করিবার জন্য ধর্ম্মঘট পন্থাকে হিংসা কার্য্যের গোষ্ঠীভুক্ত করিয়া শ্রমিকদের ক্যাপিটালিষ্টদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই উপদেশের সারমর্ম্ম ক্যাপিটালিষ্টদের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে শ্রমিকদের স্বার্থকে বলি দেওয়া। হরিজন পত্রিকার পাতায় পাতায় মহাত্মা গান্ধীর যে উপদেশ আমরা দিন দিন পাইতেছি তার গূঢ় অর্থ হইতেছে যে কোনভাবে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদের স্বার্থের সংরক্ষণ।—

সুন্‌ইয়াৎসেন চাহিয়াছিলেন সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব, মহাত্মা গান্ধী চাহিতেছেন সংস্কার। সুন্‌ইয়াৎসেন পুতিগন্ধময় জরাজীর্ণ সমাজকে ভাঙিয়া চূরমার করিয়া এক নতুন সমাজব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিলেন—যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসার করিয়া, অথচ যান্ত্রিক সভ্যতার শোষণের দিকটাকে নানাভাবে সঙ্কুচিত করিয়া চীনকে আধুনিক দেশগুলির সমপর্য্যায়ে আনাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু ভারতের পুরাতন সমাজব্যবস্থাকে ভাঙিয়া ফেলিবার কল্পনাও করিতে পারেন না—তাঁহার জীবনের সাধনা বর্ত্তমান সমাজব্যবস্থার সংস্কার করিয়া এক রাম রাজত্বের প্রবর্ত্তন করা। তাই সুন্‌ইয়াৎসেন চীনে ফিউডালতন্ত্রের অবসান ঘটাইবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, আর মহাত্মা গান্ধী ফিউডালতন্ত্রের সাথেই জোড়াতালি দিয়া চলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

সুন্‌ইয়াৎসেনের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা সমস্ত চীনকে এক করিয়া এক বিরাট জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। চিয়াংকাইসেক সুন্‌ইয়াৎসেনের কর্ম্মপন্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া চীনে এক অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্টদের চেষ্টায় সেই অন্তর্বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে—চিয়াংকাইসেক আজ কম্যুনিষ্টদের সাথে হাত মিলাইয়া সুন্‌ইয়াৎসেনের কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিয়া চীনকে আবার ঐক্যবদ্ধ করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা সমস্ত ভারতকে এক করিয়া একদিন এক বিরাট জাতীয় আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল—সে কথা অস্বীকার করিবার নয়। কিন্তু সেই জাতীয় আন্দোলনের বৈপ্লবিক গতি দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী চিন্তাকুল হইয়া সেই আন্দোলনকে বিভিন্ন পথে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করিয়া মহাত্মা গান্ধী আজ জাতীয় আন্দোলনকে পথভ্রষ্ট করিতে ব্যস্ত।

তাই চীনের মুক্তি-আন্দোলনের নেতা সুন্‌ইয়াৎসেন ও ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধীর ভিতর পার্থক্য বিশাল ও দুস্তর।

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

The Oxford Book of Light Verse: Chosen by W. H. Auden
(Oxford Univ. Press)

কোনো কোনো যুগে সাহিত্য উচ্ছল হয়ে' ওঠে প্রাচুর্যে, কোনো যুগে বা হয় ক্ষীণকায়। বিষয়বস্তু বা লিখনরীতি সব যুগে একরকম হয় না, কখনো কাব্য হয় অনায়াস, কখনো বা দুর্বোধ্য কঠিন। অডেনের মতে এসবের কারণ খুঁজতে হবে কবিদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছেড়ে অন্যত্র।

কারণ কালাতীত কারয়িত্রীপ্রতিভাই শুধু সর্বযুগের কবিদের সাধারণ সম্পদ। ভাষামার্গ, কথ্য ও লেখ্যভাষার প্রতি পক্ষপাত, প্রত্যক্ষপ্রয়োগ, শ্রোতাদের গুণাগুণ ইত্যাদি সবই পরিবর্ত্তনশীল। কবির মুক্তি অবশ্য সত্য-ভাষণেই, বন্ধুবান্ধবকে আনন্দদানেই। কিন্তু সে সত্যের রূপ আর সে বন্ধুদের কুলশীলনির্ণয়ের ভার সমাজের এবং অংশত হয়তো কবির জীবনযাত্রার উপরে। যখন কবির প্রত্যক্ষপ্রজ্ঞার জগৎ সমাজচৈতন্যের অখণ্ডতায় মোটামুটি পাঠকের জগতে সাযুজ্য লাভ করে, তখন কবি বহুর এক হয়, তার ভাষা হয় সরল, মুখের ভাষার পাশঘেঁষা। ছিন্নভিন্ন সমাজে কবি হয়ে' ওঠে কবিবিশেষ, তার ভাষা হয় বিশেষজ্ঞের, তাকে অস্থির হয়ে' বেড়াতে হয় চৌষট্টি সতীতীর্থে। অডেনের মতে প্রথম অবস্থায় লাইট্ বা অনায়াস বা লঘু কবিতার সম্ভাবনা। এই কাব্যশরীরে অনায়াস কবিতা মর্মে মর্মে জীবনবেদে গভীর হতে পারে। লঘু কবিতা বল্‌তে অনেকে যে ভাঁড়ামি বা ইয়ারকি বা সামাজিক পদ্য বোঝেন, তার কারণ রোমান্টিক উজ্জীবনের পরে সমাজবিপ্লবের ফলে কবি ও পাঠক এতই বিচ্ছিন্ন যে কবিদের গম্ভীর আত্মস্থতা থেকে ছুটি নিলে শুধু এই খেলো হাসিতে, নাগরিক আলাপের মৌখিকতায় বা ঠুন্‌কো ব্যঙ্গেই নাম্‌তে হত।

কিন্তু চিরকাল এম্‌নি ছিল না। এলিজাবিথান্ যুগ পর্যন্ত প্রায় সব কবিতাই অনায়াস ছিল। ধর্মের ঐক্যে, জগচ্চিত্রের একতায়, জীবনযাত্রার রীতি-পরিবর্তন যতদিন ক্রমিক মন্থর ছিল, ততদিন কবি-পাঠক ছিল সমগোত্র। ইলিজাবেথের

সময় থেকে নটরাজের পদক্ষেপ হল দ্রুত এবং সম্ভব হল সেক্সপিঅরের কিছু কিছু, ডন্, মিল্টন্ প্রভৃতির কঠিন কাব্য। হে পাঠক, দুর্বোধ্যতা সর্বদাই নিন্দনীয় নয়। কারণ লঘিমাসিদ্ধি যতই লোভনীয় হোক্, একথাও সত্য যে, সমাজচৈতন্যের একতার জন্যই লঘু কাব্য ক্রমে হয়ে' দাঁড়ায় মামুলি রক্ষণশীল সমাজের আত্মপ্রীতির আওতায় সংকেতিত বা অভ্যাসিক। আপনকালের গতানুগতিক কৃতার্থে কবি তখন চিরকালের মানবিক পুরুষার্থকে দেয় বিসর্জন। তাই সমাজ যতই অস্থির হয়, কবি যতই সমাজ থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়ে, তার দৃষ্টি ততই স্বচ্ছ হয়। কিন্তু সেই পরিমাণেই তার প্রকাশ হয় দুরূহ। কদাচিৎ এমন যুগও থাকে যখন এই দুয়ের দোটানায় একটা প্রচণ্ড ভারসাম্য আসে এবং এলিজাবিথান্ যুগের এই সৌভাগ্য হয়েছিল এবং হয়তো আজকাল সেরকম যুগের পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

সপ্তদশ শতকে দেখি ধর্মের মতো কাব্যেও উৎকেন্দ্রিক লীলা চল্‌ছে। স্পেন্‌সর্‌কে বাদ দিলে মিল্টনকেই বলা যায় প্রথম আত্মসর্বস্ব উন্মার্গ কবি। এই ছন্নছাড়া ভাব হর্বার্ট, ক্র্যাশ প্রভৃতির কাব্যে, ব্রোনের গদ্যেও দ্রষ্টব্য। এক মার্ভেলেই কিছু এবং হেরিকেই ঐতিহ্যের প্রভাব বর্তমান।

রেষ্টোরেশনে আবার সমাজ দানা বাঁধল—যদিচ শুধু সমাজের উপরতলায়, উজ্জীবিতরাজ্যের আশে পাশে। কবির মর্য্যাদা বৃদ্ধি পেল। ড্রাইডেন্ এবং পোপ্ তাই অবলীলায় কবিতা লিখলেন। সীমাবদ্ধ তাঁদের কবিতা, তাঁদের পাঠকসমাজের মতোই। কিন্তু সেই গণ্ডীর ভিতরে তাঁদের বিচরণ স্থিতধী, স্বচ্ছন্দ।

তারপরে রোমান্টিকদের পালা—যান্ত্রিক বিপ্লবে ছত্রভঙ্গ, অস্থির। গ্রাম হল গৌণ, সমাজ হল সহুরে, বিবাহে সম্পর্ক স্থাপন না করলে বা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী না হলে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ রাখা দুরূহ হয়ে' উঠ্‌ল। শ্রেণিবিভাগ হয়ে উঠ্‌ল বহুধা আর আরো ধারালো। চাকুরিয়া বা জমিদারদের দায়িত্ব ঘাড়ে না পেতেই হল এক নতুন শ্রেণী—ডিভিডেণ্ডজীবীর দল। জোড়াসাঁকো, পাথুরিয়াঘাটা বা লালগোলা বা শোভাবাজারে আর কবিদের আসন পড়ল না, পাঠক হয়ে' দাঁড়াল অপরিচিত মিশ্র এক জনসাধারণ নামে প্রত্যাহার। লিরিকল্ ব্যালাডসের প্রস্তাবে এর আলোচনা পঠিতব্য। ফলে কবিরা সমাজের দেয়ালে

মাথা ঠোকা ছেড়ে মন দিলে আত্মচর্চায়, অথর্ববেদ ছেড়ে বেদান্তে। ফলে ওঅর্ডস্‌ওঅর্থ পোপের চেয়েও সৌখীনমার্গে লিখলেন তাঁর স্তবগুলি, আত্মজীবনীর নাম দিলেন—এক কবির মনের বিকাশ। রোমান্টিকেরা সবাই ছুটলেন ঘরকে করতে বাহির, কেউ নিসর্গে, কেউ স্বর্ণভবিষ্যতে, কেউ অতীতের মায়া-কাননে, কেউবা নিরালম্ব কাব্যের সাত্ত্বিক তপোবনে।

কবির কাজের চেহারাও গেল বদ্‌লে, কবিতা হল গৌণকথকের অরণ্যে-রোদন। ব্যক্তিগত জগতে কিছুকাল চলল ঘোরা ফেরা, আবিষ্কার ও আত্ম-জ্ঞানের সীমা এসে মিশ্‌ল মনোবিশ্লেষণে। নব্যসমাজতন্ত্রের বামাচারীই আজ ভরসা।

কিন্তু এর মধ্যেও লঘুকাব্য জন্মেছে। চাষাসমাজের বর্ণস্‌ আর বনেদি বায়রন্‌ দুজনেই স্কচ্‌। কিন্তু বর্ণসের সমাজে চল্‌তি ছিল বহু একতার ধারা—ধর্মে, লোকাচারে, লোকসঙ্গীতে। ফলে বর্ণসের বিহার ব্যাপক, কান্নাহাসির জগৎ তাঁর প্রত্যক্ষ ও কৈবল্যে অভিন্ন। কিন্তু বায়রনকে হয় শুধুই মজা করতে। কাব্যের অন্তরঙ্গ গাম্ভীর্য বা কবিত্ব তাঁর নেই কারণ স্মার্ট্‌ সমাজে সে বস্তুর অস্তিত্ব নেই। তাই প্রীড্‌ও প্রাঅরের চেয়ে অসার।

তারপরে উনিশশতকে দেখা যায় গ্রামসম্পর্ক ছিঁড়ে যাওয়ায় জ্ঞাতিকুটুম্বহীন ব্যক্তিদের একমাত্র নিরাপদ ও প্রকাশ্য সম্বন্ধ দাঁড়ায় পিতামাতা ও শিশুর সম্বন্ধ। সেই ভিত্তিতে গড়ে' উঠল শিশুসাহিত্য ও নন্‌সেন্স-কাব্য। অবশ্য লোকসাহিত্য চিরকালই রয়েছে, কিন্তু সমাজের ঘুণ তাতেও ধরেছে। তাই সেকালে যে ট্রাজিক্‌ মাহাত্ম্য বর্ডর্‌-ব্যালাডেও পাওয়া যেত, তা একালের গানঘরের পালাগানে দুর্লভ। তাই এখন মনঃসম্পন্ন অনায়াস কাব্য লিখতে গেলে গা ভাসাতে হয় কোনো প্রবল শ্রেণিস্বার্থের নির্দিষ্ট স্রোতে। কিপলিং মধ্যবিত্তের সাম্রাজ্যবাদে ডুবে তাই করেছিলেন। এবং বেলক্‌ ও চেষ্টরটন্‌ রোমান্‌ ক্যাথলিক্‌।

আজকে তাই কবিকেও নিজের গরজে ভাবতে হয় ভাবী সমাজের প্রয়োজন, যেখানে অন্যায় সুযোগের পক্ষপাতে জাত ভেদবুদ্ধি থাকবে না। সচেষ্ট চৈতন্যেই তার সম্ভাবনা, নচেৎ আজকে তার অধঃপতন। সেই সমাজের একতানির্দিষ্ট স্বাধীনতাতেই সম্ভব বয়স্ক বুদ্ধিসম্পন্ন অথচ অনায়াসবোধ্য বা লঘু কাব্য।

এবম্বিধ মুখবন্ধ যাঁদের অভিরুচিমতো নয়, তাঁদেরও কিন্তু চয়নিকাটি ভালো লাগ্‌বে তার বহুবিধ কবিতার সন্নিবেশে। অনেক কবিতা নতুনও লাগ্‌তে পারে—দি মেজর ও মাইনর প্লেসর্‌স্ অব লাইফ্, দি উইক্‌এণ্ড্ বুক, দি বুক অব্ লাইট্ ভর্স্ সত্ত্বেও। বইটি আরম্ভ দি সং অব্ লিউইস্ দিয়ে—

Richard, that thou be ever trichard,
trecchen thou shalt be nevermore.

সব শেষ করে' স্কেলটন্—

By Saynt Mary, my lady,
Your mammy and your dady
Brought forth a godely babe !

ডনবরের কবির লড়াই বা flyting কবিতাটিও বর্তমান। মধ্যে অজস্র নামকরা, কম নাম করা কবির কবিতা ও বহু নামহীন কবিতা ও গান শেষ করে এসে পড়া যায় বেলক্ চেষ্টরটন্ প্রভৃতিতে। সওয়া পাঁচশ পৃষ্ঠার চয়নিকার প্রতি সুবিচার উদ্ধৃতিতে সম্ভব নয়, যার বৈচিত্র্যের মধ্যে লিডেল এবং স্কটের গ্রীক অভিধান শেষ করার উপলক্ষে হার্ডির মজার কবিতা নির্বিবাদে খাপ খেয়ে যায় লিঅর্ বা ক্যারলের সঙ্গে বা অনামী কবির এই উপদেশের সঙ্গেও—

Then to each gay flighty wife may this a warning be,
Don't write to any other man or sit upon his knee ;
When once you start like Mrs. Maybrick perhaps you couldn't stop,
So stick close to your husband and keep clear of Berry's drop.

অথবা এডমণ্ড ক্লেরিহিউ বেণ্ট্লি-র ঃ

What I like about Clive
Is that he is no longer alive.
There is a great deal to be said
For being dead.

কিম্বা ক্লফের আঠারোটি শ্লোকের কবিতাটির সঙ্গে—স্থানাভাবে যার থেকে অবিচার করে'ই মাত্র তিনটি খাপছাড়া শ্লোক দেওয়া গেল :

As I sat at the Cafe I said to myself,
They may talk as they please about what they call pelf,
They may sneer as they like about eating and drinking,
But help it I can not, I can not help thinking
How pleasant it is to have money, heigh-ho !
How " " money.

* * * *

As for that, pass the bottle, and d-n the expense,
I have seen it observed by a writer of sense,
That the labouring classes could scarce live a day,
If people like us didn't eat, drink and pay.
So useful it is to have money, heigh-ho !
So " " money,

* *

And the angels in pink and the angels in blue,
In muslins and moirés so lovely and new,
What is it they want, and so wish you to guess,
But if you have money, the answer is 'Yes'.
So needful, they tell you, is money, heigh-ho !
So " " money.

অবশ্য বইটির ত্রুটি আবিষ্কার যে কোনো পণ্ডিত করতে পারবেন। কিন্তু আমাকে এখানেই থামতে হয়। শুধু মনে হয়, ইএট্‌স্ লঘু কবি হলে কি পৌণ্ড-কেও স্থান দেওয়া উচিত ছিল না ? আর এলেন নামধারী এক অধ্যাপকের বিশ্ববিষয়ে বইয়ে একটি লিমেরিকের লেখকের নাম দেখেছি বলে' মনে হচ্ছে, সেটি কিন্তু অডেন্ নামহীন করেছেন—

There was a young lady named Bright
Who would travel faster than light.
She started one day
In the relative way
And returned the previous night.

বিষ্ণু দে

Power—a new social analysis,—by Bertrand Russell (George Allen and Unwin)—7s. 6d.

বিংশ শতাব্দীর ইংরাজ মনীষীদের মধ্যে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের উচ্চ স্থান সর্ব্বজনস্বীকৃত। যুদ্ধান্তের যুগে কিছুদিন তাঁর বিবিধ পুস্তক চিন্তাশীল লোকমাত্রের পাঠ্য ও আলোচ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁর খ্যাতি এবং ভক্তবৃন্দ এদেশে পর্য্যন্ত তখন ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে-নূতন ভাবধারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রবল হ'য়ে উঠেছে, রাসেল্ প্রমুখ নিষ্ঠাবান উদার-নৈতিকদের প্রভাব নাশ তার অন্তরঙ্গ অংশ বলে'ই মনে হয়। আজকের দিনের রাসেল্ সেই আগেকারই বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্; শুধু ইতিমধ্যে তাঁর অনেক পাঠকের মনের রাজ্যে যে-পরিবর্ত্তন এসে গেছে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ম বুদ্ধি সত্ত্বেও তিনি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারেননি।

ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা আজকাল বহুলোকের মনে ছায়া ফেলাতে রাসেল্ চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন, কারণ তাঁর মনের গড়ন ও চিন্তার ধরণ সম্পূর্ণ পৃথকগোত্রীয়। তিনি তাই এই গ্রন্থখানিতে মানুষের অতীতের ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যতের ভরসা সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন করেছেন। রাসেলের পূর্ব্ব প্রতিপত্তি এত বেশী, তাঁর লেখার সরস প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ এখনও এত অক্ষুণ্ণ, তাঁর যুক্তি-কৌশল এত নিপুণ যে এই বইখানির বহুল প্রচার অবশ্যম্ভাবী। সেইসঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্য সম্বন্ধে আলোচনার দায়িত্ব এড়ানোও অবশ্য কঠিন হ'য়ে পড়েছে।

রাসেল্ ইতিহাসের মূলসূত্র খুঁজেছেন মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে, বিশেষ করে'

যে-সব প্রবৃত্তি মানুষকে অন্য জন্তুর থেকে পৃথক করে' রেখেছে। মানুষের বহু ইচ্ছার বৈশিষ্ট্যই নাকি তাদের অসীমতা। এই সীমাহীন আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে ক্ষমতা বা শক্তিলিপ্সাকে রাসেল্ বেছে নিয়েছেন ইতিহাসের মূল প্রেরণা হিসাবে। খ্যাতি বা কীর্ত্তির অভিলাষকে অবশ্য এখানে এই শক্তিস্পৃহারই অন্তর্গত করা হয়েছে।

গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়সিদ্ধির পরও যে মানুষ স্থির থাকে না, রাসেলের মতে এর কারণ এই শক্তিসন্ধান। জড়জগতে এনার্জি যেমন মূল প্রভাব, মানবসমাজে তেমনই শক্তিলাভই হ'ল চালক-স্থানীয়। আর এই শক্তি কোন বিশেষ প্রকারের ক্ষমতা নয়; মানুষের ঈপ্সিত এই শক্তির নানা রূপ ও মূর্ত্তি আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনও একটি অন্যগুলির চাইতে বেশী প্রধান নয়। অর্থাৎ আর্থিক বিধিব্যবস্থাকে ইতিহাসে মূলবস্তুর পদমর্য্যাদা দিতে রাসেল্ একেবারেই প্রস্তুত নন।

শক্তি-অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি হ'লেও সকলের ক্ষেত্রে এর সমান বিকাশ অবশ্য দেখা যায় না। তাছাড়া সকলেই ক্ষমতার সন্ধান করলে কোনও সঙ্ঘবদ্ধ আচরণ বা প্রতিষ্ঠান অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। তাই রাসেল্ লিখেছেন যে এই মূল প্রবৃত্তি সকলের মধ্যে সমান প্রবল নয়, এবং এর আবার প্রকারভেদ আছে। নেতৃত্বের অভিলাষ হচ্ছে এ-প্রবৃত্তির প্রকট রূপ, কিন্তু অসংখ্য লোকের মনে নেতাদের অনুসরণ করবার ইচ্ছাও সেই একই আকাঙ্ক্ষার প্রচ্ছন্ন রূপ মাত্র। এই যুক্তির সাহায্যেই রাসেল্ পাওয়ার বা শক্তিলিপ্সাকে সমাজের নিয়ন্ত্রক বলে' ঘোষণা করেছেন। নেতা ও অনুচর ছাড়া আর এক জাতীয় লোকের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেননি—তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে নিরীহতার কামনা করে। রাসেলের ব্যাখ্যায় হয়ত' এও আরেক প্রকারের শক্তির সন্ধান।

রাসেল্ দেখাতে চেয়েছেন যে ক্ষমতালাভের স্পৃহা সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। শক্তিপ্রকাশের বিভিন্ন মূর্ত্তি তাই ইতিহাসের মূল কথা। এই প্রকারভেদের প্রকৃতিগত তিনটি পর্য্যায় আছে বলা যায়। এক প্রকারের শক্তি প্রচলিত ট্র্যাডিশন্ বা ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে—এক্ষেত্রে সমাজ তাকে অভ্যাসের বশে বিনা বিচারে মেনে নেয়। দ্বিতীয় এক

পর্য্যায় হ'ল বিপ্লবী শক্তি—অর্থাৎ সমাজের এক অংশ পুরাতন ব্যবস্থাকে বর্জ্জন করে' নূতন শক্তির প্রতিষ্ঠা করে অথচ অন্য অংশগুলি তখনও পুরাতনের মায়া কাটাতে পারে না এবং তাই তাদের দমন করতে হয়। তৃতীয়তঃ স্থান বিশেষে অল্পদিনের জন্য চালকশক্তি সম্পূর্ণ আবরণহীন স্বেচ্ছাচারী নিছক ক্ষমতা-প্রকাশে পরিণত হ'তে পারে, রাসেল্ তাকে উলঙ্গ শক্তি আখ্যা দিয়েছেন। এর পিছনে অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্য কিম্বা নবীন দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন খুঁজে পাওয়া দুর্লভ।

পাওয়ারের প্রকাশের মূলরূপ হচ্ছে এই তিনটি। কিন্তু যে-সব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শক্তি ব্যবহৃত হয় তাদের আবার নানা প্রকারভেদ আছে। অবশ্য এই সব ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলি সব সময় সম্পূর্ণ পৃথক বা পরস্পরবিরোধী নয়। রাসেল্ এদের মধ্যে অনেকগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পুরোহিতদের শাসন, অবাধ-রাজতন্ত্র, অভিজাতবর্গ বা অল্পসংখ্যক লোকের আধিপত্য, অস্ত্রশক্তির কর্ত্তৃত্ব, আর্থিক ক্ষমতা, লোকমতের সঙ্গঠন ও প্রভাব ইত্যাদি নানাজাতীয় শক্তি এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে রাসেলের অনেক বক্তব্যই সুচিন্তিত এবং সুপাঠ্য।

মানুষের অতীত ও বর্ত্তমান এই ভাবে আলোচনা করে' রাসেল্ তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়ে পড়েছেন। পাওয়ারের আকাঙ্ক্ষা, এই প্রবল প্রবৃত্তির তাড়না, ক্রমাগতই ইতিহাসে সর্ব্বনাশী মূর্ত্তি নিয়েছে। শক্তিসন্ধানের উপর যে-সব দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত, তাদের দোষ নির্ণয়ে তাই তাঁর লেখনী বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু মানুষ তার প্রবৃত্তির হাত থেকে কি করে' সম্পূর্ণ উদ্ধার পাবে? তাছাড়া শক্তির অপব্যবহারই দূষণীয়—মানুষের মঙ্গলসাধন করতে হ'লেও ত' ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। এমন কি অতীতেও অনেক সময় পশুবলের চাইতে মঙ্গলময় আদর্শ শক্তি হিসাবেই শেষ পর্য্যন্ত বেশী স্থায়ী হয়েছে। অবশ্য কোনও কিছু সবলে প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া গোঁড়া মনের পরিচয়, এবং রাসেলের বিশ্বাস তিনি গোঁড়ামি সহ্য করতে পারেন না। সুতরাং মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শক্তির প্রবৃত্তিকে উৎপাটন নয়, তাকে আয়ত্তে আনার উপর। শক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের মঙ্গলে লাগাতে হ'লে অবশ্য কতকগুলি ব্যবস্থার প্রয়োজন। রাসেল্ সব শেষে সেগুলির নির্দ্দেশ

দিয়েছেন। রাষ্ট্রের মধ্যে চাই গণতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা; বিভিন্ন মত প্রচার এবং শাসকদের পূর্ণ সমালোচনার অধিকারও সেই সঙ্গে স্বীকার করতে হবে। আর্থিক ব্যবস্থায় সোশ্যালিজ্‌মে রাসেলের আপত্তি নেই, কিন্তু তার মধ্যে কোনও প্রকার ডিক্‌টেটরি কর্ত্তৃত্ব সাময়িক ভাবেও অগ্রাহ্য—কেন না অবাধ শক্তি হাতে এলেই তার অপব্যবহার হবে। ভবিষ্যতের মানুষকে দায়িত্ববান ও সুখী করে' তুলতে আরও ছুটি ব্যবস্থার প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য হবে মানুষ যাতে কোনও কথা সহজে বিনা বিচারে মেনে না নেয়—অর্থাৎ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রচার। আর শান্তি ও মঙ্গলের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য মানুষের মধ্যে যে-সব গুণের বহুল প্রচলন রাসেল্‌ কামনা করেছেন, নাস্তিক হ'লেও সেগুলি তাঁর পক্ষে ধর্ম্মের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

উপরের বিবরণ থেকে রাসেলের মূল বক্তব্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করা বোধহয় সম্ভব। সমালোচকের মনে এ-প্রসঙ্গে প্রথমেই দু'টি প্রশ্ন এসে পড়ে। পাওয়ার-গ্রন্থের নামপত্রিকাতেই দাবী করা হয়েছে যে এর মধ্যে রয়েছে সামাজিক প্রগতির এক নূতন বিশ্লেষণ; কিন্তু এই নূতনত্বের দাবী কতখানি সঙ্গত? ফ্রয়েড এক সময়ে সেক্স্‌-প্রবৃত্তিকে মানুষের সকল প্রচেষ্টার উৎসে বসিয়েছিলেন, তারপর তাঁর ধারণাকে ক্রমান্বয়ে পরিশুদ্ধ করতে করতে রাসেলের মতের মতনই একটা মূল তাড়নাতে সে আইডিয়া পর্য্যবসিত হ'ল। মানুষের বিশেষ কোনও প্রবৃত্তিকে ইতিহাসের চালক হিসাবে গ্রহণ করা কিছু নূতন কথা নয়—ভাববাদী ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা মাত্রই এই গোত্রীয়। দ্বিতীয়ত তাঁর গ্রন্থের দশ ও তের পৃষ্ঠায় রাসেল দাবী করেছেন যে তাঁর ব্যাখ্যা মার্ক্সের মতামতের চাইতে বেশী ব্যাপক, সঙ্গত ও যথার্থ। মার্ক্সের খণ্ডনই তাই বইখানির উদ্দেশ্য মনে করলে নিতান্ত অন্যায় হবে না। কিন্তু গ্রন্থকারের এ-দাবী কতখানি যুক্তিযুক্ত? রাসেলের নিজের কথাতেই বলা যায় যে পাওয়ারলাভের সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে কি মানুষের অতীত, বর্ত্তমান, ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জনের বিশেষ কোন সুবিধা হয়?

ইতিহাসের যে-কোনও ব্যাখ্যার পক্ষে একটা অবশ্য কর্ত্তব্য আছে—সে কর্ত্তব্য সামাজিক পরিবর্ত্তনের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা। পরিবর্ত্তন ব্যতীত

প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের কোনও বিষয়বস্তুই থাকে না। রাসেল্ নানা ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তনের কথা বলেছেন বটে কিন্তু পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে তার যথেষ্ট হেতু নির্দ্দেশের তিনি চেষ্টা করেননি। এর কারণ সহজেই বোঝা যায়। মানুষের প্রবৃত্তি মোটামুটি একই অবস্থায় থাকে, তার মূল প্রকৃতিতে কোনও পরিবর্ত্তন বা বিবর্ত্তনের ধারার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু যুগে যুগে মূল প্রেরণা অবিকৃত থাকলে ভিন্ন ভিন্ন যুগের পার্থক্যের কারণ কি? আবার পাওয়ারের প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন রূপকেই পরিবর্ত্তনের হেতু হিসাবে নির্দ্দেশ করলে প্রশ্ন ওঠে যে সেই প্রকার ভেদই বা কেন দেখা যায়? অর্থাৎ এক এক যুগে যদি শক্তিসন্ধান এক এক মূর্ত্তি নেয় তবে সে ক্ষেত্রে কোনটি কার্য্য এবং কোনটি কারণ? বস্তুতঃ রাসেলের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এই উভয় সঙ্কটে পড়ে ব্যর্থ প্রতিপন্ন হ'তে বাধ্য। তাই তিনি সমাজের নানা অবস্থার চিত্র এঁকেছেন মাত্র; সামাজিক পরিবর্ত্তনের কোনও ধারার নির্দ্দেশ, যুগ থেকে যুগান্তর আসবার কোনও হেতুনির্ণয় সম্বন্ধে তাঁকে নীরব থাকতে হয়েছে। এ-অবস্থায় তাঁর থিওরিকে ব্যাপক ব্যাখ্যা হিসাবে দাবী করবার কোনও অর্থ নেই।

অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থখানিতে রাসেল্ সামাজিক পরিবর্ত্তনের কারণ হিসাবে দু'টি কথার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর সে-চেষ্টাকে নিতান্তই ক্ষীণ বলতে হবে। প্রথমতঃ রাসেল্ লিখেছেন যে যাদের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে কিছুদিন পর তারা অন্যদের শুভাশুভ সম্বন্ধে আর দৃষ্টি রাখে না এবং তাই বিরোধী শক্তি জেগে ওঠে। কিন্তু তিনি যখন শক্তির অপব্যবহারকে অবশ্যম্ভাবী বলতে রাজি নন, তখন প্রশ্ন থেকেই যায় যে যুগসন্ধির সময় অকস্মাৎ কেন পূর্ব্বপ্রচলিত বিধিব্যবস্থা অনেকের কাছে অন্যায় মনে হ'তে থাকে। বিপ্লবের কারণ শুধু শাসকদের নৈতিক দুর্ব্বলতা, এ-ব্যাখ্যা কোন ঐতিহাসিককে তৃপ্ত করতে পারবে না। অন্যত্র রাসেল্ বল্ছেন যে পরিবর্ত্তনের কারণ হ'ল যে প্রকৃত শক্তিশালী লোকেরা এর মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ খোঁজে। কিন্তু তারা কেনই বা প্রচলিত ব্যবস্থার রক্ষায় সে-শক্তি নিয়োগ করে না এ-প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। যদি বলা হয় যে সমাজের সংরক্ষক শক্তিকে পরিবর্ত্তনের সমর্থক শক্তি পরাস্ত করে, তবে প্রকারান্তরে আবার আমাদের মূল প্রশ্ন ফিরে আসে।

ভাববাদী ব্যাখ্যা তাই শেষ পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাসকে ভগবানের লীলা বলেই স্বীকার করতে বাধ্য হয় ; রাসেলের সামাজিক বিশ্লেষণের যুক্তিসঙ্গত পরিণাম সেই বহুপ্রাচীন আদর্শবাদের মধ্যেই।

অতীত সম্বন্ধে রাসেলের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা তাই তার স্বভাবজাত পঙ্গুতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ভবিষ্যতের ভরসার বিষয়েও তাঁর মতামত খুব বাস্তব নয়। শক্তিলিপ্সাকে মানুষের মঙ্গলসাধনে নিযুক্ত করতে হ'লে যে-সব ব্যবস্থা রাসেলের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, সেগুলি কার্য্যকরী করবার উপায় কি ? ক্ষয়োন্মুখ ধনিকসমাজে আজ গণতন্ত্র সমূহ বিপন্ন হ'য়ে পড়েছে, উদার-গণতন্ত্রের শুধু মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করলেই সে-সঙ্কট কাটবে না। রাসেল্ সোশ্যালিজম্ বাঞ্ছনীয় বলেছেন কিন্তু ডিক্‌টেটর্‌শিপের উপর তাঁর এতই বিতৃষ্ণা যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধ উদারনৈতিক পদ্ধতির ভিতর দিয়ে সিদ্ধ না হ'লে তিনি তার প্রতি বিমুখই থাকবেন। এক্ষেত্রে অবশ্য সন্দেহ ওঠা অনিবার্য্য যে রাসেলের পক্ষে সোশ্যালিজম্ কল্পনার বিলাস মাত্র, নূতন সমাজ-গঠনের প্রতি তাঁর আন্তরিক টানের অভাব আছে। ধনিকতন্ত্রও যে মূলধনীদের ডিক্‌টেটর্‌শিপ্ এ-কথা রাসেল্ হৃদয়ঙ্গম করেননি। বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও শিক্ষার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস, অথচ নিরপেক্ষ বুদ্ধিবাদও যে শ্রেণীস্বার্থকে ছাড়িয়ে ওঠে না—এই সন্দেহটুকু তাঁর মনে উদয় হয়নি। ইউটোপিয়ান বা অবাস্তব সোশ্যালিষ্ট্ কথাটির প্রচলন হয়েছিল বিদ্রূপ হিসাবে ; বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্‌কে ইউটোপিয়ান্ লিবারেল্ আখ্যা দেওয়া অন্যায় হবে না।

মার্ক্সের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার গোড়ার কথা ছিল, শ্রেণীসম্বন্ধে ধারণা এবং ডায়ালেক্‌টিকের নিয়ম অনুসারে শ্রেণীসম্বন্ধের ক্রমবিকাশ। রাসেলের থিওরি কোন অংশেই এর থেকে বেশী ব্যাপক বা সঙ্গত নয় ; পক্ষান্তরে মার্ক্সের বক্তব্য পর্য্যন্ত তিনি ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। আসলে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেলের মনোভাব আঠারো শতকের তথাকথিত যুক্তিবাদের নূতন সংস্করণ। সমাজ তাঁর কাছে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে atomistic। সমাজের প্রকৃতি ও গড়ন যে-শ্রেণীবিভাগের উপর নির্ভর করে, রাসেলের চোখে তার সম্যক রূপ ধরা পড়েনি। এই জাতীয় মনোভাব মধ্য শ্রেণীর আধিপত্যের দার্শনিক আবরণ মাত্র। আলোচ্য গ্রন্থের ২১৩ পৃষ্ঠায়

তাই রাসেল্ যখন আধুনিক মানবের জীবনযাত্রার ছবি এঁকেছেন তখন হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই সে-ছবিতে ফুটে উঠেছে শুধু ইংরাজ মধ্য শ্রেণীর জীবনের অভিজ্ঞতাটুকু। মার্ক্সের মতবাদ কখনই এত সংকীর্ণ ও স্বল্পপরিসর নয়।

রাসেলের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাথমিক দুর্ব্বলতার জন্য তাঁর পুস্তকে এমন অনেক মন্তব্য স্থান পেয়েছে যার যাথার্থ্য গভীর সন্দেহের কথা। রাসেল্ বোঝেন নি যে মার্ক্সের বাস্তব ব্যাখ্যাকে আর্থিক বলা হয় এইজন্যই যে শ্রেণীর উৎপত্তি ও প্রকৃতি আর্থিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। শ্রেণীস্বার্থের জন্য সাময়িক অর্থক্ষয় স্বীকার ক'রে নেওয়ার মধ্যেও সুতরাং মার্ক্সের থিওরির দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন হয় না। জার্মানি বা ইটালিতে আজ যদি রাষ্ট্রশক্তি স্থানীয় ধনিকদের কাছ থেকে কিছু বেশী দেয় আদায় করতে বাধ্য হয়, তার থেকে প্রমাণ হয় না যে ফ্যাশিষ্ট্ শাসন ধনতন্ত্রের বিরোধী। একথা বোঝা সহজ যে ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকে শ্রেণীস্বার্থের দাবী অনেক বেশী; নয়ত নানা আর্থিক অসুবিধা সহ্য ক'রেও শ্রমিকেরা ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার প্রয়াস পেত না।—মার্ক্সের কর্ম্মপদ্ধতি ও সামাজিক বিশ্লেষণে রাষ্ট্রিক বা পোলিটিকাল্ শক্তির উপর জোর দেওয়া হয়নি, ১০৪ পৃষ্ঠার এই উক্তি এতই অসার যে রাসেলের মতন পণ্ডিতের পক্ষে তা' শোভা পায় না।—শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের জন্য দায়িত্ব মার্ক্সবাদের উপর চাপিয়ে রাসেল্ শুধু এই প্রমাণ করেছেন যে সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীভেদের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি অসংখ্য সাধারণ বুদ্ধিবাদীদের মতন একেবারেই সচেতন নন।—বার্ল্ ও মীন্স্ নামক দুই মার্কিন্ লেখকের উপর নির্ভর করে' আলোচ্য গ্রন্থে বারবার বলা হয়েছে যে মার্ক্সের বিশ্লেষণকে ব্যর্থ করেছে আধুনিক ধনতন্ত্রের রূপ; ব্যবসা বাণিজ্যে নাকি আজকাল চূড়ান্ত কর্তৃত্ব নির্ভর করে মূলধনের মালিকের চাইতে মুষ্টিমেয় কর্ণধারদের হাতে। রাসেল্ মনে রাখেন নি যে আর্থিক জগতে এই নূতন এক কর্তৃত্বের ধারার সন্ধান মার্ক্সই প্রথম দিয়েছিলেন। তিনি একথাও ভেবে দেখেন নি যে এতে ধনতন্ত্রের প্রকৃতির সবিশেষ পরিবর্ত্তন আসে না, কারণ ব্যবসার কর্তৃপক্ষেরা একই ধনিকশ্রেণীর প্রতিভূ মাত্র—ঠিক যেমন রাষ্ট্রশক্তি শাসকশ্রেণীর প্রতিভূ।

শ্রীসুশোভন সরকার

Italian Fascism—Cactano Salvemini. (Gollancz)

প্রায় সতেরো বৎসর হ'তে চলল, মহাবীর মুসোলিনী তাঁর সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে ইটালীর রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করেন। তাঁরই অনুগত শিষ্যমণ্ডলীর অনুগ্রহে এইটুকু আমরা জেনেছি যে, গত মহাসমরের পরে ইটালীতে 'বলশেভিজম্'-এর উৎপাত আরম্ভ হয়; ১৯১৯ থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের হিড়িক চলে। মুসোলিনীর অভ্যুদয়ে 'বলশেভিজম্'-এর ভূত পালায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামানো ইটালীয়দের স্বভাববিরুদ্ধ; তারা জানে কেবল খেতে এবং বংশ বৃদ্ধি করতে। মুদ্গরের রাজত্ব শেষ হ'লেই নাকি ইটালীর আবার সর্ব্বনাশ ঘনিয়ে আসবে।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর নানা উদ্যোগ-আয়োজনের ফলে যে ইটালী পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ব'লে গণ্য হ'ত, ফ্যাশিষ্ট প্রচারকার্য্যের পাণ্ডারা তাদের মহাবীর-পূজার অন্ধ আতিশয্যে সেই দেশকেই আজ বলকান রাজ্যের পর্য্যায় নামিয়ে এনেছে। ফ্যাশিষ্টদের চতুর প্রচারকার্য্য দেশকে ফতুর করলেও তারিফের যোগ্য। কিন্তু যে মহাবীর মুদ্গরের সাহায্যে মুমুক্ষু জাতিকে তরাতে এসেছেন, তাঁরই রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদের নামান্তর হ'ল ফ্যাশিজম্। ১৯৩২ সালে 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইটালিয়ানা'-র চতুর্দ্দশ ভাগে ফ্যাশিজম্-এর দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে তাঁর এক নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। অবশ্য তাঁর এই রসগর্ভ রচনার রহস্য ভেদ করার সাধ্য না থাকলেও সাধারণ বুদ্ধিতে যা' ধরা পড়ে, তা হ'চ্ছে এই: ১৯১৫ সালের জানুয়ারি মাসে ফ্যাশিষ্ট রিভলিউশ্যনারী পার্টি স্থাপনের সময়ে তাঁর মনে কোনো বিশেষ মতবাদের মূল ছিল না। ১৯০৩-৪ থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত সোশ্যালিজম্ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল; কিন্তু এই মতবাদের কার্য্যকারিতার দিক তাঁর বোধগম্য হয়নি। ১৯০৫ সালে জার্ম্মেণীতে রিভিশ্যনিষ্ট আন্দোলন আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যালিজম্ সর্ব্ববাদিসম্মত মতবাদের উপযোগিতা হারায়; বামপন্থী বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে রাশ্যা-য় বলশেভিজম্-এর ভিত্তি স্থাপিত হয়। উত্তর-সামরিক যুগে শুভকর সমাজতন্ত্রবাদ শূন্যগর্ভ হয়ে প'ড়ে পৈশুন্য ও ঘৃণাকে নিয়ে তার কারবার চালায়। তাই উপচিকীর্ষু মুসোলিনীকে এক নূতন রাজনৈতিক দল

গ'ড়ে তাঁর কার্য্য আরম্ভ করতে হয়। মানুষের বিবর্ত্তন ও ভবিষ্যৎ ভেবে ফ্যাশিষ্টরা এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছে যে, পৃথিবীতে কোনো দিন চিরস্থায়ী শক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একমাত্র সমরের দ্বারাই মানুষের অমর হবার সম্ভাবনা আছে। ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা নাকি অচল এবং শ্রেণীসংগ্রামের উপর ফ্যাশিষ্টদের কোনো আস্থাই নেই। তাদের প্রধান উপজীব্য হল শুদ্ধি ও শৌর্য্য। সুস্থ ও স্বস্থ জীবনের লক্ষণই হচ্ছে সাম্রাজ্যবিস্তারের সঙ্কল্প। অগ্রগামী জাতিকে দাঁড়াতে হলে সাম্রাজ্যবাদী হতেই হবে; এবং তাই হচ্ছে স্বভাবসম্মত। এর ব্যতিক্রম ঘটলে বুঝতে হবে জাতির অন্তিমকাল আসন্ন। প্রত্যেক যুগেই যেমন এক একটা মতবাদের উপযোগিতা আছে—বর্ত্তমান যুগেরও তেমনি একমাত্র মতবাদ হচ্ছে ফ্যাশিজম্।

মুসোলিনীর এই মতবাদ যেমন মৌলিক, তেমনি অযৌক্তিক। তার কারণ, 'Never have ideas guided Mussolini, it is he who guides them; he does not subserve them, it is they which subserve him; he knows them; he knows quite well what they stand for; he knows even better what they condemn, for he has betrayed it (Romain Rolland)। ফ্যাশিজম্-এর ফাঁকিটা ইটালীতে যারা প্রথমেই ধরেছিলেন, এণ্টোনিও গ্রামস্কি-র দশা থেকেই তাঁদের অবস্থা অনুমেয়। মুসোলিনী সগর্ব্বে নিজেকে মেকিয়াভেলি-র সুবোধ শিষ্য ব'লে প্রচার ক'রে থাকেন কিন্তু তাঁর মজ্জাগত 'clerical humbug' যে কতদূর ঘৃণ্য, তা সম্ভবতঃ অজ্ঞাতই থেকে গেছে।

ফ্যাশিষ্ট আমলে ইটালীতে নাকি এমনই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দেখা গেছে, যা আগের আমলে ছিল না। ফ্যাশিষ্টদের মুখ-নিঃসৃত এই ঘোষণা সত্য হয় নি এই যা আশার কথা। শুদ্ধি ও শৌর্য্যের নামে যারা মিথ্যা ও চাতুরীর মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, তাদের আচার ও আদর্শের মধ্যে কদাচিৎ সমীকরণের অসম্ভাব ঘটে। ১৯২২ সালে ইটালীর যা ঋণ ছিল, আজ তা' দ্বিগুণ হয়েছে। ইটালীয় শিল্পের অবস্থাও চরমে এসে পৌচেছে। ব্যাঙ্কা কমার্শিয়েল ইটালিয়ানা-র যে শেয়ার ১৯৩০ সালে ১,৪৮৩ লিরেতে বিক্রী হয়েছে, ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে তার দাম মাত্র ৫০ লিরে। নেভিগেজিয়োন জেনারেল ইটালিয়ানার যে শেয়ার ১৯২৯ সালে ১,৫০০ লিরেতে বিক্রী হয়েছে, ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে তার দাম

মাত্র ৭১ লিরে। ১৯২৭ সালে যে দেশে ৮০,০০০ মোটর তৈরী হয়েছে, ১৯৩৬ সালে সেই দেশ থেকেই তার প্রায় অর্দ্ধেক মোটর উৎপন্ন হয়েছে। অস্তমিত আত্ম-মর্য্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য মুসোলিনী পূর্ব্ব আফ্রিকা আক্রমণ করলেন। কিন্তু তাতে কাঁচা মাল অথবা লোকবৃদ্ধি সমস্যার কোনও সমাধান না হওয়ায় তাঁর সম্মান নিশ্চয়ই অক্ষুণ্ণ থাকে নি। 'After Italy had conquered Ethiopia politically, Ethiopia would thus conquer Italy economically'। ফিউমে সমস্যা নিয়ে বেলগ্রেড সরকারের সঙ্গে আপোষ ক'রে মুসোলিনী বুদ্ধির কাজ করলেও রূর সম্পর্কে পয়েনকারের চালে তিনি মাৎ হয়েছেন। কর্ফু অধিকার করতে গিয়েও তাঁকে পস্তাতে হয়েছে। ইটালীর সঙ্গে জার্ম্মেণীর আজ যত ঘনিষ্ঠতাই থাক্, ব্রেন্নারে ইটালী-জার্ম্মেণীর সীমান্ত নিয়ে গোলোযোগ একদিন বাধবেই। উত্তর-সামরিক যুগে ইটালীর যে অবস্থা ছিল, মুসোলিনী আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য তা আজ ঘুচিয়েছেন। রণক্লান্ত ইউরোপে মহাবীর মুসোলিনী সজোরে শিঙ্গা বাজিয়ে চলেছেন; হাততালি দেবার লোকেরও হয় ত' অভাব নেই। স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের জের মেটাতে গিয়ে শীঘ্রই না তাঁকে আবার শিঙ্গা ফুঁকতে হয়!

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তাসের দেশ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়) মূল্য—এক টাকা।

সমুদ্রপারের কোনো রাজপুত্রের নিজের যুবরাজী সঙ্ আর ভালো লাগ্‌ল না। সদাগরের সঙ্গে সে বেরিয়ে পড়্‌ল, আর নৌকাডুবি ইত্যাদি দুর্ঘটনার পর তারা এসে পড়ল অদ্ভুত এক দেশে। সেখানকার লোকেরা হাসে না, গান গায় না; অগ্রগতির নামে শিউরে ওঠে; তারা মানে শুধু নিজেদের শাস্ত্র; তাদের অশুচি মন্ত্রকে শুচি করার উপায় "বাদুড়ে খাওয়া গাবের আঁটি পুড়িয়ে" ইত্যাদি; সে দেশের অর্থ নেই আছে শুধু নিয়ম। এই তাসের দেশে রাজপুত্র নিয়ে এলো সমুদ্রপারের হাওয়া। সেখানে এলো প্রাণ, এলো স্পন্দন; এলো শিহরণ, এলো চাঞ্চল্য; তাদের সনাতন শাস্ত্রের ছন্দ গেল কেটে; শৃঙ্খলের অলঙ্কার ছিঁড়ে তারা বেরিয়ে এলো, তারা বেঁচে উঠ্‌লো।

অনেক সমুদ্র পেরিয়ে, জাহাজ ডুবির পর, এক অদ্ভুত কাল্পনিক রাজ্যের অবতারণা করে নিজেদের দেশের ও সমাজের দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ করা ও

প্রচলিত রীতিনীতিকে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করার পথ বোধকরি সুইফ্‌ট্‌ই প্রথম আবিষ্কার করেন। সুইফ্‌ট্‌-এর লেখার সঙ্গে সেদিক দিয়ে "তাসের দেশ" নাটিকার খানিকটা মিল আছে। সনাতন ধর্ম্ম ও তার শাস্ত্র, হিন্দু সমাজ ও তার বিধি-ব্যবস্থার প্রতি ব্যঙ্গ যে সময়োচিত তাতে সন্দেহ নেই। এ নাটিকা পড়্‌লে ও একে প্রকাশ্যভাবে অভিনীত হতে দেখ্‌লে এই সব অর্থহীন রীতিনীতি সম্বন্ধে হিন্দু-সম্প্রদায় সচেতন হবেন। কিন্তু, আমার মনে হয়, আজকাল যে যুগ এসেছে তাতে কোনো বিশেষ ধর্ম্মকে ব্যঙ্গ কর্‌লেই সব কাজ শেষ হয় না। কারণ, চেষ্টা কর্‌লে বেশীর ভাগ প্রচলিত ধর্ম্ম ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকেই ব্যঙ্গ করা যেতে পারে। "তাসের দেশের" ব্যঙ্গ যদি সমস্ত ধর্ম্মকে নির্ব্বিশেষে ব্যঙ্গ করতো, তা' হলেই বোধকরি এর উদ্দেশ্য সফল হত। "তাসের দেশের" রাজা ও প্রজারা যে পরিবেষ্টনীতে মুক্তি পেলো, সেই ভাবালু স্বপ্নের দিনও গত হয়েছে। অবশ্য এনাটিকা পড়্‌লে ও একে অভিনীত হতে দেখ্‌লে পাঠক ও দর্শক নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন; কিন্তু সেটা সাময়িক। আধুনিক দিনের যে রূঢ় আবেষ্টনীর মধ্যে বেশীর ভাগ লোকের দিন কাটছে, নাটকে বা উপন্যাস তার ছায়া প্রতিফলিত না হলে তাদের প্রভাব কখনই স্থায়ী হতে পারে না, পারে না গভীরভাবে নাড়া দিতে। অডেন্‌-ইশারউডের নাটিকায় আধুনিক কালের ছায়া দেখা যায় এবং সে কারণেই তাদের নাটকগুলি আজ জনপ্রিয়। বর্ত্তমানের ব্যর্থতার ও গ্লানির সম্মুখীন্‌ না হয়ে কোনো 'আইভরি-টাওয়ারে' উত্তর খোঁজা আজকাল অনেকেই পছন্দ হয়তো করেন না। এ নিয়ে "একটা আষাঢ়ে গল্প" বেশ লেগেছিল কিন্তু নাটিকা কি সফল হবে?

"তাসের দেশের" কয়েকটি গান বেশ ভালো লাগ্‌লো। তবে রবীন্দ্রনাথের গানের কথাটাই তো আর সব নয়। এবং সে কারণে সুর বাদ দিয়ে গানের সমালোচনা কর্‌তে গেলে হয়তো গণেশকে বাদ দিয়ে তাঁর ইঁদুরের সমলোচনাই হবে। এই ভয়ে উক্ত প্রচেষ্টা থেকে নিরস্ত হলুম।

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্ড্রা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত

পরিচয়—বৈশাখ, ১৩৪৬

বিষয়-সূচী

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৪৬

শেষ কথা

করো নাই করো, শেষ কথা এসেছি বলিতে,
তোমার প্রদীপ আছে, নাইকো সলিতে।
শিল্প তার মূল্যবান, দেয় না সে আলো,
চোখেতে জড়ায় লোভ, মনেতে ঘনায় ছায়া কালো
অবসাদে। তবু তারে প্রাণপণে রাখি যতনেই,
ছেড়ে যাব তার পথ নেই।
অন্ধকারে অন্ধদৃষ্টি নানাবিধ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরে
আচ্ছন্ন করিয়া বাস্তবেরে।
অস্পষ্ট তোমারে যবে
ব্যগ্রকণ্ঠে ডাক দিই অত্যুক্তির স্তবে
তোমারে লঙ্ঘন করি সে ডাক বাজিতে থাকে সুরে
তাহারি উদ্দেশে, আজো যে রয়েছে দূরে।
হয় তো সে আসিবে না কভু,
তিমিরে আচ্ছন্ন তুমি তারেই নির্দেশ কর তবু।
তোমার এ দূত অন্ধকার
গোপনে আমার
ইচ্ছারে করিয়া পঙ্গু গতি তার করেছে হরণ,
জীবনের উৎসজলে মিশায়েছে মাদক মরণ।

রক্তে মোর যে দুর্বল আছে
শঙ্কিত বক্ষের কাছে,
তারেই সে করেছে সহায়,
পশু বাহনের মতো মোহভার তাহারে বহায়।
সে যে একান্তই দীন,
মূল্যহীন
নিগড়ে বাঁধিয়া তারে
আপনারে
বিড়ম্বিত করিতেছ পূর্ণ দান হোতে
এ প্রমাদ কখনো কি দেখিবে আলোতে ?
প্রেম নাহি দিয়ে যারে টানিয়াছ উচ্ছিষ্টের লোভে,
সে-দীন কি পার্শ্বে তব শোভে ?
কভু কি জানিতে পাবে অসম্মানে নত এই প্রাণ
বহন করিছে নিত্য তোমারি আপন অসম্মান।
আমারে যা পারিলে না দিতে
সে কার্পণ্য তোমারেই চির দিন রহিল বঞ্চিতে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার ধর্ম

বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্‌গীতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বলিতেন গীতাই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গীতাভাষ্যের একস্থলে তিনি লিখিয়াছেন—'এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।' 'ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত তাঁহার এ সম্পর্কে অভিমত এই ঃ—'যদি কোথাও ধর্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে ভগবদ্‌গীতায়।' 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে গীতোক্ত ধর্মকে লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত সর্বলোক-হিতকর সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। ঐ ধর্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত।' এ সকল খুব উচ্চ প্রশংসা—স্তুতি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা কতটা সঙ্গত, সত্যোপেত ?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে গীতা-ধর্ম বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হয়। ধর্ম কি ? 'ধারণাৎ ধর্ম উচতে'—যাহা মনুষ্যকে 'ধারণ' করিতে পারে, পুষ্ট করিতে পারে, পীন করিতে পারে, তৃপ্ত করিতে পারে, চরম শ্রেয়ের পথে চালিত করিয়া 'নিঃশ্রেয়সে' (যাহাকে Summum Bonum বলে) নীত করিতে পারে—তাহাই ধর্ম। গীতোক্ত ধর্ম কি এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ?

জীবের পরম চরম লক্ষ্য ঐ নিঃশ্রেয়স—যাহার অপর নাম 'মুক্তি'। মুক্তি কি ? গীতাভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি'। * * 'ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে—কিন্তু ব্রহ্ম কি ? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য শুদ্ধ মুক্ত—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ হয়।'

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ

এ মুক্তি নির্বাণ মুক্তি—বৈদান্তিক যাহাকে 'বিদেহ-কৈবল্য' বলেন। নদী যেমন সমুদ্রে মিশ্রিত হইয়া নামরূপ হারাইয়া একাকার হয়—সেই একাকার অবস্থা—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—উপনিষদ্

'এ মুক্তি সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ' (ধর্মতত্ত্ব, ২য় অধ্যায়)—উপনিষদ্ যাহাকে 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য', গীতা যাহাকে 'অত্যন্তং সুখম্ অশ্নুতে' বলিয়াছেন—বুদ্ধদেব যাহাকে 'পামোজ্জবহুলং' বলিতেন। 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্থ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—"ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব—ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়—ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাব-প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।" 'কৃষ্ণচরিত্রে' পাপপুণ্য প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'পাপপুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধিতে উপস্থিত হইতে পারি তাহাই পুণ্য, তাহাই ধর্ম ;—তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ, তাহাই অধর্ম।' *

কিন্তু নির্বাণ-মুক্তি ছাড়া আর এক প্রকার মুক্তি আছে—যাহার নাম 'নির্মাণ-মুক্তি'। এ অবস্থায় মুক্ত জীব 'নির্মাণকায়ম্ অধিষ্ঠায়' (অপ্রাকৃত দেহ অবলম্বন করিয়া) ঈশ্বরের সহিত মিলিত থাকে, নামরূপ হারাইয়া মিশ্রিত হয় না—জলস্তম্ভে জলদ যেমন জলধির সহিত মিলিত হয়, মিশ্রিত হয় না। যাহাকে আমরা 'জীবন্মুক্তি' বলি, ঐ জীবন্মুক্তি এই নির্মাণ মুক্তিরই পূর্বরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতরামে' লিখিয়াছেন—'ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ ও দুঃখের অতীত, সে ইহলোকেই মুক্ত।' পুনশ্চ—'নিষ্কাম কর্মীই মুক্তির অধিকারী। মনুষ্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে না' (গীতাভাষ্য, ২৩৯ পৃষ্ঠা)। 'মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে 'মুক্ত'—এক কথায় অনুশীলনের পূর্ণ মাত্রায় মোক্ষ' (ধর্মতত্ত্ব)।

---

* যাহাকে 'Problem of Sin' বলে, অর্থাৎ ভগবান্ যখন পুণ্যময়, পুণ্যই যখন তাঁহার অভিপ্রেত—তখন পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণচরিত্রে' এ প্রশ্ন উৎথাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—'খৃষ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ। হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখ-দুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখ দুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখ দুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহারই অংশ।'

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন—'মোক্ষ আর কিছুই নয় ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাব-প্রাপ্তি'। ইহাকেই গীতায় ভগবান্ 'মম সাধর্ম্যম্ আগতঃ' বলিয়াছেন—এই 'similitude of God'-কে খৃষ্টানেরা 'Deification' বলেন, ('when He and I become one'—Eckhart), আমরা এ দেশে 'ব্রহ্মসারূপ্য' বলি। কি উপায়ে জীব ব্রহ্মের 'স-রূপ' হইতে পারে? 'ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাব প্রাপ্ত' হইতে পারে? আমরা জানি ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ—তিনি একাধারে প্রতাপঘন, প্রজ্ঞাঘন, ও প্রেমঘন—'the glorious Trinity of Power, Wisdom and Love.'—যুগপৎ 'Life, Light and Love'—সন্ধিনী, সংবিদ্ ও হ্লাদিনী শক্তির বিস্ফূর্জিত মূর্তি। জীব যখন ব্রহ্মের অংশ (মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা), ব্রহ্ম-অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ (যথা অগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ ব্যুচ্চরন্তি সহস্রশঃ), ব্রহ্মের-প্রতিচ্ছবি (God made man in His own image—Bible)—তখন জীবের অভ্যন্তরেও ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব, ঐ প্রতাপ প্রজ্ঞা প্রেম বিস্ফূর্ত না হইলেও অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে—

সত্যংজ্ঞানম্ অনন্তঞ্চ হ্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী

যাহাকে আমরা ধর্ম বলি, তাহার লক্ষ্য জীবের ঐ অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ ভাব সুব্যক্ত করা—ঐ অস্পষ্ট প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেমকে বিস্ফূর্জিত করা। যে জীবে ঐ প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত, ঐ সচ্চিদানন্দ ভাব মহোজ্জ্বল,—তিনিই 'ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাব-প্রাপ্ত', তিনিই ব্রহ্মের সারূপ্যসিদ্ধ—তিনিই মুক্ত।

জীব কিরূপে মুক্ত হইবে? জীব কিরূপে ব্রহ্ম হইবে? প্রণালীশুদ্ধ সাধনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে আমি অন্যত্র লিখিয়াছি—'সাধনাদ্বারা জীবের মধ্যে অব্যক্ত সৎ-ভাব, চিৎ-ভাব ও-আনন্দ ভাব—অব্যাকৃত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি সুব্যক্ত করিতে পারিলে—তবেই জীব ব্রহ্ম হইবে—তবেই জীব বুঝিতে পারিবে 'তত্ত্বমসি'—তবেই জীব বলিতে পারিবে—'সোহং' 'চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং'। এইরূপ সাযুজ্যসিদ্ধির জন্য কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—একশঃ কোন মার্গই যথেষ্ট নয়। পরমাত্মার যে চিদ্‌ভাব—জীবের বিজ্ঞানময় কোশের সাহায্যে

যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—জ্ঞানযোগদ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে ; পরমাত্মার যে আনন্দভাব—জীবের আনন্দময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—ভক্তিযোগদ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে ; এবং পরমাত্মার যে সৎভাব—জীবের হিরণ্ময় কোশের সাহায্যে যাহার আংশিক প্রকাশ হয়—কর্মযোগের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ জীবকে একাধারে বীর, পীর ও ধীর (Hero, Saint and Sage) হইতে হইবে। এইরূপে যখন জীবের সৎ-ভাব চিৎ-ভাব ও আনন্দভাব পূর্ণ বিকশিত হইবে, যখন তাহার মধ্যে অর্দ্ধব্যক্ত প্রতাপ, প্রজ্ঞা ও প্রেম পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত হইবে, তখন জীব আর জীব থাকিবে না, শিব হইবে। তখন সে যজুর্বেদের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিবে—যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহম্ অস্মি—ক্রাইষ্টের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারিবে—I and my Father are one.

এই যে মুক্তি বা ভগবানের 'সাধর্ম্য'-প্রাপ্তি—তাহার জন্য ত্রিবিধ technique—কর্ম, জ্ঞান, ও ভক্তির প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে এই ত্রিধারা ভিন্ন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ছিল। কর্মবাদী বলিতেন, সংসার-তরণের, মোক্ষসাধনের একমাত্র উপায় কর্ম—

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ অনার্থক্যং অতদর্থানাম্

—মীমাংসা সূত্র, ১।২।১

অন্য পক্ষে জ্ঞানবাদী বলিতেন—জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ—মুক্তির একমাত্র উপায় জ্ঞান।

কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ জ্ঞানাদেব প্রমুচ্যতে

ওদিকে ভক্তিবাদী বলিতেন, ভক্তিরেব গরীয়সী—জ্ঞান-গন্ধহীন, কর্মদ্বারা অনাবৃত নগ্ন ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা—

ভক্ত্যাহম্ একয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্

—ভাগবত

গীতায় কিন্তু বিশ্বগুরু যুগপৎ কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির উপদেশ দিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, 'All mystic ways (কর্ম জ্ঞান ও ভক্তি) are equal—all are equally roads to God'—শুধু তাই নহে, শ্রীভগবান্ সমন্বয়ের উচ্চ চূড়ায় আরূঢ় হইয়া ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জীবের ব্রহ্মসারূপ্যলাভের জন্য কেবল কর্ম, কেবল জ্ঞান, কেবল ভক্তি পর্য্যাপ্ত নয়—জীবকে ব্রহ্মে বিকশিত হইতে হইলে এ মার্গ-ত্রয়কেই সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে হয়। সেইজন্য গীতায় দেখি কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদের অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্ভুত যুক্ত-ত্রিবেণী-সঙ্গম রচনা করিয়াছেন—যে পুণ্যতর কল্যাণতর ত্রিবেণীতে সরস্বতীর কর্মধারা, যমুনার জ্ঞানধারা এবং গঙ্গার ভক্তিধারা সমান উজ্জ্বল, সমস্রোতে বহমান! বঙ্কিমচন্দ্র কি এই পুণ্যসঙ্গমে কোনদিন স্নান করিয়াছিলেন ?

স্বীকার করি, কর্মযোগের উপর তাঁহার বেশ পক্ষপাত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারামে' বলিয়াছেন—'যত প্রকার মনুষ্য আছে, রাজর্ষিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'। সেইজন্য সংসারত্যাগিনী দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্লমুখীকে গৃহে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে যথার্থ সন্ন্যাসিনী করিয়াছেন। 'তার কোন কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ কর্ম-পরায়ণ—তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী।' পুনশ্চ—'ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা অবশ্য কর্তব্য। করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে—তাহা বিবেচনা করা কর্তব্য নহে—সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ (গীতা, ২।৩৮)। ইহাই পশ্চাৎ কর্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।' (গীতাভাষ্য, ১১০)

অর্থাৎ, নিষ্কাম হইয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম করিতে হইবে—তবেই কর্ম কর্মযোগে উন্নীত হইবে। 'অনুষ্ঠেয় যে কর্ম—অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগ পূর্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্মত্যাগ হইল—নচেৎ হইল না। ইহাই কর্মযোগ'। (সীতারাম)

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

—গীতা, ২।৪৮

ইহারই ভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'পূর্বশ্লোকে ফলাকাঙ্খাশূন্য যে কর্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম করার পক্ষে তিনটি বিধি নির্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম করিবে। দ্বিতীয়, সঙ্গত্যাগ করিয়া কর্ম করিবে। তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্য জ্ঞান করিবে।' (গীতাভাষ্য, ১৪৭)

পক্ষান্তরে 'আনন্দ মঠে'র শেষ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সত্যানন্দের গুরু চিকিৎসকের মুখ দিয়া বলিতেছেন—'প্রকৃত হিন্দু ধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে, অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে।'

আবার দেখিতে পাই—'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্র ভক্তির প্রস্তুতি করিতেছেন (ধর্মতত্ত্ব ১৪ হইতে ১৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

'ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং অনুশীলনের একমাত্র সেই উদ্দেশ্য ভক্তি। × × ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়। × × একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। × × যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বর-মুখী বা ঈশ্বরাবর্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি। × × যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে সে ভক্ত নহে।'

এখন প্রশ্ন এই—যাহাকে আমি গীতার ত্রিবেণী বলিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার সন্ধান পাইয়া ছিলেন কি না? যদি না পাইয়া থাকেন, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতানুশীলন অসম্পূর্ণ ছিল বলিতে হইবে। তাঁহার গীতাভাষ্য ও ধর্মতত্ত্ব একটু নিবিষ্টভাবে পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র ঐ ত্রিবেণীর কেবল ইঙ্গিত নয়, বিস্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। 'পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে Thought, Action and Feeling বলিয়াছেন—ঐ তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে পারে। Thought ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্মযোগ; এবং Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ'। (গীতাভাষ্য, ১১২) 'শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়াছিলেন, (জ্ঞান ভিন্ন) ধর্মের অন্যপথও আছে; অধিকারিভেদে

তাহা জ্ঞানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞান মার্গ এবং অন্য মার্গ পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা লইয়া গীতা।'

এখানে আমরা ত্রিবেণীর ইঙ্গিত পাইলাম। এইবার সামঞ্জস্যের স্পষ্ট আভাস অন্বেষণ করি। এই যে ত্রিমার্গ—জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—গীতায় 'তাহাদের সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে।'

জ্ঞান ও কর্মের সামঞ্জস্য দেখাইতে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'প্রকৃত জ্ঞান কি? যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদয় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি

—গীতা ৪।৩৫'

বলা বাহুল্য, এ জ্ঞান পাণ্ডিত্য (Pedantry) নহে—তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিন্ত (উপনিষদ্)—এ জ্ঞান Head-learning নহে, Soul-wisdom (প্র-জ্ঞান)। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

'কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয় না। জ্ঞান ও কর্ম—উভয়ের সংযোগ চাই। কেবল কর্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। * * উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।* * এইরূপে কর্মবাদের ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্মপ্রণেতৃশ্রেষ্ঠ ভূতলে মহামহিমাময় এই নূতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন।'

কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য কি?

'ময়ি সর্ব্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশী র্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥

—গীতা, ৩।৩০

অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিতে কর্ম সকল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া মমতা ও বিকারশূন্যভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হও। 'কর্ম' ঈশ্বরের, আমি তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ—এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে—অহং কর্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা

(শঙ্কর)। তাহা হইলেই কর্মযোগ সিদ্ধ হইল।* * ঈশ্বরার্থ বা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট যে কর্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম বন্ধন মাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি? দাঁড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য হইল।'

জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য কি?

গীতা জ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন—

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তির ব্যভিচারিণী—১৩।১০

এবং চতুর্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তকেই শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থাপন করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—

'ভক্তির সঙ্গে ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। এই অপূর্ব তত্ত্ব, অপূর্ব ধর্ম কেবল গীতাতেই আছে। এরূপ আশ্চর্য্য ধর্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই।'

গীতোক্ত ধর্ম কি Asceticism? Asceticism-এ ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ। গীতাতেও কি তা'ই? গীতা কি জনসমাজকে সংন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে চান? 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংস' ইত্যাদির গীতাভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ২।৬২-৩ শ্লোকের টীকায় তিনি বলিতেছেন —'তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে—তাহার বিশেষ বিধি পর শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে।

রাগদ্বেষ-বিযুক্তৈস্তু বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়ৈ শ্চরন্।
আত্মবশ্যৈ র্বিধেয়াত্মা প্রসাদম্ অধিগচ্ছতি॥

'যিনি বিধেয়াত্মা*, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার

---

* এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র কান্তের Metaphysics of Ethics হইতে একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন— All ethical gymnastic consists therefore simply in the subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances, hazardous to morality. ইহাই 'বিধেয়াত্মা' হওয়া। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন— ইন্দ্রিয় সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্মাচরণ নাই। ইহা সকল ধর্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম মন্দিরের প্রথম সোপান। সর্ব শাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়-সংযমের কথা।'

বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। অর্থাৎ, তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ।' এই কথা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেছেন—'গীতোক্ত ধর্ম Ascetic Philosophy নহে—ইহা প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।'

প্রচলিত একটি প্রাচীন শ্লোকে এ কথার সমর্থন আছে—

ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
য হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ

—ধর্ম অর্থ ও কাম যুগপৎ সেবা করিবে। যে ব্যক্তি এই ত্রিবর্গের একতমে আসক্ত, সে জঘন্য। সেই জন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ !—৭।১১

বঙ্কিমচন্দ্র পুনশ্চ বলিতেছেন—

'Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে—এই গীতোক্ত ধর্ম তাহারও বিরোধী। কেন না Puritanism এই 'বিদ্বেষ'-বুদ্ধি-জাত' (পাঠক ! উদ্ধৃত গীতাশ্লোকের 'রাগদ্বেষবিযুক্তৈঃ' বিশেষণটি স্মরণ করুন)। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র একটা ঐতিহাসিক উদাহরণের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। 'রোমান্ ক্যাথালিক্ ধর্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়-বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ—কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চির কৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্য ঋষিরা যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ —কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচর্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দার পরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্বেষশূন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য ; অতএব কেবল ধর্মতঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন।

গীতায় অবশ্য 'সংন্যাসে'র কথা ভূয়োভূয়ঃ আছে। কিন্তু—

জ্ঞেয়ঃ স নিত্য-সংন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি—গীতা, ৫।৩

'ইংরেজেরা তাহাকে Asceticism বলেন, সংন্যাস (বৈরাগ্য)-শব্দে তাহা বুঝায় না। এই পরম পবিত্র ধর্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্ব্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম বৈরাগ্য; অথচ Asceticism কোথাও নাই।'—ধর্মতত্ত্ব, ষোড়শ অধ্যায়

গীতার সার কথা কি? গীতাভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথার আলোচনা করিয়াছেন।

'সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকার ভেদে পদ্ধতি নির্ব্বাচন মাত্র। হিন্দুধর্মে বা অপর কোন ধর্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল।'

অন্যত্র বঙ্কিমচন্দ্র এই ঈশ্বরে চিত্তার্পণকে 'ঈশ্বরারাধনা' বলিয়াছেন। 'সর্বভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা।

সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতাম্ উপেত
সমত্বম্ আরাধনম্ অচ্যুতস্য
—বিষ্ণুপুরাণ

আমরা ক্রমশঃ ভূয়োভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত ঈশ্বরারাধনাও তাই—সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্বভূতের হিতসাধন।* সেই জন্য গীতাকারের মুখে পুনঃ পুনঃ 'সর্বভূতহিতে রতঃ' পদটি প্রযুক্ত দেখিতে পাই।' গীতা বলেন,

মৎকর্মকৃৎ মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মাম্‌এতি পাণ্ডব॥
—গীতা, ১১।৫৫

---

* 'ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম। সর্বভূতকে ভাল বাসিবে।'
—সীতারাম, তৃতীয় খণ্ড—সপ্তম পরিচ্ছেদ।

'সে-ই ভগবানের সহিত মিলিত হয়—যে তাঁহার কর্ম করে, তিনি যাহার পরম, যে তাঁহার ভক্ত, যে আসক্তিশূন্য, যে সর্বভূতে বৈরহীন।'

সাধারণতঃ মানুষ সংকীর্ণ ও অনুদার। সে জন্য দেখা যায় মানবিকধর্ম প্রায়ই সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট—'My 'ism' is the only ism'—'আমার ধর্মই ধর্ম —তোমার ধর্ম অ-ধর্ম, যদি না হয় উপধর্ম'। এই সংকীর্ণ মনোভাব, এই 'religious snobbishness' জগতে যে বিতণ্ডা বিবাদ বিগ্রহ অস্বস্তি ও অশান্তি উৎপন্ন করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। ইহার প্রতিকার কি? প্রতিকার গীতার উদাত্ত শিক্ষার অনুসরণ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তান্ তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থঃ! সর্বশঃ॥

—গীতা, ৪।১১

'যে জন ভগবান্‌কে যে ভাবে চায়, সে তাঁহাকে সেইভাবে পায়। মনুষ্য সর্ব প্রকারে তাঁহার পথেরই অনুবর্তন করে।'

ইহার ভাষ্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন ঃ—

'পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, কেহ নিরাকারের কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; কোনও জাতি ভূতযোনির, কোন জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জীবের, কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা, কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে—অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সেই উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দনসিন্দুরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণ-জ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্বতকে বল্মীক-পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। ব্রহ্মবাদীও ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত নহেন—শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য

আর একজনের অগ্রাহ্য—ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য। স্থূলকথা, উপাসনা আমাদের চিত্ত বৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য—ঈশ্বরের তুষ্টি-সাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি-অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাঁহার তুষ্টি বিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে তিনি বিচারক—কেন না কর্মের ফলদাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধার্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বা তপশ্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়,—তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ শ্লোকের তাৎপর্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্মগত পার্থক্য থাকে না; হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাকার-বাদী, সাকার-বাদী, বহু দেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম—একমাত্র সর্বজনাবলম্বীয় ধর্ম। ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাকাব্যও আর নাই।'

সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অসংকোচে বলিয়াছেন—

'ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম—ইহাই একমাত্র Catholic Religion.' (গীতাভাষ্য, ১৬৯ পৃষ্ঠা)। এইভাবে পাশ্চাত্যেরা কেহ কেহ গীতাকে 'Bible of Humanity' আখ্যা দিয়াছেন। এ সম্পর্কে ১৩১২ সনে 'গীতায় ঈশ্বরবাদে' আমি এইরূপ লিখিয়াছিলাম :—

"গীতা অতি অপূর্ব গ্রন্থ। জগতের সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। * * গীতার একটি বিশেষত্ব—ইহার সার্বভৌমতা।

গীতায় সাম্প্রদায়িকতা অথবা সঙ্কীর্ণতার লেশ মাত্র নাই। সেই জন্য সকল শ্রেণীর দার্শনিক, সকল সাম্প্রদায়ের সাধক গীতাকে সমান আদরের চক্ষে দেখেন। গীতা বিশ্বতোমুখ গ্রন্থ। কি কর্ম্মী, কি জ্ঞানী, কি যোগী, কি ভক্ত, সকলেরই পক্ষে গীতা তুল্য-উপাদেয়। * * গীতা সত্যের সূর্যস্বরূপ। সূর্যে যেমন সকল বর্ণের সমন্বয়, সেইরূপ গীতায় সমস্ত সার সত্যের সমন্বয়। গীতা যদি সার্বভৌম না হইয়া সত্যের একদেশ বা অংশ মাত্র প্রকটিত করিত, তবে কি গীতার শুভ্রালোকে বিশ্বজনের চিত্ত উদ্ভাসিত হইতে পারিত ?”

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অহিংসা

মাধবীলতাকে নিয়া বাহিরে বিশেষ কিছু হৈ চৈ হইল না। রাজপুত্র নারায়ণের আশঙ্কাটা দেখা গেল নিছক তার নিজেরই কল্পনা,—অন্যায়ে অনভিজ্ঞ মনের স্বাভাবিক ভীরুতার ফল। যাদের কাছ হইতে চুরি করিয়া আনা হইয়াছে মাধবীলতাকে, চোর বা বমাল সম্বন্ধে তাদের কিছুমাত্র মাথা ব্যথার লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, জীবনের আকস্মিক গতিপরিবর্ত্তনের ধাক্কায় আহত ও বিব্রত মাধবীলতার রক্তমাংসের ক্ষয় বন্ধ হইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে ফিরিয়া আসিতে লাগিল স্বাভাবিক ইক্ষুদণ্ডের রং,—তাদের কোন সাড়া শব্দেই পাওয়া গেল না যাদের কথা ভাবিয়া মাধবীলতাকে প্রকাশ্যে আশ্রমে আনার জন্য বিপিন নারায়ণকে অনুযোগ জানাইয়াছিল, অত পরামর্শ দরকার হইয়াছিল দুজনের।

নারায়ণ গোলমাল করিল না। হয়ত সাহস পাইল না, হয়ত ভাবিয়া দেখিল গোলমাল করা মিছে অথবা হয়ত ঘাড়ের বোঝা নামিয়া যাওয়ায় নিঃশ্বাস ফেলিল স্বস্তির। আশ্রমে ভর্ত্তি করার জন্যই মেয়েটিকে সে আনিয়াছে প্রথমে এই কথা বলা হইয়াছিল সদানন্দকে, তাঁর কাছে এই ঠাটই বজায় রাখিয়া চলিতে হইল আগাগোড়া। দেখা গেল, ঠাট বজায় রাখিতে সদানন্দও কম ওস্তাদ নন। এসো বাবা বোসো, বলিয়া রাজপুত্রকে তিনি বসাইলেন কাছে। রাজপুত্রের বেলা নির্ব্বিকার ভাবটা কমাইয়া একটু স্নেহ জানাইবার জন্য বিপিনের যে অনুরোধ ও উপদেশ এতকাল কিছুতেই স্মরণ রাখিতে পারিতেন না, আজ যেন সেই অনুরোধ ও উপদেশের মর্য্যাদা সুদে আসলে দিবার জন্যই নির্ব্বিকার ভাবটা বিসর্জ্জন দিয়া জানাইলেন গভীর স্নেহ। বলিলেন 'হ্যাঁ যাও, বেড়িয়ে এসো গে' একটু নদীর ধার থেকে দুজনে। কবে আবার দেখা হয় তোমাদের ঠিক তো নেই। কেন যাবে না মাধু, যাও। শীগগির ফিরো—সন্ধ্যার আগে।'

মাধবীলতাকে চোখের দেখা দেখিতে না দিয়াই সদানন্দ রাজপুত্র নারায়ণকে ফিরাইয়া দিতে পারিতেন, কারও ক্ষমতা ছিল না বাধা দেয়। বিপিন তো রাগ করিয়াছেই, না হয় আরও খানিকটা বেশী রাগ করিত। কিন্তু দুজনকে

নির্জ্জনে একটু আলাপ করিতে দেওয়াই সদানন্দ ভাল মনে করিলেন। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার বলিয়া নয়,—বোঝাপড়া হইবে না, এরকম অবস্থায় বোঝাপড়া হয় না, বোঝাপড়ার কিছু নাই। একটু আবোল তাবোল বকিবার সুযোগ পাক দুজনে। সদানন্দের জোর-জবরদস্তির অভিযোগ যেন ঘুণাক্ষরেও মনে না জাগে কারও: মাধবীলতা আশ্রমে থাকিতেছে স্বেচ্ছায়, নারায়ণ তাকে আশ্রমে রাখিয়া যাইতেছে স্বেচ্ছায়, এর মধ্যে আর কারও কর্ত্তৃত্ব নাই। বিপিনও হয় তো একটু ঠাণ্ডা হইবে ব্যাপার বুঝিয়া, জোর দিয়া বলা চলিবে বিপিনকে যে, মাধবী থাকতে চাইলে আমি কি করব বিপিন?

এত সব ভাবিয়া সদানন্দ দুজনকে নদীর ধারে বেড়াইতে পাঠাইয়া দিলেন। তবু একান্ত যুক্তিহীনভাবেই মনটা একটু উতলা হইয়া রহিল বৈ কি। বর্ষার গোড়ায় একি অপরাহ্ণ আসিয়াছে আজ। দীপ্তি সম্বরণ করিয়া বর্ণচ্ছটা বিতরণের আর কি দিন জুটিত না অকালে ক্লান্ত সূর্য্যের। মন্থর গতিতে নদী তীরের কোনখানে ওরা দুজনে পৌঁছিয়াছে, কি বলাবলি করিতেছে নিজেদের মধ্যে। কত অভিমান আর অনুনয় না জানি রাজপুত্র প্রকাশ করিতেছে কথায়, সুরে, মুখের ভাবে, চোখের বিষাদে। অনুযোগ হইয়া উঠিতেছে মিনতি। মন যদি না মানে মাধবীর? মোড় যদি ঘুরিয়া যায় তার মনের? যদি সে তুলনা করে এই বিরাট-দেহ শ্রীহীন দরিদ্র প্রৌঢ়ের সঙ্গে রূপবান ধনবান সঙ্গী যুবকটির, আর তুলনা করিয়া যদি তার মনে খটকা বাধে যে কি হইবে ধার্ম্মিকের মুখোস পরা নরপিশাচটার আশ্রমে বাস করিয়া, তার চেয়ে রাজপুত্রের হাত ধরিয়া উধাও হইয়া যাওয়া ঢের ভাল, যাহোক তাহোক ফলাফল? সকাতর ক্লিষ্ট ঔৎসুক্যের সঙ্গে সদানন্দ দুজনের ফিরিয়া আসার প্রতীক্ষা করেন, নিজেকে নিজেই মনে মনে বলেন, আমি কি, অ্যাঁ?—অভ্যস্ত আত্মাদর যেন দীনভাবের আধিক্যে কোথায় তলাইয়া যায় কিছুক্ষণের জন্য এবং এতক্ষণে প্রকৃত পুণ্যবানের মত অস্থায়ীভাবে বিনা প্রতিবাদে মাধবীলতা সম্পর্কে নিজেকে বিশ্বাস করিয়া ফেলেন—পাপী। তেজস্বী কম নন সদানন্দ। গোঁয়ার নন্ বলিয়া বিপিন জানে মানুষটা তিনি নরম,—খুঁটিনাটিতে যে সর্ব্বদা হার মানে মোটামুটিতে কবে তার প্রচণ্ড তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছিল সে কথা মনে করিয়া রাখে কে? তেজস্বীর কাছে দুঃখ বেদনা সহজে আমল পায় না। কিন্তু অন্যায়ের

ক্ষণিক উৎসমুখে নিবিড় মমতার এক অপরূপ মাধুর্য্য উৎসারিত হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে, তার আপশোষ বড় দুরন্ত। আহা, কি মিষ্টিই ছিল মাধবীলতাকে উমার জিম্মা করিয়া দিয়া আসিবার পর হইতে, প্রায় সমস্ত রাত্রির অযাচিত জাগরণের ছটফটানি রীতিমত আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত, সেই বীভৎস করুণ পাশবিক মায়ার স্বাদ। আনস্বাদিতপূর্ব্ব সেই মাধুর্য্যের লোভেই হাল ছাড়িয়া দিয়া ধৈর্য্যহীন ক্লেদাক্ত দুঃখে কী কাবুই হইয়া পড়েন মহা তেজস্বী সদানন্দ।

সন্ধ্যা পার হইয়া যায়, দুজনের ফিরিবার নাম নাই। নিজের সঙ্গে নিজের বিষাক্ত আত্মীয়তা স্থাপনের মজাটা সদানন্দ পরিষ্কার টের পাইতে থাকেন। তারপর যখন খবর আসে নারায়ণ চলিয়া গিয়াছে, মাধবীলতা উমা ও রত্নাবলীর কুটীরে ফিরিয়া গিয়াছে, তখন খুসী হইবার ক্ষমতাও থাকে না এমনি নিস্তেজ আর ভোঁতা হইয়া পড়েন।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা, বিপিনও গোলমাল করিল না। অন্ততঃ সদানন্দ যেরকম ভাবিয়াছিলেন, সেরকমভাবে করিল না। পরের উত্তেজনা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিয়া উত্তেজিত হওয়ার মত প্রথমটা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ফাট' ফাট' বোমার মত অবস্থায় সদানন্দের কাছে আসিয়া দাবী করিল, এর মানে?—সদানন্দ জবাব দেওয়া মাত্র বোমার মত ফাটিয়া গেল। বাস্। আর কিছুই নয়। নিজের বিস্ফোরণে নিজেই যেন সে দারুণ আহত হইয়াছে, রাগ করিবারও আর ক্ষমতা নাই।

তারপর আশ্রমের কারও কাছে কিছু না বলিয়া সে যে কোথায় চলিয়া গেল সেই জানে। মাধবীলতার সঙ্গে নদীর ধারে একটু পায়চারি করিয়া নারায়ণ যেদিন ফিরিয়া গেল, বিপিন আশ্রমে অনুপস্থিত। আরও দুদিন পরে সে ফিরিয়া আসিল। গম্ভীর চিন্তিতমুখে সদানন্দকেই যেই জিজ্ঞাসা করিল, মাধবী নারাণবাবুকে কি বলেছে?

'আমি তো জানি না বিপিন। মাধবী যেতে চায় না, আমিই বলে কয়ে দুজনকে নদীর ধারে পাঠিয়ে দিলাম। ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছে আমি কি করে বলব?'

বিপিন হঠাৎ হাসিয়া বলিল, 'তোর পাতানো মেয়ে, তুই ছাড়া কে বলবে? বাবা বলে ডাকে না তোকে?'

বিপিন কিছু সন্দেহ করিয়াছে নিশ্চয় এবং এটা তার নিছক সন্দেহমূলক কদর্য্য পরিহাস নয়। কিন্তু সদানন্দ ধরা দিলেন না। উদাসভাবে হাই তুলিয়া বলিলেন, 'পাতানো মেয়ে আবার কিসের !'

ভিতরটা রি রি করিতে লাগিল। একটা যেন খণ্ডযুদ্ধ হইয়া গেল বিপিনের সঙ্গে, যাতে জয় পরাজয়ের পার্থক্য নাই, তবু জয়ী হইলেই বেশী ক্ষতি। বিপিন হাত কচলায় আর ঠিক যেন মুখের হাসিটাকেই চিবাইতে চিবাইতে অশ্রুনিরোধের অভিনয় করিতে থাকে। কিছু ভাবিতেছে এমন কথা মনেও করা যায় না, জিহ্বা যেন আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে চুপ চাপ থাকিবার ভঙ্গিটা এমন খারাপ। হঠাৎ 'হুঁ' বলিয়া যেন ভাবিতে লাগিল তামাসা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিবে কি না।

সদানন্দ ধৈর্য্য হারাইয়া বলিলেন, 'কি ভাবছিস শুনি ?'

'কিছুই ভাবছি না।'

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। বিপিন যা ভাবিতেছিল, বলিবে কিনা ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সঙ্কোচটা কিসের তাও সে নিজেই ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কিসে যেন বাধিতেছে—একটা অর্থহীন অকারণ বাধা। খানিক পরে হঠাৎ মরিয়া হইয়া বলিয়া বসিল, 'মাধবীকে ফিরিয়ে রেখে আসি তবে কাল পরশু ?'

'কোথায় ?'

'যেখান থেকে এসেছে, ওর মামার বাড়ী।'

সদানন্দ মাথা নাড়িয়া জোরের সঙ্গে বলিলেন, 'না। এইখানে থাকবে মাধবী, কোথাও যাবে না।'

ছোট একটি নুড়ি পাথর বিপিন হাতে নাড়াচাড়া করিতেছিল, উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার সেটিকে লুফিয়া লইয়া সে হঠাৎ মুচকি হাসিয়া বলিল, 'কেন মিছে বালির ঘর বাঁধছ বাবা! রাজপুত্তুরকে ছেড়ে তোমার দিকে ঝুঁকবে তেমন মেয়েই ও নয়। গুরু সেজে বড় জোর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে গালটা টিপে দিতে পার, তার বেশী কিছু—'

'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিপিন ?'

বিপিন ধৈর্য্যহারা হইয়া বলিল, 'মাথা আমার খারাপ হয়নি, হয়েছে তোর।

কচি একটা মুখ দেখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে গেছিস্! ঢং করে রত্নীর ওখানে রাখা হল কেন, নিজের কাছে রাখলেই হত, বুকে করে ?'

সদানন্দকে কথাটি বলিবার সুযোগ না দিয়া বিপিন গটগট করিয়া চলিয়া গেল। সেদিন আর কাছেই ঘেঁষিল না সদানন্দের। খবর আসিল মাধবীলতাকে সে অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে জেরা করিয়াছে। চালচলনে যেন কেমন একটু রহস্যের আমদানী হইয়াছে বিপিনের। কাজ ও কথা হইতেছে খাপছাড়া, প্রতিক্রিয়া হইতেছে অপ্রত্যাশিত। পরদিন দেখা হইলে সদানন্দ তাকে একটু বুঝাইয়া বলিতে গেল যে, দোষটা যখন সদানন্দের, আশ্রমে থাকিবার জন্য মাধবীলতাকে পীড়ন করাটা কি সঙ্গত হইবে ? একথায় বিপিন রাগ করিবে সদানন্দ তা জানিত, কিন্তু রাগটা যে তার এমন অদ্ভুত রকমের হইবে সে তা কল্পনাও করে নাই।

'শেষ পর্য্যন্ত মাধবীকে পীড়ন করব তাও ভাবতে পেরেছিস সদা ? ভয় নেই, তোর প্রেমের পথে কাঁটা হয়ে থাকব না, আমি বিদায় হচ্ছি।'

মুখচোখের কি ভঙ্গি বিপিনের, সর্ব্বাঙ্গে কি থর থর কম্পন। দেখিলে মনে হয় ভিতর হইতে কি যেন তাকে জ্বালাও দিতেছে, ধরিয়া নাড়াও দিতেছে। সদানন্দ তার বাহুমূল চাপিয়া ধরিলেন। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর অসুখ করেছে নাকি বিপিন ?'

বিপিন শুধু বলিল, 'হাত ছাড়। আমার হাতটা লোহা দিয়ে তৈরী নয়।'

তারপর আর কিছুই বিপিন বলিল না, কোথায় যেন চলিয়া গেল। চলিয়া গেল ? কোথায় চলিয়া গেল বিপিন তার এই আশ্রম ছাড়িয়া, তার প্রাণের বন্ধু সদানন্দকে ছাড়িয়া ? কারোকে প্রশ্ন করিবার উপায় নাই, সদানন্দকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। বিপিন কোথায় গিয়াছে সদানন্দই যদি না জানেন, সে তবে কেমন কথা হয় ? গুরুদেবকে না জানাইয়া গিয়াছে নাকি বিপিন ! সদানন্দের মনের মধ্যে নানা চিন্তা পাক খায়, নানা দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে, বাহিরে গম্ভীর হইয়া থাকেন, যথারীতি নিজের কাজ করিয়া যান। নিয়ম কানুন বাঁধাই আছে আশ্রমে, কোন ব্যবস্থারও অভাব নাই, তবু বিপিন না থাকিলে যেন চলে না, আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার অবাধ গতি

ঠেকিয়া ঠেকিয়া থামিয়া থামিয়া চলিতে থাকে—অসুবিধা সৃষ্টি হয়, গোলমাল বাধিয়া যায়, অনুষ্ঠান নিখুঁত হয় না, ঠিক যেন গৃহিণীবিহীন বৃহৎ সংসার। বিশেষভাবে সব ঠিকঠাক করিয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোথাও গেলেও বিপিনের অনুপস্থিতি সব সময়েই অনুভব না করিলে চলে না, এবার তো সে কিছু না বলিয়া কহিয়া হঠাৎ চলিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ সদানন্দকে বিপিনের খবর জিজ্ঞাসা করে।

সদানন্দ সংক্ষেপে ভাসা ভাসা জবাব দেন, 'আসবে, দু'চার দিনের মধ্যে আসবে।'

দু'তিনটা দিন কাটিয়া যাওয়ার পর বিপিনের জন্য সদানন্দের মন কেমন করিতে থাকে। অনেক রকম মনোভাবের মিশ্রণে প্রথমে মনের মধ্যে যে খিচুড়িটা তৈরী হইয়াছিল সেটা হজম হইয়া যাওয়ার পর ক্ষুধার মতই অভাববোধটা ক্রমেই যেন হইয়া উঠিতে থাকে জোরালো। এটা একটু আশ্চর্য্য। কতবার তো ছাড়াছড়ি হইয়াছে বিপিনের সঙ্গে, মাস কাটিয়াছে, বছর কাটিয়াছে, বিপিনের জন্য এরকম মন খারাপ হইয়াছে কবে? তবে এভাবে ছাড়াছড়ি হয় নাই কোন বার। একসঙ্গে চলিতে চলিতে দুজনের পথ চলিয়া গিয়াছে দুদিকে, দুজনে তাই চলিয়াও গিয়াছে দূরে। এবার বিপিন রাগ করিয়াছে, মনে আঘাত পাইয়াছে, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাকে। কে ভাবিতে পারিয়াছিল এমন হইবে? রাগিয়া কলহ করিবে না, বোঝাপড়ার চেষ্টা করিবে না, নূতন নূতন মতলব আঁটিয়া প্রকারান্তরে নিজের জিদ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিবে না, কেবল বলিবে চললাম, আর বলিয়া গট গট করিয়া চলিয়া যাইবে! এমন কি ঘটিয়াছে যার জন্য এমন ভয়ানক আঘাত পাইল বিপিন, এমন কাণ্ড করিয়া বসিল?

সদানন্দের সবচেয়ে দুর্ব্বোধ্য মনে হয়, সমস্ত ফেলিয়া চলিয়া গেল বিপিন, কিন্তু এই চরম চালটা কোন দিক দিয়া কাজে লাগানর চেষ্টা করিল না। চলিয়া যাওয়ার ভয় দেখাইয়া কাবু করিয়া চলিয়া যাওয়ার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাধবীলতা সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে রাজী হওয়ার সুযোগ দিয়া সদানন্দকে বশ করিবার চেষ্টা করিলে এবং চলিয়া যাওয়ার পরেও সদানন্দকে মত পরিবর্ত্তন করিয়া তাকে ডাকিয়া ফিরাইয়া আনিবার উপায় সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া গেলে, তবেই

যেন কাজটা বিপিনের প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইত। এভাবে চলিয়া যাওয়া তো সম্ভব বলিয়াই মনে হয় না বিপিনের পক্ষে।

বিপিনের কি চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছিল? ভাল লাগিতেছিল না আশ্রমের শিষ্য, ম্যানেজার, মন্ত্রী, সংগঠক ও বন্ধুর জীবন? এ ধরণের সন্দেহ মনে আসিলে সদানন্দ সঙ্গে সঙ্গে ঝাড়িয়া ফেলেন। আশ্রম সম্বন্ধে বিপিনের মমতার কথা তাঁর চেয়ে কে ভাল করিয়া জানে। যেখানেই গিয়া থাক বিপিন, আশ্রমের জন্য মন যে তার ছটফট করিতেছে তাতে সন্দেহ নাই।

বিপিন ফিরিয়া আসিবে। রাগের মাথায় দুদিনের জন্য কোথাও গিয়াছে, আবার ফিরিয়া আসিবে। একদিকে মন কেমন করা যেমন চাপা যায় না, অন্যদিকে বিপিনের ফিরিয়া আসিবার আশাটাও অসংখ্য যুক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়। সমগ্রভাবে বিচার করিয়া নিজের অবস্থাটা সদানন্দ মোটামুটি বুঝিতে পারেন। বিপিন যেমন হোক, বিপিনকে ছাড়া তাঁর চলিবে না।

বুঝিতে পারিয়া রাগ হয়। এই আশ্রমের এতগুলি মানুষের মধ্যে যাকে ইচ্ছা একটি মুখের কথায় তিনি মাটিতে লুটাইয়া দিতে পারেন, শতাধিক মানুষ বাহির হইতে সপ্তাহে তিন দিন তাঁর উপদেশ হাঁ করিয়া শুনিয়া যায়, দেশের চারিদিকে নিকটে ও দূরে জানা অজানা কত ভক্ত তাঁর ছড়াইয়া রহিয়াছে, বিপিনকে ছাড়া তাঁর চলিবে না? এ তো ভাল কথা নয়।

আশ্রম পরিদর্শন ও পরিচালনার ভারটা সদানন্দ নিজের হাতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন। বিপিন গিয়াছে যাক। সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া বিপিন আশ্রমে নাই ভাবিয়াই বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে—করুক। আশ্রমবাসী ও আশ্রমবাসিনীদের উপদেশ ও নির্দ্দেশ দিতে, দর্শনার্থীকে দর্শন দিতে, আশ্রমের কাজ ও জিনিষপত্রের হিসাব রাখিতে, নদীর ধারে কাঠের গুঁড়িটাতে বসিয়া আশ্রমের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরিকল্পনা গড়িয়া তুলিতে, এমন কি রাত্রে বিশ্রামের জন্য শয়ন করিতে পর্য্যন্ত বিপিনকে মনে পড়িয়া মন খারাপ হইয়া যায়—যাক্। বিপিন যেমন চলিয়া গিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে তাকে ছাড়া তাঁর চলিবে না, তিনিও তেমনি আশ্রমকে নিখুঁতভাবে চালাইয়া, আশ্রমের উন্নতি করিয়া দেখাইয়া দিবেন বিপিনকে ছাড়াও তাঁর চলে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি টের পাইলেন, উন্নতি দূরে থাক, বিপিন এতকাল যেভাবে চালাইয়া আসিয়াছে ঠিক সেইভাবে আশ্রম চালানর কাজটাও যেমন কঠিন, তেমনি জটিল। বিপিন যে বলিয়াছিল, সে কিছু বোঝে না, কেবল তার আদর্শ নিয়া থাকে, মনের মধ্যে আদর্শ পোষণ করা এক কথা আর সেটা কার্য্যে পরিণত করা আলাদা কথা—এবার বিপিনের সে কথার আসল মানেটা হাড়ে হাড়ে টের পাইতে লাগিলেন। কিন্তু সদানন্দ ক্ষুব্ধও হইলেন না, নিরুৎসাহও হইলেন না। এমন তো হইবেই। কাজ করার অভ্যাস চাই, কৌশল আয়ত্ত হওয়া চাই, জানা চাই কি হইলে কি হয়, কি করিতে কি করা দরকার। এক হিসাবে ভালই হইয়াছে বিপিনের চলিয়া যাওয়াতে। বিপিনের উপর বড় বেশী নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছিলেন, বড় বেশী দূরে সরিয়া যাইতেছিলেন আশ্রমের পরিচালনা ও সংগঠনের খুঁটিনাটি হইতে। এবার নিজে সব বুঝিয়া নিজের মনের মত করিয়া আশ্রম চালাইতে পারিবেন, আশ্রমকে গড়িয়া তুলিতে পারিবেন।

বিপিনের অনুপস্থিতির জন্য যতটা না হোক, সদানন্দের অপটু ম্যানেজারির ফলে আশ্রমে আরও বেশী বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে লাগিল। বিপিন ফিরিয়া আসিল দশ বার দিন পরে, এই সময়ের মধ্যেই কত নিয়ম যে ভাঙ্গিয়া পড়িল, কত ব্যবস্থা যে উল্টাইয়া গেল, সৃষ্টি হইল নূতন নিয়ম। ফলটা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইত বলা যায় না। পরিবর্ত্তনের সময় বিশৃঙ্খলা আসিবেই। আশ্রমে তিনি একটা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছেন, আশ্রমবাসী নরনারী একটু ভ্যাবাচেকা খাইয়া গিয়াছে, টের পাইয়াও সদানন্দ বিশেষ ব্যস্ত হন নাই। সাজিয়া ঢালিতে গেলে এসব যে অবশ্যম্ভাবী তিনি তা জানেন। সদানন্দের ব্যবস্থায় আশ্রমের জীবন হয়ত এতদিনকার কতগুলি কৃত্রিমতার খোলস ছাড়িয়া আরও উঁচু স্তরেই উঠিয়া যাইত শেষ পর্য্যন্ত, কে বলিতে পারে! অন্ততঃ কড়া বিধিনিষেধগুলি যে শিথিল হইয়া আসিত, তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাল করিয়া গড়িবার উদ্দেশ্যে সদানন্দের ভাঙ্গন ভালরকম আরম্ভ হইবার আগেই বিপিন ফিরিয়া আসিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আশ্রমও যেমন ছিল হইয়া গেল তেমনি।

সদানন্দ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'বাঁচলাম ভাই। বলা নেই কওয়া নেই কোথা গিয়েছিলি তুই? আশ্রম চালান কি আমার কাজ!'

'বাহাদুরী করতে তোকে কে বলেছিল? যা আরম্ভ করেছিলি তুই—চমৎকার!'

কথাটায় খোঁচা লাগিল সদানন্দের। একবার ইচ্ছা হইল সত্য সত্যই বাহাদুরী করিয়া বলেন, কয়েকটা মাস পরে ফিরিয়া আসিলে আশ্রমের উন্নতি দেখিয়া বিপিনের তাক লাগিয়া যাইত। বিপিন রাগিয়া যাইবে ভাবিয়া ইচ্ছাটা দমনও করিলেন, নিরীহভাবে একটু শান্ত হাসিও হাসিলেন।

কোথায় গিয়াছিল বিপিন? আমবাগানটা বাগাইতে—একেবারে দানপত্র পাকা করিয়া আসিয়াছে। একটা খবর দেয় নাই কেন বিপিন? কেন দিবে, সদানন্দ যখন চায় যে বিপিন আর তার এত সাধের আশ্রম সমস্ত চুলোয় যাক! কি গরজ বিপিনের খবর দিবার! না না, ঠিক তা নয়, খুব ব্যস্তও ছিল বটে বিপিন, একটু মজাও দেখিতেছিল বটে। হঠাৎ সে জন্মের মত বিদায় হইয়া গেলে সদানন্দ কি করে দেখিবার সাধটা বিপিনের অনেক দিনের।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ-সাহিত্যের গোড়ার কথা

বিংশ শতকের প্রথম দিকে যে সাহিত্যিকগণ বাঙ্‌লা কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন শরৎচন্দ্র তাঁদের অগ্রণী—একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না। গল্প ও উপন্যাস রচনায় তিনি এমন একটি টেক্‌নিক্ উদ্ভাবন করেছিলেন যার জন্য তাঁকে "যুগপ্রবর্তক" আখ্যা দেওয়া হয়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব থেকে তিরোভাব পর্য্যন্ত সময় নিতান্তই অল্প—বোধহয় বিশ বৎসরের বেশী নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সাহিত্যের সমালোচনা হয়নি এমন নয়, কিন্তু আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শরৎ-সাহিত্যের বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে তাঁর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে সামাজিক বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে। যা সামাজিক বিষয়-বস্তু নয় এমন অ-সামাজিক জিনিষ আলোচনা করে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক প্রতিভার অপব্যবহার করেননি। Allegory বা রূপক এবং ঐতিহাসিক সাহিত্যের সঙ্গে সমসাময়িক যুগের সমস্যা মিশিয়ে anachronism-এর হাস্যকর অবতারণা শরৎ-সাহিত্যে দেখা যায় না। যদিও দ্বিজেন্দ্র রায়ের "দুর্গাদাস" একখানা নাটকমাত্র, তা সত্ত্বেও বইখানা anachronism-এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। মোগল যুগের ঐতিহ্যগত পটভূমিকার উপর লেখকের যুগের সাম্প্রদায়িক সমস্যাই অঙ্কিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি"[১]-তেও গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের puritanism-কেই কি প্রচার করা হয়নি? শরৎচন্দ্র খুব ভালো করেই বুঝেছিলেন যে রূপক ও ইতিহাসের সাহায্যে যে আবহ তৈরী হয় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। লেখাপড়াকে যাঁরা অতিরিক্ত রকম ভয় বা অহেতুক শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন এটা তাঁদের অপকর্ম। কেন-না এতে ইতিহাসকে অনেকটা বিকৃত করা হয়, এবং তার ফলে সামাজিক মানুষের পক্ষে

১। "এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প।……এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের ইতিহাস মিশাইয়া "রাজর্ষি" গল্প……" (জীবন স্মৃতি, পৃঃ ১৭৪)

শুভের চেয়ে অশুভ ঘটবার সম্ভাবনাই খুব বেশী : অন্ততঃ সত্য ঘটনার অপলাপ ঘটে। শরৎসাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে তার পূর্ণাঙ্গ সমাজ-ধর্ম। এইজন্য শরৎচন্দ্র সর্ব প্রথমেই আমাদের প্রশংসার্হ।

সমাজ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই একটা দৃষ্টিভঙ্গী আস্‌তে বাধ্য। সামাজিক মানুষের প্রকার-ভেদের অন্ত নেই, আবার তারা নানা স্তর বা শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীগুলোরও কোন স্থিরতা নেই। সর্বদাই বিভিন্ন শ্রেণীর সংমিশ্রণ তথা শ্রেণী বিশেষের বিলোপ চল্‌ছে। এর মধ্যে একটা স্তর বা শ্রেণীকে বেছে নিতে হয় যাদের সুখ দুঃখকে ফুটিয়ে তোলাই সাহিত্যিকের বড়ো কাজ। শ্রেণীভিত্তিস্থাপিত ধনতন্ত্রের যুগে সাহিত্যিকের পক্ষে শ্রেণী-নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

শ্রীকান্ত ছিল মসীজীবী কেরাণী, সুরেন্দ্র, বৃন্দাবন ছিল শিক্ষক। হরেন্দ্র ছিল ডাক্তার। একাদশী বৈরাগী ছিল ক্ষুদ্র মহাজন, বিজয়ার পিতা বনমালী ছিল ছোট জমিদার। "রামের সুমতি"-র শ্যামলাল ছিল জমিদার-কাছারীর কর্মচারী।

শরৎ-সাহিত্যে কোন শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বেশী ফুটে উঠেছে? উপরোক্ত উদাহরণ থেকে এ-প্রশ্নের উত্তর খুব সহজেই মেলে। স্কুল-মাষ্টার, কেরাণী, দোকানদার, ছোট-জমিদার, জোতদার, পত্তনীদার, এমনি ধরণের চরিত্রই ভীড় করে দাঁড়িয়েছে বেশী। এইজন্য যে পটভূমিকার সৃষ্টি করতে হয়েছে সেখানে পল্লীগ্রামই হয়েছে সবচেয়ে উপযুক্ত। সেজন্য শরৎ-সাহিত্যে পল্লীগ্রামের চিত্রই অঙ্কিত হয়েছে।

প্রাক্-শরৎ-সাহিত্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী (petit bourgeois) বড়ো একটা স্থান পায়নি। তারা ছিল নিতান্ত অবজ্ঞাত ও অশ্রদ্ধেয়। তাদের যে আবার কিছু বক্তব্য আছে—তাদের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা যে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হতে পারে এটা ধারণার বহির্ভূত ছিল। শরৎচন্দ্রই প্রথম ভাষা দিয়েছেন এদের মূক মুখে এবং সেই সঙ্গে সাহায্য করেছেন এই শ্রেণীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয়ে।

পীড়িত রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে যখন শ্রীকান্ত কলিকাতা থেকে পশ্চিম যাচ্ছে তখন হাওড়ার পুলের উপর অশ্বযান এলে রাজলক্ষ্মী দুপাশের বিপুল জনস্রোত

দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তখন অফিসের ছুটি হয়েছে; সন্ধ্যাবেলা কুলায়-প্রত্যাশী পাখীর মতো উদগ্রীব হয়ে ঘর-মুখো কেরাণীর দল ছুটে চলেছে ট্রেন ধরবার জন্য। তাদের ভাবভঙ্গীতে বিস্মিত হয়ে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে জিজ্ঞাসা করে "হ্যাঁ-গা এরা কারা?" শ্রীকান্ত তখন কেরাণী জীবনের ঘটনা এমন সহানুভূতির সঙ্গে একটির পর একটি করুণভাবে বলে চলল যে রাজলক্ষ্মী অশ্রু সংবরণ করতে পারল না। একজন কেরাণী পীড়িতা ছোট মেয়ের জন্য দু'আনা দামের পুতুল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। ষ্টেশনে জনসমাবেশের চাপে সেটা ভেঙে যায়। ভদ্রলোকটি ভাঙা পুতুলের টুক্‌রোগুলো উড়ানির প্রান্তে বাঁধতে লাগল। এটা রাজলক্ষ্মীর দৃষ্টি এড়ায়নি। রাজলক্ষ্মী তাকে কাছে ডেকে দুঃখ দারিদ্র্যের বিবৃতি শুনে মেয়েটির জন্য একখানা শাড়ী কাপড় দান করলে। ভদ্রলোকটি চলে গেলে শ্রীকান্ত এই ব্যাপার নিয়ে তামাসা করায় রাজলক্ষ্মী বহুক্ষণ তার সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ করে দেয়। মসীজীবী কেরাণী সম্প্রদায়ের উপর অসম্ভব রকম সহানুভূতিই এখানে ফুটে উঠেছে।

কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েছেন "পথের দাবী"তে। নায়ক সব্যসাচী ভারতীর প্রশ্নে উত্ত্যক্ত হয়ে তার দলের আন্দোলন-কাজ যে কেবল মধ্যবিত্তদেরই প্রগতি-কামী সে-ইঙ্গিতই করেছে।

মধ্যবিত্তরাই শরৎ-সাহিত্যের প্রাণ। পেটিবুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শরৎচন্দ্র বিশ্লেষণ করেছেন সমাজ-ব্যবস্থাকে।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে দুটো স্পষ্ট রূপ দেখা যায়। একদল উন্নতি চায় না বা পায় না আর একদল যারা প্রগতিশীল ও উন্নতিকামী। শরৎসাহিত্যে উন্নতিকামী মধ্যবিত্তদেরই আশা আকাঙ্ক্ষা বেশী রূপ পেয়েছে। প্রগতিকামী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীকে উন্নীত করবার উৎসুক চেষ্টাই শরৎ-সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ বা উদ্দেশ্য। এজন্য বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার উপর তিনি বেশ খানিকটা বিরূপাক্ষ হয়েছিলেন। কিন্তু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমূল বিপ্লবের সমর্থন করেননি।

পূর্বতন যুগে যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্থান পেয়েছিল সমাজব্যবস্থার উপরে সেটাই শরৎ-সাহিত্যের মূলসূত্র বা ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অগ্রদূত হলেও তিনি পূর্ব রাগকে (Prenuptial love) সমর্থন

করতে পারেননি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথে পূর্বরাগ আছে সত্য কিন্তু তা সগৌরবে আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তার নির্মল জ্যোতি প্রকট হয়ে উঠতে পারেনি—বোধহয় ব্রাহ্মধর্মের শুচিতার আবরণ ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠেছিল।

"গোষ্ঠীগত সমাজের taboo বনাম প্রেম" যে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে তার বৈচিত্র্যময় ঘটনার সমাবেশ শরৎ-সাহিত্যে দেখা যায়। "দেবদাস" এই শ্রেণীর উপন্যাসের মনোরম উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের "প্রতাপ-শৈবলিনী-"র ট্র্যাজেডিই এর জন্মদাতা। "চন্দ্রশেখর" ও "দেবদাস"-এর মূল ঘটনার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ঘটনার বাস্তবতা, প্রকাশের দৃঢ়তা ও নতুন টেক্‌নিকের মধ্য দিয়ে নায়কনায়িকার পূর্বরাগ থেকে বিয়োগপর্ব পর্যন্ত সমস্তটাই "দেবদাস"-এ খুব মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে ট্র্যাজেডির গভীরতার জন্য।

শরৎচন্দ্র নিপুণ হস্তে দক্ষতার সঙ্গে পূর্বরাগের চিত্র অঙ্কিত করেছেন। "দত্তা", "পরিণীতা" এবং "ছবি"-র মতো পূর্বরাগের মিলনান্তক পরিণতি (climax) বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যে খুবই বিরল। প্রেমের আকর্ষণের কাছে সংস্কৃতি ও ধর্ম যে নিতান্তই গৌণ এবং অবান্তর হয়ে পড়ে—এটা আমরা দেখতে পাই বিজয়ার চরিত্রে। সে আবাল্য ব্রাহ্মধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিপালিত হয়েও নরেন্দ্রকে পাবার জন্য হিন্দুমতে বিবাহ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। এবং এই স্বাধীন প্রেমের বিকাশের জন্য বিজয়ার অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে শরৎচন্দ্র গ্রহণ করেছেন--তিনি বুঝেছিলেন খুব বেশী করে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভিন্ন স্বাধীন প্রেমের মিলন ঘটা সম্ভব না।

এই সময়ে ভারতীয় ধ্যানধারণায় নারী-স্বাধীনতার অর্থ ছিল কেবলমাত্র "ঘোমটা খুলিয়া চলাফেরার স্বাধীনতা"। স্বাধীন প্রেম (সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় যৌন স্বাধীনতা) যে এ-সীমার মধ্যে পর্যবসিত হবে না সেটা কারও মাথায় ঢোকেনি। নারী যেরূপ ভালবেসে বিবাহ করবে সেরূপ ভালবাসার বিরতি ঘটলে স্বাধীনভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদও করবে—এই সত্য শরৎসাহিত্যে ফুটে উঠেছে প্রাণবন্ত চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে। শরৎসাহিত্যে এই সত্য একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গৃহদাহে "অচলা-মহিম" শ্রীকান্তে "অভয়া-রোহিণী" ও শেষপ্রশ্নে "কমল-শিবনাথের" দৃষ্টান্ত এই সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশ্ন তুলেছে।

যদিও ভারতীয় সমাজে মান্ধাতার যুগ থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পত্যন্তর গ্রহণ একেবারে অচল ছিল না, তা সত্ত্বেও শৈব ও বৈষ্ণব বিবাহের মধ্যে দিয়ে এ-রীতি কেবলমাত্র নিম্ন শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। সুতরাং এ-প্রশ্নের উত্থাপন বড় একটা দেখা যেত না সাহিত্যক্ষেত্রে। কিন্তু বর্তমান শতকে ধনদৌলতের রূপান্তরের ফলে (ধনতন্ত্রের পূর্ণ পরিণতির ফলে) কী পুরুষ কী নারী উভয়েই উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বাধীন economic unit বলে বিবেচিত হয়েছে।

নারী আর স্ত্রীধন-স্বরূপ কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় অলঙ্কার বা কিছু কিছু "অঙ্গসম্পত্তিরই" মালিক নয়। উপার্জনের স্বাধীনতার সঙ্গে এবং গোষ্ঠীগত পরিবার স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তিগত পরিবারে রূপান্তরিত হবার সঙ্গে নারীর অধিকারের মধ্যে সম্পত্তি নামক পদার্থের ভগ্নাংশ এসে পড়েছে রীতিমতোভাবে। "অর্থ আসে যার হাতে শক্তি আসে তার হাতে"—এই স্বাভাবিক সত্য অনুসারে নারীও পুরুষের মতো নরনারীর যৌনসম্পর্কে নিজেকে স্বাধীন বলে বিবেচনা করছে। সুতরাং পরিবার পালনে, গৃহধর্মে, পতিপত্নীত্ব নির্ধারণে, সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষের মতো নারীও সমানাধিকার দাবী করছে। কী বুর্জোয়া, কী মধ্যবিত্ত (নিম্ন শ্রেণীর কথা পূর্বেই বলা হয়েছে) সকল শ্রেণীতেই এই প্রশ্ন বিভিন্ন আকারে দেখা দিচ্ছে। শরৎচন্দ্র এই সমস্যাকে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে বড়ো প্রশ্ন করে দেখিয়েছেন। শরৎসাহিত্যের অন্তরে অন্তরে এরই সুর সর্বত্র বেজেছে। প্রাক্-শরৎসাহিত্যে এই সমস্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমরা দেখতে পাইনি।

নির্ধন সমাজে বা অল্পবিত্ত সমাজে যেখানে কায়িক শ্রমশক্তিই নরনারীর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় সেখানে বুর্জোয়া শ্রেণীর চেয়ে প্রেমের আকর্ষণ অধিক অনেক পরিমাণে। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায় "বিলাসী"তে। "মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসীর" ট্র্যাজেডির পর শরৎচন্দ্র সেখানে চমৎকারভাবে বলেছেন : "তবু এত বড়ো দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল তাহাকে যে বস্তুটা, সেটা কেহ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইল না ?" আরও তিনি বলেছেন, "আমার মনে হয়, যে দেশের নর-নারীর মধ্যে হৃদয় জয় করিয়া বিবাহ করিবার রীতি নাই, বরঞ্চ তাহা নিন্দার সামগ্রী, যে দেশে নর-নারী আশা করিবার

সৌভাগ্য, আকাঙ্ক্ষা করিবার ভয়ঙ্কর আনন্দ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত ; যাহাদের জয়ের গর্ব্ব, পরাজয়ের ব্যথা, কোনটাই জীবনে একটিবারও বহন করিতে হয় না, যাহাদের ভুল করিবার দুঃখ, আর ভুল না করিবার আত্মপ্রসাদ কিছুরই বালাই নাই……তাই বিবাহ ব্যাপারটা যাহাদের নিছক contract, তা সে যতই কেননা বৈদিকমন্ত্র দিয়া document পাকা হোক, সে দেশের লোকেদের সাধ্যই নাই, মৃত্যুঞ্জয়ের অন্নপাপের কারণ বোঝে।…

এখানে কি শরৎচন্দ্র স্পষ্টই দেখাচ্ছেন না যে বুর্জোয়া সমাজে প্রচলিত তথা-কথিত প্রেমের আকর্ষণের চেয়ে নির্ধন সমাজে নিম্নশ্রেণীর নর-নারীর প্রেমের আকর্ষণ যথেষ্ট পরিমাণেই বেশী ? সাহিত্যক্ষেত্রে পূর্বরাগ ও স্বাধীন প্রেমের এত দৃঢ় উদাহরণ শুধু শরৎ-সাহিত্যেই সম্ভব হয়েছে। এই নতুন যুগধর্মী ধারণাকে যথাযথ অঙ্কিত করবার জন্য বাঙলাসাহিত্য শরৎচন্দ্রের কাছে অপরিমিত ভাবে ঋণী। নির্ধন সমাজে স্বাধীন প্রেমের আন্তরিক আকর্ষণের পক্ষে Engels যে যুক্তি দিয়েছেন তা পাঠকের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করা গেল।

"কিন্তু সম্পত্তির আকর্ষণকে যৌন-আকর্ষণ কোন মতেই পরাস্ত করিতে পারে নাই। রাজারাজড়াদের মহলে, ধনী ব্যবসায়ীর মহলে, এক কথায় সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র সমাজে যৌন-আকর্ষণ বা স্বাধীন চুক্তির প্রভাবে বিবাহ রহিয়া গিয়াছে ব্যতিরেক। এখানে ধনদৌলতের প্রভাবে বিবাহই নিয়ম। অপর দিকে, বড়ই মজার কথা— নিঃস্ব ধনদৌলতহীন নরনারীরাই জানে আসল স্বাধীন সর্ত্তের বিবাহ কি বস্তু। যৌন-আকর্ষণে বিবাহ একমাত্র গরীব সমাজেরই নিয়ম। * * * প্রেমের অধিকার নামক যে মানবাধিকার তাহা কেবল নির্ধনেরাই চাখে।"*

স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উঠলেই এক শ্রেণীর সমালোচক বলে থাকেন যে প্রাচীন ভারতে এ রূপ দেখা গেছে। লেখাপড়া ও ধর্মকার্যে নারীরা যে পুরুষের মতো সমানাধিকার ভোগ করত এই কথা প্রমাণিত করবার জন্য গার্গী, মৈত্রেয়ী, খনা প্রভৃতি মহিলাদের নাম করা হয়। সম্পত্তির উপর নারীর অধিকারস্বরূপ "স্ত্রীধন" এবং বিবাহ ব্যাপারে স্বাধীনতার উদাহরণের জন্য "স্বয়ম্বর" প্রথার

* "পরিবার গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র"—শ্রীবিনয়কুমার সরকার ; translated from "The Family, Private Property and the State" by Frederich Engels.

নামোল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রশ্ন করি এ-সব কি সত্য? মহাভারতে দেখা যায় যখন কর্ণ লক্ষ্যভেদ করবার জন্য স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত তখন তাঁকে সুতপুত্র বলে লক্ষ্যভেদ করতে দেওয়া হয়নি। রাজামহারাজাদের কন্যার পাণিপ্রার্থী হতে পারে একমাত্র রাজামহারাজাদের পুত্রই। সেকালের স্বয়ম্বর প্রথার মধ্যে পূর্বরাগের ঘটনা তো দেখাই যেত না পরন্তু বিবাহ ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করত গোষ্ঠী, কুল ও শ্রেণীর উপরে এবং তার আকর্ষণ-বিকর্ষণ হত পিতামাতার ইঙ্গিতে।

তবে কি বুঝতে হবে এগুলো স্ত্রী-স্বাধীনতার লক্ষণ নয়? প্রাচীন যুগে যৌথ ধনসম্পত্তির আমলে "জননী বিধি"-শাসিত (matriarchal) সমাজে নারীর যে স্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার ছিল তা পরবর্তী যুগে "পুরুষ বিধি"-শাসিত (patriarchal) সমাজের আধিপত্যে ক্রমশই লোপ পেতে থাকে। "স্ত্রীধন" ও "স্বয়ম্বর" সেই যুগের সামাজিক অনুষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। নারীকে সর্ববিষয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে করতে এই লুণ্ঠন কার্য এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছল যে যে-সকল অধিকার আর বিলুপ্ত করা যায়নি তা-ই "স্ত্রীধন" ও "স্বয়ম্বর" প্রথায় কোনক্রমে জীবিত থেকে গেল, এইরূপ ব্যাখ্যা করলেই সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়।

সুতরাং কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশিষ্ট রূপকে একটা সম্পূর্ণ রূপ বলে প্রচার করলে এটা ধারণা করা খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত যে ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা হচ্ছে। এই বিকৃত ব্যাখ্যা কখন সম্ভব হয়? যখন সমসাময়িক সামাজিক রীতিনীতির ভারসাম্য স্থাপন করবার জন্যই ইতিহাস লেখার চেষ্টা করা হয় তখনই এই ঐতিহাসিক অপব্যাখ্যার আবির্ভাব হয়।

স্ত্রী-স্বাধীনতাকে শরৎচন্দ্র মোটেই fetish করেন নি vulgar ঐতিহাসিকের খণ্ড দৃষ্টি দিয়ে। স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থে শরৎচন্দ্র complete independence-ই উপলব্ধি করেছিলেন। সামাজিক অবস্থানে, সম্পত্তিতে ও যৌন সম্পর্ক স্থাপনে পুরুষের মতো নারীরও পূর্ণ অধিকার-দাবীই শরৎ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অবদান। তিনি খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে সম্পত্তির ক্রমবিকাশ ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল প্রেমের স্বাধীনতা। "দত্তা-"র বিজয়ার চরিত্রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও যৌন স্বাধীনতার বৈজ্ঞানিক মিলন ঘটেছে।

এই জন্যই শরৎচন্দ্র একখানা গ্রন্থ রচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গ্রন্থখানার নাম "নারীর মূল্য।" শরৎচন্দ্র আর কখনো প্রবন্ধ পুস্তক লেখেননি "স্বদেশ ও সাহিত্য" ছাড়া, অন্তত আমরা জানি না। যদিও পুস্তকখানা খুব উচ্চাঙ্গের হয়নি তা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের মননশীলতার গতিভঙ্গী অনায়াসেই ধরা পড়ে।

শরৎচন্দ্রের মানবপ্রীতি (Humanism) খুব প্রশংসার যোগ্য। মানুষের বাহিরেকার রূঢ় বা দুর্বল রূপের যবনিকার অন্তরালে নিভৃত হৃদয়ে যে অন্তর্নিহিত মানবতার ফল্গুধারা সর্বদা প্রবহমাণ শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সেই রূপকেই উন্মুক্ত করে দেখিয়েছে পাঠকের দৃষ্টির সম্মুখে। রাম ও ইন্দ্রনাথ—এদের মতো দুঃসাহসী চরিত্রের পিছনে যে একটা শান্ত ও সরল মানুষের মনোভাব ক্রিয়াশীল সেটার আন্তরিক রূপ শরৎচন্দ্র অঙ্কিত করেছেন চমৎকারভাবে। এই মানব-প্রেমিক মনোবৃত্তি চরম পরিণতিতে এসে পৌঁছেছে সমাজ-বহিষ্কৃত তথাকথিত পতিত-নারীদের শাশ্বত মমতাময়ী মাতৃত্ব ও দেবতার নির্মাল্যের মতো পবিত্র ভালবাসার চিত্রাঙ্কনে। "চরিত্রহীন"-এর সাবিত্রীর মধ্যে একনিষ্ঠ প্রেমের অভাব ঘটেনি। শরৎচন্দ্রের মানবপ্রেমিক মনোভাব সামাজিক নারীদের এই দুরবস্থার কারণরূপে দেখিয়েছে সমাজের যথেচ্ছাচার—যা' মানুষের বাহ্যিক রূপকেই বিচারের মানদণ্ড করে নিয়েছে : অন্তর্নিহিত মানবতা সেখানে হয়ে গেছে গৌণ এবং অপাংক্তেয়। স্খলিত-সমাজ নরনারীকে মানুষ সর্বদা ঘৃণায় পরিহার করে চলে তাদের দুর্নীতিপরায়ণ বাহিরেকার অ-সামাজিক রূপকে দেখিয়ে। শরৎচন্দ্র অনুভব করেছিলেন যে সমাজে দুর্নৈতিক ও অ-সামাজিক চরিত্রের আবির্ভাব ঘটে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সামাজিক অসামঞ্জস্যের চাপে।

এর কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র এক প্রকার সমাজতন্ত্রে এসে পৌঁছেছেন এবং সেই কারণে তিনি সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কার এবং রীতিনীতির উপর কটাক্ষ করেছেন। অবশ্য এ সমাজতন্ত্রের রূপ প্রাক্-মার্কসীয় নীতিপন্থী অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের সমাজ-তন্ত্রের দর্শন বৈজ্ঞানিক economic deterninism-এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সামাজিক অসঙ্গতির মূলে যে শ্রেণী-সংঘর্ষ ও শ্রেণী-স্বার্থ নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়ে আসছে এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি পরিষ্কার ছিল না। এর মুখ্যত: দুটো কারণ আছে : প্রথম, শিল্পী মনের গতির প্রাচীন ধর্ম থেকে শরৎচন্দ্রের বিচ্যুতি ঘটেছিল, আর দ্বিতীয় হচ্ছে : তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল

না। এই দুটোর মাধ্যমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে অনেকাংশে খর্ব করেছিল। শরৎচন্দ্র মানবপ্রেমের অপর একটা দিক্‌ রূপে দেখেছেন হিতৈষণাকে। রমেশের পল্লীগ্রামে গিয়ে পাঠশালা স্থাপন, পথনির্মাণ এবং "পণ্ডিতমশাই" বৃন্দাবন কর্তৃক নিজস্ব সামান্য অর্থে ও স্বীয় পরিশ্রমে স্কুল পরিচালনা ও নলকূপ নির্মাণ—এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বুঝা যায় যে শরৎচন্দ্র সেবাধর্মকে খুব বেশী সমর্থন করেছেন।

এই মনোবৃত্তির পিছনে একটা বিশিষ্ট ধারণা কাজ করেছে সেটা হচ্ছে "Plain living and high thinking"-এর মতবাদ। গত শতকের পূর্বতন সমাজে এই মত মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে চলে এসেছে। প্রাচীন সমাজে এই নীতির প্রয়োজনীয়তাও ছিল বেশী কারণ ধনোৎপাদন ছিল সঙ্কীর্ণ। কিন্তু বর্তমান যুগে বিরাট উৎপাদনযন্ত্র যেখানে সক্রিয় হয়েছে সেখানে এ-নীতিকে সমর্থন করা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দেয়। পক্ষান্তরে সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙন গঠনের সময় যখন একটা শ্রেণী উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হয় তখন বুদ্ধি বা অর্থের দিক দিয়ে সে যতখানি অগ্রসর হতে পারে সামাজিক ব্যবহার ও নীতির দিক দিয়ে ততটা এগোতে পারেনা। এই ব্যবহারমান্দ্য লুকোবার জন্যই সে আশ্রয় নেয় প্রাচীন যুগীয় এই নীতির।

অনেকেই মনে করেন নরেন্দ্র (দত্তা) সুরেন্দ্রনাথ (বড়দিদি) প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কন অতিমানুষের রোমান্টিক ছবি। কিন্তু আমাদের মনে হয় এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বুর্জোয়াশ্রেণীতে উন্নয়নলিপ্সু পেটিবুর্জোয়াদের অসামাজিকতাকে অতিমানবতার ব্যঙ্গময় সান্ত্বনার মসলীনে ঢেকে superman বলে চালাবার প্রচেষ্টাই শরৎচন্দ্র করেছেন।

প্রাক্‌-শরৎসাহিত্যে রোমান্টিক মনোভাবের অতিরঞ্জিত সমাবেশ আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই। কিন্তু শরৎচন্দ্র রোমান্টিসিজ্‌মকে সমর্থন করেননি। বরং যে উপন্যাসে রোমান্স ঘটেছে তার জন্যে তিনি রীতিমত আফশোষ করেছেন। বৈদ্যনাথধামে "তপোবন"-দর্শনে গিয়ে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়ে যখন সরোজিনী লাঞ্ছনা ভোগ করছিল ঠিক সেই psychological মুহূর্তে সতীশকে আবির্ভূত করানোর মধ্যে যে রোমান্স আছে শরৎচন্দ্র সেজন্য বিশ লাইন ব্যাপী সাফাই গেয়েছেন।

এবার শরৎচন্দ্রের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গীর বাস্তব বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সমাজ-পিরামিডের সমস্ত সৌধটিকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাবে কে? প্রথম, যারা সমাজ-পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করে; আর দ্বিতীয়ত, যারা একেবারে সর্বনিম্ন ভিত্তিতে অবস্থান করে অর্থাৎ গণশ্রেণী। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মধ্যবিত্তদের সামাজিক অবস্থান এরূপ স্থানে যেখান থেকে সমস্ত সমাজকে এককালীন দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য তাদের ধ্যানধারণা খণ্ড হতে বাধ্য হয়। এই পেটিবুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সংহত সঙ্ঘশক্তি state-power-কে তারা উপেক্ষা করে অথবা দেখতে পায় না। রাষ্ট্রিক কর্তব্যের বিরাট গুরুদায়িত্ব থেকে যারা বহুকাল ধরে অব্যাহতি পেয়ে এসেছে তাদের পক্ষে বুর্জোয়া দর্শন সহজসাধ্য নয়। যে পরিমাণে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী ও সমাজ গোষ্ঠী-নিরপেক্ষ হয়ে রাষ্ট্রিক চেতনার মধ্যে এসেছে ঠিক সেই পরিমাণে সে অযৌক্তিককে পরিহার করে যুক্তি আর প্রজ্ঞাকে গ্রহণ করেছে এবং আংশিক ভাবে বুর্জোয়া দর্শনে পেঁৗছেছে। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের বুর্জোয়া দর্শনের মূলে এই কারণই সক্রিয়।

বুর্জোয়া দর্শনের অভাবে রাষ্ট্রশক্তির সম্বন্ধে উপেক্ষা থেকেই জন্ম নেয় প্রক্ষিপ্ত নিঃস্ব দর্শন ও inferiority-complex-এর ব্যঙ্গময় মনোবৃত্তি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে সেবাধর্মকে শরৎচন্দ্র সমর্থন করেছেন। কিন্তু এই সেবাধর্ম পেটি-বুর্জোয়া মননের চরম নিদর্শন। তবে শরৎচন্দ্র হয়তো মনে প্রাণে জানতেন যে এ-সকল সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান স্থাপনে নিছক ব্যক্তিগত সহজ জ্ঞান এবং হিতৈষণা দিয়ে কোন কাজই সম্ভবপর নয়। এটা ফিউডাল যুগেই সম্ভব ছিল—ধনতন্ত্রের যুগে এটা হাস্যকর নয় কী? "পণ্ডিতমশাই"-এর কেশব বৃন্দাবনকে বলছে,"·········এ গাঁয়ে তুমি যেন নিজের অর্থ এবং সময় নষ্ট করে ছেলের শিক্ষা দিচ্চ, কিন্তু আরও কত শত সহস্র গ্রাম রয়েছে, সেখানে 'ক' 'খ' শেখাবারও বন্দোবস্ত নেই। আচ্ছা, এ কায কি গভর্‌মেণ্টের করা উচিত নয়?" বৃন্দাবন কেশবকে সমর্থন করে না। এ-সকল কাজ যে ষ্টেটের এলাকাভুক্ত এ কথাটা কেশবের মুখ দিয়ে শরৎচন্দ্র বলিয়েছেন কিন্তু আবার বৃন্দাবনকে দিয়ে সেটাকে নাকচ না করে এ-সত্য প্রতিষ্ঠিত করলেই সঙ্গত হত। রাষ্ট্র-শক্তিকে উপেক্ষা করবার মনোভাবই এখানে নগ্নরূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

শরৎচন্দ্র নারী-স্বাধীনতাকে গ্রহণ করেছেন অথচ তার বিকাশকে দেখতে পাননি। এর মূলে তাঁর পেটিবুর্জোয়া মনোবৃত্তির আর একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। পারিবারিক জীবনে রন্ধনে ও আহার্য পরিবেশনে যে অসামান্য নারীত্ব বর্তমান—এই ধারণা শরৎ-সাহিত্যে পরিষ্কার দেখা যায়। সতীশ-কিরণময়ী, কেদার-মৃণাল, বিজয়া-নরেন্দ্রের ঘটনায় নারীর সেবাধর্মকে নারীত্বের চরম বিকাশ বলে প্রচার করা হয়েছে। বর্তমান যুগে যখন এই সকল সামাজিক ও পারিবারিক ক্রিয়া সকল রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে তখন এগুলোকে এত দৃঢ়ভাবে সমর্থন করা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় দেয় না কি? পেটিবুর্জোয়া মনোভাব দিয়ে বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন মধ্যবিত্তের চরিত্র সৃষ্টি করার এটা একটা আনিবার্য প্রতিক্রিয়া।

এখান থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে শরৎচন্দ্র বুর্জোয়া সভ্যতার অনিবার্য অগ্রগতিকে লক্ষ্য করেও তাকে কায়মনে সমর্থন করতে পারেননি অথবা অস্বীকার করে গেছেন। ধনিক সভ্যতার রথচক্রতলে ফিউডাল সমাজব্যবস্থার স্তরে স্তরে যে ভাঙন ধরেছে তার রূপায়ণিক পরিস্থিতি সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ফুটে উঠেছে—শরৎচন্দ্রের দৃষ্টির সম্মুখেই ঘটেছে এই বিরাট পরিবর্তন, অথচ একে অস্বীকার করে পঙ্গু প্রাণশক্তিহীন ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচিয়ে রাখবার হাস্যকর চেষ্টা করেছেন। এই পশ্চাদ্‌গামী দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই শরৎচন্দ্র নিবীর্য পল্লীপ্রথাকে পুনরুজ্জীবিত করবার নিষ্ফল প্রয়াস পেয়েছেন। এজন্য তিনি শহরের শিক্ষিত বুর্জোয়া এবং পেটিবুর্জোয়া নায়কদের কর্মবহুল জীবনের পটভূমিকা করে অঙ্কিত করেছেন পল্লীকে। এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ "পল্লী-সমাজ"-এর রমেশ-চরিত্র। শহরের শিক্ষিত রমেশকে নিয়ে এলেন পল্লীর আবেষ্টনীর মধ্যে পল্লীসংস্কারের জন্য, যার প্রাণশক্তি ধনতন্ত্রের প্রচণ্ড দুর্মর আঘাতে নিঃশেষিতপ্রায় হয়ে এসেছে। শরৎচন্দ্র শ্লেষাত্মক কশাঘাত করেছেন "পল্লী-সমাজের" দুর্বলতার উপর তাকে পুনরুদ্‌বুদ্ধ করবার জন্য। কিন্তু যে-পল্লীর জীবনীশক্তি আজ ক্রমাগতই বিলুপ্ত হতে বসেছে—যার পুনরুজ্জীবনের কোন আশাই নেই—তাকে নতুন করে আঘাত করবার কোন সার্থকতাই থাকতে পারে না।

পূর্বেই বলেছি petit-bourgeoisie-র জীবনে দারিদ্র্যের স্পর্শ শরৎচন্দ্রের

মনকে বেশী করেই বিচলিত করেছিল। ঠিক এই কারণেই শরৎচন্দ্র সামাজিক অসামঞ্জস্যের মৃদু সচেতনতাজনিত পরিবর্তনের প্রয়াসপন্থী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এ-ধারণা এত সঙ্কীর্ণ পরিক্রমায় পর্যবসিত যে কাজ কিছুই হয়নি। বুর্জোয়া এবং গণশ্রেণী এই দুটো শ্রেণীর দোটানায় পড়ে অর্থাৎ বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণীর নিষ্পেষণে আর গণশ্রেণী থেকে আপন সত্তাকে ঊর্ধে রক্ষা করে চলতে ভয়—এই উভয়সঙ্কটের মধ্যে পড়ে নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণী অনেকক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে। বুর্জোয়াদের সাথে শ্রেণী-সংগ্রামে একমাত্র গণশ্রেণীই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে পারে। একথা মার্ক্‌স বলেছেন। এই শ্রেণী-সংগ্রামে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী অখণ্ড মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভগ্নাংশ হয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা কিছু পরিবর্তনশীল হয় কিন্তু মূলত সেটা সমাজ-প্রগতির পন্থী না হয়ে পরিপন্থীই হয়ে পড়ে। "পথের দাবী" এই সত্যের নিদর্শন। এখানে শরৎচন্দ্র যে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছেন সেটা যে-কোন বৈজ্ঞানিক দর্শনেরই বিরোধী।

শরৎসাহিত্যে প্রতিভার প্রেরণা জুগিয়েছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রচুর অভিজ্ঞতা ও তীব্র অনুভূতি। তাঁর মধ্যে যে autodidactism বা quackism-এর ছাপ ছিল সেটাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলবার বারংবার প্রয়াস পেয়েছেন। শেষ বয়সে তিনি একখানি উপন্যাস রচনা করে তাঁর সম্পূর্ণ নতুন ধ্যানধারণার এবং প্রচুর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন—যা বাস্তবিক আশ্চর্যকর। রবীন্দ্রনাথের "গোরা" এবং শরৎচন্দ্রের "শেষপ্রশ্ন" বাঙ্‌লা কথাসাহিত্যের অপূর্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, চলে গতানুগতিকের সাহায্যে। প্রাচীন যুগে প্রতিষ্ঠিত কতকগুলো বিধিনিষেধই মানুষের সামাজিক জীবনকে পরিচালিত করে। পূর্বতন যুগের সংস্কারই মানুষের জীবনের গতি নিরূপণ করে। নতুন economy-র পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক কারণে ভাঙন ধরে পূর্বযুগীয় সংস্কারে। কিন্তু মানুষ এরূপ রক্ষণশীল যে সে মজ্জাগত সংস্কারের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে না। যুগযাত্রায় সমাজব্যবস্থার অনেকদূর অগ্রগতি হয় নতুন economy-র দিকে ; কিন্তু অতীতের সংস্কার মানুষের গতিরোধ করে। হরেন্দ্র, রাজেন্দ্র, আশুবাবু এঁরা সকলেই সমাজবদ্ধ জীব, এদের মধ্যে

সংস্কারহীন নরনারীর আবির্ভাবে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় শরৎচন্দ্র তার যথাযথ রূপকে অঙ্কিত করেছেন। সমাজতন্ত্রবাদের মূলে রয়েছে সমাজ-প্রগতির অনন্ত সম্ভাবনার স্বীকৃতি, তাহলে কমলকে তার একটা অগ্রগতির ধাপ বলা চলে।

অতীতের অন্তর্নিহিত সংস্কার ও ঐতিহ্যের ভিৎ ভেঙে তার ভগ্নস্তূপের উপর নতুন যুগের ইমারৎ যতদিন না গড়ে তোলা হচ্ছে, ততদিন নতুন economy-র সঙ্গে পুরানো economy-র সর্বদা সংঘাত ঘটবে। সেই কারণে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা পূর্বতন সমাজ-ব্যবস্থার সংস্কারের আবেষ্টনীবদ্ধ হলে প্রগতির পরাভব অনিবার্য।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে-সকল সভ্যতার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে তাদের সংস্কৃতির ছাপ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে যেমন বৈচিত্র্য দিয়েছে তেমনি তার ঐক্যেরও অন্তরায় হয়েছে। ভারতবর্ষের বর্তমান দুঃখকষ্ট কেবলমাত্র ধনতন্ত্রের দুর্মর চাপে প্রসূত হয়নি, অতীত সভ্যতার মত সংস্কারই ভারতবর্ষের দুরবস্থাকে বাড়িয়ে তুলেছে। অতীতযুগের সভ্যতার ও কৃষ্টির বিবিধ ধারার মূল উৎস হচ্ছে কতকগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও সংস্কার। এই বিশ্বাস ও সংস্কারের বিলুপ্তি ঘটা উচিত ছিল বর্তমান যুগের আবির্ভাবে; কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি সেটাই কমলের "শেষপ্রশ্ন"।

শরৎসাহিত্যে পেটিবুর্জোয়া ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তি বর্তমান। এ-যুক্তি অনস্বীকার্য, কিন্তু তা নিতান্তই স্বাভাবিক।

একটা সামাজিক অবস্থা থেকে আর একটা সামাজিক অবস্থার মধ্যে স্বভাবত অগ্রগতি ও বিপরীতগতি দুটোই থাকে। বিবর্তনগতির দিকটা ও লক্ষ্যই মূল কথা—তার তীব্রতা ও অবস্থান সব সময়ে সমান হয় না। একে উপেক্ষা করার অর্থ রোমান্টিক অগ্রগতির ব্যঙ্গময় সান্ত্বনার মধ্যে আত্মসমর্পণ করা। তাই শরৎসাহিত্যে যেখানে তীব্রতার কিছু হ্রাস হয়েছে এবং অবস্থান যেখানে পূর্বতন যুগের অবস্থায় গিয়ে পড়েছে তা প্রতিক্রিয়া-শীলতার পর্যায়ে পড়লেও তাকে নিন্দা করা রোমান্টিক প্রগতিতে বিশ্বাসের নামান্তর মাত্র।

শরৎচন্দ্রের পেটিবুর্জোয়া মনোভাবের উদ্ভব হয়েছে মননশীলতার দিক থেকে তিনি শ্রেণী-গণ্ডী (class-integument) ও শ্রেণী-স্বার্থের (class-interest) ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি বলে। ভারতীয় মধ্যবিত্ত-সমাজের মানুষের পক্ষে সেটা হয়ে পড়ে অসম্ভব রকমভাবে দুরূহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে সত্যিকারের গণসাহিত্যের ইঙ্গিত বর্তমান সেটা যদি আধুনিক যুগের বামপন্থী তরুণ সাহিত্যিকদের মননকে এদিকে বেশী করে আকর্ষণ করতে পারে তাহলেই সার্থক হয়ে উঠবে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভা।

সুধাময় ভট্টাচার্য

চন্দ্রলোক

"Through me you pass into the grieving realm
Through me you pass into the eternal grief
Through me you pass among the kin that's lost—"

—*Inferno*—

ক্লান্তি নেমেছে নগরের বুকে—
ধূসর মেঘের অঞ্চল ভরা পাপ।
ধনভাণ্ডারে অনশনে মরে
বিরহী যক্ষ—গলিত মাধবী মঞ্জরী আর
নির্জ্জন প্রান্তর।
চর্ব্ব্য, চোষ্য, পানীয় চার্ব্বাকেরও
ধূলি ধূসরিতু।
ইতিহাস শুধু হাসে বিধাতার হাসি।
তাই ক্ষান্তির ছায়া,
ব্যসনের গ্রাসে—ফণি মনসার
ক্ষেতে ক্ষেতে ঘোরে কাক।
আয়ু সীমানায় মহাত্মাদের সারি।
কুম্ভীপাকের ভাবনা কাঁপায় পা—
পুণ্যের থলি গোণাগুণি, চাপা
ফিস্ ফিস্ কানে কানে।
নিদারুণ শীতে হাড়ে হাড়ে ঝঙ্কৃত—
তিব্বতী কৈলাস।
দূর হতে শুনি,
লৌহ কবাটে শৃঙ্খল-গুঞ্জন।
এবার শাস্তি-পুরস্কারের তুহিন রাত্রি-দিন।

আর্ত্তনাদের দুর্ব্বার প্রান্তরে
দুয়ার কি যাবে খুলে !
তবু ভাল,
আমি শোভাযাত্রার শেষে।
কুষ্ঠের সারি,
অন্ধ, খঞ্জ, বধিরেরা গলাগলি।
মৃতবৎসার বৎসেরা জমে, মেঘের মতন
হামাগুড়ি দিয়ে, দূরে।
অস্ত্রোপচারে, হাঁসপাতালের দল—
অন্ত্রবিহীন, যন্ত্রণা-কুঞ্চিত
কবন্ধদের সারি।
স্বদেশ প্রেমিক,
টেররিষ্টদের ঘাড়ে চেপে চলে—
এখানেও বক্তৃতা !
কামুক কামুকী মৈথুনরত—
কুক্কুর-কুক্কুরী।
বিশ্বপ্রেমিক মাতালেরা করে,
ছায়াদের হাতে আত্মাসমর্পণ।

আমাদের ক্লান্ত দেহে
সাড়া নাই প্রারব্ধ পাপের।
প্রাক্তন, জাতক স্রোতে
ক্ষয়ে ক্ষয়ে, মুছে গেছে আজ।
প্রার্থনার শেষ ঋণ,
শোধ করি তর্পণের তিলে
পিতৃলোক পানে।
ঊর্দ্ধে জ্বলে ধরিত্রীর কামনা তপন—
যে কামনা স্থবিরের—

শিথিল পেশী ও মেদে।　ঘোরে কৃমি কীট
অন্ত্রে অন্ত্রে।
অগ্নিমান্দ্য তাই কল্পশেষে।
আজ তাই পুংসবন
অনুর্ব্বর বর্ব্বরের হাতে।
পৃথিবীর রক্ত-মাংস চক্রহীন-প্রজ্ঞাহীন
পাতালের পথে।
প্রপঞ্চের যাত্রাশেষে ক্ষান্ত তাই স্থবিরের গান।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

ভারতপথে*

(২৬)

"এস্‌মিস্‌ এস্‌মূর
এস্‌মিস্‌ এস্‌মূর
এস্‌মিস্‌ এস্‌মুর
এস্‌মিস্‌ এস্‌মূর..."

"রণি—"

"বলো ?"

"অদ্ভুত ব্যাপার, না ?"

"তোমার পক্ষে প্রায় অসহ্য হ'য়ে উঠেছে নিশ্চয়।"

"একটুও না, আমি ঠিক আছি।"

"যাক, তবু ভালো।"

এডেলার কথায় আগের চাইতে অনেক বেশি সহজ ও স্বাভাবিক ভাব এসেছিল। বন্ধুদের দিকে ঝুঁকে ও বল্‌ল, "আমার জন্যে কেউ ভেবো না, এখন অনেক ভালো আছি ; আর মোটেই মাথা ঘোরে না। আমার জন্যে কিনা তোমরা অনেক করেছ, ধন্যবাদ তোমাদের।" বেশ চেঁচিয়ে ওকে কথা বলতে হোলো, কেননা ঐ একঘেয়ে এস্‌মিস্‌ এস্‌মূর তখনও চলছিল।

হঠাৎ এই সব গেল থেমে। বুঝি দেবতার কানে তা পৌঁছেছিল, দর্শনপ্রার্থীদের তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এর পর মিষ্টার অমৃতরাও উঠে যখন বললেন, "আমার সহযোগী উকিলের হ'য়ে আমি মাপ চাচ্ছি, আমাদের মক্কেলের তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাই মনের আবেগ তিনি সামলে উঠতে পারেননি—" সবাই একটু আশ্চর্য্য হোলো।

হাকিম বললেন "মিষ্টার মামুদ আলিকে নিজে এসে মাপ চাইতে হবে।"

"অবশ্য। আমরা খবর পেয়েছিলাম যে মিসেস্‌ মূরের ইচ্ছা ছিল সাক্ষ্য

* ই, এম, ফর্ষ্টার-এর উপন্যাস "ভারতপথে"র অনুবাদ এই সংখ্যায় শেষ হইল। বইটির সম্পূর্ণ অনুবাদ শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

আর বিশেষ জরুরি কথা নাকি তাঁর বলার ছিল। কিন্তু সাক্ষ্য দেবার আগেই তাঁর ছেলে তাড়াতাড়ি তাঁকে এদেশ থেকে দিল সরিয়ে। তাতেই মিষ্টার মামুদ আলির মাথা যায় বিগড়ে—কেননা এর ঠিক আগেই আবার চেষ্টা হয়েছিল আমাদের একমাত্র ইউরোপীয় সাক্ষী মিষ্টার ফিলডিংকে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার। পুলিশ যদি মিসেস্ মূরকে সাক্ষী হিসাবে দাবী না করত তাহলে মিষ্টার মামুদ এ বিষয়ে কোনো কথাই তুলতেন না।" এই বলে উনি বসে পড়লেন।

হাকিম উক্তি করলেন, "এই মামলায় মিছে বাইরের জিনিষ টেনে আনার চেষ্টা হচ্ছে। আবার বলছি, সাক্ষী হিসাবে মিসেস মূরের কোনো সত্তাই নাই। মিষ্টার অমৃতরাও বা মিষ্টার ম্যাকব্রাইড, আপনাদের কারও অধিকার নাই, উনি কি বলতেন না বলতেন তা অনুমান করার। তিনি যখন এখানে উপস্থিত নাই, তখন কিছু বলাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।"

ক্লান্তস্বরে পুলিশ সাহেব বললেন, "আমি যা বলেছিলাম তা ফিরিয়ে নিচ্ছি, পোনেরো মিনিট আগেই নিতাম একটু সুযোগ পেলেই। বিন্দুমাত্র এসে যায় না আমার মিসেস মূর থাকা বা না থাকাতে।"

"আসামীর পক্ষ থেকে আমি আগেই তো ওঁর সম্বন্ধে সব কথা প্রত্যাহার করেছি।" অতঃপর উকিলি রসিকতা ক'রে উনি বললেন, "বোধহয় বাইরে যে-সব ভদ্রলোক আছেন আপনি বললে তাঁরাও প্রত্যাহার করবেন তাঁদের কথা"—তখনো বাইরে ধূয়ো চলছিল।

একটু হেসে দাশ সাহেব জবাব দিলেন, "আমার ক্ষমতার দৌড় অতদূর নয়।"

যাক্, গোলমাল মিটল, আর এডেলা যখন সাক্ষ্য দিতে এল ততক্ষণে আদালত-ঘর বেশ শান্ত হ'য়ে এসেছে, মামলা সুরু হ'য়ে অবধি এত শান্ত একবারও হয় নাই। বিশেষজ্ঞরা মোটেই এতে আশ্চর্য্য হলেন না। নেটিভদের ঐ রকম—বেশিক্ষণ ওরা লেগে থাকতে পারে না, তুচ্ছ একটা কিছু নিয়ে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তারপর আসল ব্যাপার যখন আসবে ততক্ষণে ওদের শক্তি পাবে লোপ। ওরা খুঁজছিল একটা মনোমত অভিযোগ। বৃদ্ধা মহিলাটিকে সরানোর কাহিনীতে সেই অভিযোগ ওরা পেয়েছিল—বাস্, এবার আজিজকে যখন দ্বীপান্তরে দেওয়া হবে তখন ওদের অভিযোগের উৎসাহ ফুরিয়া আসবে।

কিন্তু আসল সঙ্কট উপস্থিত হোলো পরে।

এডেলার বরাবরই ইচ্ছা ছিল সত্যি কথা বলা, একেবারে নিছক সত্যি কথা, আর এই কঠিন কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্যে ও প্রস্তুত হ'য়েছিল আগে থেকে—কঠিন, কেননা, মারাবার গুহার দুর্ঘটনার সঙ্গে ওর জীবনের আর একটি ব্যাপার, রণির সঙ্গে ভবিষ্যতে ওর বিবাহ, ছিল যুক্ত, যদিও তাদের সূত্র ছিল মাত্র একটি। গুহায় ঢোকবার ঠিক আগেই ওর মনে হয়েছিল ভালবাসার কথা, সরল মনে ও তাই আজিজকে জিজ্ঞাসা করেছিল বিবাহ ব্যাপারটা কি রকম, আর ওর ধারণা হয়েছিল এই প্রশ্নের ফলে আজিজের মনের সুপ্ত সয়তানি উঠেছিল জেগে। হাটের মাঝে এই সমস্তর আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা ওর পক্ষে মর্ম্মান্তিক, তাই এই একটি ঘটনা ও পেরেছিল গোপন রাখতে; আরো এমন সব খুঁটিনাটি বলতে ওর আপত্তি ছিল না যাতে অন্য মেয়েরা আঘাত পাবে কিন্তু ওর নিজের এই দুর্ব্বলতার কথা প্রকাশ্যে কবুল করার সাহস ওর ছিল না, আর ওর ভীষণ ভয় হয়েছিল জেরায় পাছে সব ফাঁশ হ'য়ে যায়। কিন্তু জবাব দিতে উঠে নিজের গলার স্বরে ওর এই ভয়টুকুও ঘুচে গেল। অজানা অদ্ভুত এক ভাব ওর দেহ মন যেন প্রচণ্ড বর্ম্মের মতন ঘিরে ধরল। কি যে ঘটেছিল সে ভাবনাই ওর মনে এল না, লোকের পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়ে যে-ভাবে ওর আদৌ তা হ'লই না; আবার মারাবার পাহাড়ে ও করল প্রত্যাবর্ত্তন, আর সেখান থেকে ম্যাকব্রাইডের সঙ্গে ওর কথাবার্ত্তা চলছিল যেন মাঝখানের অন্ধকার পেরিয়ে। সেই ভীষণ দিন আবার এল তার প্রত্যেকটি ছোটখাট ঘটনা নিয়ে—কিন্তু এডেলা এখন একেবারে এই দিনের অঙ্গীভূত আর এর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, আর এই যুগ্মযোগের ফলে এই স্মরণীয় দিনটি হয়ে উঠেছিল আশ্চর্য্য মহীয়ান। কেন যে সে তখন মনে করেছিল এই অভিযান একেবারে বাজে? আবার উঠল সূর্য্য, হাতী এসে দাঁড়াল ওদের জন্যে, চারদিকে ছেঁকে ধরল ঘিরে মেটে রঙের পাহাড় আর তারই মধ্যে দেখা গেল এক নম্বরের গুহা। ঢুকল সে ঐ গুহার ভিতর, দেশলাইর আলোর প্রতিভাস ফুটে উঠল পালিশ করা দেওয়ালে—সব কিছুই সুন্দর, কিন্তু ওর চোখে কিছু তখন পড়েনি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ওকে করা হোলো, আর ঠিক ঠিক উত্তরও ওর যোগালো। হ্যাঁ, 'ছোরা পুকুর' ওর চোখে পড়েছিল, তবে নাম তার ও জানত না; মিসেস মূর প্রথম গুহা থেকে বেরিয়ে

ক্লান্ত হ'য়ে প্রকাণ্ড এক পাথরের ছায়ায় শুকনো কাদার কাছে ব'সেছিলেন। এডেলার মনে হচ্ছিল দূর থেকে ওকে কে যেন ডাকছে মোলায়েম কণ্ঠস্বরে, তারই আহ্বানে আর পিছনের পাখার হাওয়ায় ও এগিয়ে চলেছে সত্যের পথের পথিকের মতন……"আসামী আর গাইড কাউয়া দোলের উপর আপনাকে নিয়ে গেল আর সঙ্গে অন্য কেউ ছিল না?"

"সব থেকে আশ্চর্য্য আকারের যে-পাহাড়? হ্যাঁ!" বলতে বলতে চোখের সামনে ফুটে উঠল কাউয়া দোল, পাথরের ঢালুর উপর খাঁজগুলো আবার ওর চোখে পড়ল, মুখে এসে লাগল গরম হাওয়ার ঝলক। আর কিসের যেন ঝোঁকে ও বল্‌ল, "যতদূর জানি কেউ আর ছিল না, মনে হোলো আমরা শুধু একলা।"

"আচ্ছা, বেশ। পাহাড়টাতে উঠতে মাঝপথে একটা তাকের মতন আছে—এই খানিকটা এবড়ো খেবড়ো জায়গা, আর একটা নালার মুখের কাছাকাছি ছড়ানো কতকগুলো গুহা।"

"বুঝেছি, আপনি কোন জায়গাটার কথা বলছেন।"

"ঐ গুহাগুলোর একটাতে আপনি একলা ঢুকেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আর আসামী আপনার পিছন পিছন গিয়েছিল?"

মেজর ক্যালেণ্ডার অমনি মন্তব্য করলেন, "এবার বাছাধন ধরা পড়েছেন।"

কিন্তু এডেলার মুখে কথা নাই। প্রশ্নের স্থল আদালত, ছিল ওর উত্তরের অপেক্ষায়। কিন্তু উত্তরস্থলে যতক্ষণ আজিজ না আসে, কি করে ও উত্তর দেবে?

যে একঘেয়ে স্বরে উত্তর প্রত্যুত্তর চলছিল, তেমনি একঘেয়ে স্বরেই পুলিশ সাহেব প্রশ্ন করলেন, "আসামী তো আপনার পিছন পিছন গিয়েছিল—না?" আগে থেকে ঠিক ছিল প্রশ্ন আর জবাব কি হবে, তাই সাক্ষ্যের এই অংশে এমন কিছু ছিল না যা চমক লাগায়।

"আচ্ছা, মিষ্টার ম্যাকব্রাইড, আমাকে আধ মিনিট সময় দেবেন এর জবাব দিতে?"

"নিশ্চয়।"

অনেকগুলো গুহা ও দেখতে পেল, আর মনে হোলো ও রয়েছে তাদের একটার ভিতরে, আবার বাইরেও ওর লক্ষ্য রয়েছে—গুহার মুখটার দিকে, আজিজ ঢোকে কিনা দেখবার জন্যে। কিন্তু, কই, আজিজকে তো দেখা গেল না। অনেকবার ওর মনে এই সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু মনে হওয়া এক কথা, মুখে বলা আর এক। অনেক কষ্টে ও বল্‌ল, "আমি ঠিক বলতে পারি না।"

"এ্যা, কি বললেন ?"

"আমি ঠিক বলতে পারছি না।"

"আপনার কথা বুঝতে পারলাম না।" ঝপ ক'রে ভদ্রলোক মুখ বন্ধ করলেন, মুখে ওঁর ফুটে উঠল ত্রাস। "আপনি রয়েছেন ঐ তাক বা যা বলেন, তার ওপরে, একটা গুহার মধ্যে আপনি ঢুকলেন, আমি বলি কি যে আসামীও আপনার পিছন পিছন গেল।"

এডেলা ঘাড় নাড়ল।

"কি বলতে চান বলুন তো।"

ও শুধু নিরসভাবে বলল, "না।"

ঘরের মধ্যে এখানে ওখানে অল্প স্বল্প গোলমাল সুরু হোলো, কিন্তু আসল ব্যাপার কি এক ফিলডিং ছাড়া কারও মাথায় তা ঢোকেনি। উনি বুঝেছিলেন এডেলা এবার ভেঙে পড়বে আর ওঁর বন্ধুটি পাবে খালাস।

ম্যাজিষ্ট্রেট সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলছেন, জোরে বলুন, শুনতে পাচ্ছি না।"

"আমি বোধহয় ভুল করেছি।"

"ভুল ? কি রকম ?"

"ডাক্তার আজিজ আমার পিছন পিছন গুহার মধ্যে আদবেই যাননি।"

পুলিশ সাহেব নথিপত্র সজোরে টেবিলের উপর রেখে আবার তা তুলে নিয়ে নির্ব্বিকারভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস কেষ্টেড, তাহলে এবার শুনুন—যা বলছিলাম। দুঘণ্টা পরে আমার বাংলোয় আপনি যে এজাহার স্বাক্ষর করেছিলেন, তা আপনাকে পড়ে শোনাই।

"মিষ্টার ম্যাকব্রাইড, মাপ করবেন, এখন ওসব কিছু হতে পারে না। আমি নিজে স্বাক্ষীকে যা জিজ্ঞাসা করবার করছি। বাইরের লোক যারা

আছে চুপ না করলে এই আদালত ঘরে কাউকে থাকতে দেব না। মিস কেষ্টেড, এই মামলার বিচার ভার রয়েছে আমার হাতে আপনার যা বলবার আমাকে বলুন, আমি বুঝি আপনার সাক্ষ্যের গুরুত্ব কতখানি। মনে রাখবেন, আপনি ঈশ্বর সাক্ষী করে কথা বলছেন।”

“ডাক্তার আজিজ……”

টার্টনের পরামর্শে মেজর ক্যালেণ্ডার চেঁচিয়ে উঠলেন—“এই মোকদ্দমা আমি থামিয়ে দিচ্ছি, সাক্ষীর শরীরের অজুহাতে।” অমনি সাহেবের দল উঠে দাঁড়ালেন, তাঁদের বিপুল সাদা দেহের পশ্চাতে ক্ষুদ্রকায় হাকিম হলেন লুপ্ত। এদেশী লোক যারা ছিল তারাও উঠে পড়ল। একসঙ্গে শত শত ব্যাপার ঘটছিল, তাই পরে এই ঘটনার বর্ণনার কারও সঙ্গে কারও মিল পাওয়া যায় নাই।

ন্যায়ের প্রতিনিধি চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন—“আপনি তাহলে অভিযোগ প্রত্যাহার করছেন ? আমার কথার জবাব দিন।”

এডেলার বোঝার সাধ্য ছিল না কি ওকে পেয়ে বসেছিল যাতে ও বল পেল। কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল ওর চোখের সামনের সেই সব ছবি, আবার এই নিরস পৃথিবীতে ও এসেছিল ফিরে, তবু যা দেখেছিল তা ওর মনে ছিল লেগে। প্রায়শ্চিত্ত ও অপরাধ স্বীকার, তা পরে হতে পারে। একেবারে কাঠখোট্টা ভাষায় ও জবাব দিল, “আমি সব অভিযোগ প্রত্যাহার করছি।”

“আর বলতে হবে না—আপনি বসুন। মিষ্টার ম্যাকব্রাইড, এর পরেও কি আপনি মামলা চালাতে চান ?”

পুলিশ সাহেব এমন ভাবে এডেলার দিকে তাকালেন যেন সে একটা ভাঙা যন্ত্রবিশেষ, আর বল্‌লেন “পাগল হ'লেন নাকি ?”

“মশায়, কিছু ওঁকে জিজ্ঞাসা করবেন না, আপনার আর কোনো অধিকার নাই।”

“আমি সময় চাই ভেবে দেখতে—”

আদালতের পিছন থেকে শোনা গেল নবাব বাহাদুরের গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি ; “সাহেব, আপনাকে মামলা উঠিয়ে নিতেই হবে—এ যে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হ'য়ে উঠছে।”

বিষম একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছিল, তারই মধ্যে টার্টন-গিন্নি চীৎকার ক'রে বললেন, "নেবেন না উনি মামলা উঠিয়ে। আর সব সাক্ষীদের ডাকা হোক। আমরা কেউ আর নিরাপদ নই—"

রণি চেষ্টা করল ওঁকে থামাতে, রেগেমেগে উনি মারলেন তাকে এক ধাক্কা, তারপর এডেলাকে উচ্চকণ্ঠে যা মুখে এল বল্লেন।

"আচ্ছা, বেশ, আমি মামলা উঠিয়ে নিচ্ছি—", খুব উদাসীন ভাবে এই কটি কথা ব'লে পুলিশ সাহেব গেলেন ওঁর বন্ধুবর্গকে আগলাতে।

অতঃপর মিষ্টার দাস তাঁর আসন ছেড়ে উঠলেন, তাঁর অবস্থা হয়েছিল প্রায় আধমরা। মোকদ্দমাটিকে তিনি বাগ মানিয়েছিলেন—অতিকষ্টে। ভারতবাসীরাও যে হাকিমি করতে পা'রে তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন।

যাদের কানে পৌঁছল ওঁর শেষ কথা তারা শুনল উনি বললেন, "আসামী একেবারে মুক্তি পাবে, ওর চরিত্রে একটি দাগও পড়েনি; মোকদ্দমার খরচের বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে অন্যত্র।"

তারপর ভাঙল আদালতের ঠুনকো বাঁধ, ঘৃণার, আক্রোশের তীব্রধ্বনি একেবারে সপ্তমে উঠল, কেউ করল চীৎকার, কেউ দিল গালি, এ ওকে জড়িয়ে ধ'রে করল আদর, কেঁদে ভাসিয়ে দিল অনেকে। এদিকে ছিল সব সাহেবের দল, চাকরদের আওতায়, আর ও দিকে মূৰ্চ্ছিত আজিজ এলিয়ে পড়েছিল হামিদুল্লার গায়ে। এক পক্ষে জয়, অপর পক্ষে পরাজয়—মুহূর্ত্তের জন্য এই বিরোধ হ'য়ে উঠল চরম। তারপর আবার জীবনের বৈচিত্র্য এল ফিরে, একের পর এক লোকেরা সব গেল চ'লে যে-যার কাজে, খানিকক্ষণ পরে একটি লোক রইল না এই আজগবি কাণ্ডের লীলাভূমিতে—সেই নগ্নকায় সুদর্শন দেবমূর্ত্তি ছাড়া। এ বোধই তার হয়নি যে অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে। শূন্য মঞ্চ আর সাহেবদের জন্যে বিশেষভাবে আমদানি করা সব উলটানো চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে সে তেমনি টেনে চলেছিল পাখার দড়ি, তারই ফলে ক্ষণে ক্ষণে আলোড়িত হ'য়ে উঠছিল পুঞ্জীভূত ধুলো।

শেষ

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

আধুনিক ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি

আমাদের চোখের সম্মুখে ইংরাজের পররাষ্ট্রনীতি যে কিরূপে পরিবর্তিত হইতেছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। চোখের সম্মুখে যাহা ঘটে তাহার এক একটি বিশেষ ঘটনাই কেবল মানুষ লক্ষ্য করিয়া থাকে, মূলগত নীতিটি কিন্তু অলক্ষিতই থাকিয়া যায়। এই জন্যই, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া মাঞ্চুরিয়া, চীন, আবিসিনিয়া, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও স্পেন সংক্রান্ত বিরাট ঘটনাগুলিই আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু আমরা কখনই প্রায় ভাবিয়া দেখি না যে আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাবলী যত বড়ই মনে হউক সেগুলি প্রকৃতপক্ষে একটি সুনির্দিষ্ট রাজনীতির সময়োপযোগী বিকাশরূপ মাত্র। এই নীতিটি না বুঝিয়া কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর সাহায্যে কখনই ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি বুঝিতে পারা যাইবে না, এবং ভারতবাসীও তদ্ব্যতিরেকে আপন কর্তব্য নির্ধারণ করিতে সমর্থ হইবে না।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বত্রই দেখা যায় যে অপর সমস্ত শক্তিকে পরাস্ত করিয়া আপন প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখা বা আপনি প্রাধান্য লাভ করাকেই প্রত্যেক জাতি আপনার প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে। যতদিন পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতিতে বিভক্ত থাকিবে ততদিন এই নীতি পরিবর্তিত হইবে না। Canon Sheppard, Ossietzky প্রভৃতি শান্তিবাদী প্রচারক মানুষেরা এই দুর্নীতির প্রতি অন্তরে ও বাহিরে যতই ঘৃণা প্রদর্শন করুন, মানুষ কেবল কথার বশে কোনদিনই তাহার প্রকৃতি পরিবর্তন করিবে না। এই কথা বুঝিয়াই কৌটিল্য হইতে Chamberlain পর্যন্ত প্রত্যেক রাজনীতিবিৎ প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বলিয়া আসিতেছেন: "শত্রু কে? যাহার রাজ্যের সীমানা তোমার রাজ্যের সীমানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে" (কৌটিল্য)।

কিন্তু আর একটি কথা এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিতে হইবে; সেটি এই যে আধুনিক প্রত্যেক জাতিই প্রকৃতপক্ষে দুইটি বিভিন্ন জাতির সম্মেলন। Marx নয়, স্বয়ং Disraeli বলিয়া গিয়াছেন যে প্রত্যেক দেশে

ধনী ও দরিদ্র নামক দুইটি বিভিন্ন জাতির বাস। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির পরস্পর সম্বন্ধ যে শাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে তাহার নাম রাজনীতি; কিন্তু একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির সম্বন্ধ আলোচিত ও নিরূপিত হয় অর্থনীতি নামক একটি বিভিন্ন শাস্ত্রে। এই জন্যই Stafford Cripps বলিয়াছেন, "nationalism" is "the political alibi for competitive capitalism"। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় কিন্তু স্বরাষ্ট্রকে সম্পূর্ণরূপে পররাষ্ট্র হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবার উপায় নাই; সেই জন্যই রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি বর্তমানে অনেকটা একাকার হইয়া গিয়াছে,—Paul Einzig প্রভৃতি চিন্তাশীল লেখকদের রচনা হইতে যাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। এবং এই জন্যই, Schacht প্রভৃতি নাৎসি চর যখন বিদেশে গিয়া রাষ্ট্রনীতি হইতে অর্থনীতি সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিতে চায়, তখন বুঝিতে হইবে যে তাহারা ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা কথা বলিতেছে (Schacht-Labeyrie সংবাদ অনুসন্ধেয়)। কিন্তু তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় বলিয়া মনে হয় না যে তথাকথিত রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য অপর সমস্ত জাতিকে পরাস্ত করিয়া স্বরাষ্ট্রের বলবৃদ্ধি করা; কিন্তু রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির প্রধান উদ্দেশ্য স্বরাষ্ট্রের একটি বিশেষ শ্রেণীর শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখা। কিন্তু কোন দেশেরই স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রনীতি বিভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। এ চেষ্টা Republican Spain-এ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কমিউনিষ্ট মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া করা হইয়াছিল, কিন্তু Franco-র বিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে এ-নীতি সেখানে ফলবতী হয় নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে যে-শক্তি স্বরাষ্ট্রে আপন প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে, পররাষ্ট্রেও সেই শক্তিই রাষ্ট্রের নামে আপনারই শক্তি-বৃদ্ধি করিতে চাহিবে। এবং কোন রাষ্ট্র যদি পররাষ্ট্রে আপন শক্তিবিস্তার করিতে সমর্থ হয় তবে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতপক্ষে সেই রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট শ্রেণীই সেই শক্তির অধিকারী। সুতরাং স্বরাষ্ট্রেই হউক আর পররাষ্ট্রেই হউক, ইংল্যাণ্ডের রাজনীতি বুঝিতে হইলে ব্রিটিশ-সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে কিরূপে বিভক্ত তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সাত বৎসর পূর্বে দুই সপ্তাহের জন্য একবার লণ্ডন গিয়াছিলাম; ইংল্যাণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় আমার ঐ পর্যন্ত। কিন্তু তথাপি সহজেই বুঝিতে

পারিয়াছিলাম যে ইউরোপের অপরাপর দেশ হইতে ইংল্যাণ্ডের বাস্তবিকই বিরাট্ পার্থক্য আছে। Berlin অথবা Paris হইতে কোন ব্যক্তি প্রথম লণ্ডনে আসিলে আমার মনে হয় তাহার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য লাগিবে লণ্ডনের রাজপথের বিরাট জনপ্রবাহ ও তুই পাশের প্রাসাদশ্রেণী। Kurfuerstendamm বা Champs Elysées-র জনতা কলিকাতাবাসীর নিকট যেরূপ বিস্ময়কর লাগে, Berlin ও Paris-বাসীরও ঠিক সেইরূপ বিস্ময়কর লাগিবে লণ্ডনের রাজপথের জনপ্রবাহ। অন্ততঃ আমার সেইরূপ লাগিয়াছিল।

প্রথম বিস্ময় কাটিতে না কাটিতেই দ্বিতীয় বিস্ময়। দ্বিতীয় দিনে পথে বাহির হইয়া মাত্র খান তুই তিন ছবি তুলিয়াছি, এখন সময় বেশ বলিষ্ঠ একটি লোক আসিয়া বলিল সে একজন ex-soldier, আপাততঃ বেকার, কিছু বখ্‌শিস্ পাইলে লণ্ডনের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান আমাকে দেখাইয়া দিবে। সে যে পেশাদার guide নয় তাহাও সে আমাকে বলিল। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম ইংল্যাণ্ড অপেক্ষা Germany ও France অনেক দরিদ্র, কিন্তু তথাপি এই তুই দেশে অনেক ভ্রমণ করিয়াও তো কখনও একটিও ভিক্ষুক আবিষ্কার করিতে পারি নাই! তাহার উপর কোন ex-soldier যে ঐ তুই দেশে কোন বিদেশীর নিকট নিজেকে ভিক্ষুক বলিয়া পরিচয় দিবে তাহা কল্পনাও করা যায় না। তখনই বুঝিলাম প্রথম দিনে যে ইংল্যাণ্ডের প্রাসাদ-শ্রেণী দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এই ex-soldier-টি সেই ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী নয়। এই ব্যক্তিটি যে কোন্ ইংল্যাণ্ডের অধিবাসী তাহা বুঝিতে পারিলাম যেদিন আন্‌মনে এলোমেলো পথ চলিতে চলিতে লণ্ডনের slum-quarter-এ আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি যে সৈনিক-ভিক্ষুক অন্য দেশেও হয়তো পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লণ্ডনের মত সেই বীভৎস ও জঘন্য slums অন্ততঃ Germany ও France-এ কোথাও পাওয়া যাইবে না। সেই সব শীর্ণদেহ, জীর্ণবস্ত্র, নিস্তেজ ও জ্যোতিহীন শিশু ও মহিলার দৃশ্য কয়েক বৎসর ইউরোপে থাকার পর আমাকে এতই বিচলিত করিয়াছিল যে দৈন্য ও নৈরাশ্যের সেই চিত্রের প্রত্যেকটি রেখা পর্যন্ত এখনও আমার চিত্তে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। এই ইংল্যাণ্ডের সহিত ভারতবাসীর বিবাদ থাকিতে পারে না, কারণ কেহই বলিতে পারিবে না

যে ইহারাই ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়া আপনি ধনী হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কার্য যাহারা করে, অথবা অপরকে পয়সা দিয়া করায়, তাহাদের বাস এখানে নয়; তাহাদের বাস দূরের ঐ অভ্রভেদী প্রাসাদশ্রেণীর মধ্যে। তাহারা দাম্ভিক ও স্বার্থপর, কিন্তু ইহারা এতই দীন ও বিনয়ী যে বিদেশীর নিকট ভিক্ষা করিতেও ইহাদের লজ্জাবোধ হয় না। ঐ সব প্রাসাদবাসীকে ইহারা মিত্র ও সজাতীয় বলিয়াও মনে করিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অন্ততঃ প্রতিফলিত আভিজাত্যের অহঙ্কার বশতঃ ইহারা পদানত ভারতবাসীর নিকট আপনার দৈন্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত।

সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংল্যাণ্ডেও যে কেবল ধনী ও দরিদ্র নামক দুইটি পৃথক্ জাতির বাস তাহাই নহে, ইংল্যাণ্ডেই ধনে ও মানে এই দুইটি জাতির পার্থক্য সর্বাপেক্ষা অধিক। এই কথাটি সর্বাগ্রে স্মরণ না করিলে শুধু ইংল্যাণ্ড কেন কোন রাজ্যেরই স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্রনীতি বুঝিতে পারা যাইবে না। দেশপ্রেম, জাতীয় একতা প্রভৃতি প্রাচীন বুলি প্রকৃত পক্ষে লোক ভুলান ছড়া মাত্র; কারণ যত দিন না দেশের মধ্যে শ্রেণীহীন একটি মাত্র জাতির প্রতিষ্ঠা হয় ততদিন জাতীয়তা কথাটিরই কোন অর্থ হয় না। ইংল্যাণ্ড এইরূপ শ্রেণীহীন দেশ নয়; সুতরাং ইংল্যাণ্ডের শাসক সম্প্রদায় তাহাদের শ্রেণীর স্বার্থানুসারেই স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। কিন্তু কেবল তাহাই নহে; ইংল্যাণ্ডের শাসক সম্প্রদায় জানে যে পররাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে আপন সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় অপরাপর দেশেও তাহাদেরই মত একটি শাসক ও ধনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা। কারণ ধনিক সম্প্রদায় কোনকালেই কোন প্রকার রাজনৈতিক সীমানা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বোধ হয় জার্মানীর নাৎসি-পিষ্ট ইহুদি ধনিক সমাজ। কারণ Mowrer (Germany Puts the Clock Back) দেখাইয়াছেন যে যে-নাৎসি দল জার্মানী হইতে ইহুদিদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল সেই নাৎসিদলকেও ইহুদি ধনিকরা অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছিল, কারণ তাহারা মনে করিত, অন্ততঃ সাম্যবাদিদের তুলনায়, নাৎসিরা হইল "friendly to capital"। এই বিষয়ে Hugo Stinnes, Fritz Thyssen ও ইহুদিরা সম্পূর্ণ একমত।

ইহাদের সকলকেই একে একে নাৎসিরা কবলিত করিয়াছে কিন্তু তথাপি ইহারা হিট্‌লারকে তাহাদের মিত্র বলিয়া মনে করে। ইহুদিরা পর্যন্ত যে উদ্দেশ্যে নাৎসিদের সাহায্য করিয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে বণিক্‌বৃত্তি ইংরাজও তাহাদের সাহায্য করিবে না কেন? পার্থক্য কেবল এই যে ইহুদিরা হিট্‌লারকে নিজের টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিল; কিন্তু ইংরাজ নাৎসিদের অপরের রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া ধনোপার্জন করিতে উপদেশ না দিলেও অনুমতি দিয়াছে।

এ কথা আজ আর বোধ হয় কাহাকেও নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে ইংরাজের চক্রান্তেই Abyssinia ইটালীর কবলিত হইয়াছে, কারণ ইংরাজ ইচ্ছা করিলেই Suez Canal বন্ধ করিতে পারিত এবং অন্যান্য বহু উপায়েই আরও এত রকম বিঘ্ন উৎপাদন করা ইংরাজের পক্ষে সম্ভব ছিল যাহাতে Mussolini-র পক্ষে ঐ দেশ জয় করা কোন ক্রমেই সম্ভব হইত না। Abyssina ইংরাজের নিকট সাহায্য পাইবার ভরসাতেই Italy-র সহিত সম্মুখ যুদ্ধেও সাহস করিয়াছিল, এবং এই হঠকারিতার ফলেই Abyssinia ধরাপৃষ্ঠ হইতে আজ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল। ইংরাজ যদি Abyssinia-কে ভরসা না দিত তাহা হইলে ইংরাজকেও Hoare-Laval চুক্তির মত ঘৃণ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইত না, এবং Negus-ও হয়তো যুদ্ধ না করিয়া Italy-র নিকট আত্মসমর্পণপূর্বক আপন রাজ্যের কিয়দংশও রক্ষা করিতে পারিতেন। কিন্তু যাহা ঘটিল তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইংরাজ দেখিল বলদৃপ্ত ইটালীকে ঠাণ্ডা করিবার একমাত্র উপায় ইটালীকেও একটি Contented Power-এ পরিণত করা। এই মহান্‌ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ Abyssinia Mussolini-র নিকট বলি দেওয়া হইল। কুশীদজীবী Chamberlain যাহা অনুমান করিয়াছিল ঘটিলও ঠিক তাহাই। Abyssinia গ্রাস করিয়া অজগর Italy ইংরাজের নিকট প্রার্থনা করিল হজমী গুলি, অর্থাৎ টাকা। কাজেই এক ঢিলে দুই পাখী ফতে হইল। Italy-কে দিন কতকের জন্য ঠাণ্ডা করা হইল, এবং অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের ধনিক শ্রেণী Abyssinia-তে টাকা খাটাইয়া আপনাদের অর্থবিস্তার করিবার আরও একটি সুযোগ পাইল।

জাপানের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড ঠিক একমনা হইয়া কার্যে অগ্রসর হইতে পারে নাই, কারণ ইংল্যাণ্ডের এই অভিনব পররাষ্ট্রনীতি তখনও সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া

উঠে নাই। Lytton Commission ও Plymouth Committee-র মধ্যে বাস্তবিকই একটা পার্থক্য আছে। Lytton-এর মনে বাস্তবিকই ভয় ছিল যে মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়া জাপান বলশালী হইয়া উঠিলে ইংরাজদের পক্ষে ভারতবর্ষ রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে; Plymouth কিন্তু প্রথম হইতেই স্থির সংকল্প করিয়া বসিয়াছিল যে Spain-এ বামপন্থীদের ধ্বংস করিতেই হইবে। Lytton তাই ভয়ে ভয়ে তাহার report দাখিল করিল—যাহার ফলে জাপান সম্পূর্ণ বেপরোয়া হইয়া সমগ্র চীন গ্রাস করিবার জন্য অভিযান সুরু করিল। এবার কিন্তু ইংরাজ বাধা দিল না। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে যে-জাতির প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল, চীনের মত বিরাট একটি প্রাচীন সভ্য জাতিকে জাপানের হস্তে তিলে তিলে দগ্ধ হইতে দেখিয়াও সে-জাতির আজ কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। কারণ ইংরাজ আজ বুঝিয়াছে যে তাহার নিজের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে জাপানকেও সাম্রাজ্যলাভে সাহায্য করিতে হইবে, এবং অপরের সম্পত্তি চীন দেশ গ্রাস করিয়াই যদি জাপানের রাজ্যক্ষুধা শান্ত হয় তবে ইংরাজের তাহাতে লাভ বই লোকশান নাই। এই জন্যই "অসভ্য" জাপানের হস্তে সহস্র প্রকারে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও ইংরাজ একবারও ক্রোধ পর্যন্ত প্রকাশ করে নাই। "Panay"-র ব্যাপারে Roosevelt জাপানের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু চীনে ব্রিটিশ রাজদূত স্বয়ং জাপানের বোমায় আহত হইলেও বকধার্মিক ইংরাজ আকাশে আঁখি তুলিয়া কেবল বলিয়াছিল: "they know not what they do"। Napoleon ব্রিটিশ রাজদূতের প্রতি যথোচিত ভদ্র ব্যবহার না করার জন্য যে ইংরাজ Amiens-এর সন্ধি প্রত্যাহার করিয়া লইতে ভয় পায় নাই, এই ইংরাজ কি সেই ইংরাজ?

জাপানের প্রতি ইংরাজের এই সহানুভূতির আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে জাপান আজ চীনে যাহা করিতেছে শতাধিক বর্ষ পূর্বে ইংরাজ ভারতবর্ষে ঠিক তাহাই করিয়াছিল। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও স্থানের নাম যদি উল্লেখ না করা যায় তবে ইংরাজের ভারত বিজয় ও জাপানের চীন বিজয়ের ইতিহাসে কোন পার্থক্যই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কাজেই জাপানের কাজ নীতিবিগর্হিত বলিয়া তিরস্কার করিলে ইংরাজের নিজের পায়েই কুড়ুল মারা হইবে। নাৎসিরাও যখন ধুয়া ধরিল যে জার্মানরা

হইল "Volk ohne Raum" (people without space), নূতন প্রসারক্ষেত্র না পাইলে Dejanira-র মায়া-tunic পরিহিত Hercules-এর মতই জার্মান জাতি জার্মানীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পিষ্ট হইয়া মরিবে—তখন বাস্তবিকই তাহাদিগকে কোন সদুত্তর দিবার উপায় ইংরাজের ছিল না, বিশেষ ইংরাজই যখন জার্মানীর পূর্ব উপনিবেশগুলি গ্রাস করিয়া বসিয়াছিল। তত্ত্বকথায় বিচলিত হওয়া কিন্তু ইংরাজের ধাতেই নাই। ইংরাজ একথা শুনিয়া কেবলমাত্র স্থির করিল যে জগৎসমক্ষে দেখাইতে হইবে যে অন্যান্য দেশও তাহাদেরই মত সাম্রাজ্য বিস্তার এখনও করিতেছে; সুতরাং শতবর্ষ পূর্বের পাপের জন্য এখন ইংরাজকে দোষী সাব্যস্ত করা আদৌ যুক্তিসঙ্গত হইবে না। জাপানকে ইংরাজের চীন বিজয়ে সাহায্য করার ইহাও একটি কারণ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু জাপানকে ইংরাজের সাহায্য করার ইহা অপেক্ষাও বড় কারণ এই যে সোভিয়েট রাশিয়া ধ্বংস করিতে হইলে জাপানের সাহায্য ইংরাজের প্রয়োজন। সোভিয়েট রাশিয়া ইংরাজকে ধ্বংস করিতেই হইবে, কারণ বর্তমান জগতে একমাত্র এই দেশই হইল "unfriendly to capital", যে capital ইংল্যাণ্ডের শাসক-সম্প্রদায়ের বুকের হাড়। কিন্তু রাশিয়া, জার্মানী বা জাপান—কোন দেশের বিরুদ্ধেই ইংরাজের খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করিবার উপায় নাই, কারণ যুদ্ধ ঘোষণামাত্রই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিবে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই Australia, Canada, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশকেও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। Statute of Westminster-এর পর হইতে ইংরাজকে সাহায্য করিবার জন্য Canada, Australia প্রভৃতির কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ইংরাজ যদি আজ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তৎসত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকা Hitler-এর প্রতি প্রীতিবশতঃ জার্মানীকেই সাহায্য করিতে থাকে, তবে আর কিরূপে বলা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত? কাজেই আধুনিক ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র হইল কিরূপে আপনি যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া রাশিয়াকে (unfriendly to capital) সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত এবং জার্মানী ও ইটালীকে (friendly to capital) অপেক্ষাকৃত দুর্বল

করিয়া দেওয়া যায়। এই উদ্দেশ্য যে কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয় ঃ—এক কথায় জার্মানীর সহিত রাশিয়ার যুদ্ধ বাধাইয়া দিবার চেষ্টাই হইল Chamberlain ও Halifax-এর পররাষ্ট্রনীতি। কিন্তু কেবল তাহাই নয়; এই যুদ্ধে যাহাতে জার্মানীই জয়ী হয় সে-চেষ্টাও ইহাদের করিতে হইবে, কারণ দুর্বল হইয়াও যদি রাশিয়া বাঁচিয়া থাকে—তাহাতেও ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায়ের শান্তি নাই। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন জার্মানীকে বলশালী হইতে দেওয়া, এবং সেই উদ্দেশ্যেই হিট্‌লারকে Austria ও Czechoslovakia উপহার দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে একদিকে জার্মানী কিছুকালের জন্য অন্ততঃ জাপান ও ইটালীর মত contented power হইয়া থাকিবে এবং অপর দিকে হিট্‌লারের রাশিয়া আক্রমণের পথেও আর কোন বাধা থাকিবে না। ইংরাজের নিকট প্রশ্রয় পাইয়া জার্মানী যে আজ অস্ত্রসজ্জায় ইংল্যাণ্ড অপেক্ষাও বলশালী হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ইংল্যাণ্ড জানে, কিন্তু তথাপি ইংরাজ শাসক-সম্প্রদায়ের তাহাতে বিশেষ ভয় নাই, কারণ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে হিট্‌লার প্রথমে রাশিয়ার সহিত অস্ত্রপরীক্ষা না করিয়া কখনই ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করিবে না। এবং রাশিয়াকে পরাস্ত করার পর জার্মানী নিজেই এত দুর্বল হইয়া পড়িবে যে কিছুকালের জন্য অন্ততঃ হিট্‌লারের পক্ষে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করা সম্ভব হইবে না।

জনশক্তিতে দুর্বল ফ্রান্স্ পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ইংরাজের হাতের পাঁচ হইয়া পড়িয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার লইয়া ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স্ ও রাশিয়া যদি একযোগে জার্মানী আক্রমণ করিত তাহা হইলে হিট্‌লার নিশ্চয়ই পরাস্ত হইত। মুসোলিনি মুখে যতই লম্ফ-ঝম্প করুক, প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বাধিলে যে Italy কখনই তাহাতে যোগ দিত না তাহা Chamberlain নিশ্চয়ই জানে, কারণ Italy-র অবস্থান এরূপ যে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সমবেত নৌবাহিনী দুই দিনেই ইটালী বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধে গ্রীসের যে দশা হইয়াছিল এ-ক্ষেত্রে ইটালীরও সেই দশা হইত। চেকোশ্লোভাকিয়া লইয়া যদি যুদ্ধ বাধিত তবে একা জার্মানীকেই ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স্ ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইত, এবং তাহাতে জার্মানীরই যে পরাজয় হইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু Chamberlain তাহা হইতে দিল না, কারণ তাহার উদ্দেশ্য জার্মানীকে

দিয়া রাশিয়া ধ্বংস করা। এই ব্যাপারেও ইংল্যাণ্ড এক ঢিলে দুই পাখী ফতে করিয়াছে। Delcassee-প্রবর্তিত যে নীতি অনুসরণের ফলে ফ্রান্স্ গত মহাযুদ্ধে নির্ভয়ে জার্মানীর সম্মুখীন হইতে সাহস করিয়াছিল, Chamberlain-এর চক্রান্তে ফ্রান্স্ সেই নীতিও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের হাতের পাঁচ ফ্রান্স্ এখন সম্পূর্ণরূপেই ইংল্যাণ্ডের করায়ত্ত হইল, কারণ চেকোশ্লোভাকিয়ার সহিত চুক্তিভঙ্গ করাতে ফ্রান্সের আর কোন কালেই রাশিয়ার নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা রহিল না। অপর দিকে চেকোশ্লোভাকিয়া এবং তৎসঙ্গে Balkan State গুলিও হিট্‌লারের হস্তগত হওয়ায় জার্মানীর Drang-nach-Osten (পূর্বদিকে অভিযান) নীতি অনুসরণের পথে আর কোন বাধাই রহিল না।

জার্মানীর এই পূর্বাভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য অবশ্যই রাশিয়া ধ্বংস করা, কিন্তু নাৎসিরা স্পষ্টভাবে সে কথা বলে না। তাহারা বলে, নেপোলিয়ন রাশিয়ার হাত হইতে পোল্যাণ্ড্‌কে যেরূপে উদ্ধার করিয়াছিল হিট্‌লারও সেইরূপেই Stalin-এর হাত হইতে Ukrainianদের রক্ষা করিবে। কিন্তু হিট্‌লারের এই ভণ্ড ঔদার্যের পশ্চাতে যে কি ভীষণ দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে তাহা বুঝিতে হইলে স্মরণ করা দরকার যে হিট্‌লার শাসন ক্ষমতা লাভ করিবার বহু পূর্বেই Hugenberg প্রকাশ্যে League of Nations-এ প্রস্তাব আনিয়াছিল যে জার্মানীকে Ukraine-এ উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেওয়া হউক। নাৎসি জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতির কর্ণধার General Haushofer তাহার পত্রিকায় গত কয়েক মাস ধরিয়া প্রকাশ্য ভাবেই "স্বাধীন" Ukraine-এর জন্য তীব্র আন্দোলন সুরু করিয়াছে। Haushofer হইল জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতির ব্যারোমিটার। আমাদের দেশে Haushofer-এর নাম ততটা পরিচিত নয়, কিন্তু ইউরোপে বহুদিন হইতেই লোকে জানে যে পররাষ্ট্রনীতিতে Haushofer-ই নাৎসিদের oracle। চেকোশ্লোভাকিয়া ধ্বংসের প্রধান কারণ Haushofer-এর তীব্র আন্দোলন। এমন একদিন ছিল যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্মান্‌রা রাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই জার্মানীর সহিত যোগস্থাপনের চেষ্টা করিলেও জার্মানী তাহাতে রাজী হয় নাই। কিন্তু Haushofer-এর অক্লান্ত আন্দোলনের ফলে এই চেকোশ্লোভাকিয়া লইয়াই Hitler ইউরোপে আবার এক লঙ্কাকাণ্ড

বাধাইতে উদ্যত হইয়াছিল। এই Haushofer-ই এখন Ukraine লইয়া ঠিক সেই প্রকার আন্দোলন সুরু করিয়াছে। Hugenberg ও Haushofer-এর কার্যকলাপ বিবেচনা করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই থাকে না যে Ukraine-এর স্বাধীনতার ধূয়া তুলিয়া জার্মানী শীঘ্রই রাশিয়া আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। হিট্‌লারের এই সঙ্কল্পটিকে কার্যে পরিণত করানই হইল এখন Chamberlain ও Halifax-এর পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

অস্ত্র

হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিতেই মৃদু দীপালোকে দেয়ালে বিলম্বিত বিকটাকার খড়্গাটির দিকে দৃষ্টি পড়িল। মনে হইল যেন একটি ছায়ামূর্ত্তি তাহার পার্শ্ব হইতে দ্রুতবেগে সরিয়া গেল। বাতিটা উস্কাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীক্ষ্ণধার ফলকাগ্ররেখা ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। হরিহর অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে দেখিতে দেখিতে একবার শুধু শিহরিয়া উঠিলেন। প্রাচীন বংশগৌরবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে ঐ খড়্গাটি কক্ষে বিলম্বিত হইয়া তাঁহাকে একটুও গৌরবান্বিত বোধ করায় নাই, বরঞ্চ, জন্মাবধি আজ এই প্রৌঢ় বয়স পর্য্যন্ত কারণে অকারণে যখনই তিনি উহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তখনই তিনি, কি জানি কেন, শিহরিয়া উঠিয়াছেন। বংশের একটি সংস্কারগত অন্ধ বিশ্বাস এই যে ঐ খড়্গাটি বংশের ভাগ্যনির্ণয় করে, সেইজন্যই হরিহরের বহুদিন যাবৎ ঐ অস্ত্রটিকে অপসারিত করিবার বলবতী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও করিতে পারেন নাই, শুদ্ধ তাঁহার স্ত্রী উমারাণীর জন্য।

হরিহরের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন ঘোর শৈব। তন্ত্রাচার তাঁহাদের নিত্যধর্ম্ম ছিল, কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীর যুগে হরিহর তাঁহাদের সেই শোণিতসিক্ত আভিজাত্যের নিষ্ঠুর দর্পের কথা ভাবিতেই পারেন না; তাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষদের শৈবাচার পরিত্যাগ করিয়া হরিহর যেমন বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিলেন, উমারাণী ঠিক তেমনি অন্য পথে গেলেন। তিনি পরিত্যক্ত আচার ও দেবতার পক্ষপাত করিয়া মাপকাঠি ঠিক রাখিলেন। হরিহর মনে মনে উমারাণীকে একটু ভয় করেন, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে ঐ খড়্গাটিকে দেখিতে দেখিতে, মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কারণ, উমারাণীর জেদের ফলেই খড়্গাটির আসন এই কক্ষে অটুট। হরিহরের মনে কেমন যেন ভয়ের সঞ্চারও হইল। ঐ খড়্গাটির সারা অঙ্গ হইতে অদৃশ্য শোণিতধারা টপ্ টপ্ করিয়া এখনও পাড়িতেছে।

নিদ্রা ভাঙ্গিতেই যে অপস্রয়মাণ ছায়ামূর্ত্তির মত তিনি দেখিয়াছিলেন, হয়ত তাহা তন্দ্রাঘোর ও ম্লান দীপালোকের ইন্দ্রজাল, তথাপি হরিহরের দেহটা

কেমন যেন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। ঐ ছায়ামূর্ত্তিটি কি প্রপিতামহ রুদ্রকান্তের? রুদ্রকান্তের পিতা শিবকান্তের? এখনও কি তাঁহারা ঐ খড়্গের মায়া ভুলিতে পারেন নাই! বংশের পুরাতন, শ্রুত কাহিনীগুলি তাঁহার একে একে মনে পড়িতে পাগিল।

সে কাপালিকের নাম এখন আর মনে নাই যিনি একদিন অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে শ্মশানে বিচরমাণ শিবকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে ঐ খড়্গাটি দিয়া যান। বলিয়াছিলেন—"ইহা হইতেই তোমার সিদ্ধিলাভ ও ঐশ্বর্য্যলাভ ঘটিবে।"—সে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

শিবকান্ত পঞ্চ নরবলি দ্বারা দেবীর তুষ্টি সাধন করিয়া, গুপ্তধন আবিষ্কার করিয়া এই জমিদারীর গোড়াপত্তন করেন।

রুদ্রকান্তের সময়ে সারা বাংলাদেশ মোগল ভয়ে ভীত। ঐ খড়্গের সাহায্যে বিংশতি নরবলি দ্বারা দেবীর আরাধনা করিয়া তিনি মোগলের শত্রুতা ত' দূরের কথা বরং মিত্রতা লাভ করিয়া স্বাধীনভাবে জমিদারী শাসন করিতে লাগিলেন।

হরিহর শিহরিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। পঞ্চবিংশতি কবন্ধ ও ছিন্নমুণ্ড সকল যেন এখনও অদৃশ্যভাবে বিবরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

দূর ঈশানপুরের এক দরিদ্র সদাচারী ব্রাহ্মণ বিংশতি বলির একজন ছিল। রুদ্রকান্তের তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, ভয়ে কেহই কিছু বলিতে পারে নাই। সেই ব্রাহ্মণের এক যুবক পুত্র পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে একদিন রাত্রে দেবীমন্দির হইতে খড়্গাটি অপহরণ করিয়া রুদ্রকান্তকে হত্যা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যুষে দেখা গিয়াছিল যে তাহার ছিন্ন দেহ অন্তঃপুরের বহির্ভাগে পড়িয়া রহিয়াছে।

আরও অনেক কাহিনীই মনে পড়িতে লাগিল, সে সমস্তই শোণিত-কাহিনী।

হরিহর হঠাৎ শয্যাত্যাগ করিয়া খড়্গাটির দিকে অগ্রসর হইলেন। ইচ্ছা এই যে পার্শ্বস্থিত কোনও একটি কক্ষে অস্ত্রটিকে রাখিয়া দৃষ্টির অন্তরাল করিয়া দিবেন। কিন্তু খড়্গাটিকে তিনি নামাইতে পারিলেন না,—বড় ভারী। ভয়ে ভয়ে তিনি হাতটা টানিয়া লইলেন, হঠাৎ হাত টানিয়া লওয়ায় খড়্গাটি দুলিয়া

দেওয়ালের গায়ে আহত হইয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ করিয়া উঠিল। সে শব্দে উমারাণী জাগিয়া উঠিলেন। উঠিয়া দেখেন যে হরিহর একদৃষ্টে বিস্ফারিত নেত্রে খড়্গাটির প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন।

তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কি হল এত রাত্রে ?"

হরিহর উত্তর না দিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে তাকাইলেন। উমারাণী একটু শঙ্কিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া স্বামীর নিকটবর্ত্তী হইয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "কি গো, কি হয়েছে ?"

হরিহর এইবার অস্ফুটস্বরে বলিলেন "এই খাঁড়াটাকে সরাতে চাই।"

উমারাণী বুঝিতে পারিলেন না—"কেন ?"

হরিহর একটু থামিয়া একনিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলেন, "আমার ভাল লাগে না, ওটাকে অন্য কোথাও রাখ্‌তে হবে"—

উমারাণী বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, "ওমা সে কি কথা! ও যে শুভ জিনিষ, ওটাকে ভাল লাগে না কেন ?"

হরিহর আবার একটু থামিয়া বলিলেন, "ওটার দিকে তাকালেই মনে হয় যেন এখনও ওর গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। কত নরবলি ওটা দিয়ে হয়েছে বল ত—কত পাপ"—

উমারাণী হাসিয়া উঠিলেন—"ওঃ ভুলেই গিয়েছিলুম যে তুমি আবার বৈষ্ণব।"

হরিহর উত্তর দিলেন না, শুধু একবার খড়্গাটির দিকে ফিরিয়া তাকাইলেন। দীপালোকে খড়্গাটির শাণিত ফলকাগ্র।

উমারাণী তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আবার দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বেশ ত ওটাকে কাল সকালে না হয় কালী মন্দিরে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করব, এত রাত্তিরে কি করি বল ?"

হরিহর কিছু না বলিয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। তাঁহার একটু লজ্জাবোধ হইল। ছিঃ, উমারাণী হয়ত তাঁহাকে কাপুরুষ ভাবিল, কিন্তু কি করিবেন, ঐ অস্ত্রটিকে দেখিলেই কেমন যেন একটা ভয়ের ভাব মনে উদিত হয়। বংশের উহা একটি সম্পদ তিনি তাহা বিশ্বাস করেন, কিন্তু, উহার প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই উহার সমস্ত রক্তাক্ত ইতিহাস যেন পুনরুজ্জীবিত হইয়া তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে একটি বিভীষিকাময় দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়। তিনি যেন দেখিতে

পান রক্তাম্বর-ভূষিত রুদ্রকায় প্রপিতামহ রুদ্রকান্ত, বিংশতি নরশোণিত-সিক্ত ঐ শাণিত, বিরাট, খড়্গ হস্তে করালবদনা কালীমূর্ত্তির সম্মুখে রক্তস্নাত হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া, জলদ গম্ভীর স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন,—"বরং দেহি মে দেবী", মনে হয় যেন কোনও এক বিশালবাহুধৃত হইয়া ঐ খড়্গটি তাঁহার স্কন্ধের উপরে ঝুলিতেছে।

সাধারণতঃ হরিহর অতি প্রত্যুষেই শয্যাত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু মধ্যরাত্রে একবার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে পরদিন একটু দেরী করিয়াই তিনি জাগিলেন। জাগিয়া দেখিলেন উমারাণী শয্যায় নাই; বোধ হয় ততক্ষণে তাঁহার সন্ধ্যাপূজা সমাপ্ত হইয়াছে। পার্শ্বস্থিত কক্ষে পুত্রকন্যারা কোলাহল করিতেছিল। গত রাত্রির ঘটনা সহসা মনে পড়িয়া যাওয়াতে দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে খড়্গটি নাই। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। পশ্চিমের জানালা দিয়া এক ঝলক রৌদ্র কক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহার মনটা অকারণ খুশীতে ভরিয়া উঠিল। তিনি গুণ গুণ করিয়া গান ধরিলেন, "সজনী, ভাল করি পেখন না ভেল"—কিন্তু সবে যখন তিনি 'সজনী' বলিয়া একটু গলাটা খেলাইতে গেলেন, সেই সময় কক্ষে প্রবেশ করিলেন উমারাণী। স্বামীকে তদবস্থায় দেখিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, "সেকি! তোমার আহ্নিক পূজা এখনও শেষ হয় নি!—নায়েব মশাই এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন। রায়পুরের গোমস্তা নাকি ঘণ্টাখানেক ধরে জরুরী খবর নিয়ে এসেছে"—

হরিহর সচেতন হইয়া উঠিলেন। রায়পুরের প্রজারা কয়েকদিন হইল খাজনা দিবে না বলিয়া দলবদ্ধ হইতেছে। উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অনাবৃষ্টির ফলে তাহাদের খাজনা দিবার সামর্থ্য নাই এই তাহাদের অভিযোগ। হরিহর শতকরা দশটাকা করিয়া খাজনা মাফ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে প্রজারা কি বলিয়াছে তাহারই সংবাদ লইয়া বোধহয় গোমস্তা আসিয়াছে। হরিহর উঠিয়া বসিলেন।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আহ্নিকাদি সারিয়া কাছারীঘরে গিয়া বসিলে পর বৃদ্ধ নায়েব রায়পুরের গোমস্তা তারিণীকে আগাইয়া দিল। তারিণী যাহা বলিল তাহার মর্ম্ম এই যে গত তিনচার দিন যাবৎ প্রজারা বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ

করিয়াছে। দলের নেতা রামকান্ত মণ্ডল, পরাণ মুখুজ্জে, অবিনাশ দত্ত প্রভৃতি ও তাহাদের সহায় বাগ্দীর দল। তাহারা একবাক্যে বলিয়াছে যে তাহাদের খাজানা দিবার কোনও উপায় নাই। জমিদার মা বাপ সুতরাং এ যাত্রা মাফ্ করিতে হইবে।

হরিহর সমস্ত শুনিয়া, শুধু বলিলেন, "হুঁ।"

বৃদ্ধ নায়েব চশমার ফাঁক দিয়া একবার তাকাইল। সে দুই পুরুষ ধরিয়া নায়েব সরকারে কাজ করিতেছে। হরিহরের পিতা গৌরীকান্তের আমলে সে হাতে খড়ি দিয়াছে। প্রজারা তখনকার দিনে টুঁ শব্দটি করিতে পারিত না, এমনি কড়া মেজাজী লোক ছিলেন গৌরীকান্ত। হরিহরের উপর তাহার তেমন আস্থা নাই, হয়ত, সব খাজানা কাঁদুনীর ফলে মাফই করিয়া দিবেন। কিন্তু, গৌরীকান্তের সময়ে একবার কাজরাঙ্গা গ্রামের প্রজারা এম্নি দল পাকাইয়াছিল বলিয়া তিনি যে কঠোর ব্যবস্থার অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে কথা ভাবিয়া আজও পর্য্যন্ত নায়েব মনে মনে প্রশংসায় শতমুখ হইয়া উঠে।

হরিহর প্রশ্ন করিলেন, "কাকাবাবু, আপনার কি মত?"

নায়েব হাসিয়া উত্তর দিল, "এর আবার মতামত কি বাবাজী; প্রজার কথা মত কাজ করতে গেলে কি আর জমিদারী চলে?"

তারিণী মাঝে বলিয়া উঠিল—"কত্তা, সত্যি সত্যি—"

নায়েব তাহাকে ধমক দিল—"আঃ, তুমি থাম না বাপু। এ সব ত নিত্যকার ঘটনা, ও জমিদারী থাক্‌লে হবেই। আর প্রত্যেক বছরেই একটা না একটা অজুহাতে খাজ্‌না মাফ করলে তো জমিদারী নিলামে চড়াতে হবে—হেঃ—"

হরিহর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু, আপনার আসল মতটা কি?"

নায়েব ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, "বাবাজী, ও মাফ্‌টাফ্ আমার মতে না করাই ভাল, একবার করলে জো পেয়ে বস্‌বে।"

হরিহর একমুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া মাথা নাড়িলেন, "না, সেটা করা ভাল হবে না—", পরে তারিণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওদের গিয়ে বলো যে শতকরা পঁচিশ টাকা মাফ্ করে দিলুম। আর যেন গণ্ডগোল না করে।"

নায়েব অপ্রসন্নমুখে নীরব রহিয়া গেল। তারিণী কিছুক্ষণ পরে রায়পুরের

দিকে অগ্রসর হইল। আরও কতকগুলি কাজ সমাপ্ত করিয়া হরিহর উঠিয়া পড়িলেন, কিন্তু কাছারীঘর হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একটু অগ্রসর হইতেই নায়েবের কয়েকটা কথা কানে যাওয়ায় থমকিয়া দাঁড়াইয়া চোরের মত কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন।

নায়েব তখন সরকারকে বলিতেছিল, "বুঝ্‌লে চরণ, বাবাজীর বাপ গৌরীকান্ত ছিলেন শিবের অবতার ; ভালমানুষ ত ভালমানুষ, কিন্তু রাগ্‌লে কার বাবার সাধ্যি ঠাণ্ডা করে। একবার কাজরাঙ্গার প্রজারা এম্‌নিতরো জোট পাকিয়েছিল ; গৌরীকান্ত তিনবার বলে পাঠালেন যে কিছু খাজ্‌না মাফ্ হয়ে যাবে। কিন্তু, কে কার কথা শোনে। তারপরে একদিন দেখা গেল যে দলের চারজন লোক একেবারে—", কি একটা কথা আরও বলিয়াই নায়েব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হরিহর কথাগুলি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন একটু ; নায়েবের কথাগুলির মধ্যে যে ইঙ্গিতটা লুক্কায়িত ছিল, তাহা যেন তাহাকে সপাং করিয়া কষাঘাত করিল। খুন করিবেন তিনি !

নায়েব তখনও বলিতেছিল, "তারপরেই বুঝ্‌লে, ব্যাটারা ত একেবারে কন্ধকাটা হয়ে পড়ল, তখন আর যায় কোথায়, সুড়সুড় করে যে যার খাজ্‌না দিয়ে গেল। শাসন মানেই বলের প্রকাশ, দয়ামায়া করলে কি আর চলে—হেঃ—"

চরণ উত্তরে কি বলিল শোনা গেল না। কিন্তু, হরিহর কথাগুলি শুনিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। কাপুরুষতা ও অক্ষমতার যে ইঙ্গিতটা এবারে হইল তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে হরিহরের মস্তিষ্কে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। তিনি আর যাই হউন না কেন, কাপুরুষ নন। বংশের অন্যান্য জমীদারদের যে ক্ষমতা ছিল, তাঁহার তাহা অপেক্ষা একতিল কম নাই, কিন্তু তিনি রক্তপাত ঘৃণা করেন ; বৈষ্ণবাচার তাঁহাকে মানুষকে ভালবাসিতে বলে। কিন্তু যুক্তিতর্কে তিনি মনঃস্থির করিতে পারিলেন না, দ্রুতপদে কাছারী ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়াই আবার থামিয়া গেলেন। নিজেকে সংযত করিয়া লইতে লইতে মনে মনে স্থির করিলেন তাঁহারও যে ক্ষমতা আছে তাহার পরিচয় একদিন সুযোগ মত দেওয়া যাইবে।

দিন তিনেক কাটিয়া গেল।

সেদিন ভোর বেলায় হরিহর একটা ভয়াবহ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাঘোরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন। কুয়াশার মত মনের মধ্যে সে স্বপ্ন এখনও কুণ্ডলায়িত হইয়া রহিয়াছে। সেই খড়্গ, যাহার কথা হরিহর প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছিলেন তাহা যেন কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত করিল ; তাঁহার ছিন্ন কবন্ধের উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত রক্তধারা যেন তাঁহার ছিন্নমুণ্ডের ভয়ার্ত্ত মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত করিয়া তুলিল।

হরিহর প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পূজাধ্যান করিলেন। স্বপ্নদৃশ্যটা যেন একটা অশুচির মত তাঁহার দেহ মনকে বারংবার শিহরিত ও সঙ্কুচিত করিতেছিল। অবশেষে পূজা সারিয়া যখন তিনি বাহির হইলেন, তখন মনটা যদিও অনেকটা হাল্কা ও পবিত্র বোধ হইতেছিল তবুও কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। কি যেন একটা দুর্ঘটনা ঘটিবে, স্বপ্নে যেন তাহারই গূঢ় ইঙ্গিত।

কিছুক্ষণ পরে কাছারী ঘরে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নায়েব মাথা নাড়িয়া বলিল, "বলেছিলুম না বাবাজী, শক্ত না হলে কাজ চলে না! শোন এবার সব তারিণীর মুখে—"

হরিহর আসন গ্রহণ করিলে পর তারিণী আগাইয়া আসিল। তাহার চক্ষু মুখ উৎকণ্ঠায় শুষ্ক, রুক্ষ কেশ। একটু গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া সে বলিল—"হুজুর! দিন তিনেক ধরে রামকান্ত, অবিনাশ দত্ত আর বাগ্দীরা দল পাকাচ্ছে, তোড়জোড় করছে। আমাকে পরশুদিন পরাণ মুখুজ্জে বলে গেল—'সামর্থ্য থাক্‌লে কে না দেয় গোমস্তা। জমীদারকে বলো—খাজ্‌না আমরা দিতে পারব না। আমাদের কথা তো তিনি শুন্‌লেনও না, শুনবেনও না ; দেখা করতে গিয়েছিলুম, কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—, তারপর কাল রাত্তির থেকে বাগ্দীগুলো সব ধেনো টেনে আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়, চীৎকার করে। গতিক বড় সুবিধের নয় কত্তা, আমি ত বৌ আর ছেলেদের শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি ; আমার উপর ছোটলোকের দল একেবারে খাপ্পা হয়ে রয়েছে—" সমস্ত কথা বলিয়া তারিণী অসহায় ভাবে হরিহরের মুখের দিকে তাকাইল।

হরিহর সব শুনিলেন, শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নায়েব অল্প হাসিয়া

বলিল, "বলেছিলুম না বাবাজী যে কালসাপের জাতকে না থেঁতোলে শায়েস্তা হয় না। সেদিন ত রাগ করেছিলে"—

নায়েবের এই উক্তি আর হাসি এক মুহূর্ত্তে হরিহরের মাথায় আগুন জ্বালাইয়া দিল। সমস্ত সংযমের বাঁধ হঠাৎ নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল, বিবেক, ধর্ম্ম তুচ্ছ মনে হইতে লাগিল। শাসকের যে উত্তপ্ত রক্তপ্রবাহ তাঁহার দেহে চলাচল করিতেছে, তাহা যেন মুহূর্ত্তমধ্যে বন্যার স্রোতের মত উদ্দাম ও প্রখর হইয়া উঠিল।

হঠাৎ তিনি নায়েবকে প্রশ্ন করিলেন, "কাকাবাবু, বাবার বন্দুকটা কি হল?"

নায়েব হাসিল—"সে কি আর আছে বাবাজী, মরচে ধরে নষ্ট হয়ে গেছে।"

হরিহর বলিলেন, "আজকে আমি কলকাতায় যাব কাকাবাবু, বন্দুক কিন্‌তে।"

নায়েব বিস্মিত হইয়া গেল,—"বন্দুক কিন্‌বে? তুমি বৈষ্ণব মানুষ! হাঃ হাঃ হাঃ, হ্যাঁ, বন্দুক চালাত বটে তোমার বাবা; উঃ, কি হাতের নিশানা—"

হরিহর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, পরপর নায়েবের এই উক্তি তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। পাশবালিশটাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"কাকাবাবু ভুলবেন না আমি আমার বাবারই ছেলে—"

নায়েব অকস্মাৎ এই প্রচণ্ড রূঢ়তায় একটু থতমত খাইয়া আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কিছু বলিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হরিহর তারিণীর দিকে তাকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "প্রজাদের গিয়ে বলো তারিণী, উত্তর আমি পরে পাঠাবো—"

সন্ধ্যার সময় হরিহর নায়েবকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। যাওয়ার আগে উমারাণী প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ কল্‌কাতায় কেন?"

হরিহর একটু ইতস্ততঃ করিতে করিতে বলিলেন, "যাচ্ছি জমিদারীর কাজে"। উমারাণী একটু বিস্মিতা হইয়াছিলেন, "এখন আবার কি কাজ?"

হরিহর উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন—"মেয়েমানুষের সব খবরে কি দরকার, এ্যঁা?"—

দিন দশেক পরে হরিহর একদিন প্রত্যুষে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে লইয়া আসিলেন একটি ঝক্‌ঝকে দো'নলা বন্দুক ও একশত কার্ত্তুজ। উমারাণী দেখিয়া, হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এ আবার কি খেলা গো ?"

হরিহর পরুষ কণ্ঠে নাটকীয়ভাবে উত্তর দিলেন, "এ খেলার অর্থ তুমি বুঝ্‌বে না গৃহিণী—বুঝ্‌বে দুর্বিনীত অবাধ্য প্রজারা—"

উমারাণী শুধু নিঃশব্দে হাসিলেন।

ইহার পরের ইতিহাস একটু অভিনব।

হরিহরের আহ্নিক পূজায় বসিতে বিলম্ব হয়। কোনও রকমে পূজা সারিয়াই উঠিয়া পড়েন। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ করিয়াই বন্দুক কাঁধে ঘোড়ায় চড়িয়া পড়েন; বর্ষার কাদা ভাঙ্গিয়া চাঁদপুরের বিলের দিকে অগ্রসর হন। নিস্তব্ধ প্রান্তর কম্পিত করিয়া তিনি বন্দুক ছুঁড়েন এবং প্রায়ই একটি দুইটি পাখী শিকার করেন। যখন উড্ডীয়মান পাখীগুলি ঘুরপাক খাইতে খাইতে রক্তাক্ত দেহে ভূতলে পড়ে, তখন একটা অদ্ভুত পাশব আনন্দে দেহটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, বারুদের গন্ধে কেমন যেন নেশা লাগে।

সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া উজ্জ্বল দীপালোকে স্বহস্তে, বন্দুকের মসৃণ, ঝক্‌ঝকে নল দুইটি পরিষ্কার করেন।

একদিন উমারাণী দেখিয়া বলিলেন, "তোমার বুড়োবয়েসে ভীমরতী হল নাকি ? বন্দুক নিয়ে কি ছেলেমান্‌ষী করছ বল ত"—

হরিহর কোনও উত্তর না দিয়া ভ্রূকুটি করিয়া চলিয়া গেলেন। কাছারীঘরে গিয়া নায়েবকে বলিলেন, "রায়পুরে এবার খবর পাঠিয়ে দিন কাকাবাবু। যতটুকু মাফ্‌ করেছি, তার বেশী আর মাফ্‌ করব না—এক কপর্দ্দকও না। দু'সপ্তাহের মধ্যে খাজনা চাই-ই, নইলে—যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা আমি করব।"

সেদিন বিশ্বনাথ বন্দুকটা হাতে লইয়া সাশ্চর্য্য নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এমন সময় হরিহরের হাতে ধরা পড়িয়া গেল।

হরিহর তাহার কান ধরিয়া টানিলেন—"কি হচ্ছে রে পাজী ?"

বিশ্বনাথ কাঁদিয়া ফেলিল, হরিহর গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"খবরদার, বন্দুকে হাত দিবি ত' হাত ভেঙ্গে দেব।"

উমারাণী গর্জ্জন শুনিয়া সেখানে আসিলেন, তিনি বলিলেন, "না হয় বন্দুকটা ধরেছেই একটু, তাতে হয়েছে কি যে মারলে ?"

হরিহর অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি যা করি, তার ওপর কথা বলবার মত সাহস তোমার কম থাকাটাই ভাল ; এটা মনে রেখো।"

উমারাণী স্বামীর মুখে জীবনে এমন কটুকথা শুনেন নাই।

হরিহর বন্দুক কিনিবার পর হইতেই অস্ত্রটিকে শিয়রে রাখিয়া নিদ্রা যান। একটা অহেতুক ভয় তাঁহাকে সব সময়েই বন্দুকটার উপরে নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছে। সেইদিনই মধ্যরাত্রে হঠাৎ কি একটা শব্দে, উমারাণী জাগিয়া বাতিটা জ্বালাইতে গেলেন। অন্ধকারে বাতিটা খুঁজিতে গিয়া একটা ছোট টিপয় পড়িয়া গেল,—সে শব্দে হরিহর হঠাৎ জাগিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বন্দুকটি তুলিয়া ধরিলেন। অন্ধকারের মধ্যে এক পা অগ্রসর হইয়া কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কে—এক পা এগিয়েছ কি মরেছ—কে ?"

উমারাণী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "বলি আর কত ঢং করবে শুনি ; কর না গুলি,—মাগো, ভয়ে বুকটা কাঁপ্‌ছে।"

হরিহর অন্ধকারে লজ্জায় জিভ্‌ কাটিলেন।

পরের দিন সকালবেলায় তিনি বাহিরের বাগানে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে ছিন্ন বস্ত্রে, কর্দ্দমাক্ত দেহে ও রক্তাক্ত মস্তকে তারিণী ঘোড়ায় চড়িয়া উপস্থিত হইল।

হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া সে কাছারীঘরে আগুন লাগানোর কথা, তাহাকে প্রহার করার কথা যখন শেষ করিল, তখন হরিহরের দেহ, মন ক্রোধে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্‌ হইয়া যাইতেছিল। পূর্ব্বপুরুষদের উদ্ধত রক্তস্রোত কি যেন দাবী করিতে লাগিল, ঝক্‌ঝকে বন্দুকটার কথাও সাথে সাথে সাপের মত মাথায় কিলবিল করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

একঘণ্টা পরে, বন্দুক কাঁধে ধব্‌ধবে সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া বাগ্দী সর্দ্দার শ্রীমন্তকে লইয়া তিনি রায়পুরের দিকে ছুটিলেন। লোকজন লইয়া নায়েব সঙ্গে যাইতে চাহিল কিন্তু তিনি যাইতে দিলেন না। আজ হঠাৎ তাঁহার খেয়াল চাপিল যে তিনি একাকী যাইয়াই উদ্ধত প্রজাদের পদানত ও শান্ত করিবেন।

ঘণ্টা দুয়েক পরে যখন রায়পুরে গিয়া পৌঁছাইলেন তখন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা। কাছারীঘরের দিকে তিনি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন ভস্মস্তূপের রাশি। তাঁহার সাময়িক বাসের জন্য যে বাড়ীটি ছিল, তাহা ঠিকই আছে। সেইদিকে যাইতেই তিনি দেখিতে পাইলেন,—পরাণ মুখুজ্জ্যে, অবিনাশ দত্ত, রামকান্ত মণ্ডল, কালী বাগ্দী ও আরও জনদশেক লোক জটলা পাকাইতেছে। অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত অভিনব হইল হরিহরের এই উপস্থিতি। তাঁহাকে দেখিয়া সকলের গুঞ্জনধ্বনি মুহূর্ত্ত মধ্যে থামিয়া গেল, সম্মোহিত অবস্থায় মিনিটখানেক কাটিবার পর সকলেই ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া প্রণাম জানাইল। সকলেরই চোখে মুখে একটা বিদ্রোহী গাম্ভীর্য্য।

হরিহর ঘোড়া হইতে নামিলে পর শ্রীমন্ত ঘোড়া দুইটিকে গাছের গুঁড়িতে বাঁধিল।

হরিহর শ্রীমন্তকে আদেশ করিলেন, "যা, তারাপদ আর পুরুতঠাকুরকে গিয়ে খবর দেগে আর তাড়াতাড়ি চাবিটা নিয়ে এসে ঘরের দরজা খুলে দে।"

শ্রীমন্ত চলিয়া গেল, কাঁধ হইতে বন্দুক নামাইয়া তিনি বাড়ীর দাওয়ায় গিয়া বসিলেন। সামনের একটি গাছের ডালে একটি পাখী বসিয়া ডাকিতেছিল, হরিহর তাহা দেখিয়া বন্দুকে গুলি ভরিলেন; সকলে বিস্ফারিত নেত্রে নিঃশব্দে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। পাখীটি ডানা ঝট্‌পট্ করিয়া ক্ষীণ আর্ত্তনাদে একমিনিট পরেই মাটিতে পড়িয়া গেল। একবার পাখীটির দিকে তাকাইয়া তিনি বন্দুকের নলে ফুঁ দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়া দিলেন, পরে ধীরে ধীরে সমবেত লোকদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিলেন; সকলে সে দৃষ্টির সম্মুখে সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আপনাদের কি ঠিক হল? আজ এই বাড়ীটাতে আগুন লাগাবেন আর আমার মাথা ফাটাবেন বুঝি?"

অবিনাশ দত্ত আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আজ্ঞে—আমরা ত কিছুই জানি না—সকাল বেলায় দেখি এই ব্যাপার—"

হরিহর অতি কষ্টে ক্রোধ দমন করিলেন,—"মিথ্যাবাদীর সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশী,—যাক্ সে কথা, আপনাদের আমি আজ নিজে এই জিজ্ঞেস করতে এসেছি, আপনাদের কি ঠিক হল? খাজনা কবে দিচ্ছেন? আর কাছারীঘরে

আগুন লাগানো, তারিণীকে মারধর করার কি অর্থ ?—জেনে রাখুন, সুদ আর আসল, আমি দুই-ই আদায় করব, ছাড়ব না কিছুই। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর নয় ; আপনারাও আর সাপ নিয়ে খেলবেন না।” একটু থামিয়া আবার ধীরে ধীরে বলিলেন—“আমার মত আমি জানালাম, এবার আপনাদেরটা।”

রামকান্ত আগাইয়া আসিয়া বলিল, “রাগ না করে আমাদের অবস্থাটা একবার বিচার করুন কর্ত্তা। দু'দুবারের অনাবৃষ্টি আমাদের একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করেছে—”

হরিহর উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, “তর্কের দরকার নেই মোড়লের পো, আমি সব জানি। খাজ্না আমার চাই-ই চাই, যে রকম করেই হোক—”। সকলে চুপ করিয়া রহিল, নিজেদের মধ্যে একটু দূরে গিয়া কি বলাবলি করিল ; পরে পরাণ মুখুজ্জ্যে বলিল—“যদি বিকেল পর্য্যন্ত সময় দেন তো আমাদের মতটা—”

হরিহর আবার ক্রোধ দমন করিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার ক্রোধের মাত্রা বাড়িয়া যাইতেছিল।

তিনি বলিলেন, “আচ্ছা।”

সকলে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, কেবল রহিয়া গেল কালী বাগ্দী।

হরিহর প্রশ্ন করিলেন—“তুই কি চাস ?”

কালী বাগ্দী হাতজোড় করিয়া ধরা গলায় বলিল, “কালকের ব্যাপারের জন্যে মাফ্ চাইছি কর্ত্তা—আমায় শাস্তি দিন ; কিন্তু সত্যি বল্ছি খাজ্না দেবার মত সামর্থ্য আমাদের নেই। একেবারেই নেই।—দত্ত, মুখুজ্যেরা দিতে পারে হয়ত কিন্তু আমরা একেবারে মরে আছি—”

হরিহর ক্ষমা করিতেন কিন্তু কল্যকার ব্যাপারের পর আর হয় না—তিনি মাথা নাড়িলেন, “আর হয় না—না।”

কালী বাগ্দী স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “তাহলে এই আপনার শেষ কথা ?”

“হ্যাঁ।”

“ভাল করলেন না কিন্তু হুজুর গরীবের উপর এই অত্যাচার করে”। হরিহর

তাহাকে আর কথা বলিতে দিলেন না। সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিলেন, "মুখ সাম্‌লে শুয়ারের বাচ্ছা—"

কালী বাগ্দী হাসিল—"গালই দিন আর যাই করুন, আপনার যেমন সহ্যের সীমা আছে আমাদেরও তা আছে এটা মনে রাখ্‌বেন।"

হরিহর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"এখান থেকে চলে না গেলে গুলি করব বলে দিচ্ছি—"

কালী বাগ্দী আর একবার উপেক্ষার হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।—

হরিহর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবিতে লাগিলেন।

বৈকাল কাটিয়া গেল, কিন্তু দত্ত, মুখুজ্জ্যে প্রভৃতি কেহই আসিল না। আজই যাহা হউক একটা হেস্তনেস্ত করিয়া তিনি বাড়ী ফিরিবেন, ইহাই ছিল হরিহরের ইচ্ছা এবং তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে প্রজারা মাথা নোয়াইবে; কারণ, এরূপ ঘটনা অন্যত্র বহু ঘটিয়াছে। অন্যথায় কোর্টের ডিক্রী ত আছেই। সময় কাটিতে লাগিল, কিন্তু কেহই আসিল না।

বন্দুকটা হাতে লইয়া হরিহর নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে পূবের আকাশ অন্ধকার করিয়া শ্রাবণের ঘন মেঘ সগর্জ্জনে অগ্রসর হইতে লাগিল। এবং একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি নামিল।

শ্রীমন্ত প্রশ্ন করিল, "হুজুর, বাড়ী ফিরলেন না?"

হরিহর মাথা নাড়িলেন, "না, আজকে আর ফিরব না। দেখা যাক্ ওদের দৌড়টা কাল পর্য্যন্ত—"

শ্রীমন্ত উস্‌খুস্ করিয়া বলিল, "কিন্তু, গেলেই ভাল করতেন।"

হরিহর ব্যঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেন রে, ভয় করছে নাকি?"

অবরুদ্ধ গর্জ্জনে লাঠি হাতে বুক ফুলাইয়া শ্রীমন্ত দাঁড়াইল। ঝাড় লণ্ঠনের কম্পমান আলোকে অতিকায় শ্রীমন্তের ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল, স্ফীত নাসারন্ধ্র ও বাঘের মত জ্বলন্ত চক্ষু।

"ভয় হুজুর। কিন্তু কাকে?"—শ্রীমন্ত অল্প একটু হাসিল।

হরিহরও সে হাসি দেখিয়া হাসিলেন।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল।

বাড়ীটি দ্বিতল নহে। তিনটি মাত্র কক্ষ। মাঝের কক্ষের এক পার্শ্বে

হরিহর পালঙ্কে শয়ন করিলেন, পালঙ্কের নিকটবর্ত্তী জানালাটা শ্রীমন্ত বন্ধ করিয়া দিয়া মাটিতে শয়ন করিল। কিন্তু কক্ষের উত্তর পার্শ্বের জানালাটা খোলা রাখিয়া ও সেখানে একটি মশারী টাঙ্গাইয়া সে এক কারসাজী করিল, অবশ্য হরিহর নিদ্রিত হওয়ার পর। সে অনেক প্রজাবিদ্রোহের কাহিনী জানে, তাই এই সতর্কতা অবলম্বন করিল।

বৃষ্টি আর বাতাসের বেগ বাড়িয়া চলিল। মাঝে মাঝে মেঘ গর্জ্জন আর দীপ্ত বিত্যুতের বিসর্পিল ভ্রূকুটি। জনমানবের, লোকালয়ের অস্তিত্ব যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তুই মিনিট হাঁটিলেই ভৈরব নদ, তাহারই কূল ভাঙ্গার আর প্রবল জলধারার শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।

তখন প্রায় মধ্য রাত্রি। ঠন্ করিয়া শব্দ হওয়ায় হরিহর ও শ্রীমন্ত উভয়েই জাগ্রত হইয়া পড়িল। শ্রীমন্ত টর্চ্চ জ্বালিতে দেখা গেল যে একটি বর্শা উত্তরের শূন্য মশারীটাকে বিদ্ধ করিয়া মেঝেতে পড়িয়া রহিয়াছে। শ্রীমন্ত কোণ হইতে একটা সড়কি তুলিয়া লইয়া হঠাৎ দরজা খুলিয়া ফেলিল, হরিহরও বন্দুক তুলিয়া লইলেন। দরজা খোলার সঙ্গেই তুই তিনটা ছায়ামূর্ত্তি উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পার্শ্বের জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে হরিহরের সমস্ত চেতনা একটা উন্মাদ আগ্রহে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। টর্চ্চের আলোতে ঝোপের মধ্য দিয়া একটা ধাবমান সাদা কাপড়ের অংশ দেখিতে পাওয়া গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষণধারামুখর অন্ধকার রাত্রি বিক্ষুব্ধ করিয়া আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জনতলে একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ মুহূর্ত্তের জন্য উত্থিত হইয়া পরমুহূর্ত্তেই বর্ষণের শব্দের মধ্যে মিলাইয়া গেল। একটা নৃশংস আনন্দের পাশবিক আত্মপ্রকাশে হরিহর কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি ছুটিয়া অগ্রসর হইলেন, পশ্চাদনুসরণ করিল শ্রীমন্ত।

টর্চ্চের আলোতে আবিষ্কৃত হইল একটি মৃতদেহ মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হরিহর শবটার চুলের ঝুঁটি ধরিয়া উঠাইলে দেখিলেন কালী বাগ্দী। মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া গুলি যাওয়াতে রক্তমিশ্রিত ঘিলু গড়াইয়া পড়িতেছিল—হাতে একটু লাগিয়া গেল। শ্রীমন্তের চক্ষু শকুনির মত একবার জ্বলিয়া উঠিল, হরিহর তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া দেখিতে লাগিলেন। বৃষ্টিতে দেহ সিক্ত হইয়া গেল,

তবু ভ্রূক্ষেপ নাই। পূর্ব্বপুরুষদের যে শোণিত-পিপাসা তাঁহার দেহে লুক্কায়িত ছিল, তাহা আজ এতদিনে মুক্তিলাভ করিয়া শিরায় শিরায় উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খলতায় বেড়াইতে লাগিল।

কালী বাগ্দীর চুলের ঝুঁটি নাড়িয়া, সেই শবদেহের বিস্ফারিত নেত্রের উপর থুথু ফেলিয়া অশ্লীল গালি দিয়া বলিলেন, "শালা—মাম্‌দোবাজী আমার সঙ্গে"—

শ্রীমন্ত বলিল—"কত্তা—লাস তাড়াতাড়ি না সরালে মুস্কিল হবে কিন্তু"—

হরিহর তাহার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"তোর জাতভাইকে মারলাম কিন্তু ছিমন্ত"—

শ্রীমন্ত ধীরে ধীরে বলিল—"মনিবের শত্রু আমারও শত্রু কত্তা"। হরিহর মাথা নাড়িলেন।

শ্রীমন্ত আবার বলিল "লাস কিন্তু তাড়াতাড়ি সরাতে হবে কত্তা—দেরী করলে জানাজানি হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ একে কাঁধে করে নিয়ে ভৈরব নদীতে ডোবাবার ব্যবস্থা কর, কিন্তু এই রক্ত ?"—

শ্রীমন্ত বলিল, "সে আমি ঠিক করে দিচ্ছি—কিন্তু, লাসটা অন্ততঃ কয়েক মাইল দূরে ফেললে হত"—

হরিহর মাথা নাড়িলেন—"হ্যাঁ, ভাল হত, কিন্তু নৌকো পাওয়া গেলে ত।"

পরে স্বরটা নীচু ও গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"কিন্তু মনে রাখিস লাস যেন না ভেসে ওঠে।"

অন্ধকারে প্রেতের মত দাঁড়াইয়া মিশকালো শ্রীমন্ত ঝাঁক্ড়া ঝাঁক্ড়া বাব্‌রি চুল নাড়িয়া জানাইল, সে মনে রাখিবে।

কিছুক্ষণ পরে শ্রীমন্ত লাস কাঁধে ভৈরবের তীরে উপস্থিত হইল, বিদ্যুতালোকে দেখা গেল বর্ষার ভৈরবের মত্ত অজগরের মত দুরন্ত উল্লাস। টর্চ্চের আলোতে দূরে একটা অর্দ্ধজলমগ্ন ডিঙ্গি বাঁধা অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গেল, তাহার দড়ি কাটিয়া ফেলিয়া, জল ফেলিয়া দিয়া তাহার মধ্যে শ্রীমন্ত লাস ফেলিয়া চড়িল—মুহূর্ত্ত মধ্যে ডিঙ্গিটা ঘুর্ণাবর্ত্তে একটা প্রচণ্ড ঘুরপাক খাইয়াই তীব্রবেগে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল।

হরিহর অন্ধকারে কাদা ঠেলিয়া, কাঁটা ভাঙ্গিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া নদী হইতে বাড়ীতে ফিরিলেন, কিন্তু অন্ধকারের ভিতরে কেমন যেন একটা মৌনতা, হরিহর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। অকস্মাৎ মনে হইল, উমারাণীর সহিত এই দুর্য্যোগময়ী রাত্রে দেখা করিতে হইবে; আজ তাঁহার লভ্য বিজয়ীর প্রেম। সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশা ছিন্ন করিয়া যেমন সূর্য্যালোক প্রকাশিত হয়, তেম্নিভাবে মনের অন্তস্তলে যে খড়্গাটির কথা বিস্মৃতির আবরণে বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহা আবার বাহির হইয়া আসিল, ইচ্ছা হইল বাড়ীতে গিয়া খড়্গাটিকে দেখিতে হইবে, কালীমন্দিরে প্রণাম করিতে হইবে।

বন্দুক কাঁধে তিনি ছুটিলেন। অন্ধকারের ভিতর তাঁহার ধবধবে সাদা ঘোড়াকেও দেখা যায় না। অরণ্যের স্তব্ধতা, বৃষ্টির সঙ্গীত, আর বর্ষার রাত্রি ভেদ করিয়া তিনি উড়িয়া চলিলেন। বারুদের আর রক্তের গন্ধ যেন কোথা হইতে আসিতেছে, রক্ত পান করিবার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবারভাবে তাঁহার মনকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। হরিহর ছুটিলেন, ধব্ধবে সাদা ঘোড়ার মুখ হইতে ফেনা বাহির হইয়া জলে ও ঘামে এক হইয়া গেল, তবু তিনি ছুটিলেন—দুর্য্যোগের রাত্রে শত্রু-বিজয়ী বীরের মত দম্ভ ও দর্প লইয়া। বাতাসের বেগ, বিদ্যুতের প্রকাশ ও মেঘ গর্জ্জনের তালে তাল মিলাইয়া তিনি ঘোড়া ছুটাইয়া চলিলেন—চলিলেন—চলিলেন—

শ্রীনবেন্দুভূষণ ঘোষ

দেশ-বিদেশ

ম্যুনিক ব্যবস্থার কৃতিত্বে যাঁদের ব্যগ্র বিশ্বাস ছিল তাঁরা সম্ভবত এখন ভীতিচকিত হয়ে উঠেছেন। তাঁদের মানসিক উদ্বেগের কারণ তাঁরা নিজেই। তার জন্য হিটলারকে দায়ী করা অন্যায় হবে। প্রবঞ্চকের ব্যবসাই হ'ল প্রতারণা করা। যাঁরা বিশ্বাস করতে চান যে শঠ ও দস্যু স্বেচ্ছায় নীতি-বন্ধনের মাহাত্ম্য মেনে নেবে তাঁদের অনুযোগ করার কিছু থাকে না। হিটলারের আচরণে মিষ্টার চেম্বারলেনের বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ খেদোক্তির কোন অর্থ নেই।

চেম্বারলেন যে ইচ্ছা করেই এবং অভিপ্রায়পূর্ব্বক মধ্য ইয়োরোপে নাৎসি শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেকোশ্লোভাকিয়াকে নির্ম্মমভাবে বলি দিয়েছেন তাতে সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। এখন হিটলারের বাড়াবাড়ি যখন চেম্বারলেনী সঙ্গতিরও সীমা লঙ্ঘন করছে তখন নিছক আত্মরক্ষার জন্যও চেম্বারলেন তাঁর সোভিয়েট-বিদ্বেষের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। ফ্যাশিজম্‌-সন্তোষ নীতির ব্যর্থতায় তিনি হয়ত আহত হয়েছেন কিন্তু তার অসারতা সম্বন্ধে এখনও হয়ত সন্দেহহীন হ'ন নি। জনমতের বিক্ষোভ কিছু প্রশমিত হ'লে হয়ত এখনও তিনি জার্ম্মানির সঙ্গে চতুঃশক্তির সন্ধি করতে প্রস্তুত আছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় চেম্বারলেনের ইতস্তত করার এই কারণ। ইংলণ্ডের সঙ্গে যোগদানে সোভিয়েটেরও যে দ্বিধা দেখা যাচ্ছে তার কারণ ইংলণ্ডের আন্তরিকতা সম্বন্ধে এই সন্দেহের অবকাশ।

অনেকে হয়ত যুক্তি দেখাতে পারেন যে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যদি অবধারিতরূপে সোভিয়েটের সঙ্গে সংযুক্ত হ'য়ে একটি ফ্যাশিজম্‌ বিরোধী শিবির গঠন করে তা' হ'লে শান্তি সংরক্ষণ অপেক্ষা যুদ্ধের সম্ভাবনাই বেড়ে যাবে। এর উত্তরে বলতে হয় যে ফ্যাশিজম্‌কে দাবিয়ে রাখতে হ'লে, তথা যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ রাখতে হ'লে, ফ্যাশিষ্ট শক্তির চেয়ে আরও দুর্দ্ধর্ষ শক্তির সমাবেশ ভিন্ন গতি নেই। এর বিরুদ্ধে যদি এই যুক্তি প্রযুক্ত হয় যে তাতে ত' আর চরম সমাধান হবে না কারণ সশস্ত্র শান্তি সংশয়সঙ্কুল, তা' হ'লে প্রশ্ন করতে হয় যে ফ্যাশিজমের অস্তিত্বের সঙ্গে চিরশান্তি সঙ্গত কি না এবং তা যদি না হয় তা হ'লে ফ্যাশিজমকে

বিধ্বস্ত করার উপায় কি। নিরস্ত্রীকরণ এবং বোঝাপড়ার পন্থা ব্যর্থ হয়েছে। দাবীপূরণের দ্বারা সন্তুষ্টিসাধনও বিফল হয়েছে। ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত বলপ্রয়োগই খালি করা হয়নি। পশুবলকে দমন করার উপায় পশুবল ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ফ্যাশিজমকে বলপ্রয়োগের দ্বারা সংযত রাখতে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ ঘুচে গেছে। যাঁদের এখনও সন্দেহ আছে তাঁদের মত তাঁদের আশাপ্রসূত। তাঁদের অন্যতর বহু আশা যেমন ভেঙেছে এ আশাও তেমনি ভাঙবে। চিরশান্তি সকলেরই কাম্য। কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে প্রথমে শান্তির প্রতিবন্ধকগুলিকে অপসারিত করতে হবে। এ অবস্থায় সংস্কৃতি, সভ্যতা, চিরশান্তি এবং প্রগতি অনুকূল শক্তিসমূহের সংহতি কাম্য। যুদ্ধ যদি অনিবার্য্য হয় তা হ'লে এর প্রয়োজন আরও বেশি।

যে অবস্থায় "ম্যুনিক" সঙ্ঘটিত হয়েছিল বর্ত্তমান অবস্থার পরিণতিতে এখনও তার কোন বিশিষ্ট পার্থক্য দেখা দেয়নি। ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স এখনও সন্তুষ্টীকরণের নীতি নিরঙ্কুশভাবে ত্যাগ করেনি। কেবলমাত্র ইয়োরোপের আবহাওয়া এবারে হয়ত অধিকতর ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী। তার কারণ হ'ল যে হিটলার এতদিন নিজেকে জার্ম্মান-বর্ণের ত্রাণকর্ত্তা বলে জ্ঞান করতেন, কিন্তু এখন তিনি নিজেকে অন্য বর্ণেরও উদ্ধারকর্ত্তা বলছেন। আগে হিটলারের আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন তা হয়ে উঠেছে অসীম। স্বভাবতই ফ্যাশিষ্ট-বিরোধিতা আরও প্রগাঢ় এবং আরও বিস্তৃত হয়েছে। নতুবা অবস্থার বিশেষ পার্থক্য হয়নি। চেক-সঙ্কটের বেলায়ও যেমন এবারেও তেমনি ইংলাণ্ড ও ফ্রান্স একধারে পোলাণ্ডকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং অন্যধারে ডানসিগ্ ও পোলিশ করিডোর সম্বন্ধে নাৎসিদের সন্তুষ্ট করতে রাজি আছে। পোলাণ্ডকে সাহায্য দানের ঘোষণা পোলাণ্ডের ভৌম অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়নি, তার স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সম্ভবত পোলাণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ করে এবারের মত যুদ্ধ আবার স্থগিত করা হবে।

এইটুকুই খালি আশার কথা যে ইংলণ্ড বলকানের রাজ্যগুলির সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে জার্ম্মান-বিরোধী একটি দল সংগঠনের জন্য। কিন্তু এ সমস্ত কেবল ভীতিপ্রদর্শনের জন্য ফাঁকা আওয়াজ হতে পারে। মোটের উপর এইটুকুই আশাপ্রদ যে ব্রিটিশ জনসাধারণ তার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির সীমানা

অতিক্রম করেছে এবং ইয়োরোপে ব্রিটিশ নিরপেক্ষতার অসারত্ব সম্বন্ধে তার চোখ খুলেছে।

উপস্থিত ইতালীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট নয়। জার্ম্মানির চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের পর মুসোলিনি হিটলারকে অভিনন্দিত না করায় সকলেই একটু বিস্মিত হয়েছেন। রোম-বার্লিন সৌহার্দ্দ-বন্ধনে শিথিলতা আসা বিচিত্র নয়। কম্যুনিজম-বিরোধিতা এই প্রীতিবন্ধনের ততটা উদ্দেশ্য নয় যতটা পরস্পরের স্বার্থসিদ্ধি। এবং এই প্রীতিবন্ধন ততদিনই দৃঢ় থাকবে যতদিন না মুসোলিনি কিছু সুবিধা করতে পারেন। মুসোলিনির নীরবতা হয়ত হিটলারকে এই ইঙ্গিত দিতে পারে যে জার্ম্মানির এবার ইতালীর আত্মপ্রসারণের প্রতি নজর দেবার সময় এসেছে। এর পরের আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কট ইতালীর দ্বারাই সঙ্ঘটিত হওয়া সম্ভব।

হিটলারের বক্তৃতায় তাঁর শান্তি অনুগমন সম্বন্ধে উক্তির উপহাস্যতা সম্পর্কে টিপ্পনি কাটাও বাহুল্য।

ইয়োরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কেবল এই আশা পোষণ করতে পারি যে অ-ফ্যাশিষ্ট দেশগুলির বোধোদয় হচ্ছে।

আমাদের রাষ্ট্রিক অগ্রগতির ইতিহাসে ত্রিপুরীকে যুগপ্রবর্ত্তক বলে বিবেচনা করবার কোন কারণ নেই। কিন্তু ত্রিপুরীর কোন গুরুত্ব নেই এমন কথা বলা হচ্ছে না। ত্রিপুরীতে যে দ্বন্দ্ব এবং সঙ্ঘর্ষ প্রকাশ পেয়েছে তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। এই সঙ্ঘাত ব্যক্তিত্বগত নয়, কর্ম্মপ্রণালী-সম্পর্কিতও নয়। এর উৎস আরও গভীর। অবশ্য আমাদের অপরিণত রাষ্ট্রনীতির কুজ্ঝটিতে আসল প্রশ্নটি অনেক সময় প্রচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। তবুও আসল প্রশ্নকে ঘিরেই সঙ্ঘর্ষকে সর্ব্বদা চলতে হয়।

১৯৩৫ সাল থেকে আমাদের রাষ্ট্রজীবনের প্রধান প্রশ্ন হ'ল আমরা ইংরাজ-নির্দ্দিষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ করব কি না। এর উত্তর আমরা দিয়েছি সুস্পষ্ট নির্জ্জলা "না।" এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করলে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করতে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের যৌক্তিকতার আলোচনা এখানে অবান্তর। এই কথা খালি মনে রাখতে হবে যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করুক

বা না করুক কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হ'ল ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলন পরিচালিত করা। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ মানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করাও নয়, মিটমাট করাও নয়। নূতন কনষ্টিটিউশানের অসারতা প্রতিপন্ন করতে এবং ফেডারেশান রোধ করতে কংগ্রেস বাধ্য। এটি হ'ল কংগ্রেসের অস্তিত্বের কারণ। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ হ'ল অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার।

ত্রিপুরীর দ্বন্দ্বসঙ্ঘাতের মধ্যে এই আসল প্রশ্নটি কতকটা চাপা পড়ে গেছে। ফেডারেশানকে কি ভাবে প্রতিরোধ করা হবে সে বিষয় সিদ্ধান্ত না ক'রে কংগ্রেস গান্ধিজির নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করলে। আসল কথা গান্ধিজির নেতৃত্ব নয়, পাটেলপন্থীদের নেতৃত্ব। গান্ধিজির নেতৃত্ব সম্বন্ধে তাঁদের এই সরব ঘোষণার অর্থ কি? তাঁরা নানা কৌশলে নিজেদের একাধিপত্য বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন। এমন কি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ সম্বন্ধেও তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন না। পদ এবং শক্তির মোহ তাঁদের অনেকগুলি ফ্যাশিষ্টসুলভ বৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। কনষ্টিটিউশানবিজ্ঞ পণ্ডিত কংগ্রেসে বহু আছেন। কিন্তু কংগ্রেসশীর্ষে উপবিষ্ট তথাকথিত দক্ষিণপন্থীদের আচরণ কনষ্টিটিউশান সঙ্গত এবং গণতন্ত্র সঙ্গত হওয়া ত দূরের কথা ফ্যাশিষ্ট একাধিপত্যের অনুরূপ হয়েছে। ফ্যাশিজমই যদি তাঁদের লক্ষ্য হয় ত সাধুমহাত্মার দোহাই দেওয়ার বা constitutionalism-এর ভান করার কোন প্রয়োজন নেই। সোজাসুজি ফ্যাশিজমকে বরণ করলে অনেক অপ্রয়োজনীয় কুহেলিকা কেটে যায়।

রাজকোটের ব্যাপার, মন্ত্রিত্ব ত্যাগে দ্বিধা, দেশীয় রাজ্যে জন-আন্দোলন রদ, বড়লাট সাহেবের সঙ্গে সম্ভবত ফেডারেশান সম্বন্ধে মিটমাট, কৃষাণ এবং মজুরদের কংগ্রেসে গ্রহণ করা সম্বন্ধে ভয় ইত্যাদি দক্ষিণপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট পরিচয় দেয়। এঁদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ যে কোথায় পৌঁছবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। এঁদের একটি প্রধান শক্তি হয়েছে বামপন্থীদের অসঙ্ঘবদ্ধ দুর্ব্বলতা।

ত্রিপুরীতে এই প্রগতিপরিপন্থী দলের আত্মপ্রকাশই হল ত্রিপুরীর গুরুত্ব। এই বিরুদ্ধতা-অসহিষ্ণু দলের পরিণতি ফ্যাশিষ্টসুলভ একাধিপত্য। গান্ধিজি ঠিকই বলেছেন যে কংগ্রেসকে বিশুদ্ধ করা দরকার। কিন্তু বিপদ হল যে যাদের ছেঁটে ফেলতে হবে তারাই এখন কংগ্রেসের হর্তা কর্তা বিধাতা।

শ্রীমোহিত বসু

পুস্তক-পরিচয়

বাংলা ভাষা পরিচয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ কর্তৃক মনোনীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত।

১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই গ্রন্থ বাংলা ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা নহে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত নহে, যাঁহারা "সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে" বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক পরিচয় পাইতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য ইহা লিখিত হয় নাই। "ভাষার ক্ষেত্রে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যাতে আমাকে খুশি করেছে, ভাবিয়েছে, আশ্চর্য করেছে তারই কৌতুকের ভাগ সকলকে দেব বলেই লেখবার ইচ্ছে হ'ল।... চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি ব'কে যাব। তাতে ক'রে মনে তোমরা সেই চ'লে বেড়াবার স্বাদটা পাবে। তারও দাম আছে।" বৈজ্ঞানিকের সন্ধানী দৃষ্টির মধ্যে এই বিস্ময়বোধ তেমন ফুটিয়া উঠে না, রসিক ও সন্ধানী, যিনি একাধারে দুই, যিনি ভাষার প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীলতার মধ্যে সারা জীবন অফুরন্ত আনন্দের উপাদান পাইয়া আসিয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই এরূপ পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। সাহিত্যিক মাত্রকেই ভাষার সাহায্যে মনোরাজ্যের বিচিত্র সম্পদ্‌ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইতে হয়; কিন্তু সেই ভাষার প্রবাহ কয়জনের চোখে পড়ে? রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন; তাঁহার দৃষ্টি "খাপছাড়া" হইতে পারে, হয়তো তাঁহার আলোচনা প্রণালী "সুসম্বদ্ধ" নহে, তথাপি ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার ঔৎসুক্য, বিচার ও সরস প্রকাশভঙ্গী বাঙ্গালী পাঠকের পরম সমাদরের বস্তু। "ছবি ও গান"-এর প্রথম সংস্করণে, ১৮০৫ শকের ফাল্গুনে, প্রায় ৫৫ বৎসর পূর্বেও তিনি 'বিজ্ঞাপনে' পাঠকদিগকে ছন্দের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া লইয়াছিলেন। সেই হইতে আজ পর্যন্ত তাঁহার লেখনী এবিষয়ে শিথিল হয় নাই। তাঁহার 'শব্দতত্ত্ব', তাঁহার 'ছন্দ' পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠক

অনেক কিছু শিখিয়াছে, ভাষা চর্চার পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বাড়িয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ভাষারূপের সরস বর্ণনা এখনও নূতন, অনবদ্য। 'বাংলা ভাষা পরিচয়'-এ আমরা পূর্বেকার সেই সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সরস বর্ণনা ফিরিয়া পাইয়াছি। তাঁহার "খাপছাড়া" দৃষ্টির অভিজ্ঞতায় তিনি যাহা দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা অমূল্য, কারণ তাহার পরিচয় লইতে গিয়া আমরা শুধু ভাষারূপকেই দেখি না, সেই সঙ্গে রূপকারকেও দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের আলোচনা 'নৈর্ব্যক্তিক' হইবার নয়।

পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে লেখক একটি বিষয়ে পাঠকদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন ; এই পুস্তকে বাংলার 'চল্‌তি' ভাষারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য তাই বলিয়া যে সকল কথার আলোচনা হইয়াছে তাহা শুধু প্রাকৃত বাংলার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নহে। মানুষের গৌরবের কতখানি কারণ তাহার ভাষার প্রকাশক্ষমতা ; ভাষার জাতি, শ্রেণী ও ঐক্যগত বন্ধন ; ভাষা বস্তুর প্রতীক বটে, তবে প্রয়োজনমত 'নির্বস্তুক' হইতে পারে ; জ্ঞানের ও ভাবের ভাষার মূলগত পার্থক্য ; ভাষার সাহায্যে সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই সাহিত্য আমাদিগকে কি কথা শুনাইতে চায় ; জাতীয় মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার রূপের পরিবর্তন ; মাতৃভূমির সঙ্গে মাতৃভাষার নিগূঢ় যোগ ; রাষ্ট্রীয় সুবিধার জন্য হিন্দুস্থানী ভাষা গ্রহণ করিলেও মাতৃভাষার উন্নতি তাহাতে ব্যাহত হওয়া উচিত নয়,—এ সকল আলোচনা প্রাকৃত ও সাধু বাংলা, এমন কি, আধুনিক যুগের যে কোনও ভারতভাষার সম্বন্ধে সঙ্গত। সমগ্র গ্রন্থের এক-চতুর্থাংশ ভাগ এইরূপ আলোচনায় পূর্ণ।

গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ প্রাকৃত বাংলার শব্দ, শব্দযোজনা, শব্দের ধারা, বাক্যে শব্দবিন্যাস-রীতি লইয়া। বাংলা শব্দতত্ত্বে যখন তিনি এসকল আলোচনা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার পাঠকমহলে হর্ষ ও বিস্ময়ের কী সাড়াই না পড়িয়াছিল। এখানে সেই ভঙ্গী একটুও কমিয়া যায় নাই, বরং আরও উজ্জ্বল হইয়াছে। চল্‌তি ভাষার ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রনাথের মতে সমুজ্জ্বল। তাঁহার বিশ্বাস, "সুয়োরাণী নেবেন বিদায় আর একলা দুয়োরাণী বসবেন রাজাসনে।" এই কথায় সকল পাঠক সায় দিতে পারিবেন না। প্রাকৃত বাংলার প্রতিষ্ঠা হউক, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে "সুয়োরাণী" বিদায় লইবেন, এরূপ লক্ষণই বা

কোথায় ? যতীন্দ্রমোহন সিংহ যেদিন "নারায়ণ" পত্রে সাহিত্যসম্রাটের কাছে এই চল্‌তি ভাষা বনাম সাধুভাষা মোকদ্দমা দায়ের করেন, সেদিন একটা সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, তাহা এত শীঘ্র নাকচ হইবার কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে মুদ্রাকর-প্রমাদ বড় একটা থাকে না। মুদ্রিত কোনও পুস্তকেই থাকা অনুচিত, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তো নিতান্ত অশোভন, কিন্তু এই পুস্তকেই একাধিক আছে, দেখিতেছি। 'ব্যাভিচার' (১১৫ পৃঃ), 'প্রসংশিত', 'রূপলখ্য'—বর্ণাশুদ্ধির পরিচয়; ইহা লোকশিক্ষা সংসদ্ বা ইহার প্রকাশক, কাহার পক্ষে অধিক প্রশংসার কথা, তাহা বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকে কয়েকটি নূতন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন,—যেমন 'নির্বস্তুক' ও 'জাতিক'। 'নির্বস্তুক' (ইংরাজি abstract অর্থে) কথাটা গ্রহণ না করিবার কোনও হেতু নাই, 'জাতিক' গ্রহণ করিবার কোনও হেতু নাই। সমস্ত পদ হইলে (যেমন 'আন্তর্জাতিক') '—জাতিক' চলে বটে, কিন্তু নিতান্ত অসহায় অবস্থায় চলে কি ? 'জাতীয়' ও 'জাতির' এই দুইটি কথা থাকিতে 'জাতিক'-এর প্রয়োজন কিছু আছে কি না, তাহাও বিচার্য্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীর সম্পর্কে 'জাতীয়' ও বৃহত্তর গণ্ডীর বিষয়ে 'জাতিক', সম্ভবতঃ এই পার্থক্যটুকু দেখানই এখানে স্বতন্ত্র নামকরণের উদ্দেশ্য। মোটামুটি 'কান্ত' বিশেষণের একটু বাহুল্য এবারকার পুস্তকে দেখিতেছি; বিরহান্তক ও মিলনান্তক নাটক (পৃঃ ৩০), রাষ্ট্রিক কাজ (পৃঃ ৪৫)।

আর দুইটি কথা বলিয়াই এবিষয়ে আমরা আলোচনা শেষ করিব। প্রথম, প্রসঙ্গ ক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা হইতে 'গুরু-চণ্ডালির' ব্যবস্থা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু 'দরদ' প্রভৃতি কথার সর্ব্বত্র প্রয়োগ সত্ত্বেও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে না। একদিন যাহারা চণ্ডাল ছিল, নিতান্তই অস্পৃশ্য ছিল, এখন আর তাহারা চণ্ডাল নাই, গুরুর সঙ্গে সমান আসনের অধিকারী,—কথাটা সত্য; কিন্তু নূতন চণ্ডালের অভাব নাই, এবং বিভিন্ন প্রকৃতির শব্দের একত্র যোজনা সর্ব্বত্র চলে না।

রাষ্ট্রিক ভাষার আসনে বাংলাকে না বসাইয়া যে হিন্দীকে বসান হইয়াছে, তাহাতে কবিগুরুর কোনও আপত্তি নাই; তবে তিনি অবশ্য সেই সঙ্গে এই কথাও বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক ভাষাগুলির স্বতন্ত্রতা অক্ষুণ্ণ না রাখিলে কখনও

বিভিন্ন প্রদেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না। যাঁহারা হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসাইবার পক্ষে, তাঁহারা একথা সর্ব্বদাই স্বীকার করিয়াছেন ও এই মতের সারবত্তা শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

Studies in a Dying Culture—by Christopher Caudwell
(Bodley Head)

নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস রেনেশাঁস্ ইউরোপের দায়ভাগ। বর্ত্তমানকালে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এ ধরণের স্বাতন্ত্র্যে আস্থা হারিয়েছেন, এবং মোটামুটি দুটো দিক থেকে এর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছে। সমাজ, ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্বন্ধে হিউম যা বলেছিলেন তা আজকাল বহুলভাবে প্রচারিত। অন্য দিকটা আধুনিক ইংরাজ লেখকদের মধ্যে মৃত কড্ওয়েলই সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করেছেন। দুদিকের সমালোচনার ফলাফল অবশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। হিউমের মনোভঙ্গী ঐতিহাসিক নয়, তিনি হিউম্যানিজম্ সম্পূর্ণভাবে বরবাদ করে ক্ষান্ত হয়েছেন, কিন্তু কড্ওয়েল প্রমুখ লেখকেরা ইতিহাসের সাহায্যে সমাজ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন।

Man is born free, but everywhere he is in chains—আধুনিক ইউরোপের মূল বিশ্বাস রুসোর এই বিখ্যাত পংক্তিটি এবং এটাই রেনেশাঁস্ বুর্জোয়ার প্রধান ছাড়পত্র। 'Illusion and Reality'তে কড্ওয়েল দেখিয়েছেন যে ব্যাপারটি প্রথম থেকেই সত্যি নয়; উপরের পংক্তিকে সত্যি বলে মানলে জঙ্গলে প্রত্যাগমন করা ছাড়া উপায় নেই। মানুষ শেষ পর্য্যন্ত সামাজিক জীব; এবং সমাজের সঙ্গে তার সহোদর সম্পর্ক। ঐতিহাসিক ধারার আবিষ্কার এবং প্রধান প্রয়োজন স্বীকার করে নেওয়াটা স্বাধীনতার সুত্রপাত, কারণ তাহলে সমাজপতিকে আয়ত্তে আনা যায়। Freedom is recognition of necessity। কিন্তু এ সত্যটি বুর্জোয়া ভাবধারায় পরিপুষ্ট মনীষীরা স্বীকার করে নিতে পারেন নি। অনেকে কিছুদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে পিছিয়ে এসেছেন। তাঁদের লেখায় গোলক ধাঁধার, আত্মপরিক্রমার কারণ

ঐতিহাসিক উপলব্ধির অভাব, তাঁদের শেষ ব্যর্থতার কারণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে অন্ধ বিশ্বাস। এ বিশ্বাসপ্রসূত গোলক ধাঁধাটা আধুনিক সভ্যতার গতিতে অবশ্যম্ভাবী, সেজন্য কড্‌ওয়েল তাঁর বইএ মিরস্কির মতো অনর্থক গালিগালাজ করেন নি, কারণ আবিষ্কারের এবং বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সত্য তিনি যাচাই করেছেন শ, ওয়েল্‌স্‌, লরেন্স, টি-ই লরেন্স, ফ্রয়েড্‌ ইত্যাদির লেখার বিচারে, এবং এঁদের সম্বন্ধে কড্‌ওয়েলের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন। তিনি দেখিয়েছেন কী প্রকারে সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হয়ে শ অর্বাচীন উপহাস-রসিকতায়, লরেন্স 'রক্তের অন্ধকারে' আশ্রয় নিলেন। টি, ই, লরেন্স সভ্যতার মুষ্টি থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টায় যেখানে আশ্রয় নিলেন সেখানেই অজ্ঞাতসারে বুর্জোয়া সভ্যতার সমস্ত ক্লেদাক্ত বীজ রোপন করলেন।

এ বই পড়ায় কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। সনাতন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাস বরবাদ্‌ করলেই কি বুর্জোয়া সাহিত্যিকদের প্রধান বাধা অপসারিত হবে, তাঁরা আর বুর্জোয়া থাকবেন না? অডেন প্রমুখ কয়েকজন ইংরাজ লেখক ত ইতিহাসের অনিবার্য্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু কোনো মহৎ সাহিত্য এখনো তাঁরা সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁদের রচনায় ইচ্ছাপূরণের প্রয়াসটা পীড়াজনক। সেজন্য মনে হয় এঁদের ইতিহাসে বিশ্বাসটা এখনো অস্থিমজ্জাগত হয় নি, নেহাৎ সৌখিন এবং মৌখিক আছে, এবং হওয়া হয়ত সম্ভব নয়। রেনেশাঁস্‌ বুর্জোয়ার দলিলে জ্ঞাতসারে দস্তখত করেননি বলেই বোধ হয় সাম্প্রতিক ইংরাজি কবিতার উপর এলিয়ট তাঁর দীক্ষার আগে পর্য্যন্ত উন্মোচনী শক্তির কাজ করেছেন। যদি সম্পূর্ণভাবে এটা উপলব্ধি করা যায় যে 'ব্যক্তির কৈবল্যে বাহুল্য ব্যক্তিও' তাহলে নতুন ভিত্তিতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন হবে। অন্তত কয়েকজন ইউরোপীয় লেখকের রচনায় এ ধরণের ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু অডেন প্রমুখাদির অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মতো; এঁরা আজ পর্য্যন্ত শুধু বলতে পারেন: We cannot choose our world, our time, our class.

বড়ো পটেই কড্‌ওয়েলের হাত খোলে। তাঁর অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় 'Illusion and Reality'তে স্পষ্ট। কিন্তু ছোট প্রবন্ধের সীমায় তিনি অনেক সময় জোরালো হতে পারেন নি। যতক্ষণ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন ততক্ষণ তাঁর ক্ষমতা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু প্রতি প্রবন্ধেই শেষের দিকে তিনি

ভারসাম্য আনার জন্য ভবিষ্যতের মানদণ্ডে বর্ত্তমান সাহিত্যকে যাচাই করার চেষ্টা করেছেন ; সে মানদণ্ডটা অনেকের কাছেই অনাবশ্যক ঠেক্‌বে।

সমর সেন

The Individual and the Group—by B. K. Mallik,
(Allen and Unwin)

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ডক্‌টার বসন্তকুমার মল্লিক মহাশয় হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে একটি বই লিখেছেন। সমস্যার জটিলতা ও গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু এর বিশ্লেষণ ও সমাধান সম্বন্ধে সুচিন্তিত মন্তব্য খুব কম শোনা যায়। এই সমস্যা সম্পর্কে অরুচিকর মতবাদ ব্যক্ত করলে অপাঙ্‌ক্তেয় হতে হবে। এই ভয়ে আমি সমালোচকের অলোভনীয় পদ ও দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রথমে গর্‌রাজি ছিলুম। কিন্তু শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় আমাকে বল্‌লেন, "আপনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন্‌। আপনি পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে সমালোচনা করতে পারবেন।" এক্ষেত্রে সম্পাদকের ফরমাশ কার্য্যে পরিণত করা নেহাৎ সোজা ব্যাপার নয়। মাঝে মাঝে পক্ষপাতিত্ব এসে বুদ্ধির স্থৈর্য্য নষ্ট করে দেবে। এর জন্য লেখককে ও পাঠককে সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থাক্‌তে হবে। আমি তাই একটু ফাঁপড়ে পড়ে গিয়েছি। একটা পুরানো কথা মনে পড়ে গেল। পরলোকগত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আমাকে একদিন বলেছিলেন "An impartial review means a review of a book which you have not read" কিন্তু আমি যে আলোচ্য বইখানা আগাগোড়া পড়ে ফেলেছি। এ অবস্থায় আমার কলম দিয়ে নিছক নিরপেক্ষ সমালোচনা নাও বেরুতে পারে।

মল্লিক মহাশয়ের বই সবটা না পড়ে থাকতে পারলুম না। তাঁর বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কখনও মামুলী কথা বলেন না। নূতন ও অপ্রচলিত মতবাদ ব্যাখ্যা ক'রে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এটা নিন্দার কথা নয়। প্রত্যেক চিন্তাশীল লেখকই এই শ্রেণীভুক্ত। গ্রন্থকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন

তাঁর অভূতপূর্ব্ব বিশ্লেষণে ও তাঁর ভাষাসৌষ্ঠবে। তাঁর ইংরাজি লেখবার ক্ষমতা আছে; বেশ ঝর্‌ঝরে ভাষায় তিনি তাঁর ভাব প্রকাশ করেছেন। মল্লিক মহাশয়ের একটি মুখ্য প্রতিজ্ঞা এই যে বর্ত্তমান সময়ে দু'রকম সমাজনীতি দ্বারা সভ্যসমাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কতকগুলি সমাজে ব্যক্তির প্রধান্য স্বীকৃত হয়েছে। এই সকল সমাজে ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির জন্য অনেক কৌশল ও অপকৌশল অবলম্বিত হয়েছে। ব্যষ্টিপ্রাধান্যই উক্ত সমাজগুলিতে মূলনীতি হিসাবে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেছে। এর ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অন্যান্য অশুভ লক্ষণগুলি গোষ্ঠীজীবনের স্থিতি কষ্টসাধ্য করে তুলেছে। পাশ্চাত্য সমাজ বিশেষতঃ ইংরাজ সমাজ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অপর দিকে গ্রন্থকার দেখতে পাচ্ছেন যে হিন্দু সমাজে ব্যক্তিত্ব বা ব্যষ্টির চেয়ে সমষ্টি কিংবা গোষ্ঠীর কদর বেশী। হিন্দু সামাজিকত্বের দাবী কখনও উপেক্ষা করেননি। যূথভ্রষ্টত্ব হিন্দু কল্পনা করতে পারেন না। প্রত্যেক হিন্দুই—এমন কি হিন্দু সন্ন্যাসীরাও—কোন না কোন দল বা সম্প্রদায়ের আওতায় ধর্ম্মচর্চ্চা কিংবা কৃচ্ছ্রসাধন করে থাকেন। যিনি প্রাক্তন দল ছেড়ে চ'লে যান, তিনি হিন্দুজনসমষ্টির মধ্যে একটা নূতন দল গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। গ্রন্থকার তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছেন যে পাশ্চাত্য সমাজে প্রতিযোগিতা, বর্জ্জননীতি ও ধ্বংসোন্মুখতা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই ত্রিতাপক্লিষ্ট সমাজ আদর্শ সমাজ হ'তে পারে না। হিন্দুসমাজের সমষ্টিপ্রাধান্য আধ্যাত্মিক জীবনের সহায়তা করে। এই সমাজ টেঁকসই—নানা ঐতিহাসিক বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এই সমাজ স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রেখেছে।

এখানে আমি কতকগুলি প্রশ্ন তুলতে চাই। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ কি? গ্রন্থকারের পক্ষে দুরকম সমাজনীতির উল্লেখ করার মানে হচ্ছে এই যে তিনি মনে করেন ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটা শাশ্বতিক বিরোধের সম্বন্ধ রয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ মুখ্যতঃ গণিতাত্মক। ব্যষ্টির সমাহার নিয়েই সমষ্টি হয়। যে সম্বন্ধ সংযোগাত্মক সে সম্বন্ধ বিরোধের সম্বন্ধ হ'তে পারে না। সংযোগ ও বিরোধ পাশাপাশি থাকতে পারে না। সুতরাং একথা বিশ্বাস করা যেতে পারে যে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে সম্বন্ধ অহিনকুলের সম্বন্ধ নয়। কতকগুলি সমাজ ব্যষ্টিপ্রধান ও কতকগুলি সমাজ সমষ্টিপ্রধান—এরকম ভাবে ভাগ করা ঠিক দার্শনিকোচিত

হয়নি। প্রত্যেক সমাজেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব খানিকটা খর্ব্ব করা হয়েছে। প্রত্যেক সমাজেই সমষ্টির প্রাধান্য খানিকটা স্বীকৃত হয়েছে। ব্যক্তিদের অনুমোদন অগ্রাহ্য ক'রে কোন সমাজেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আংশিকভাবে নাকোচ করা হয়নি। সামাজিক জীবনের মূলনীতি যে সংযোগ, সেই সংযোগ পুরুষেচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে ইচ্ছা ও উদ্দাম বাসনা এক জিনিষ নয়। ইচ্ছানামক বস্তুটি হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় না—এটা জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাতসারে পারিপার্শ্বিক অবস্থাদ্বারা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

আজ যে ইতালি ও জার্ম্মানিতে মুসোলিনি ও হিট্‌লার প্রচণ্ড একাধিপত্য দেখাচ্ছেন, তা'ও সাধারণ ইতালিবাসী ও সাধারণ জার্ম্মানের রাজনৈতিক ইচ্ছার দরুণ সম্ভবপর হয়েছে। বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি দেখে ইতালি ও জার্ম্মানির লোকেরা ভাবছে যে এ ছাড়া তাদের অন্য পথ নেই। বেনিটো মুসোলিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বলেছেন যে ফ্যাশিজম ইতালিবাসীদের ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটা ইতালীয় জাতির এক অভিনব সৃষ্টি। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়। ইংরাজের জন্মভূমিতে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লক্ষিত হয়, তারও প্রতিষ্ঠা ইংরাজজাতির ইচ্ছার ওপর। ইংরাজ যখন একটা আকস্মিক ও দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন হবে, তখন হয়তো ইংরাজের জাতীয় ইচ্ছা বদলে যাবে। তখন ইংরাজের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে একটা মস্ত পরিবর্ত্তন আসবে। এখন থেকেই তো তার আমেজ সুরু হয়েছে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে হিন্দুর সমাজবিধি সাধারণ হিন্দুর ইচ্ছার ওপর স্থাপিত বলেই চারদিক্ থেকে গালাগাল খেয়েও মাথা তুলে আছে। এখানে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে এই জবুথবু দেশের লোকদের ইচ্ছাটাও জবুথবু হয়ে গিয়েছে। সুদীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার ফলে সাধারণ হিন্দুর ইচ্ছা জড়ভরতের দশা প্রাপ্ত হয়েছে।

নানা সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ধর্ম্মগত কারণে এদেশে ব্যক্তিত্ববোধ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এটা যে সমষ্টিপ্রাধান্য কিংবা কোন বিশ্বজনীন আদর্শবাদের প্রভাবে হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত হবে না। এদেশের আবহাওয়া গতানুগতিক-তারই প্রশ্রয় দিয়েছে। একদিন আমি বাসে চেপে কোনও এক জায়গায় যাচ্ছিলুম। আমার ডান পাশে যে সহযাত্রীটি বসেছিলেন, তিনি ভ্রমবশতঃ

আমার পা' মাড়িয়ে দেওয়াতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ব্রাহ্মণ?" আমি একটু মুস্কিলে পড়ে গেলুম। বিংশশতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষভাগে গান্ধীপ্রধান ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের অপরূপ সৃষ্টি 'বাস' নামক প্রবহণে বসে একজন আর একজনকে জিজ্ঞাসা করছে "আপনি কি ব্রাহ্মণ?" আমি বল্‌লুম, "কেন, বলুন তো ম'শায়?" তিনি উত্তর দিলেন—"আপনি যদি ব্রাহ্মণ হন্, তা'হলে আপনার পায়ের ধুলো নেবো—আমি আপনার পা মাড়িয়ে দিয়েছি যে।" আমি আমার সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—"আপনি ও সব মানেন নাকি?" তিনি বল্লেন, "আমি ও সব বুঝি সুঝি না। শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণ দেবতা, তাই আমি ব্রাহ্মণকে ভক্তি করি।" কলিকাতার ট্রাফিক সেদিন মধ্যাহ্নে সে রাস্তায় বেশ কোলাহল সৃষ্টি করেছিল। এর দরুণ আমি আমার সহযাত্রীর অন্যান্য কথা শুনতে পেলুম না। কিন্তু আমি একটু আত্মস্থ হ'য়ে ভাবলুম, হিন্দুমহাসভার গত অধিবেশনের সামাজিক প্রস্তাবগুলিতে সাধারণ হিন্দুর ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে না এই বাসের কোণে বসে আমার সহযাত্রীটি সাধারণ হিন্দুর ইচ্ছা শব্দে স্ফুটতর ক'রে তুলেছে? মীমাংসকেরা বলে থাকেন যে বর্ণ নিত্য ও সর্ব্বগত এবং ধ্বনি সাময়িক ও আপেক্ষিক। হিন্দুমহাসভার প্রস্তাবগুলি কি সাময়িক ধ্বনির মত আর এই সহযাত্রীর উক্তিটি কি চিরন্তন বর্ণের মত?

মল্লিক মহাশয়ের গ্রন্থে পাশ্চাত্য সমাজের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেটা হয়তো আংশিকভাবে সত্য হতে পারে। কিন্তু সমষ্টিকে একেবারে অগ্রাহ্য করে কি কোন রকম সামাজিক কিংবা গোষ্ঠীগত জীবন চলতে পারে? সমষ্টির প্রাধান্য একেবারে অস্বীকৃত হয় নি বলে এখনও প্রতীচীর সমাজ স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে। যে দিন গোষ্ঠীর প্রাধান্য মেনে নিতে পশ্চিম দেশের লোকেরা একেবারে নারাজ হবে, সে দিন পশ্চিম ভূভাগে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অরাজকতা সুরু হবে। বর্ত্তমান সমালোচকের মতে সমষ্টির প্রাধান্য ইংরাজ কিংবা ইউরোপীয় সমাজই আধুনিক কিংবা পূর্ব্বতন হিন্দু সমাজের চেয়ে ভাল রকম উপলব্ধি করতে পেরেছে। মার্কিন দার্শনিক Santayana তাঁর কোন এক পুস্তকে বলেছেন সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে হলে স্বার্থত্যাগ চাই। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থদ্বারা চালিত হলে সঙ্ঘবদ্ধ জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

তার পর Santayana বলতে চাচ্ছেন যে এংলোস্যাক্‌সন জাতি স্বার্থত্যাগের পরকাষ্ঠা দেখিয়েছে। এই মার্কিন লেখকের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন হিস্পানি দেশের লোক। এ ক্ষেত্রে তাঁর মত একেবারে ছেঁদো কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। যদিও প্রাচ্যবাসী জাপানীরা এ ধরণের স্বার্থত্যাগের পথে ইংরাজদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে, তথাপি ইংরাজের প্রাপ্য সাধুবাদ ইংরাজকে দিতে হবে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির মাপকাঠি নিয়ে হিন্দু সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের পার্থক্য নির্ণয় করা সমীচীন হবে না। সূক্ষ্মবিশ্লেষণে অনেক ভুলচুক ধরা পড়বে। সমষ্টির স্থিতির জন্য ইংরাজ অনেক বিষয়ে এমন স্বার্থত্যাগ দেখাতে পারে যা নাকি হিন্দু সমাজে অন্ততঃ বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে বিরল। এ বিষয়ে এশিয়া-বাসীদের গুরু হচ্ছে জাপানীরা—সমষ্টির কল্যাণের জন্য স্বার্থত্যাগ কাকে বলে তা' শুধু জাপানীরাই জানে। এ বিষয়ে ভারতবর্ষ এশিয়াকে কিছু শেখাতে পারে না। এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এ সত্যের অপলাপ করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কথাটি একটু কড়া শোনাচ্ছে বটে। তাই এখানে অন্য প্রসঙ্গ তুলবো। হিন্দু সমাজ ও ইউরোপীয় সমাজের পার্থক্য কোথায়? বর্ত্তমান সমালোচকের মতে হিন্দু সমাজ একটা written code-কে আদর্শ করেছে ইউরোপ চালিত হচ্ছে unwritten code দ্বারা। লিপিবদ্ধ স্মৃতি স্থাণুর মত জড় ও অচল—অলিপিবদ্ধ স্মৃতিতে প্রগতির অনুকূল ব্যবস্থা স্বতঃ সম্ভবপর হয়ে থাকে। লিপিবদ্ধ স্মৃতির নমনশীলতা কম সুতরাং কার্য্যকারিতা কম। অলিপিবদ্ধ স্মৃতি এ দোষ থেকে মুক্ত। বর্ত্তমান যুগ ও যে যুগে প্রাচীন স্মৃতিকারেরা আইন কানুন লিপিবদ্ধ করেছিলেন—এই দুই যুগের মধ্যে আস্‌মান জমীন তফাৎ। তাই ইদানীন্তন প্রগতিস্রোতের ধাক্কা হিন্দু সমাজ সামলাতে পারছে না। প্রগতির পথে এই সমাজবিধি একটা মস্ত বাধা সৃষ্টি করেছে। আইন কানুন দিয়ে জীবনের আটঘাট খুঁটিনাটি সমেত বেঁধে দিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর এমন নির্দয়ভাবে হাত দিতে ফ্যাশিষ্ট ও নাৎসীরা সাহস করে না। প্রাচীন ইহুদিদেরও এতগুলি বিধি ও নিষেধ মেনে চলতে হ'তো না। স্মৃতিশাস্ত্র পড়লে মনে হয় যেন হিন্দুকৃষ্টির আত্মা বিশ্বের ঘাত প্রতিঘাতের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বলছে—"আমি এতগুলো অসংলগ্ন দল সৃষ্টি করেছি। এদের ঘাঁটিয়ো না।

বিপুল, গভীর, মধুর মন্ত্রে বিশ্ববাজনা এদের শুনিয়ো না। দোহাই, এদের স্বতন্ত্র থাক্‌তে দেও।" নিষ্ঠুর ইতিহাস কিন্তু এ মিনতিতে কর্ণপাত করলে না। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের কাল-বৈশাখী হিন্দু সমাজের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বয়ে যাচ্ছে। সুপ্তোত্থিতের ন্যায় হিন্দু সমাজ চোখ কচ্‌লিয়ে দেখছে যে ভেতরে ও বাইরে দুদিকেই জটিল সমস্যা উত্তাল তরঙ্গের মত খাই খাই করছে।

হিন্দুর সমাজবিধি ও পাশ্চাত্য সমাজবিধির মধ্যে আর একটি পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত সমাজবিধিতে গোষ্ঠীর সাহচর্য্য ও সামাজিক সম্বন্ধ জন্মের ওপর নির্ভর করে এবং দ্বিতীয়োক্ত সমাজবিধি মতে পুরুষ স্বেচ্ছায় কিংবা স্বোদ্যমে গোষ্ঠী বদলাতে পারে। অনেকেই বলে থাকেন যে হিন্দুর সমাজবিধিতে ধন মর্য্যাদা ঠাঁই পায় না। কার্য্যতঃ কিন্তু প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজেও ধনগত কৌলিন্য স্বীকৃত হয়েছে। মহাভারতে জরৎকারু আক্ষেপ করে বলেছেন যে তিনি ধনহীন সুতরাং কেউ তাঁকে পোছে না। ভর্ত্তৃহরি সে যুগের হাল চাল লক্ষ্য করে বড় দাগা পেয়ে লিখেছিলেন, "সর্ব্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি"। মৃচ্ছকটিকে নির্ধনের কাতরোক্তি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। ধনগত কৌলিন্য বৈষম্যমূলক সমাজের চিরন্তন ব্যাধি। এ বিষয়ে অহিন্দু সমাজগুলি হিন্দু সমাজের চেয়ে বেশী উদারতা দেখাতে পারে নি। হিন্দু সমাজও অহিন্দু সমাজের চেয়ে উচ্চতর আদর্শ চোখের সামনে ধরতে পারে নি। যাঁরা একথা স্বীকার করতে নারাজ তাঁরা যেন পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মজীবন মনোযোগ দিয়ে আলোচনা করেন।

বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক গীবন তাঁর "রোমক সাম্রাজ্যের পতন ও অবসান" নামক বিরাট গ্রন্থের কোন কোন অংশে কল্পিত আধ্যাত্মিক কারণের অবতারণা না ক'রে নৈসর্গিকভাবে খৃষ্টধর্ম্মের বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক গবেষণার আলোকে গীবন-দর্শিত কারণগুলি আগাগোড়া গ্রাহ্য না হ'লেও গীবনের আদিম প্রচেষ্টা যে পরবর্ত্তী ইতিহাস লেখকদের নূতন পথ দেখিয়েছিল সে বিষয়ে মতানৈক্য হবে না। হিন্দু সমাজবিধির কাল্পনিক কিংবা তাত্ত্বিক স্থায়িত্ব সম্বন্ধে অনেক লেখকই অনেক রকম মতামত ব্যক্ত করেছেন। বর্ত্তমান সমালোচকের বিবেচনায় এই সব মতামত কল্পনা জগতের বেতার বার্ত্তার মত চমকপ্রদ কিন্তু অবাস্তব। হিন্দু সমাজের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মল্লিক মহাশয় অনেক

কথাই বলেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে হিন্দু সমাজ কি অর্থে টি'কে আছে? আমরা তো হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব চর্ম্মচক্ষে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখছি কতকগুলো অসংলগ্ন দল হিন্দু সমাজ বলে আত্মপরিচয় দিচ্ছে। এই অসংলগ্নতার দরুণ হিন্দু সমাজের ভেতর অনৈক্য দেখা দিয়েছে এবং এই কারণে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জয়যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে। অভিব্যক্তি-সম্পৃক্ত বিশ্বের জীবনসংগ্রামে অতিকায় হস্তী পাঁয়তারা কষতে কষতেই অক্কা পেল। আর মশার দল এখন পর্য্যন্ত রাত্তিরে সুর ক'রে আমাদের বলে থাকে, "মরিতে চাহি না মোরা সুন্দর ভুবনে, তোমাদেরই মাঝে মোরা বাঁচিবারে চাই।" কিন্তু তা' হ'লে কী টেনিসন-বর্ণিত "glory of going on and still to be"-র কোন সার্থকতা ও বাহাদুরি নেই?

হাঁ, বিলক্ষণ আছে। কিন্তু হিন্দু সমাজের এই দৃশ্যমান স্থায়িত্বের নিদান সম্বন্ধে খোঁজ ক'রতে হবে। হিন্দুর সমাজবিধি এখনও টি'কে আছে কারণ প্রাচীন কালে কিংবা আধুনিক যুগে এই সমাজবিধির ওপর তেমন কঠোর কিংবা হানিকর ভাবে কেউ আক্রমণ করে নি। বৌদ্ধ নিকায়ে যেমন জায়গায় জায়গায় বামুনদের অকথ্য ভাষায় গাল দেওয়া হয়েছে, তেমনি আবার অপর দিকে ধর্ম্মপদে বামুনদের প্রশংসা করা হয়েছে। তা' পড়ে প্রত্যেক বামুনই আহ্লাদে আটখানা হবে। মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠতার দরুণ তাদের আক্রমণ-নীতি তেমন কার্য্যকরীভাবে চালাতে পারে নি। যেখানে যেখানে আক্রমণ-নীতি ভয়াবহভাবে চালানো হয়েছে, সেখানে সেখানে হিন্দুর সমাজনীতি পরাজয় স্বীকার করেছে। অর্থাৎ হিন্দু সমাজ ছেড়ে তারা প্রাণভয়ে অহিন্দু ধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গোয়াতে দেশী ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেড়েছে এই কারণে। হিন্দুর তুলনায় মুসলমান তো বরাবরই মুষ্টিমেয় ছিল। মুষ্টিমেয় মুসলমান অসংখ্য হিন্দুদের ওপর কত অত্যাচার করবে? এখানে তো গণিত শাস্ত্র একেবারে উপেক্ষিত হতে পারে না। রোমক সাম্রাজ্যে পাষণ্ডপীড়ন নীতির দরুণ খৃষ্টানেরা যে অত্যাচার সহ্য করেছিল, সে রকম অত্যাচার হিন্দু সমাজকে সহ্য ক'রতে হয় নি। একদিকে মুষ্টিমেয় খৃষ্টান আর অপর দিকে সহস্র সহস্র রোমান। এ রকম অবস্থার ভেতর দিয়ে হিন্দু সমাজ কখনও যায় নি। সুদূর প্রাচ্যের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন যে অষ্টাদশ

শতাব্দীতে জাপানের খৃষ্টানেরা ভয়ঙ্কর অত্যাচার সহ্য করেছিল। সেই আক্রমণ নীতি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ভীতিজনক যে আক্রমণনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দ্বারা অনুসৃত হয়। সে রকম অবস্থায় যদি কোন সমাজবিধি স্থায়িত্ব বজায় রাখতে পারে, তা' হ'লে নিশ্চয়ই 'বাহবা' বলতে হবে। ইতিহাসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বরাবরই হিন্দু সমাজের সহায়তা করেছে। তা হ'লে বৌদ্ধপ্রধান ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজবিধির পুনরুত্থান হ'লো কী ক'রে? সে ইতিহাস এখনও ভাল ক'রে লেখা হয়নি। যখন লেখা হবে, তখন হিন্দুর পক্ষে অগৌরবকর অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হবে। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ, সুধন্বা প্রভৃতি ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নৃপতিদের গল্পে এবং "নিরঞ্জনের রুষ্মা" নামক বৌদ্ধ কবিতায় তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজবিধির আপাত স্থায়িত্বের আর একটি অনাধ্যাত্মিক ও নৈসর্গিক কারণ হচ্ছে এই যে প্রাচীন কাল থেকে হিন্দুর সামাজিক জীবনে বিবাহ বাধ্যতামূলক ব'লে গণ্য হয়েছে। এই প্রথাটি বংশবৃদ্ধির সহায়তা করেছে এবং এর দরুণ হিন্দুর সমাজ-বিধি স্থায়িত্ব লাভ ক'রেছে। কিন্তু সবার ওপর একথাটি সত্য যে হিন্দু সমাজ-বিধি এখনও টি^কে আছে কারণ এই বিধি হিন্দুর ইচ্ছার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বিশেষজ্ঞেরা একথা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবেন না যে বিদেশীয় রীতিনীতি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রীকেরা যে অনুসন্ধিৎসা দেখিয়েছিল, সে রকম জিজ্ঞাসা প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে ছিল না। গ্রীকদের তুলনায় প্রাচীন হিন্দুর দৃষ্টি এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ছিল ব'লে মনে হয়। এ বিষয়ে অজ্ঞতাও হিন্দু সমাজ-বিধির স্থায়িত্বের একটি অন্যতম কারণ। জন্মান্তরবাদের প্রভাবে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারে নি আর এ বিষয়ে তাদের ইচ্ছাশক্তি শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

মল্লিক মহাশয়ের বই পড়লে বেশ বুঝতে পারা যায় যে তিনি অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন প্রণীত Hindu View of Life নামক পুস্তকদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। উক্ত অধ্যাপক মহাশয় যে খুব জোরালো ভাষায় ও সুনিপুণভাবে হিন্দুধর্ম্মের ঔদার্য্য ও বিশ্বজনীনতা ব্যক্ত করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অধ্যাপক প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে মল্লিক মহাশয় বলতে চান যে মানবিকতার পূর্ণ বিকাশের জন্য হিন্দুর সমাজবিধিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদিও হিন্দুধর্ম্ম গুণ ও কর্ম্মের পার্থক্যহেতু শ্রেণী-বিভাগ করেছে, তা'হলেও

মানবের চরম লক্ষ্য মুক্তিতে সর্ব্ববর্ণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে হিন্দু কখনও অনুদারতা দেখায়নি ; হিন্দুসমাজ পাষণ্ডপীড়নদ্বারা কখনও সর্ব্বংষহার তৃণশোভিত সুকোমল মাটি নররক্তে কলুষিত করেনি। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন "Hinduism has never indulged in the game of heresy-hunting"। প্রাচীন ও মধ্যযুগের চার্চ্চের চেয়ে যে প্রাচীন হিন্দু সমাজ অপেক্ষাকৃত উদার ছিল, একথা স্বীকার করতে বর্ত্তমান সমালোচক আদৌ কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই—has Hinduism indulged in the more useful game of history-writing ? হিন্দুরাজ্যে পাষণ্ডপীড়নের ইতিহাস তো এখনও নিরপেক্ষভাবে লেখা হয়নি ; এবিষয়ে বৌদ্ধ ও জৈনদের অনেক কিছু বলবার আছে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ও শৈবদের মতামতও শুনতে হবে। একথা সত্য যে দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন খৃষ্টান সম্প্রদায় স্বাধীন হিন্দু রাজাদের কাছ থেকে সদয় ব্যবহার পেয়েছিল। স্বাধীন হিন্দু রাজত্বে ধর্ম্মমতের জন্য এই সম্প্রদায় কোনদিন নিপীড়িত হয়নি। বরং পর্ত্তুগলের ফিরিঙ্গিরাই দাক্ষিণাত্যের খৃষ্টানদের সঙ্গে জঘন্য ও কদর্য্য ব্যবহার করেছিল। যদিও এ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু সমাজের আপেক্ষিক উদারতা শতমুখে স্বীকার্য্য, তথাপি একথা মেনে নিতে হবে যে খৃষ্টান পরিচালিত মার্কিনদেশে ও ইংলণ্ডে বর্ত্তমান সময়ে যে ধর্ম্মগত স্বাধীনতা লক্ষিত হয় তা' প্রাচীন হিন্দু রাজ্যে ছিল না। আর একটা জিনিষ বোধ হয় ছিল না—মুক্তিতে শূদ্রের অধিকার বরদাস্ত করা হ'তো না। রামায়ণ-বর্ণিত শূদ্রতপস্বীর উপাখ্যানে তার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে স্পষ্ট বলেছেন—"এবং প্রাপ্তে বয়ং ব্রূমো ন শূদ্রস্যাধিকারো বেদাধ্যয়নাভাবাৎ" অর্থাৎ এ রকম অবস্থায় আমাদের মত এই যে শূদ্রের অধিকার নেই কারণ শূদ্র বেদ পড়তে পারে না।" গীতাতে অবশ্য অন্য ধরণের কথা আছে—কিন্তু সেখানে ভক্তিজনিত মুক্তি সূচিত হয়েছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে বৈদান্তিক মুক্তি শূদ্রের জন্য নয়। স্মৃতিকারেরা ও দার্শনিকেরা শূদ্রত্বের গুড়ে বালি ফেলে দিয়েছেন। উপনিষদের রৈক্ক ও মহাভারতের বিদুর ব্যভিচারপর্য্যায়ভুক্ত ; এঁরা সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত নন্।

আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই—what is the Hindu view of life ? অহিন্দুর মধ্যে যাঁরা হিন্দুর পুঁথিপত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের মত

হচ্ছে এই যে হিন্দু ধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ নির্ব্বিবাদে মেনে নিয়েছে। জীবনসম্বন্ধে হিন্দুদৃষ্টির মূলতত্ত্ব জন্মান্তরবাদেই খুঁজতে হবে। ভাল কাজ করলে ভবিষ্যতে উচ্চ বর্ণে জন্মলাভ হবে। আর খারাপ কাজ করলে অনাগত জন্মে কপূয়যোনিতে প্রবেশ করতে হবে। বামুনেরা বর্ণাশ্রমের শ্রেষ্ঠ জীব; তাঁরা সমাজের গুরু। বেদের নিন্দা ক'রো না আর বামুনদের সমীহ ক'রে চোলো। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ স্মৃতি-নির্দ্দিষ্ট কাজ ক'রে যায়। শূদ্‌দুর যেন বেদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে। এই মতগুলি, সর্ত্তগুলি মেনে নিয়ে তোমরা যে কোন ধর্ম্মমত বিশ্বাস ও প্রচার করতে পার। অহিন্দুর বিবেচনায় এটাই হচ্ছে সত্যিকার Hindu view of life। তা' হ'লে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ও মল্লিক মহাশয় তাঁদের উদারতাব্যঞ্জক মতবাদ পেলেন কোথায়? তার উত্তর হচ্ছে এই যে এক্ষেত্রে তাঁরা বিশ্বাসেচ্ছার দ্বারা চালিত হয়েছেন; তাঁরা will to believe-এর অদৃশ্য প্রভাব এড়াতে পারেননি। আর তাঁদের বিশ্বাসেচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সমর্থনশীল মনোবৃত্তির দ্বারা। Defence-complex-এর কেরামতিতে আজকাল হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক অশ্রুতপূর্ব্ব থিওরি বাজারে চালু করা হচ্ছে। এরকম ঘটনা ধর্ম্মের ইতিহাসে প্রায়ই ঘটে থাকে। সুতরাং এটা একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার নয়। গ্রীক্ বিজ্ঞান ও গ্রীক্ দর্শন যখন Judaism কে আঘাত করেছিল, তখন Philo'র প্রভাবে নব্য ইহুদি ধর্ম্ম গড়ে উঠেছিল। বর্ত্তমান জাপানে প্রাক্তন শিণ্টো ধর্ম্মকে আধুনিক ছাঁচে ঢালাই করা হয়েছে। চোদ্দ ছটাক পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সঙ্গে দু'ছটাক আন্দাজ বাছা বাছা সংস্কৃত শ্লোক একত্র মিশিয়ে Neo-Hinduism নামক জগা খিচুড়ি তৈরী হয়। তাতে আবার বিভিন্ন প্রকৃতির লেখকগণ বিভিন্ন রকমের কল্পনাপ্রসূত মসলা যোগ ক'রে দেন। তার দরুণ জিনিষটা একটু ঝাঁঝালো ও তিক্ত হয়ে পড়ে। খাঁটি, অনাবিল হিন্দুয়ানির স্নিগ্ধতা ও মধুরতা এতে নেই। প্রাচীন হিন্দুয়ানির তুলনায় Neo-Hinduism একটু কাটখোট্টা গোছের বলে মনে হয়। আদত জিনিষটির একটা সৌন্দর্য্য আছে যা' চিন্তাশীল অহিন্দুকে মুগ্ধ করে দেয়।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির আলোকে মল্লিক মহাশয় হিন্দুমুসলমান-সমস্যা আলোচনা করেছেন। তিনি বল্‌ছেন যে প্রাগ্ ব্রিটিশ যুগের গোষ্ঠীপ্রধান গ্রাম্য জীবনে এ সমস্যা ছিল না। ইংরাজের আমলে জমিদারি প্রথা সুরু হ'ল এবং জমিদারি

প্রথার সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যষ্টিপ্রাধান্য। গোষ্ঠীর প্রাধান্য গ্রাম থেকে উধাও হ'ল এবং তৎসঙ্গে সমষ্টিপ্রাধান্য সংশ্লিষ্ট সংযম, স্বার্থত্যাগ ও সংহতি অন্তর্হিত হল। সামাজিক ও নৈতিক জীবনে একটা অরাজকতার আবির্ভাব দেখা গেল। হিন্দুমুসলমান-সমস্যা এই অরাজকতার একটি বিকাশমাত্র। যাঁরা মানবজাতির সামাজিক ওলট পালটে ব্যষ্টির ও সমষ্টির জয় পরাজয় ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পান না, তাঁরা হয়তো মল্লিক মহাশয়ের মতবাদ একেবারে অগ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে—হিন্দুমুসলমান সমস্যার বীজ কি হিন্দুর সমাজবিধিতে নিহিত নেই? অসংলগ্নতা ও সংশ্লিষ্টতার অভাব যে সামাজিক জীবনের স্বরূপ সে সমাজে এই রকম সমস্যা নিশ্চয়ই দেখা দেবে। এ যুগে ভারতের Zeitgeist সঙ্ঘবদ্ধতা ও সংশ্লিষ্টতা প্রবর্ত্তিত করতে সচেষ্ট হয়েছে—ঐতিহাসিক ঘটনাস্রোতও এই দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। এই কারণে অসংলগ্নতা ও অসংশ্লিষ্টতার সঙ্গে সংহতির একটা বিরোধ অনিবার্য্য। এই অন্তর্নিহিত বিরোধ হিন্দুমুসলমান-সমস্যায় ফুটে উঠেছে।

চীন দেশেও মুসলমান আছে, কিন্তু সেখানে তো কন্‌ফুশিয়ান ও মুসলমানদের মধ্যে কোন কলহ নেই। সেখানে অবশ্য দুটি দলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবার জন্য কোনও শক্তিশালী তৃতীয় পক্ষ নেই। কিন্তু ভারতবর্ষে তৃতীয় পক্ষের মতলব কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব হয়নি কারণ এদেশের সামাজিক আবহাওয়াতেই বিরোধ ও দ্বন্দ্বের আমেজ পাওয়া যায়। কন্‌ফুশিয়ান্ সমাজ-নীতি এ দোষ থেকে মুক্ত; তাই চীন দেশে মুসলমানসমস্যা নেই। যদিও কয়েকটি বিষয়ে কন্‌ফুশিয়ান্ সমাজনীতি ও মনুস্মৃতির মধ্যে বিস্ময়কর সমতা দৃষ্ট হয়, তথাপি কন্‌ফুশিয়াস্ সামাজিক ব্যাপারে কখনও অসংলগ্নতা ও অসংশ্লিষ্টতার প্রশ্রয় দেননি। কাজেই মুসলমানদের নিয়ে সেখানে কোন ভয়াবহ সমস্যা ওঠেনি।

পাশ্চাত্য দেশের সামাজিক জীবনেও একটা অসংলগ্নতা আছে, সেটা হচ্ছে কাঞ্চন-কৌলিন্য নিয়ে। সেজন্যই সেখানে ধনিক ও সর্ব্বহারাদের মধ্যে আড়াআড়ি ঘনিয়ে উঠেছে। প্রাচীন ভারতের সর্ব্বহারা তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন ছিল না, তারা চারু দত্তের মত শ্লোকে খেদ প্রকাশ ক'রে ইতি ক'রতো। কাজেই এ সমস্যা তখন সঙ্গীন হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন সে রামও নেই,

সে আযোধ্যাও নেই। এখন আছে শুধু বৈষম্যবোধজনিত জ্বালা আর আধুনিক জীবনসংগ্রামের নির্মম ও নিষ্করুণ বাস্তবিকতা।

হিন্দু-মুসলমানসমস্যা হেসে উড়িয়ে দেবার কিংবা ফষ্টিনাষ্টি করবার বিষয় নয়। সমস্যা আছে—এটা জলজ্যান্ত সত্য। তবে এর কারণ সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি ততটা পরিষ্কার নয়। যখনি নিজেদের কথা ওঠে, তখনি কুয়াশার ঝাপ্‌সা ভাব আমাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ ক'রে দেয়। কিন্তু আমাদের ভারতীয় প্রাণের অন্তরতম স্থানে কোথায় যেন একটা মিলনেচ্ছা সুপ্তাবস্থায় রয়েছে। সেখানে মাঝে মাঝে বেদনার একটা ক্লেশকর স্পন্দন অনুভূত হয়। সমস্যার মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটন করা দুষ্কর বটে। কিন্তু কতকগুলি 'নেতি'-বাচক তথ্য সহজেই বোধগম্য হবে। কোন দেশদ্রোহী মুসলমান কুচক্রীর মগজে এ সমস্যার প্রথম উদ্ভব হয়নি। কোন ভেদনীতিকুশল রাজপুরুষের যাদুতে এর প্রাথমিক উন্মেষের রহস্য নিহিত নেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না হলে কোন মায়াবী ভেল্কির জাল পাততে রাজী হয় না। মল্লিক মহাশয় জার্মান দার্শনিক হেগেলের ওপর বিরূপ। কিন্তু হেগেলের মতবাদ হয়তো সমস্যার ওপর আলোকপাত করবে। ভারতের মনীষা dialectic-এর পথ অনুসরণ ক'রে আসছে। এই ডায়েলেক্‌টিকের তিনটি স্তর আছে—প্রতিজ্ঞা, বিরোধ ও সমন্বয়। বিরোধের স্তরে ভারতের মনীষা প্রকটিত হচ্ছে হিন্দুমুসলমানসমস্যায়। কিন্তু বিরোধ শেষ কথা নয়। তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ সমন্বয়ের অবস্থা এখনও অব্যক্ত রয়েছে; সমন্বয় অভিব্যক্তির প্রতীক্ষায় আছে। প্রকৃতির বিধানে শীতের পর বসন্ত একদিন আসবে এবং ঝড়ের পর সূর্য্যের কিরণ শান্তির বার্ত্তা ঘোষণা ক'রবে। এই আশার বাণী ডায়েলেক্‌টিকে অস্ফুটভাবে ধ্বনিত হচ্ছে।

শ্রীআশানন্দ নাগ

Days of Hope—By Andre Malraux (Routledge)

স্পেনের অন্তর্বিপ্লব অবলম্বন করে রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদ-পত্র সঙ্ঘের প্রতিনিধি ও বহু সংখ্যক পর্য্যটক তাঁদের মতামত ও মানসিক

প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন। অধিকাংশ রচনা রচয়িতার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিমতের প্রভাবে একদেশদর্শী, কিম্বা অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক তর্কের প্রাবল্যে কষ্টপাঠ্য। যে অল্প সংখ্যক গ্রন্থ উচ্চ আদর্শে প্রণোদিত তার মধ্যে নির্য্যাতিতের প্রতি সমবেদনার আতিশয্য পাঠকের মনে ক্লান্তি আনে।

আলোচ্য গ্রন্থখানির মৌলিকত্ব উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার গণতন্ত্রের রক্ষাকল্পে নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন, অথচ প্রতিপক্ষ ফ্যাশিষ্ট শক্তি সম্বন্ধে কোন উষ্মা বা তিক্ততা প্রকাশ করেন নি। স্বীয় বাঞ্ছিত তন্ত্রের পরাজয়েও নিস্ফল ক্ষোভ পোষণ করেন নি। অর্থের অসম বণ্টন প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধির প্রতিবিধান তাঁর কাম্য হলেও এই সমস্যা-সঙ্কট তাঁর মানসিক বিকার সৃষ্টি করে নি। কথাশিল্পী তিনি ; আদর্শের খাতিরেও অশোভন উত্তেজনা প্রকাশ করতে নারাজ। সাধারণ লোকের মধ্যে শৌর্য্য ও আত্মত্যাগের অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব তাঁকে সানন্দ বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল এবং তিনি তারই বিবৃতি দিয়ে গেছেন ছাড়াছাড়া ভাবে।

জার্ম্মাণ-ইটালীয় রণসম্ভার ও লোকবলে সজ্জিত দোর্দ্দণ্ড ফ্যাশিষ্ট বাহিনীর প্রতিপক্ষে শৃঙ্খলাহীন প্রায় নিরস্ত্র শ্রমিক-বৃন্দ অযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। পরস্পরের সংঘর্ষ অবলম্বন করে এমন কোন গাথা রচনা হতে পারে না যার তুলনা দিতে গেলে সাবেকি বীরত্বব্যঞ্জক সাহিত্যের কথা উল্লেখ করা যায়, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থাকারের লিখনভঙ্গীর প্রগাঢ় গাম্ভীর্য্য ও শক্তিমত্তা যথার্থই শ্রেষ্ঠতম গ্রীক্ ট্রাজেডীর সমতুল্য সংঘটন-সমূহের সৃষ্টি করেছে। ছোট ছোট নিষ্ফল বীরত্বের কাহিনী এমন প্রগাঢ়ভাবে মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে যে শেষ ফলাফল হয়ে গেছে গৌণ ও অবান্তর। অভিজ্ঞতা স্বোপার্জ্জিত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনায় সমাচ্ছন্ন হলেও নির্লিপ্ত ঔদার্য্যে বিমণ্ডিত।

প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি স্বাধীনতার উন্মাদনা, বেতার বক্তৃতা, সঙ্গীত ও রাজপথের কোলাহলে মুখর। রাজধানী মাদ্রিদ ও বার্সিলোনার সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ দমন করতে বেগ পেতে হয়েছিল। পরস্পর-বিরোধী ও বিশৃঙ্খল শ্রমিকসঙ্ঘগুলি সহসা দেশ-রক্ষার দায়িত্বভার পেয়ে সুসজ্জিত যন্ত্র-বাহিনীর অগ্রসর প্রতিহত করেছিল মেদ ও মাংসের দ্বারা। শিক্ষিত অফিসারের অভাবে ভুঁই-ফোঁড় নবীন নেতারা নিষ্ফল পরাক্রমে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে পরোক্ষভাবে

করেছিল নিগ্রহের প্রবর্ত্তন। ক্রমে বিদেশী আদর্শবাদীরা গঠন করলো আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী। তারই বিমান বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন গ্রন্থকার।

বিমান-বাহিনীর গঠন ও যুদ্ধের বিবরণ গ্রন্থখানির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বর্ণনা খরধার ও দ্রুতগামী, বড় বড় সমস্যাকে স্পর্শ মাত্র করে মোড় ঘুরে গেছে। প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানব মনের স্তুতিবাদ আছে ক্ষণে ক্ষণে কিন্তু এত আচম্বিতে যে চমক ভাঙবার অবসর থাকে না। উদাহরণ দিলে এর বৈচিত্র্য বোধগম্য হবে—

দুই ঘণ্টা পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে যে সকল এরোপ্লেন শত্রু শিবির আক্রমণ করতে গেছে সে গুলির ফিরবার সময়ও উত্তীর্ণ হলো বলে—সিগারেটের ধোঁয়া স্বাভাবিক অলস চক্রাকার উত্থান ভঙ্গী ছেড়ে ভীতত্রস্ত ফুৎকারে পরিণত হয়েছে। অজানা আশঙ্কায় কথোপকথন মৃদু হতে মৃদুতর হতে চলেছে। বিশ জোড়া চক্ষু সুদূর পাহাড়ের মাথায় দিগন্ত রেখায় নিবদ্ধ। সকলেই জানে কোন না কোন এরোপ্লেন ফিরবে না। প্রত্যেকে ভাবছে তার নিজের মৃত্যুর দিনেও সহকর্ম্মীরা এমনি অধীর ভাবে ধূমপানের অন্তরালে মানসিক উত্তেজনা প্রচ্ছন্ন রাখবার প্রয়াস পাবে। কমাণ্ডার মাঞ্চীন (গ্রন্থকার?) স্বয়ং অন্তরীক্ষে অন্তর্হিত। সহসা অনুচ্চ আলাপও স্তব্ধ হয়ে গেল। একটি জাহাজ পর্ব্বতের অপর প্রান্ত হতে নেমে এল। এঞ্জিন দুইটিই নীরব। অপরাহ্নের কর্কশ আলোকে পাণ্ডুর প্রান্তর পৃথিবী হতে বিযুক্ত কোন হতপ্রাণ গ্রহের মত দেখাচ্ছিল। মাঞ্চীন অক্ষতভাবে বেরিয়ে এসে টেলিফোন করতে ছুটলেন। উত্তপ্ত লোহিত ধারার উপর হতে বাহির করা হল আর একটি দেহ। সাম্যতন্ত্রের জনৈক ইংরাজ সাধক। পকেটে রক্তলিপ্ত গ্রন্থ, প্লেটো। সুদক্ষ কর্ম্মচারীর একান্ত অভাব। নবাগত স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অনভিজ্ঞ ও অক্ষম ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। অনেকে গত মহাযুদ্ধের সময় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিল—তারপর কারখানা অথবা জেলখানায় দীর্ঘকাল কাটিয়ে অথর্ব্ব হয়ে গেছে। পেশী ও দেহসন্ধির প্রতিক্রিয়াত্মক শক্তি গেছে ক্ষয়ে। একটি জার্ম্মাণ শ্রমিক তার আবেদন অগ্রাহ্য হতে ভেঙে পড়লো। দেহ যখন মনকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে জীবনের কার্য্যক্ষম সময় বিগত তখন অবস্থা হয় মর্ম্মান্তিক। কিন্তু পাঠকের হৃদয় কোন ব্যক্তিগত

জীবনের ট্রাজেডীতে বিচলিত হবার অবসর পায় না। রাশিয়ান সিবিস্কীর প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাসের মধ্যে গিয়ে পড়ে। নির্ব্বাচিত হওয়ায় সে মহা উৎফুল্ল হয়ে আত্মজীবনী ব্যক্ত করতে বসেছে। বালক কালে লোহিত বাহিনীর বিরূপভাজন হয়েছিল। এখন প্রাণপাত করে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার দাবী অর্জ্জন করতে চায়।

জনৈক সহকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে যে সে পার্টি আর সভা নিয়ে এত ব্যস্ত যে কার্য্য অবহেলিত হচ্ছে। মাঞীন কম্যুনিষ্টদের কিছু বলতে চান না—পার্টির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ এত নিগূঢ়, প্রায় দৈহিক, যে তাঁর বিস্ময় বোধ হয়। সমস্যার অন্ত নাই। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর মধ্যে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর ধরা পড়ে। স্বেচ্ছাসেবকেরা পরস্পরের কাছে জানতে চায় ফ্যাশিষ্ট শক্তির প্রতিপক্ষে জীবন বিপন্ন করবার কারণ কী, উত্তর শুনে মঞীন স্থির করেন মানুষের স্বভাবই হচ্ছে সহজ প্রবৃত্তিকে যুক্তাভ্যাসের জটিল আচ্ছাদনে আবৃত করা।

ফ্যাশিষ্টদের শ্রেষ্ঠতম যন্ত্র-বাহিনী অগ্রসর হচ্ছিল বঙ্কিম সরীসৃপ রেখার মত। মাঞীন-এর বিমান বাহিনী মেঘের অবগুণ্ঠনে দেহ ঢেকে অগ্রসর হলো। চুল্লীর উপরের কম্পমান বাষ্পরেখার মত গ্রীষ্মের উত্তাপ-লহরী পৃথিবী বেষ্টিত করে ছিল। অনন্ত শান্তির মধ্যে নিমগ্ন তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তর চক্রবালে মিশেছে। এখানে সেখানে চাষীর টোকা। ক্রমে ধরণীতল রুক্ষ শিলায় সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল। আল্‌কাজার ও পরিত্যক্ত বৃষ-ক্রীড়া চক্র সমেৎ বাদাজজ এগিয়ে এলে দৃষ্টিপথে। নিম্নে সনাতন স্প্যানিশ সহর। বিবর্ণ মলিন গৃহাচ্ছাদনের অন্তরালে বাতায়ন গাত্রে কৃষ্ণাভ সুন্দরী। শিশু-অঙ্গুলি নিস্বনিত ক্ষীণ পিয়ানো ধ্বনির শ্রোতা শীর্ণ বিড়াল। আকাশপথের পরিপ্রেক্ষিতে ভ্রম হয় মনুষ্যবিরচিত সব কিছুই শুষ্ক ক্ষণভঙ্গুর—যেন প্রথম বোমার আঘাতেই ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। মৃত্তিকা রং-এর ছদ্মবেশে লরীর অভিযান নিশ্চল পথরেখার সঙ্গে মিলিয়ে ছিল। সহসা বোধগম্য হল তাদের গতি। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পার্শ্ব অনলের রক্তিম বিস্ফোটনে ও ধূমে ভরে গেল। শ্বেত পাগড়ী পরিহিত বিন্দু বিন্দু মূর দেহগুলি ছন্নছাড়া হয়ে ছড়িয়ে পড়লো—ভয়ত্রস্ত পিপীলিকাবৃন্দ যেন অণ্ড বহন করে পালিয়ে চলেছে। শান্তিপ্রিয় সেমব্রান-এর অভ্যাস ছিল অকারণে গুলি বর্ষণের মধ্যে নেমে আসা, বিবেক যাতে ভাববার অবসর না পায়।

স্কালী বিপর্য্যস্ত বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে কাতর হয়ে পড়েছিল, তথাপি মূষিকের গর্ত্তের উপর মার্জ্জারের দৃষ্টির মত তাঁর সচকিত চক্ষু শত্রুর অক্ষত অংশের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। জার্ম্মান য়ুঙ্কারের দল পশ্চাদ্ধাবন করাতে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করতে হলো। কার্য্য তখন সিদ্ধি হয়েছে।

আকাশ-যুদ্ধের উত্তেজনার পর হাসপাতালে আঘাতপ্রাপ্ত সহকারীদের পরিদর্শন কার্য্য ছিল মাঞ্জীন-এর ক্লান্তি অপনোদনের অভ্যস্ত উপায়। যন্ত্রণার আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে আহত সৈনিকদের উদ্দীপনাপূর্ণ তর্ক-বিতর্ক ও সমাজ-সংস্কারের পরিকল্পনা তাঁর মানসলোকে রেখাপাত করতো না। সমাজতন্ত্রের চেয়ে গভীরতর কোন কারণ তাঁকে মুক্তি-সংগ্রামে নামিয়েছে, তেমনি অজ্ঞাত কারণেই আকৃষ্ট করতো কথার অন্তরালে মোটা মানব-সত্তার প্রতি। যেদিন তিনি নবীন ইংরাজ যুবকটিকে আশ্বাস দিতে পারলেন যে সে চলৎক্ষম হবে সেদিন জগতের অস্তিত্ব তাঁর কাছে সার্থক প্রতীয়মান হলো।

সূর্য্য যখন অস্তগামী হল, টলিডো সহরটি পড়েছিল বিশাল প্রান্তরের মাঝে প্রক্ষিপ্ত মালার মত। নদীর বাঁকে ঠেলে উঠেছিল আল্‌কাজার। জ্বলন্ত গৃহশ্রেণী হতে উত্থিত ধুমরাশির বক্ররেখা পাণ্ডুর শিলারাজি স্পর্শ করে চলেছিল। যুদ্ধ-বিরতির ক্ষণিক অবসরটুকু সন্ধ্যার দীর্ঘায়িত অর্দ্ধ-আলোকে পূর্ণ শান্তি ঘোষণা করছিল। মেঘের উপরের আকাশ হয়েছিল অপরূপভাবে নির্ম্মল। জেম গান গেয়ে চলেছিল মনের আনন্দে। পুবের বাতাস মেঘগুলিকে ঠেলা দিয়ে নিয়ে চলেছিল। হঠাৎ ছিদ্রের মধ্যে দৃষ্টি পড়তে মনে হলো ধরণী আবর্ত্তনশীল। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যেন একখণ্ড উপেক্ষিত পরমাণু বিশেষ। জেম চক্রাকারে উঠে চল্লো। তার বিমান যন্ত্রটি যেন আর একটি খর্ব্বকায় গ্রহ বিশেষ। মেঘের আচ্ছাদন ভেঙে যেতে শিকার প্রবৃত্তি জেগে উঠলো।

রাত্রির ঘনান্ধকারে এরোপ্লেন ফিরে এসে নামবার সময় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। লেলিহান অগ্নিশিখা সমেত যন্ত্রখানি উল্টে গেল। তিনটি আহত ও তিনটি মৃত দেহ বাহির করা হলো। সর্ব্ব শেষে জেমকে দেখা গেলো—সে শূন্যের মধ্যে হস্ত প্রসারিত করে বেরিয়ে এল—অন্ধ হয়ে গেছে।

বিমান বিভাগের পরিচয় দিতে গিয়ে অনেকখানি স্থান দখল করলাম অথচ কিছুই বলা হল না। গ্রন্থখানির বিচিত্রতর অংশ হচ্ছে পদাতিক বাহিনীর কথা।

পুলিশ কর্ত্তা গার্সিয়ার অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিপদের সময় সিভিল গার্ড, এ্যানার্কীষ্ট, কম্যুনিষ্ট ও পার্টি-বিহীন উদ্‌ভ্রান্ত আদর্শবাদীদের সমন্বয়ে যে গণতন্ত্র গঠিত হয়ে উঠেছিল তার প্রকৃতি যে সমস্যাপূর্ণ হবে সহজেই অনুমেয় কিন্তু গ্রন্থকারের কৃতিত্ব সেগুলিকে এমন একটি উচ্চ স্তরে তুলেছেন যেখানে দ্রষ্টব্য হয় স্পেনের সনাতন মানব-সত্তা।

স্পেনের জাতীয় চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয়। আপাত প্রসারিত সামাজিক বিপ্লবের অন্তরালে সেই আদিম আফ্রিকান মন বিদ্যমান রয়েছে। তার কাঠিন্য; শারীরিক যন্ত্রনার প্রতি অবজ্ঞা; রাজ-কার্য্যে শিথিলতা; রাজনৈতিক চালের প্রতি অশ্রদ্ধা; সাহস ও শক্তির অপব্যয়, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিকীর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থে তারই প্রতিচ্ছায়া দেখেছি।

বর্ত্তমান যুগের শ্রেণীসংঘর্ষের মধ্যে সাবেকি গ্রীক ট্রাজেডীর মত শক্তি-সম্পন্ন ঘটনার সমাবেশ একমাত্র স্পেনেতেই সম্ভব। সেখানে ব্যক্তিবিশেষের স্বতন্ত্র সত্তা এত স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট যে সঙ্ঘবদ্ধ আত্মোৎসর্গের মধ্যেও পৃথগাত্মার বেদনা শ্রুত হয়।

গ্রন্থ হতে যেটুকু সংক্ষিপ্তসার উপরে তুলে দিয়েছি তাই হতে এ যুক্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে না, জানি। অনেক কথা ঘটনার তালিকা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। পুইগ, হার্নাণ্ডিস্ প্রভৃতি নেতৃবর্গের স্বল্প-পরিসর জীবন ও জিগেনেস, মার্সিয়ার অমীমাংসিত সমস্যার ভার পাঠকের হৃদয়ে যে রেখা রেখে যায় তার নিদান স্পেনের ঐতিহ্যে।

গ্রন্থখানির একটি দোষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এতে স্প্যানিশ রমণীর আত্মত্যাগ ও বীরত্ব যথোপযুক্ত স্থান পায়নি।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেক্‌জান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুঞ্জভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

বিষয়-সূচী

পুস্তক-পরিচয়

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

পরিচয়

বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষণ

[১৯৩৮ এপ্রেল মাসের 'থিয়সফিষ্ট' পত্রিকায় ডাক্তার ভগবান্‌দাসের 'The World's Dire Need for a Scientist Manifesto'—ইতি শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধের প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তত্ত্ববিদ্যা-সমিতির সভাপতি ডাঃ অ্যারাণ্ডেল্ লিখিয়াছিলেন :— The President of the Theosophical Society requests that all General Secretaries of Sections and F. T. S's will help to the best of their ability in the widest possible circulation of this appeal। তদনুসারে এই প্রবন্ধাবলি লিখিত হইল। বাস্তবিক ডাঃ ভগবান্‌দাসের উল্লিখিত প্রবন্ধে জানিবার ও ভাবিবার অনেক কিছুই আছে। প্রবন্ধটি বেশ চিন্তাপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। ঐ প্রবন্ধে ডাঃ ভগবান্‌দাস বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিয়া যে মর্মবাণী ঘোষণা করিয়াছেন, পৃথিবীর বর্তমান সঙ্কট দশায় সে বাণী আমাদের বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য।

ডাঃ ভগবান্‌দাস কাশীর একজন প্রখ্যাত নাগরিক। তিনি মিসেস্ বেসেণ্টের সহযোগী ও সহকর্মী ছিলেন। এ প্রবীণ বয়সেও তিনি নানা জনহিতকর ব্যাপারে নিযুক্ত আছেন। ডাঃ ভগবান্‌দাস সুপণ্ডিত ব্যক্তি। পাণ্ডিত্য অনেকস্থলে Pedantry অর্থাৎ, পণ্ড কর্মে পটুতা মাত্র। ভগবান্‌দাস সে ধরণের পণ্ডিত নন—তাঁহাতে প্রকৃত 'পণ্ডা' (wisdom) আছে। সেই জন্য তিনি যাহা কিছু লিখেন তাহাই মর্মগ্রাহী ও আন্তরিকতাপূর্ণ হয়। তাঁহার

Science of Emotions, Science of Social Organisation, Science of Peace, 'শ্রীকৃষ্ণ', 'সমন্বয়' প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ এ কথার প্রমাণ। পাঠক মনোযোগী হইয়া নিম্নলিখিত প্রবন্ধে তাঁহার বক্তব্যের অনুধাবন করিলে আমার উক্তি যে অত্যুক্তি নয়—তদ্‌-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবেন।]

(১)

Science-কে বাংলায় আমরা 'বিজ্ঞান' বলি। বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞান= বিশিষ্ট জ্ঞান—systematised knowledge,—knowledge regarding any department of mind or matter—co-ordinated, arranged and systematised (Ogilvie)—অর্থাৎ সংহত সমস্ত সজ্জিত জ্ঞানই বিজ্ঞান।

ইয়ুরোপের প্রধান কৃতিত্ব এই বিজ্ঞান। স্মরণ রাখিবেন—তিন শতাব্দী পূর্বে, আমরা যাহাকে বিজ্ঞান বলি, ইয়ুরোপে তাহার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না। Three centuries ago, Science, as we understand it, did not exist—Dr. Richardson। কিন্তু বিগত তিনশত বৎসরে বিজ্ঞান কি বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করিয়াছে! বৈজ্ঞানিক বিবিধ ক্ষেত্রে কি অকুণ্ঠ ধৈর্য, কি অদ্ভুত সহিষ্ণুতা, কি ত্যাগ, কি সাহস, কি উৎসাহ, কি অধ্যবসায়, কি গবেষণা, কি নৈপুণ্য, কি উদ্ভাবিনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন! বস্তুতঃ বিবিধ বিভাগে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট কীর্তির কথা যদি একবার স্মরণ করা যায়—Steam Engine, Wireless, Aeroplane, Telescope, Microscope, Bioscope, Photography, Phonography, Electric Light, Rontgen Rays, Television, Vitamins, Chloroform, Antiseptic, ইত্যাদি—'নাম নিব কত'—যাহাদিগকে 'Marvels of Modern Civilisation' বলা হইয়াছে—তবে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। তাই বলিতে ছিলাম—বিজ্ঞানই প্রতীচ্যের গৌরব এবং ঐ বিজ্ঞানের আলোক দ্বারা প্রাচ্যকে উদ্ভাসিত করিবার জন্যই বোধ হয় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলন।

কিন্তু এত সত্ত্বে, একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গে ব্যর্থতা জ্বলদ্‌-অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। (ব্যর্থতার ইংরাজি প্রতিশব্দ Frustration)।

সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র ৫০ বৎসর পূর্বে এই ব্যর্থতার পীড়া অনুভব করিয়া তাঁহার 'ধর্মতত্ত্বে' বিজ্ঞানকে এইরূপে ধিক্কৃত করিয়াছিলেন ঃ—

'এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্ত-মাংসপূতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা-বারুদ-ব্রীচ্‌লোডর-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তৎসমুদয় ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ার মুখী এদেশে আসিয়াও কালামুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না।'

সম্প্রতি জন্ স্পিয়ার (John Spiers) নামক একজন চিন্তাশীল লেখক এক সাময়িক পত্রে 'The Frustration of Science' নাম দিয়া একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, 'Frustration is writ large on the face of modern science'। স্পিয়ার সাহেবের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করি।

The very purpose of Science is to fill the human need for the conquest of nature. But at first sight to look around the world today, one would think that the purpose of Science was to throw people out of work, to design weapons of destruction and to cause world-misery.

অর্থাৎ, জগতের বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়—বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য আর সত্যের সন্ধান নয়, মানুষের জ্ঞান-বৃদ্ধি নয়—প্রাণী-হত্যার জন্য অস্ত্র রচনা,—বেকার সমস্যার বৃদ্ধিকরণ ও পৃথিবীর দুঃখ-বিবর্ধন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ লেখক বলিতেছেন—

Nearly every big industrial group keep their own staffs of special scientific research-workers and are ready at once to turn suitable discoveries to *profit-making* ends. * * At the present time, about £ 350,000 per annum is being spent by these Research Associations on obtaining new knowledge for their industries.

অর্থাৎ, ধনিকেরা স্ব স্ব ধনবৃদ্ধির জন্য যে সকল বিপুল কারুকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাদিগের ধনাগমের

পথ প্রশস্ত করিবার জন্য তৎসম্পর্কে বেতনভোগী বৈজ্ঞানিক নিযুক্ত আছেন। এ জন্য বর্ষে বর্ষে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়।

পুনশ্চ,—

If a medical research worker discovers a new vitamin, it is at once exploited by all the big manufacturers of patent medicines.

প্রত্যুত দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক এ যুগে প্রায়ই বিষয়ীর বৃত্তিভোগী ভৃত্য এবং বিজ্ঞানের গবেষণার্জিত আবিষ্ক্রিয়া লোকের হিতার্থে প্রযুক্ত না হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহের সৌকর্যার্থে বা পরপীড়নে নিয়োজিত। ইহা 'Frustration of Science' নয় ত কি ?

Chemists, physicists, mathematicians, physiologists and all technical engineers and inventors are forced to sell their labour to the various combines, industrial companies or to so-called national institutions, where their labour is put to the same exploitation or to the furtherence of short-sighted nationalism or for war. * * To them the scientist, like the manual worker, is just another servant, a servant with a brain.

যে রচনাকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে, তাহাতে ডাঃ ভগবান্‌দাস এ সম্পর্কে লিখিতেছেন—

The greatest theoretic discovery of Science is claimed to be the law of the 'struggle for existence'—a *half-truth* * * This half-truth, emphasised and approved by Science as if it were the *whole* truth, and followed in all human affairs, individual and national, has brought about the *prostitution* of Science to the service of the sword and the purse, for the misery of of mankind. It is driving mankind towards Avernus, and will plunge them into it, together with all Science and all Scientists * * and civilisation itself will perish and mankind once more reel back into the beast for long ages—*unless* the Scientists resolve to act before it is too late.

অর্থাৎ এ যুগে বিজ্ঞানের প্রচারিত প্রধানতম সত্য জীবনসংগ্রাম—জীবে জীবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ। এ তথ্য সত্যের আধখানা মাত্র। কিন্তু কি ব্যক্তিগত, কি

জাতিগত—জীবনের প্রত্যেক বিভাগে এই অৰ্দ্ধ সত্যের প্রচারের ফলে মানুষ জাহান্নমে যাইতে বসিয়াছে এবং বিজ্ঞান ধনিক ও ধানুকীর নিকট আত্ম-বিক্রয় করিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে ও দরিদ্রের নিষ্পেষণে নিযুক্ত হইয়াছে। ফলে নরকের পথ পরিষ্কৃত হইতেছে এবং রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞান-সহিত অচিরে পর্য্যুদস্ত হইবে—যদি না বৈজ্ঞানিক অতি শীঘ্র মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হন।

বিজ্ঞান যে এইরূপে নিজের ব্যর্থতা ও বন্ধ্যাত্ব ঘটাইতেছে, তাহার মুখ্য কারণ কি? ভগবান্‌দাস বলেন, ইহার মুখ্য কারণ—'Science has outrun Morals', অর্থাৎ বিজ্ঞান ধর্মের বি-সহচর; ধর্মোন্নতির সহিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গতি নাই। চারি বৎসর পূর্বে বৃটিশ বিজ্ঞান-সভার সভাপতিরূপে Sir Alfred Ewing এই কথাই বলিয়াছিলেন—

Man is ethically unprepared for the great bounty. In the slow evolution of morals, he is still unfit for the tremendous responsibility it entails. The command of Nature has been put into his hands before he knows how to command himself.

এ সম্পর্কে আর একজন বৈজ্ঞানিকের উক্তি শুনুন। ইনি লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোড্—Professor C. E. M. Joad, Head of the Department of Philosophy and Psychology, Birkbeck College in the University of London। ইনি বলেনঃ—Science has given us powers fit for the gods; yet we bring to their use the mentality of public school boys and savages. * * The superman made the aeroplane and the ape has got hold of it.

এই জন্যই ত' যত অনর্থ! এই জন্যই বিজ্ঞানের অপ-ব্যবহার, অন্যায্য ব্যবহার—That is why science is being misused, is being used most unrighteously.

ডাঃ ভগবান্‌দাস প্রশ্ন করিতেছেন—

What is the good of marvellous genius and wonderful industry in extorting the most closely hidden secrets of Nature from earth and water,

fire and air and sky, exploring the endless wonders of the Infinite and the Infinitesimal—*if* all these are to be utilised for mutual vast mass-murder by human beings ?

তদপেক্ষা প্রাচীন কালে যে প্রথা প্রচলিত ছিল—ঐ প্রকার দুর্লভ আবিষ্কার, যাহার অপব্যবহারে জগতের বিষম অহিত হইতে পারে—তাহাকে আবিষ্কর্তা কুলবধূর মত গোপনে রাখিতেন—'to keep them as close secrets in the custody of the pure and the philanthropic'—প্রাণান্তেও সাধারণে প্রকাশ করিতেন না—সেই প্রথাই ত' শতগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। প্রাচীন ভারতে ঐ নিয়মই চিরদিন অনুসৃত হইত। সে জন্য আমরা শুনিতে পাই—বিদ্যা আসিয়া 'ব্রাহ্মণ'কে বলিলেন—আমি তোমার 'সেবধি', তোমার নিধি—আমাকে 'গোপায়'—"Guard me as a secret trust, give me not to the wicked and sinful, but only to the pure of heart and large of mind; so only shall I be strong to nourish mankind; otherwise I shall only destroy thee and thy pupils and thy people".

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণম্ আজগাম—
গোপায় মাং শেবধিস্তেঽহম্ অস্মি।
অসূয়কায় অনৃজবেঽযতায়
মাং মা দাঃ বীর্যবতী তথা স্যাম্।

মনু এই বৈদিক আদেশের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেঽস্মি রক্ষ মাম্।
অসূয়কায় মাং মা দাঃ তথা স্যাং বীর্যবত্তমা।—২।১১৪

এ যুগে বিদ্যার ঐ প্রকার 'গোপায়ন' সম্ভব কিনা সন্দেহ। তবে বিদ্যার যেন অপ-ব্যবহার না হইতে পারে, তদ্‌বিষয়ে ত' আমাদের সতর্ক হওয়া চাই। ইহার সদুপায় কি ? আগামী বারে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

অহিংসা

বর্ষাকালে সদানন্দ অবসর পান বেশী। বড় চালাটার নীচে সর্ব্বসাধারণের জন্য সভা বসে মাঝে মধ্যে, লোকজন আসেও খুব কম। সামান্য জলকাদা ভক্তদের উৎসাহ কমাইয়া দেয় দেখিয়া সদানন্দ ক্ষুণ্ণ হন। নানারকম খটকা জাগে মনে। লোকে কি তাঁর কথা শুনিতে আসে হুজুগে পড়িয়া, সময় কাটানর জন্য ? একটু কষ্ট স্বীকার করিবার দরকার হইলেই অনায়াসে আসাটা বাতিল করিয়া দেয় ? কিন্তু আশ্রমের ভাণ্ডারে দান হিসাবে প্রণামী তো তাঁকে প্রায় সকলেই দেয়,—কেউ দেয় যতবার আসে ততবারই, কেউ দেয় মাঝে মাঝে। ঘরের কড়ি পরকে দেওয়া ত্যাগ বৈকি। বিনিময়ে পুণ্য অবশ্য তারা পায়। কিন্তু বর্ষাকালে পুণ্যের দরকারটা এত কমিয়া যায় কেন ওদের ? পুণ্যও কি বাজারের ভাল মাছ তরকারীর সামিল ওদের কাছে, জলকাদা ভাঙ্গিয়া যোগাড় করার চেয়ে ঘরে যা আছে তাই দিয়া কাজ চালাইয়া দেয় ? সবচেয়ে বেশী ক্ষোভ হয় সদানন্দের, বর্ষার জল ভক্তদের কাছে তাঁর আকর্ষণকে জলো করিয়া দিতে পারে বলিয়া। অহংকার বড় আহত হয়। এদিকে আশ্রমের কাজেও বর্ষাকালে শৈথিল্য আসে। নিজের নিজের কুটীরে বসিয়া উপাসনা জপতপ পূজার্চ্চনা যার যত খুসী করে, যার যত খুসী করে না, সকলকে একত্র করিয়া সদানন্দ উপদেশ বিতরণ করিতে আসেন কম। কোনদিন বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, কোনদিন থাকে মুষলধারে বর্ষণ। সদানন্দ হয়ত মেঘে ঢাকা আকাশকে উপেক্ষা করিয়া নদীর ধারে খানিকটা ঘুরিয়া আসেন, হয়ত বাহির হইয়া যান কেবল বৃষ্টিতে ভিজিতে। অথবা হয়ত নিজের ঘরে শুইয়া বসিয়া পড়েন বই। আশ্রমের নরনারীদের উপদেশ দিতে যান খুব কম।

মাধবীলতা মাঝে মাঝে আসে। উপদেশ শুনিয়া যায়।

হিল তোলা জুতা খট্ খট্ করিয়া হাজির হয় সে একেবারে সদানন্দের অন্তঃপুরে। এটা আশ্রমের নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু সদানন্দ নিজেই যখন অনুমতি

দিয়াছেন, নিয়ম অনিয়মের প্রশ্ন কে তুলিবে। বিপিন তুলিতে পারে, সদানন্দকে পাগল করিয়া দিতে পারে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলিয়া, কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। একদিন দুপুরবেলা মাধবীলতা আসিবার পর সদান্দকে জানাইয়া হঠাৎ সে চলিয়া গিয়াছিল বাহিরে, বলিয়া গিয়াছিল ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। আধঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ।

না, বুকে সদানন্দ মাধবীলতাকে টানিয়া নেয় নাই। খাটের একপ্রান্তে পা ঝুলাইয়া মাধবীলতা যে ভাবে বসিয়া ছিল, এখনও বসিয়া আছে তেমনি ভাবেই, তেমনি মনোযোগের সঙ্গে শুনিতেছে সদানন্দের কথা। কেবল সদানন্দের দৃষ্টি বড় কোমল, বাস্তব মমতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি যেন কোন কিছুর রূপ ধরিয়া দু'চোখে ফোয়ারার মত উৎসারিত হইয়া উঠিবে, মুখের কথা শেষ হওয়ার শুধু অপেক্ষা।

মাধবীলতার মুখখানা টস্ টস্ করিতেছে জীবনীশক্তির রসে। আর হ্যাঁ, চোখ দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে বটে মেয়েটার।

'মাধবী বলছিল এখানে থাকতে ওর ভাল লাগছে না বিপিন। কদিন থেকে ওর মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে—রাত্রে ঘুমোতে পারে না।'

'তাই নাকি!' বলিয়া বিপিন এমন একটা আপশোষের শব্দ করিল যে ঘরের করুণ আবহাওয়াটা বীভৎস প্রতিবাদে ওই সামান্য শব্দটুকুরও মধ্যে বজ্রের মত গর্জ্জিয়া উঠিল। 'কি বললি?' বলিয়া সদানন্দ যে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন সে শব্দটা তুলনায় শোনাইল যেন ক্ষীণকণ্ঠের ফিসফিসানি কথা।

তারপর কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপ। একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, ঘর হইতে চলিয়া গিয়া আরেকটা ভুল বিপিন করিল না। ঠিক সময় মতই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সে বলিল, 'অন্য কথা ভাবছিলাম।'

সদানন্দ বলিলেন, 'ও!'

'এখানে থাকতে তোমার ভাল লাগছে না মাধবী?'

'লাগছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।'

কেন? মাঝে মাঝে মন খারাপ হইয়া যায় কেন মাধবীর? বাড়ীর জন্য? না, বাড়ীতে এমন কে আছে মাধবীর যার জন্য মন কাঁদিবে। তবে? মাধবী শুধু মাথা নাড়ে, মুখ ফুটিয়া শুধু বলে, জানি না। বাহিরে আকাশ ছাইয়া

মেঘ করিয়াছে, ঘরের ভিতরটাও যেন ঐরকম ভারাক্রান্ত হইয়া ওঠে। চুরি করিয়া আনা একটি যুবতী মেয়ের মন খারাপ কেন প্রশ্ন করিয়া আবিষ্কার করা কি সহজ ব্যাপার! অন্য কোথাও যাইতে চায় মাধবী? না, এইখানেই মাধবী থাকিবে, চিরকাল থাকিবে, যতদিন তার দেহে প্রাণ থাকে ততদিন।

সদানন্দ ও বিপিন মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। গুমোটে সদানন্দ ঘামিয়া গিয়াছেন, এবার বিপিন ঘামিতে আরম্ভ করে ভিতরের উত্তেজনায়। ভুল বিপিন সহজে করে না, মাধবীলতার সম্বন্ধে কেবলি ভুল হইয়া যাইতেছে। ছোট একটা টুলে বসিয়াছিল বিপিন, জানালা দিয়া বাহিরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সে মৃদুস্বরে বলে, 'আশ্রমে আটকা পড়ে গেছ কিনা, সেইজন্য খারাপ লাগছে। কদিন বাইরে থেকে ঘুরে এলে বোধ হয় ভাল লাগত। নারাণবাবু আমায় নেমন্তন্ন করেছেন পর্শু, যাবে আমার সঙ্গে মহীগড়ে? বেশ জায়গাটা।'

মাধবীলতা মাথাও নাড়ে, মুখেও বলে, 'না।'

বিপিনকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে শুনিয়া সদানন্দ একটু অবাক হইয়া যান, রাজপুত্র নারায়ণের জন্য মাধবীলতার মন কেমন করিতেছে না এজন্য বিপিনের খুসী হওয়ার কারণটা তাঁর বোধগম্য হয় না।

'চল, একটু বেড়িয়ে আসি আমরা নদীর ধার থেকে।' বলিয়া বিপিন উঠিয়া দাঁড়ায়, সদানন্দের দিকে চাহিয়া বলে, 'আমরা যাই প্রভু?'

সদানন্দ গম্ভীর ভাবে বলেন, 'যাও।'

সেইদিন হইতে বিপিনের সঙ্গে কি ভাব মাধবীলতার! সদানন্দ স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, দুজনের মধ্যে কি যেন একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে, গড়িয়া উঠিয়াছে কেমন একটা নতুন ধরণের আত্মীয়তা। বিপিন শীত মানে না, গ্রীষ্ম মানে না, বর্ষা মানে না, বছরের সকল ঋতুতেই সে সমান ব্যস্ত, কাজে তার কখনও ঢিল পড়ে না। আমবাগানে গাছ কাটিয়া কুটীর তুলিবার স্থানগুলি বর্ষা শেষ হইবার আগেই সাফ করিয়া ফেলিবে ঠিক করায় তার কাজ বাড়িয়াছে। পূজার মধ্যে সমস্তগুলি কুটীর তুলিয়া আশ্রমের নূতন অংশটিকে সে সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু এত কাজের মধ্যেও বিপিন মাধবীলতার সঙ্গে গল্প করিবার সময় পায়, তাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইবার

সময় পায়, সে যাতে আশ্রমের ছোটখাট কাজ করিয়া সময় কাটাইতে পারে তার ব্যবস্থা করিয়া দিবার সুযোগও পায়।

সদানন্দের কাছে আসে মাধবীলতা। মাঝে মাঝে আসে। শান্ত শিশুর মত চুপ করিয়া বসিয়া তাঁর কথা শোনে, একটা অভিনব নম্রতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে। আর সমস্তক্ষণ মুখখানা তার টস্ টস্ করিতে থাকে জীবনী শক্তির রসে। তবে চোখ দিয়া কিছু টস্ টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়ে না।

সন্তর্পণে একদিন সদানন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বিপিনের সঙ্গে তোমার বেশ আলাপ হয়েছে, না

'বেশ লোক উনি। আমায় খুব স্নেহ করেন।'

'আশ্রমে থাকতে তোমার এখন ভাল লাগছে?'

'তা লাগছে। ভাল সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'কি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?'

'এই—যাতে সময় কাটে, আশ্রমের কাজ কর্ম্ম করতে পাই, ঘুরে বেড়াতে পাই—'

মাঝে মাঝে দুটি একটি প্রশ্ন করিয়া জবাবগুলি সদানন্দ গম্ভীর মুখে শুনিয়া যান। একটা দিক ধীরে ধীরে তাঁর কাছে পরিষ্কার হইয়া যায়। তাঁর কাছ হইতে মাধবীলতাকে দেখাশোনা করার হুকুম পাইয়া এতদিন দেখাশোনার একেবারে চরম করিয়া ছাড়িয়াছিল উমা ও রত্নাবলী, সর্ব্বদা চোখে রাখিয়া কি ভয়ানক আদর যত্নটাই দুজনে করিয়াছিল তাকে! সে যেন শিশু, সে যেন ভঙ্গুর, সে যেন দুষ্প্রাপ্য কিছু, সেবার স্নেহে খাতিরে শাসনে মাথায় করিয়া তাকে না রাখিলে চলিবে না। বিপিন তাকে মুক্তি দিয়াছে। একরকম কিছুই করে নাই বিপিন, উমা আর রত্নাবলীকে বলিয়া দিয়াছে মাধবীলতা যা করিতে চায় তাই যেন করিতে পায় আর মাধবীলতাকে দিয়াছে কয়েকটা দায়িত্ব। আশ্রমের এক প্রান্তে আছে গোয়ালঘর, সকালে বিকালে দুধ দোয়ার সময় সে হাজির থাকিবে, যে কুটীরে যতটা দুধ যাওয়ার কথা বাঁটিয়া দিবে। আশ্রমের মেয়েরা দুজন দুজন পালা করিয়া রান্না করে, মাধবী তাদের তরকারী কুটিয়া দিয়া সাহায্য করিবে আর যদি কেউ অসুস্থ থাকে আশ্রমে

তার জন্য প্রস্তুত করিবে দরকারী পথ্য। এমনি সব ছোট ছোট কয়েকটা কাজ।

'আপনি আমায় বলছিলেন না আশ্রমের উদ্দেশ্যের কথা, ভাল বুঝতে পারিনি। বিপিনবাবু ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'কি বলেছেন বিপিনবাবু ?'

কথা আর কথার ভঙ্গি মাধবীলতাকে একটু দমাইয়া দিল। সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'কিভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকা যায় মানুষকে তাই বুঝিয়ে দেওয়া, ধর্ম্মের মধ্যে যে বিকার এসেছে সংশোধন করা, সমাজ-গঠনে—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। জীবন, ধর্ম্ম, সমাজ, দেশ এই সবের জন্য বড় বড় কাজ করা আশ্রমের উদ্দেশ্য।'

'এভাবে বলছেন যে ? তাই উদ্দেশ্য নয় আশ্রমের ?'

আহা, চোখ দুটি ছল ছল করে মাধবীলতার। আঘাত পাইবে জানিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরানোর জন্য চোখ দুটিকে যেন প্রস্তুত করিয়া নিতেছে। হঠাৎ একটা তীব্র সন্দেহের স্পর্শে সদানন্দের মন হাত দিয়া আগুন ছোঁয়ার মত ছ্যাঁৎ করিয়া ওঠে। মনে হয়, মাধবীলতা যেন ভাণ করিতেছে। বোকামির ভাণ, সরল বিশ্বাসের ভাণ, শব্দ-সংজ্ঞাগুলির অর্থ না বুঝিয়াও তৎসংক্রান্ত চিরন্তন আদর্শবাদের যে অসংখ্য পূজারিণী আছে, সেও তাদেরই একজন,—

অথবা তাঁর নিজেরই ভুল ? যেটা মাধবীর ভাণ মনে হইতেছে মাধবী আসলে তাই, তিনি নিজেই মাধবীলতা সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন ? মাধবী প্রশ্নভরা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'মোটামুটি তাই। একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে আশ্রমের, এখানে কিছুদিন থাকলেই আস্তে আস্তে সেটা বুঝতে পারবে। আরেকদিন তোমাকে ভাল করিয়া বুঝিয়ে দেব।'

মাধবীর স্বস্তি ও কৃতজ্ঞাবোধ অত্যন্ত স্পষ্ট। নিজের অস্বস্তি ও দুর্ব্বোধ্য জ্বালাবোধ সদানন্দকে পীড়া দিতে থাকে। তিনি চিৎ হইয়া শুইয়া পড়েন। মাধবীলতা সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি, তিনিই করিয়া দিয়াছিলেন তাঁর আশ্রম বাসের সমস্ত ব্যবস্থা। মাধবী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল, মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল মাধবীর, রাত্রে ঘুম হইতেছিল না। চোখের পলকে

বিপিন তার জীবনকে সহজ ও সানন্দ করিয়া দিয়াছে। আশ্রমের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের কথা কতবার তিনি বলিয়াছেন মাধবীকে, বুঝিতে না পারিয়া মনে মনে কাতর হইয়া পড়িয়াছে মাধবী। বিপিন ত্বু'কথায় সব তাকে বুঝাইয়া দিয়াছে, হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে মাধবী।

'পা টিপে দেব ?'

সদানন্দের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে মাধবীর ঔৎসুক্য মুছিয়া যায়, চোখ নামাইয়া জড়সড় হইয়া সে বসে। প্রথম এখানে আসিয়া শেষরাত্রে সদানন্দের পিঠের সঙ্গে মিলিয়া যেভাবে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল, লজ্জায় সঙ্কোচে যেন তেমনি কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইবে। কৈফিয়ৎ দেওয়ার মত ভয়ে নিজে হইতে সে বলে, 'বিপিনবাবু বলছিলেন, আপনার একটু সেবা করতে। আপনি নাকি কারও সেবা যত্ন নেন না, বড় কষ্ট হয় আপনার।'

'না, পা টিপতে হবে না। বৃষ্টি আসছে, তুমি এবার যাও মাধবী।'

আহত হইয়া মাধবী চলিয়া যায়। রাগে সদানন্দের গা জ্বালা করিতে থাকে। মাধবীকে এ কি করিয়া দিয়াছে বিপিন ঃ নিজে আড়ালে থাকিয়া এ কি সম্পর্ক সে গড়িয়া তুলিতেছে তাঁর আর মাধবীর মধ্যে ? বিপিনের সঙ্গে কথা বলিবার সময় কত হাসে মাধবী, আশ্রমের জীবন নাকি তার হাল্কা হাসিখুসীতে ভরিয়া উঠিয়াছে, অজস্র কথা বলে, মনের আনন্দে চঞ্চলপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুণগুণ করিয়া গানও নাকি শোনা যায় তার সব সময়। প্রথম প্রথম সদানন্দের কাছেও তো প্রায় এই রকমই ছিল মাধবী, আকস্মিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় একটু যা কেবল হইয়া পড়িয়াছিল কাবু। এখন সামনে পড়িলে মনোভাবের সবগুলি উৎসমুখে সে যেন তাড়াতাড়ি ছিপি আঁটিয়া দেয়, খোলা রাখে কেবল সভয় শ্রদ্ধাভক্তির উৎসটা, আর—

এইখানে একটু খটকা লাগে সদানন্দের। আর কি ? আর কি উথলাইয়া পড়ে তাঁর সান্নিধ্যগত মাধবীর সর্ব্বাঙ্গীণ অস্তিত্ব হইতে ? পরিণত নারীর সেবা ও স্নেহের সাধ ? কিন্তু সেটা কেমন হয়। সেই সহজ ও সাধারণ সাধটা তাঁকে কেন্দ্র করিয়া মাধবীর মধ্যে যদি অস্বাভাবিক রকম জোরালো হইয়া উঠিয়াও থাকে, এইভাবে কি তা আত্মপ্রকাশ করে এমন ত্বর্ব্বোধ্য ও রহস্যময় প্রণালীতে ? সর্ব্বদা যেন আত্মসচেতন

মাধবী, সর্ব্বদা সংযত—গভীর দীনভাবে সর্ব্বাঙ্গে তার একটানা ছেদহীন রোমাঞ্চ।

বৃষ্টি নামি নামি করিয়া বহুক্ষণ আকাশে আটকাইয়া ছিল। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত বৃষ্টি আজ নামিবেই না। একবার ডাকিয়া পাঠাইলে কেমন হয় মাধবীকে, একটু সেবা করিবার অনুমতি দিলে? কোমরে আঁচল জড়াইয়া হয় তো মাধবী কুটীরের মেঝে ঝাঁট দিতেছে—শাড়ী সেমিজ এলোমেলো, চুল এলোমেলো, কথা এলোমেলো, হাসি এলোমেলো। ডাক পৌঁছিলে হাত ধুইয়া কোমরে বাঁধা আঁচল খুলিবে, চুলটা তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া লইবে, কথা ও হাসি দিবে বন্ধ করিয়া। তার সেই হিলতোলা জুতাটি পায়ে দিয়া এই উঠান পর্য্যন্ত আসিবে তাড়াতাড়ি—ঠক্ ঠক্ শব্দ স্পষ্ট কাণে আসিবে সদানন্দের। তারপর জুতা শাড়ীটা এখানে ওখানে একটু টানিয়া, দুহাতে কপাল হইতে আলগা চুল কয়েকটি শেষ বারের মত উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া বলিবে, ডাকছিলেন?

সদানন্দ উঠিয়া অন্দরে গেলেন। অন্দরে কেউ নাই। সদরে গিয়া দাঁড়াইতে চোখে পড়িল, কিছুদূরে ছোট ফুলের বাগানটিতে আশ্রমের কয়েকটি মেয়ে ফুল তুলিতেছে। তাদের একজন মাধবী। তাইতো বটে, বিশ বাইশ বছর আগে একজনকে কোমরে আঁচল জড়াইয়া ঘর ঝাঁট দিতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া মাধবীকেও যে ঘরই ঝাঁট দিতে হইবে তার কি মানে আছে!

সদানন্দকে চুপ চাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মেয়েরা কাছে আসিল। অঞ্জলি ভরিয়া পায়ে ফুল ঢালিয়া করিল প্রণাম। নীরবে নির্ব্বিকারভাবে প্রণাম গ্রহণ করিয়া সদানন্দ ভিতরে চলিয়া গেলেন। পায়ে ঢালিয়া দেওয়া ফুলগুলি কুড়াইয়া মেয়েরা আবার ফিরিয়া গেল ফুল তুলিতে।

পরদিন দুপুরবেলা সদানন্দ নিজেই ডাকিয়া পাঠাইলেন মাধবীলতাকে।

মাধবী ঘরে ঢুকিবামাত্র তার হাত ধরিয়া টানিয়া লইলেন বুকে। মাধবী বিবর্ণমুখে কাঠ হইয়া রহিল। এটা বাধাও নয়, প্রতিবাদও নয়, সদানন্দও তা জানেন! কিন্তু কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে কি আকাশ পাতাল পার্থক্য! হাতের বাঁধন আপনা হইতেই ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া গেল।

'আমাকে তুমি ভয় কর মাধবী?'

মাধবী অস্ফুটস্বরে বলিল, 'না।'

মাথায় হাত বুলাইয়া সদানন্দ তাকে একটু আদর করিলেন, এ ছাড়া স্নেহ মমতা জানানোর শারীরিক প্রক্রিয়া আর কি আছে। একটু আদর করিয়াই বুক হইতে নামাইয়া দিলেন,—মেয়েটার দম প্রায় আটকাইয়া আসিয়াছে।

'কাল তোমায় বলেছিলাম বুঝি ?'

মাধবী পুনর্জীবিতার মত অদ্ভুতভাবে হাসিয়া বললে, 'হ্যাঁ। কাল যে হঠাৎ কেন রেগে গেলেন—'

'রাগিনি—আমি কখনও রাগি না। তুমি আমায় সেবা করতে চাও—কি সেবা করবে বল ত ?'

'আপনি যা বলবেন।'

'পাকা চুল তুলে দেবে ?'

মাধবী হাসিল। পাকা চুল বাছিয়া দিবার সময় তার কোলে মাথা রাখিয়া সদানন্দ চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিলেন সমস্তক্ষণ। মাধবী চলিয়া যাওয়ার পর মনে হইল, অসময়ে আজ যেন ঘুম আসিয়াছে। উঠিয়া জানালায় গিয়া দাঁড়াইলেন। রাধাই নদীর বুক আরও ভরিয়া উঠিয়াছে। কালের মত আজও নামি নামি করিয়া আকাশে আটকাইয়া রহিয়াছে বৃষ্টি। স্তিমিত দৃষ্টিতে বিফলের মত সদানন্দ চাহিয়া থাকেন। এত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সদানন্দের, এত তেজ ও সংযম, জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে কি তীক্ষ্ণই হইয়াছে তাঁর বিচারবুদ্ধি, এখন যেন জানিবার বুঝিবার ক্ষমতাটুকুও আর নাই। অন্ধ আবেগের মত, অমর সংস্কারের মত, কেবল একটা কথা মনে জাগিতেছে, তবে কি সত্যই দেবতা কেউ আছেন অন্তরালে, মানুষ যাকে সৃষ্টি করে নাই, পাপ পুণ্য যাচাই-এর একটি করিয়া কষ্টিপাথর প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দিয়া মানুষকে যিনি স্বাধীনতা দিয়াছেন কিন্তু বিচারের ক্ষমতাটা রাখিয়াছেন নিজের হাতে, অহরহ পাপ পুণ্যের ওজন করিয়া মানুষকে যিনি শাস্তি আর পুরস্কার দিতেছেন— ? নয়তো মাধবীকে বাহু বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়া তাঁর কেন মনে হইতেছে নিজে তিনি মুক্তি পাইয়াছেন—একটা অদৃশ্য দানবের নিবিড় আলিঙ্গনের অকথ্য যন্ত্রণা হইতে ?

সন্ধ্যার সময় আশ্রমের সকলকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সাধনার সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনের সম্পর্ক লইয়া উপদেশ দিবার কথা ছিল। সদানন্দ গেলেন না। পরদিন আশ্রমের সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল, সাতদিন গুরুদেব বিশেষ সাধনায় ব্যাপৃত থাকিবেন, কেহ দর্শন পাইবে না।

বিপিন বলিল, 'মাঝে মাঝে তোর পাগলামী দেখে—'

'তুই আমার সর্ব্বনাশ করবি বিপিন।'

'মাঝে মাঝে তোর পাগলামী দেখে—'

(ক্রমশঃ)

মাণিক বন্দোপাধ্যায়

ন্যায়মতে আত্মবাদ (১)*

আত্মবাদ সর্বদেশীয় দর্শনেই সুপ্রসিদ্ধ ; সুতরাং সে-সম্বন্ধে এক্ষেত্রে আমাদের নূতন করিয়া কিছু বলিবার বোধ হয় প্রয়োজন নাই। আত্মবাদের বিচারে শান্তরক্ষিত প্রথমে নৈয়ায়িকদিগকেই পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মতও যথাযথ উপস্থিত করিয়াছেন ঃ—

অন্যে পুনরিহাত্মানমিচ্ছাদীনাং সমাশ্রয়ম্।
স্বতোঽচিদ্রূপমিচ্ছন্তি নিত্যং সর্বগতং তথা ॥ ১৭১ ॥
শুভাশুভানাং কর্তারং কর্মণাং তৎফলস্য চ।
ভোক্তারং চেতনাযোগাচ্চেতনং ন স্বরূপতঃ ॥ ১৭২ ॥
জ্ঞানযত্নাদিসম্বন্ধঃ কর্তৃত্বং তস্য ভণ্যতে।
সুখদুঃখাদিসংবিত্তিসমবায়স্তু ভোক্তৃতা ॥ ১৭৩ ॥
নিকায়েন বিশিষ্টাভিরপূর্বাভিশ্চ সঙ্গতিঃ।
বুদ্ধিভির্বেদনাভিশ্চ জন্ম তস্যাভিধীয়তে ॥ ১৭৪ ॥
প্রাগাত্তাভির্বিয়োগস্তু মরণং জীবনং পুনঃ।
সদেহস্য মনোযোগো ধর্মাধর্মাভিসংস্কৃতঃ ॥ ১৭৫ ॥
শরীরচক্ষুরাদীনাং বধাদ্ধিংসাস্য কল্প্যতে।
ইত্থং নিত্যেঽপি পুংস্যেষা প্রক্রিয়া বিমলেক্ষ্যতে ॥ ১৭৬ ॥

অর্থাৎ, অন্যে (নৈয়ায়িক প্রভৃতি) ইচ্ছাদির আশ্রয়স্বরূপ এক আত্মা স্বীকার করিয়া থাকেন ; এই আত্মা আপনা হইতেই চিন্ময় নহে (স্বতোঽচিৎ), কিন্তু তাহা নিত্য ও সর্বগত। এই আত্মাই শুভাশুভ কর্মের কর্তা এবং সেই কর্মের ফলভোক্তা। চেতনার সহিত যুক্ত হওয়াতেই এই আত্মা সচেতন, আপনা হইতে ইহা সচেতন নহে। জীবের জ্ঞান ও যত্নাদি এই আত্মার সহিতই সম্বদ্ধ, এবং এই আত্মাই প্রকৃত কর্তা বলিয়া প্রচারিত। সমস্ত সুখ, দুঃখ ও সংবিত্তির এই আত্মাই ভোক্তা। এই আত্মা যখন শরীরের সহিত সঙ্গত হয়

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture, No. 10.

এবং যখন নূতন বুদ্ধি ও বেদনাদির সহিত তাহার যোগ ঘটে, তখনই বলা হয় আত্মার জন্ম ঘটিয়াছে ; আত্মার এইগুলি হইতে বিযুক্ত হওয়ার নামই মৃত্যু। ধর্ম ও অধর্ম অনুযায়ী নূতন দেহ ও মনের সহিত যুক্ত হওয়াই হইল আত্মার পুনর্জন্ম। শরীর, চক্ষু প্রভৃতি আহত হইলে কল্পনা করা হইয়া থাকে যে এই আত্মাই আহত হইয়াছে। এইরূপে আত্মা নিত্য হইলেও আত্মার প্রক্রিয়া সম্ভব হইয়া থাকে।—ইহার পরের কয়েকটি কারিকা পুঁথিতে পাওয়া যায় না ; কমলশীলের পঞ্জিকাতেও এইখানে ত্রুটি আছে।

জ্ঞানানি চ মদীয়ানি তত্ত্বাদিব্যতিরেকিণা।
সংবেদকেন বেদ্যানি প্রত্যয়ত্বাত্তদন্যবৎ ॥ ১৭৭ ॥

অর্থাৎ, আমার যে-সমস্ত জ্ঞান জন্মায় সে-গুলি যাহার দ্বারা গৃহীত হয় তাহা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্, কারণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিও প্রত্যয় মাত্র ; এবং এই প্রত্যয় ইহা হইতে পৃথক্ কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব, এক ব্যক্তি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান যেমন অপর ব্যক্তিতেই সম্ভব হইয়া থাকে।

শঙ্করস্বামী আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ বলিয়াছেন, ইচ্ছাদির কোন বিশেষ আশ্রয় নিশ্চয়ই আছে ; কারণ যেহেতু সেগুলি বস্তু সেই হেতু সেগুলি রূপাদির ন্যায় কার্য। এই কথাই পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে বলা হইয়াছে ঃ—

ইচ্ছাদয়শ্চ সর্বেঽপি ক্বচিদেতে সমাশ্রিতাঃ।
বস্তুত্বে সতি কার্যত্বাদ্রূপবৎ স চ নঃ পুমান্ ॥ ১৭৮ ॥
বস্তুত্বগ্রহণাদেষ ন নাশে ব্যভিচারবান্।
হেতুমত্ত্বেঽপি নাশস্য যস্মান্নৈবাস্তি বস্তুতা ॥ ১৭৯ ॥

অর্থাৎ, ইচ্ছাদি সমস্ত বস্তুই অপর একটা কিছু আশ্রয় করিয়া থাকিতে বাধ্য ; কারণ যেহেতু সে-গুলি বস্তু সেই হেতু সেগুলি রূপাদির ন্যায় কার্য। এই অপর কিছুই হইল পুরুষ বা আত্মা। কারিকায় বলা হইয়াছে "বস্তুত্বে সতি", অর্থাৎ "ইচ্ছাদি যখন বস্তুরূপে বর্তমান" ; সেই জন্য ইচ্ছাদির মধ্যে নাশেরও (non-existence, annihilation) গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহাতে কোন ব্যভিচার ঘটিবে না ; কারণ নাশের বস্তুতা না থাকিলেও ইহা হেতুবিশিষ্ট (এবং হেতুবিশিষ্টতাই হইল বস্তুত্বের লক্ষণ)।—এখানে দ্বিতীয়

কারিকাটিতে প্রথম কারিকাটিরই একাংশের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ইচ্ছাদি হইল বস্তু অর্থাৎ effect, সুতরাং তাহাদের একটি কারণ আছেই। কিন্তু নাশ অর্থাৎ annihilation-ও কি একটি বস্তু ? অভাবকেও কি ভাবরূপে গণ্য করা যায় ? নাশের বিশেষত্ব এই যে এক হিসাবে ইহার কারণ আছে কিন্তু কার্য নাই। প্রথম কারিকায় "বস্তুত্বে সতি" বলায় বুঝাইতেছে যে এখানে ইচ্ছাদি বস্তুর মধ্যে নাশের গ্রহণ হইবে না, যদিও তাহার হেতুবিশিষ্টতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে আত্মা সম্বন্ধে উদ্দ্যোতকরের যুক্তি আলোচিত হইয়াছে ; তাহারই অবতরণিকা স্বরূপ কমলশীল বলিতেছেন :—উদ্দ্যোতকরের মত এই যে দেবদত্তাদি ব্যক্তির রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের প্রত্যয়ের কারণ অনেক হইলেও এক (রূপরসগন্ধস্পর্শপ্রত্যয়া একানেকনিমিত্তাঃ), কারণ দেবদত্ত তাহাদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধেই মনে করিয়া থাকে "ইহা আমার দ্বারা প্রতীত হইল" ; নর্তকী ভ্রূভঙ্গী করিলেও এইরূপেই বহু লোকে যুগপৎ মনে করিয়া থাকে যে নর্তকী তাহার প্রতিই কটাক্ষ করিতেছে।

কমলশীল উদ্দ্যোতকরের এই কথার নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—কতকগুলি লোক যদি পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখে যে নর্তকী ভ্রূভঙ্গ করিলেই তাহারা তাহার প্রতি বস্ত্রাদি নিক্ষেপ করিবে, তখন দেখা যায় যে ভ্রূভঙ্গীরূপ একই কারণ বহু ব্যক্তির বিবিধ প্রত্যয়ের হেতু হইয়া থাকে, এবং প্রত্যেকেই মনে করিয়া থাকে "আমিই ইহার ভ্রূভঙ্গী দেখিয়াছি।" এক্ষেত্রেও সেইরূপ বিবিধ বিষয়ের প্রত্যয়ের যে প্রতিসন্ধান ঘটিয়া থাকে তাহার কারণ, এই প্রত্যয়াবলীর নিমিত্ত এক। সেই নিমিত্তই হইল আত্মা। প্রতিসন্ধান বলিতে বুঝায় যে "আমি যাহা দেখিয়াছি", "আমি যাহা শুনিয়াছি" এইরূপ বিবিধ প্রত্যয়ের একই জ্ঞাতার নিমিত্তাধীন হওয়া। নর্তকী-ভ্রূক্ষেপের কথায় উদ্দ্যোতকর প্রত্যয়াবলীরই (cognition) একত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। সর্বত্রই কিন্তু প্রতিসন্ধান (reminiscence) স্বীকার করিতে হইবে, কারণ ইহারই সাহায্যে একই বস্তু নিমিত্ত হইলেও বিবিধ প্রত্যয়ের উদয় হয়।*—পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে উদ্দ্যোতকরের এই কথাই বলা হইয়াছে :—

* প্রতিসন্ধানের ফলেই লোকে ভাবিতে পারে, "আমি পূর্বে আলোকিত ক্ষেত্রে যাহা দেখিয়াছি তাহাই এখন অন্ধকারে স্পর্শ করিতেছি।" উদ্দ্যোতকর এই প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দিয়া প্রতিসন্ধান বুঝাইয়াছেন।

রূপাদিপ্রত্যয়াঃ সর্ব্বেঽপ্যেকানেকনিমিত্তকাঃ।
ময়েতি প্রত্যয়েনৈষাং প্রতিসন্ধানভাবতঃ ॥ ১৮০ ॥
নর্তকীভ্রূলতাভঙ্গে বহূনাং প্রত্যয়া ইব।
অন্যথা প্রতিসন্ধানং ন জায়েতানিবন্ধনম্ ॥ ১৮১ ॥

অর্থাৎ রূপাদি সকল প্রত্যয়েরই (cognition) কারণ একও বটে বহুও বটে, কারণ দৃষ্টি ও স্পর্শাদি অনুযায়ী প্রত্যয় বিভিন্ন হইলেও সকল প্রত্যয়ই "আমার", এবং সেই জন্যই বিবিধ প্রত্যয়ের মধ্যে প্রতিসন্ধান সম্ভব হইয়া থাকে। একই নর্তকীর ভ্রূলতাভঙ্গ যে-রূপ বহু ব্যক্তির চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে ইহাও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ না হইলে দৃষ্টিস্পর্শাদি বিবিধ প্রত্যয়ের প্রতিসন্ধান ঘটিত না, যে-হেতু এরূপ স্থলে যাহা আশ্রয় করিয়া প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় তাহাই পাওয়া যাইত না।—ফলকথা এই যে চক্ষুদ্বারা রূপ দেখা যায়, কর্ণ দ্বারা শব্দ শোনা যায়; কিন্তু রূপ ও শব্দ যেখানে একই বস্তুর সেখানে কে বলিয়া দিবে যে ইহাদের মূল এক? এই কাজই হইল আত্মার।

উদ্যোতকর আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আরও একটি যুক্তি দেখাইয়াছেন ঃ— 'আত্মা' বলিয়া একটি পদ আছে, এবং ইহার অর্থ নিশ্চয়ই শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বেদনার সমবায় হইতে পৃথক্, কারণ এই সকল হইতে পৃথক্ না হইলে ঘটাদি শব্দের ন্যায় 'আত্মা' বলিয়াই বা একটি বিশেষ শব্দ থাকিবে কেন?— এই কথাই পরবর্তী কারিকাদ্বয়ে বলা হইয়াছে ঃ—

বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসংঘাতব্যতিরিক্তাভিধায়কম্।
আত্মেতি বচনং যস্মাদিদমেকপদং মতম্ ॥ ১৮২ ॥
সিদ্ধপর্যায়ভিন্নত্বে যচ্চৈবং পরিনিশ্চিতম্।
যথানির্দ্দিষ্টধর্ম্মেণ তদ্যুক্তং পটশব্দবৎ ॥ ১৮৩ ॥

অর্থাৎ "আত্মা" বলিতে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাত হইতে পৃথক্ অন্য কিছু বুঝায়, কারণ ইহা একটি পৃথক্ পদ। বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি শব্দের পর্যায়ভুক্ত নহে বলিয়া যাহা সুনির্ধারিত, তাহা যথানির্দিষ্ট স্বধর্মের সহিতই সংযুক্ত,— যেমন "পট"।

আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য উদ্যোতকর আবার ব্যতিরেকী (indirect,

negative) প্রমাণও দেখাইয়াছেন ঃ—এই জীবন্ত শরীর কখনও আত্মাশূন্য হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে নিরাত্মক ঘটাদির মত শরীরেও শ্বাস প্রশ্বাস থাকিত না। এই কথাই পরবর্তী কারিকায় বলা হইয়াছে ঃ—

প্রাণাদিভির্বিযুক্তশ্চ জীবদ্দেহো ভবেদয়ম্।
নৈরাত্ম্যাদ্ঘটবত্তস্মান্নৈবাস্ত্যস্য নিরাত্মতা ॥ ১৮৪ ॥

কমলশীল "পঞ্জিকায়" বলিয়াছেন যে কারিকার "অস্য নিরাত্মতা" এই কথা দুইটির দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। ইহাতে বুঝাইতে পারে যে জীবন্ত দেহ কখনও আত্মাহীন হইতে পারে না। অথবা এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝাইতে পারে যে এই আত্মা নিস্বভাব (অস্তিত্বশূন্য) হইতে পারে না ; অর্থাৎ, ইহার সত্ব সুসিদ্ধ।

আত্মার নিত্যত্ব ও সর্বব্যাপকতা (বিভুত্ব) কিরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহা অবিদ্ধকর্ণ দেখাইয়াছেন ঃ—মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পরই আমার প্রথম প্রজ্ঞান (cognition) যাহার দ্বারা অনুভূত হইয়াছিল, উত্তর কালের প্রজ্ঞানাবলীও নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিই অনুভব করিয়াছিল, কারণ পরবর্তী কালের প্রজ্ঞানাবলীও প্রথম মুহূর্তের প্রজ্ঞানের মত "আমারই"।* দুঃখাদির অনুভূতি সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা যাইতে পারে। আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে ইহাই হইল অনুমান-প্রমাণ। ইহাই পরবর্তী কারিকায় দেখান হইয়াছে ঃ—

সদ্যোজাতাদ্যবিজ্ঞানবেদকেনৈব বেদ্যতে।
সর্বমুত্তরবিজ্ঞানং মজ্জ্ঞানত্বাত্তদাদ্যবৎ ॥ ১৮৫ ॥

অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুর প্রথম বিজ্ঞান যাহার দ্বারা অনুভূত হয় উত্তর কালের সমস্ত বিজ্ঞানও তাহার দ্বারাই অনুভূত হইতে বাধ্য, কারণ প্রথম বিজ্ঞানের ন্যায় উত্তর কালের বিজ্ঞানাবলীও "আমার" বিজ্ঞান বলিয়া অনুভূত হয়।—

ইহাই গেল আত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ। আত্মার বিভুত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ এই ঃ—এস্থলে পৃথিবী, জল, আকাশ, মন প্রভৃতিই হইল বিচারের বিষয়

---

* মাতুরুদরনিষ্ক্রমণোত্তরকালং মদীয়াদ্যপ্রজ্ঞানসংবেদকসংবেদ্যান্যতৎকালানি মদীয়ানি প্রজ্ঞানানি ।

(বিপ্রতিপত্তিবিষয়ভাবাপন্নানি) ; এগুলি কিন্তু দূরবর্তী হইলেও আমার আত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট ; কারণ তাহাদের মধ্যেও বিশেষ রূপ (মূর্তত্ব), বেগ, পূর্বাপরত্ব, একত্র সংযোগ ও বিভাগ পরিলক্ষিত হয়—যে-সকল গুণ আমার শরীরেরও আছে। (সুতরাং আমার শরীরে যদি আত্মা থাকে তবে পৃথিবী প্রভৃতিতেই বা থাকিবে না কেন ?)। এই কথাই পরবর্তী কারিকায় বলা হইয়াছে ঃ—

মদীয়েনাত্মনা যুক্তং দূরদেশনিবর্ত্যপি।
ক্ষিত্যাদিমূর্তিমত্ত্বাদেরস্মদীয়শরীরবৎ ॥ ১৮৬ ॥

অর্থাৎ, ক্ষিত্যাদি দূরদেশবর্তী হইলেও আমার আত্মার সহিত যুক্ত, কারণ আমার শরীরের ন্যায় ক্ষিত্যাদিও মূর্তিবিশিষ্ট, এবং আমার শরীরের অন্যান্য গুণও তাহাতে আছে।—ইহার পরের কারিকাতেই আত্মবাদীর পূর্বপক্ষ শেষ হইল ঃ—

এবং চ সত্ত্বনিত্যত্ববিভুত্বানাং বিনিশ্চয়ে।
আত্মনো ন নিরাত্মানঃ সর্বধর্মা ইতি স্থিতম্ ॥ ১৮৭ ॥

অর্থাৎ, এইরূপে বিনিশ্চিত হইল যে আত্মা সৎ, নিত্য ও বিভু ; সুতরাং ধর্মাবলী কখনই নিরাত্ম হইতে পারে না।

ইহার পরেই অনাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শান্তরক্ষিত দীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। অনাত্মবাদ বলিতে ভারতীয় দর্শনে বৌদ্ধমতই বুঝায়, কারণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনাত্মবাদ ও ক্ষণভঙ্গবাদ ব্যতীত বৌদ্ধ দর্শনের বাস্তবিকই আর কোন বিশেষত্ব নাই। কিন্তু এখানেও মনে রাখিতে হইবে যে নৈয়ায়িকাদির আত্মা নিত্য বলিয়াই বৌদ্ধগণ তাহা অস্বীকার করিয়া থাকেন। আলয়বিজ্ঞান স্বীকার করিয়া বৌদ্ধগণও একপ্রকার আত্মা স্বীকার করিয়াছেন, তবে এই আত্মার বিশেষত্ব এই যে ইহা ক্ষণবিধ্বংসী। বেদান্তে ব্রহ্মও নিত্য আত্মাও নিত্য, মায়ার বশে কেবল আত্মা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন। বৌদ্ধমতে কিন্তু বিশুদ্ধ বিজ্ঞান আকাশের ন্যায় নিত্য ও একরূপ হইলেও বিজ্ঞাতৃবিজ্ঞান ও বিজ্ঞেয়বিজ্ঞান ক্ষণিক। বেদান্তে ও বিজ্ঞানবাদে এই দিক দিয়া এই মাত্র পার্থক্য।

উত্তরপক্ষের প্রথম কারিকা ঃ—

তদত্র প্রথমে তাবৎ সাধনে সিদ্ধসাধ্যতা।
সর্বজ্ঞাদিপ্রবেছত্বং ত্বজ্জ্ঞানস্যেষ্যতে যতঃ ॥ ১৮৮ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষীর প্রথম যুক্তি লইয়া কোন বিরোধই নাই, কারণ সর্বজ্ঞ ব্যক্তি যে অপরের জ্ঞানও উপলব্ধি করিতে পারেন তাহা বৌদ্ধও স্বীকার করিয়া থাকেন।—উপরিধৃত ১৭৭ সংখ্যক কারিকা লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলা হইয়াছে। ঐ কারিকায় বলা হইয়াছিল যে বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক কোন শক্তির দ্বারাই এই বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি উপলব্ধ হয়। পূর্বপক্ষী অবশ্য একথা আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন; বৌদ্ধ কিন্তু কেবল বাক্যার্থের উপর জোর দিয়া বলিলেন বৌদ্ধ মতে সর্বজ্ঞ বুদ্ধও অপরের বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি উপলব্ধি করিতে পারেন; সুতরাং এই দিক হইতে আত্মবাদীর সহিত অনাত্মবাদী বৌদ্ধের কোন মতদ্বৈধ নাই। কমলশীল এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রাবক এবং প্রত্যেকবুদ্ধ প্রভৃতিও সর্ববিৎ।

পূর্বপক্ষী (ঐ কারিকাতেই) বলিয়াছিলেন বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির প্রত্যয় বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্ কোন শক্তির পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু এই যুক্তির যে কোন বাস্তব ভিত্তি নাই (সাধ্যবৈকল্য) তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

প্রকাশকানপেক্ষং চ স্বচিদ্রূপং প্রজায়তে।
অন্যবিজ্ঞানমপ্যেবং সাধ্যশূন্যং নিদর্শনম্ ॥ ১৮৯ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞান যখন জন্মায় তখন তাহা কোন প্রকাশকের অপেক্ষা না করিয়া আপনিই স্বরূপে প্রকাশ লাভ করে। পৃথক্ কোন বিষয়ের বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা প্রযুজ্য। সুতরাং পূর্বপক্ষী যে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন সাধ্য বিষয়ের সহিত তাহার কোন যোগই নাই (absence of probandum in the probans)। অর্থাৎ, জ্ঞান যখন কোন প্রকাশকের অপেক্ষাই রাখে না তখন বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে বিজ্ঞান উপলব্ধ হয় তাহারই প্রকাশের জন্য তদিতর আত্মারূপ এক শক্তি অনুমান করার কোনই সার্থকতা নাই।

পূর্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন যে, পৃথক্ কোন শক্তির দ্বারাই

বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি উপলব্ধ হয় বলিতে বুঝায় না যে অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা সেই বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি উপলব্ধ হইতেছে। এখানে কেবল বুঝাইতেছে, যে বিষয়ের বিজ্ঞান ঘটিতেছে সেই বিষয়েরই বিজ্ঞাত রূপটি।* ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে :—

তদাকারোপরক্তেন যদন্যেন প্রবেদ্যতে।
তস্যোদাহরণত্বেঽপি ভবেদন্যেন সংশয়ঃ ॥ ১৯০ ॥

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত উদাহরণ দ্বারা (কারিকা ১৭৭) যদি কেবল ইহাই বুঝায় যে বিজ্ঞাত বিষয়ের আকারের দ্বারাই কেবল বিজ্ঞাতার বিজ্ঞানটি উপরক্ত (coloured) হইতেছে, তাহা হইলে কিন্তু অন্য বিজ্ঞানের সময় সংশয় উপস্থিত হইবে।—এই কারিকাটিও আদৌ স্পষ্ট নহে, কিন্তু কমলশীল ইহার উপর দীর্ঘ ভাষ্য রচনা করিয়া বিশেষ কোন সন্দেহের অবকাশ রাখিয়া যান নাই :—

ঐ উদাহরণের যদি এই অর্থ হয় তবে কিন্তু স্বসংবিৎ (cognition of one's own consciousness) রূপ যে জ্ঞান অন্য বিজ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়ার অপেক্ষা রাখে না,—সেই জ্ঞানের পক্ষে সংশয় আসিয়া পড়িবে, যেহেতু ইহার হেতু আর ঐকান্তিক (unambiguous) থাকিবে না।† বলা যাইতে পারে যে স্বসংবিৎও তদিতর কোন সংবেত্তার দ্বারাই উপলব্ধ হয়, কারণ সাধারণ বিষয়বিজ্ঞানের মত এই স্বসংবিৎ-ও কখনও থাকে কখনও থাকে না (উদয়ব্যয়), ইহা প্রমাণসাপেক্ষ (প্রমেয়ত্ব), এবং ইহার প্রমাণও স্মরণ রাখা যায় (স্মর্যমাণ-প্রমাণত্ব)। কিন্তু এই সব যুক্তির মধ্যে এমন কিছুই নাই যে-জন্য এগুলিকে বিপরীত বিষয় প্রমাণের জন্যও ব্যবহার করা যাইবে না (সাধ্যবিপর্যয়ে বাধকাভাবাৎ); কারণ এগুলি সবই ব্যতিরেকের উপর প্রতিষ্ঠিত (negative concomitance)। স্বসংবিৎ কোন এক স্থলে স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা প্রত্যেক বিজ্ঞান যদি অপর এক বিজ্ঞানের মুখাপেক্ষী হয় তাহা হইলে

* এ-স্থানটি অস্পষ্ট—যস্মিন্ বিষয়ে বিজ্ঞানমাগৃহীততদাকারমুপজায়তে তদিহোদাহরণম্।

† অর্থাৎ, এরূপ হইলে spontaneous consciousness (স্বসংবিৎ) ও objective consciousness-এর (বিষয়বিজ্ঞান) মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না।

অনবস্থা দোষ অবশ্যম্ভাবী।* এইরূপে একটি মাত্র বিষয় অধিগত করিতেই সমস্ত আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া যাইবে।

এখন এই অনবস্থা দোষ পরিহার করিবার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রও স্বসংবিদিত জ্ঞান যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই কিন্তু স্বীকার করা হইবে যে জ্ঞানের (উপরোক্ত) উদয়ব্যয়াদি ধর্ম আর ঐকান্তিক নহে। এইরূপে এক প্রকার জ্ঞান সম্বন্ধে যদি স্বসংবেদন স্বীকার করিতেই হয় তবে সর্বপ্রকার জ্ঞান সম্বন্ধেই বা তাহা স্বীকার করিতে বাধা কি? উত্তরে যদি বলা হয় যে এই বিশেষ বিজ্ঞানের সংবিদিত রূপই কিছুই নাই, তবে তৎসত্ত্বেও বলা যাইতে পারে যে ঐ জ্ঞান যদি অসিদ্ধ হয় তবে সমস্ত পূর্বজ্ঞানই অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এরূপ স্থলে বিষয়ই আর সিদ্ধ হইবে না। বিজ্ঞানবাদিরা বলিয়া থাকেন যে কোন প্রকার জ্ঞানের মধ্যেই গ্রাহ্যগ্রাহক ভাব না থাকায় জ্ঞান আপনা হইতেই প্রকাশ লাভ করে (গ্রাহ্যগ্রাহকবৈধুর্যাৎ স্বয়মেব প্রকাশতে), জ্ঞানান্তর দ্বারা সংবেদিত হয় না; তাঁহাদের পক্ষ হইতে অবশ্যই পূর্বপক্ষীর যুক্তি সাধ্যবিকলতা (absence of probandum in the probans) দোষে দুষ্ট।

পূর্বপক্ষী যে ধর্মীর বিশেষণ স্বরূপ 'সৎ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাও অনর্থক, কারণ সাধ্য বিষয়ের প্রমাণের জন্য এই বিশেষণের অঙ্গভাবই (participation) নাই। প্রত্যক্ষাদি প্রত্যয় শরীরাদি হইতে পৃথক্ কোন সংবেদকের দ্বারাই সংবিদিত হইয়া থাকে,—একথার দ্বারা কি না বুঝাইতে পারে (এতাবতা কিং ন গতম্)? যদি বলা যায় যে কতকগুলি প্রত্যয় প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এবং কতকগুলি অনুমানসিদ্ধ,—তাহা হইলেও ধর্মীর (এখানে সংবেদক) কোন ভেদ বুঝায় না; কারণ সকল প্রত্যয়ই সমভাবেই "আমার"। প্রতিবাদীও (এখানে নৈয়ায়িক) ঐ-প্রকার বিশেষণবিশিষ্ট ধর্মী স্বীকার করেন না, সুতরাং এই সকল হেতুর কোন ভিত্তিই নাই। একটি বিফল বিশেষণ ব্যবহার করিয়া সেইটি সমর্থনের জন্য পুনরায় যুক্তি প্রয়োগ করা হইল অর্থান্তর নিগ্রহস্থান।

* অর্থাৎ, 'আমি রামকে জানি'—এইরূপ বিজ্ঞান স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলিতে হইবে 'আমি যে রামকে জানি তাহা আমি জানি।' কিন্তু ইহাতেও শান্তি নাই, কারণ এই দ্বিতীয় বাক্যটিও নূতন একটি বিজ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়িবে।

ক্বচিৎ সমাশ্রিতত্বং চ যদীচ্ছাদেঃ প্রসাধ্যতে।
তত্র কারণমাত্রং চেদাশ্রয়ঃ পরিকল্প্যতে ॥ ১৯১ ॥
ইষ্টসিদ্ধিস্তদাধারস্ত্বাশ্রয়শ্চেন্মতস্তব।
তথাপি গতিশূন্যস্য নিষ্ফলাধারকল্পনা ॥ ১৯২ ॥

অর্থাৎ, পূর্বপক্ষীর ইহাই যদি অভিপ্রেত হয় যে ইচ্ছাদির একটা আশ্রয় আছে এবং কারণই হইল সেই আশ্রয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন বিরোধই থাকে না। আর পূর্বপক্ষী যদি বলিতে চাহেন যে ঐ আশ্রয় ইচ্ছাদির আধারস্বরূপ, তবে সেইরূপ কল্পনা নিষ্ফল হইয়া পড়িবে, কারণ যাহা গতিশূন্য তাহার জন্য আধার কল্পনা করিবার কোন সার্থকতা নাই।—কমলশীল 'পঞ্জিকায়' বলিয়াছেন যে বৌদ্ধগণও যে ইচ্ছাদিকে নিষ্কারণ মনে করেন না তাহা "চতুর্ভিশ্চিত্তচৈত্তা হি"* প্রভৃতি বচন হইতে বুঝা যায়। মূর্ত ভাবাবলী হইল প্রসর্পণধর্মী, সুতরাং তাদের অধঃপাত রোধ করিবার উদ্দেশ্যে আধার কল্পনা করিবার সার্থকতা আছে; কিন্তু সুখাদি গতিশূন্য হওয়ায় তাহাদের অধঃপাতের সম্ভাবনাই যখন নাই তখন তাহাদের জন্য আত্মাদি আধারের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

পূর্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন যে অন্তরস্থ আধেয় বস্তু আপন ক্রিয়ার সাহায্যেই যে আধারকে বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে তাহা নহে, আধারের অস্তিত্বই আধেয় বস্তুর বন্দিত্বের কারণ হইতে পারে, ঘটের অস্তিত্বই যেমন ঘটমধ্যস্থ বদরাদি ধরিয়া রাখার কারণ। আত্মা এই অর্থে সুখাদির আধার হইতে বাধা কি? ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে:—

আশ্রয়ো বদরাদীনাং কুণ্ডাদিরুপপদ্যতে।
গতের্বিবন্ধকরণাদ্বিশেষোৎপাদেন বা ॥ ১৯৩ ॥

অর্থাৎ, কুণ্ডাদি বাস্তবিকই বদরাদির আশ্রয়, কারণ তদ্দ্বারা বদরাদির গতিও রুদ্ধ হয় এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও উৎপন্ন হয়।—কমলশীল এখানে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে যাঁহারা ক্ষণিকত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়াই গতিরোধের কথা বলা হইয়াছে (কারণ যাহা উৎপত্তির ক্ষণেই পুনরায় বিনষ্ট

* এই শ্লোকপ্রতীক কোথা হইতে গৃহীত?

হইতেছে তাহার গতি থাকিতে পারে না)। আর বৈশিষ্ট্য উৎপাদনের কথা বলা হইয়াছে ক্ষণিকবাদিদের লক্ষ্য করিয়া; কারণ উপাদান কারণগুলি পূর্বে যে-স্থানে বর্তমান ছিল উৎপন্ন বস্তুর উপাদান হইতে সেই স্থানেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উৎপাদিত হইয়া থাকে।—গতিরোধক এবং বৈশিষ্ট্যোৎপাদক এই দুই প্রকারের আধারের কোন প্রকারই কিন্তু ইচ্ছাদির পক্ষে সম্ভব নয়; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে ইহাদের কোন আধারই নাই।

পূর্বপক্ষী "বস্তুত্বে সতি" বলিয়া যে যুক্তি দেখাইয়াছিলেন (কারিকা ১৭৮) তাহাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কারণ ইহা এমন একটি বিশেষণ যে সকল বস্তুর পক্ষেই ইহার বিশেষ্য হওয়া সম্ভব (ব্যবচ্ছেদ্যাভাবাৎ)। এই কথাই পরবর্তী কারিকায় বলা হইয়াছে ঃ—

নীরূপস্য চ নাশস্য কার্য্যত্বং নৈব যুক্তিমৎ।
অতো বিশেষণং ব্যর্থং হেতাবুক্তং পরৈরিহ ॥ ১৯৪ ॥

অর্থাৎ, বিনাশের কোন রূপ নাই; সুতরাং বিনাশ একটি কার্য্য অর্থাৎ বস্তু রূপে পরিগণিত হইতে পারে না; অতএব পূর্ব্বপক্ষী তাঁহার যুক্তিতে যে বস্তুত্ব রূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা (অন্ততঃ বিনাশের পক্ষে) ব্যর্থ।—বিনাশেরও যদি কার্য্যত্ব সম্ভব হয় তবেই তাহার ব্যবচ্ছেদের (exclusion) নিমিত্ত বস্তুত্বাদি বিশেষণ প্রয়োগ করা সার্থক হইতে পারে। কিন্তু বিনাশ অবস্তু হওয়াতে তাহাতে যখন কোন প্রকার ক্রিয়াই হয় না তখন তাহার হেতুমত্তা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই অনুমানের প্রয়োগটি এইরূপ ঃ—যাহা অবস্তু তাহা কিছুরই কার্য্য হইতে পারে না; যেমন শশশৃঙ্গাদি; বিনাশ কিন্তু অবস্তু; সুতরাং বিনাশের কোন হেতু থাকিতে পারে না। বিনাশ যদি একটি কার্য্য হইত তবেই ইহার বস্তুত্বের কথা উত্থাপন করা যাইত। উপরন্তু নৈয়ায়িকের কথা তাঁহার নিজের মতেরই বিরুদ্ধ; কারণ কার্য্য বলিতে বুঝায় বস্তুর আত্মলাভ (realisation), স্বীয় কারণাবলীর সমবায়, এবং বস্তুর আপন অস্তিত্ব (সত্তাসমবায়াৎ)। বিনাশের কিন্তু দ্রব্যাদির স্বভাব না থাকায় তাহা স্বকারণাবলীর সমবায়ে উৎপন্ন হইতে পারে না। এবং সেই জন্যই বিনাশ কখনই সত্তা হইতে পারে না, যেহেতু বিনাশের রূপই নাই।

নহিলে বিনাশও দ্রব্যাদির ন্যায় কোন আধার আশ্রয় করিয়া থাকিত এবং বস্তুরূপেও পরিগণিত হইত,—এবং তাহা হইলে বস্তুত্বাদি বিশেষণ প্রয়োগের দ্বারা ইহার ব্যবচ্ছেদও সম্ভব হইত না। সুতরাং পূর্বপক্ষী যে "বস্তুত্বে সতি" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

পূর্বপক্ষী "রূপাদিপ্রত্যয়াঃ"—ইত্যাদি (কারিকা ১৮০) বলিয়া যে যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছিলেন তাহারই উত্তরে এইবার বলা হইতেছে ঃ—

> ময়েতি প্রতিসন্ধানমবিদ্যোপপ্লবাদিদম্।
> ক্ষণিকেষ্বপি সর্বেষু কর্ত্রেকত্বাদিভাসতঃ ॥ ১৯৫
> মিথ্যাবিকল্পতশ্চাস্মান্ন যুক্তা তত্ত্বসংস্থিতিঃ।
> সামর্থ্যভেদাদ্ভিন্নোঽপি ভবত্যেকনিবন্ধনম্ ॥ ১৯৬ ॥

অর্থাৎ "আমার" (দৃষ্টি, শ্রুতি ইত্যাদি) বলিয়া যে প্রতিসন্ধান (reminiscence) হয় তাহার কারণ অবিদ্যার উপপ্লব ; কারণ সকল প্রকার ক্ষণিক বস্তু সম্বন্ধেই কর্তার একত্ব রূপ ভ্রান্ত জ্ঞান হইয়া থাকে। এইরূপ ভ্রান্ত জ্ঞান হইতে (মিথ্যাবিকল্পতঃ) কিন্তু বস্তুর প্রকৃত সংস্থিতি সম্বন্ধে অনুমান করা যায় না। কারণ সামর্থ্যানুযায়ী বিভিন্ন বস্তুও "একটি" মাত্র ভাবের কারণ হইতে পারে।—"আমি" দেখিতেছি, "আমি" শুনিতেছি এই প্রকার বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যেও যে একই জ্ঞাতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না (অনৈকান্তিক)। কারণ একই জ্ঞাতার দ্বারা ক্ষণিক ভাবাবলী জ্ঞাত হইতেছে—এইরূপ ভ্রান্ত জ্ঞানের বশবর্তী হইয়াও মানুষ বিবিধ ভাবাবলীর মধ্যে "একটি" ভাবের কল্পনা করিতে পারে। সুতরাং প্রতিসন্ধান জ্ঞান আশ্রয় করিয়া বস্তু সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না।—এই প্রকার প্রতিসন্ধান জ্ঞান যে কেন ভ্রান্ত তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

> একানুগামিকার্যত্বে পৌর্বাপর্যং বিরুধ্যতে।
> রূপশব্দাদিচিত্তানাং শক্তকারণসন্নিধেঃ ॥ ১৯৭ ॥

অর্থাৎ, সমস্ত কার্য যদি একই কারণের (এখানে আত্মার) অনুগামী হয় তবে কার্যাবলীর পৌর্বাপর্য সম্ভব হইতে পারে না, কারণ রূপশব্দাদির প্রত্যয়ের সম্যক্ কারণ সর্বদাই সন্নিহিত রহিয়াছে।

পূর্বপক্ষী যদি এতদ্দ্বারা কেবলমাত্র বলিতে চাহেন যে প্রত্যয়াবলী সর্বদাই কারণবিশিষ্ট তবে আর বিবাদের কোন বিষয়ই থাকে না (সিদ্ধসাধ্যতা) ঃ—

একানন্তরবিজ্ঞানাৎ ষড়্‌বিজ্ঞানসমুদ্ভবঃ।
যুগপদ্বেদ্যতে ব্যক্তমত ইষ্টপ্রসাধনম্‌॥ ১৯৮॥

অর্থাৎ, একই পূর্ববিজ্ঞান হইতে ষড়্‌বিজ্ঞানের উদ্ভব যখন স্পষ্টই যুগপৎ অনুভূত হয় তখন পূর্বপক্ষীর যাহা বক্তব্য (প্রত্যয়াবলীর কারণ বিশিষ্টতা) তাহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি।—বৌদ্ধ যে প্রত্যয়াবলীর কোন্‌ কারণ স্বীকার করিয়া থাকেন তাহা কমলশীল বুঝাইয়া দিয়াছেন। একই সমনন্তর প্রত্যয় হইতে স্পষ্টই স্পর্শাদি ষড়্‌বিজ্ঞানের যুগপৎ উৎপত্তি হইয়া থাকে, যেমন একই সঙ্গে লোকে নর্তকীর রূপ দেখিতে থাকে, মুরজাদির শব্দ শোনে, পদ্মগন্ধ আঘ্রাণ করে, কর্পূরাদি আস্বাদন করে, ব্যজনের বাতাস উপভোগ করে, এবং মনে মনে বস্ত্রাদি দান করিবার কথা চিন্তা করিয়া থাকে। বলা যায় না যে মানুষের চিত্ত অলাতক্রের ন্যায় দ্রুত বিবর্তিত হয় বলিয়াই এইরূপ যৌগপদ্যের ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় ; কারণ তাহা হইলে ঐ সব প্রত্যয়ের প্রতিভাস (reflexion) স্পষ্ট না হইয়া অস্পষ্ট হইত।

কোন বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রত্যয়ের প্রতিসন্ধান সম্ভব হয় বলিয়াই পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন প্রত্যয়াবলীর গ্রহণ একই সঙ্গে আত্মার দ্বারা ঘটিয়া থাকে। প্রতিসন্ধান কিন্তু স্মৃতির দ্বারা সম্পন্ন হয়। এবং অতীত বিষয়ের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া স্মৃতি অস্পষ্ট। রূপাদির প্রতিভাস কিন্তু স্পষ্ট।

যদি বলা যায় যে প্রত্যয়াবলীর হেতু নিত্য ও একরূপ বলিয়াই প্রমাণিত হয় যে ইহাদের নিমিত্ত এক, তাহা হইলে অনুমানের দ্বারা ব্যাপ্তি বাধিত হইয়া যাইবে। ইহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

ক্রমিণাং হ্যেকহেতুত্বং নৈবেত্যুক্তমনন্তরম্‌।
অতোঽনুমানবাধাস্মিন্‌ ব্যাপ্তের্ব্যক্তং সমীক্ষ্যতে॥ ১৯৯॥

অর্থাৎ, যে-সকল ভাব ক্রমানুযায়ী উৎপন্ন হয় তাহাদের হেতু যে এক হইতে পারে না তাহা অব্যবহিত পূর্বেই দেখান হইয়াছে ; সুতরাং এ-ক্ষেত্রে অনুমানের দ্বার ব্যাপ্তি স্পষ্টই বাধিত হইতেছে।—এই বাধন কমলশীল স্পষ্ট

করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ—যে সকল বিষয়ের কারণাবলী উপস্থিত এবং যে কারণাবলীর সামর্থ্য অপর কিছুর দ্বারা আবদ্ধ নহে, সেই সকল বিষয় যুগপৎ সংঘটিত হইবে; অঙ্কুরাদির সমগ্র সামগ্রী উপস্থিত থাকিলে তাহারা যেমন যুগপৎ উৎপন্ন হয়; দেবদত্তাদি ব্যক্তির রূপাদি বিষয়ের প্রত্যয়ের কারণ সন্নিহিতই রহিয়াছে, এবং সেই কারণ অপ্রতিবদ্ধ [unconditioned]; তথাপি তাহাদের যৌগপদ্য দেখা যায় না। সুতরাং পূর্বপক্ষীর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য।

পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত দৃষ্টান্তও যে সাধ্য বিষয়ের সমধর্মী নহে [সাধ্যবিকলতা]; তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

নর্তকীভ্রূলতাভঙ্গে নৈবৈকঃ পরমার্থতঃ।
অনেকাণুসমূহত্বাদেকত্বং তস্য কল্পিতম্॥ ২০০ ॥

অর্থাৎ, নর্তকীর ভ্রূভঙ্গী বলিতেও প্রকৃতপক্ষে (আত্মার ন্যায়) "একটি" মাত্র বিষয় বুঝায় না; ভ্রূভঙ্গীও অনেক পরমাণুর সমূহ ভিন্ন আর কিছুই নহে, —ইহার একত্ব কল্পনা মাত্র। এই কল্পনার ভিত্তি যে কি তাহা পরবর্তী কারিকায় বলা হইয়াছে ঃ—

এককার্যোপযোগিত্বাদেকশব্দস্য গোচরঃ।
সাধ্যোঽপ্যেবংবিধোঽভীষ্টো যদি সিদ্ধপ্রসাধনম্॥ ২০১ ॥

একই কার্যে ইহার উপযোগিতা আছে বলিয়াই ইহা "একটি" কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়; এই প্রকার একত্বই যদি পূর্বপক্ষীর অভীষ্ট হয় তবে আর কোন বিবাদই নাই।—এখানে ভ্রূলতাভঙ্গ প্রকৃত পক্ষে বিবিধ কার্যের সমষ্টি হইলেও দৃষ্টিরূপ একই কার্যের বিষয়ীকৃত হওয়ায় "এক" বলিয়া পরিগণিত। এই প্রকার একত্বই অভিপ্রেত হইলে আর দৃষ্টান্তের সাধ্যবিকলতা দোষ থাকে না, কারণ বৌদ্ধগণও বলিয়া থাকেন যে একটির পর একটি বিভিন্ন সংস্কার (impression) আসিয়াই একটি প্রত্যয়ের নিমিত্তভূত বিবিধ বিষয়ের বিজ্ঞপ্তি উৎপন্ন করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

বয়োমধ্যাহ্ন

নেশা না করিলেই যেন মাথা এমন ঝিম্ ঝিম্ করিতে থাকে আজকাল। প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যত রাজ্যের ভাবনা-চিন্তা আসিয়া মস্তিষ্কে হানা দেয়; সরস অনুভূতির ফলে যে মাতিয়া উঠিবে, ঘটনার এমন অপূর্ব সমাবেশ এই বয়সেই সে আশা করে না। তবু ঝাঁঝালো রসে গলা ভিজাইবার পয়সাটা কোনো রকমে হস্তগত করিতে পারিলে দুর্বল স্নায়ুগুলিতে হয় ক্ষণিক উত্তেজনার সঞ্চার; বাঁচিয়া থাকিবার ভঙ্গুর সাহস আসে মনে।

নেশার স্রোতে ভাসিয়া হারাণের জীবনে চিরস্থায়ী অবসাদ নামিয়াছে। কিন্তু নেশার অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে নেশারই হয় প্রয়োজন; আরো তীব্র, আরো ঝাঁঝালো।

নেশা সে করিবেই। বাঁচিয়া থাকা আর নেশা করা দুইটাই যেমন সমান সত্য, দুইটাই তেমন সমান মিথ্যা তাহার কাছে। প্রায়ান্ধকার ঘরটিতে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে ও বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে মন্দ লাগে না তাহার। কিন্তু একটু পরেই ক্ষুধাটা যখন অস্থির করিয়া তোলে তখন সাংসারিক লাভ-ক্ষতির উপরকার বিস্মৃতির জাল যায় ছিঁড়িয়া, অভাব-অভিযোগগুলি স্পষ্ট ও রূঢ় মূর্ত্তি ধরিয়া নাচিতে থাকে চোখের সাম্‌নে।

নেশার জন্যই না এই সব!

সুন্দরীর অনুরোধে নয়, নিজেই অনেক আফশোষ-অনুতাপ করিয়া শপথ করিয়াছে—মাইরি, ও বিষগুলো আর গিল্‌ব না সুন্দো, মাইরি বলছি, এই তোর গা ছুঁয়ে—

এমন কি সুন্দরীর চোখে অবিশ্বাসের ছায়া দেখিয়া রাগিয়া গেছে—তুই বিশ্বেস করলি না? বেশ, জালা-জালা মদ খাবো, আফিং ধরব নোতুন করে', দেখিস্।

এই সব কথা অত্যন্ত অসহায়ের মতই নিজেকে সে অভিমান করিয়া শোনাইয়াছে। কত ভৎর্সনা তাহার নিজের প্রতি, কত ধিক্কার। কিন্তু

অপরিসীম নৈরাশ্যে শেষ পর্য্যন্ত আবার সে শপথ ভাঙিতেই বসিয়াছে, নিজের উপরে সমস্ত বিশ্বাস চাপাইয়া কত ক্ষতি হইয়াছে !

এই অসহায় ভাবটা তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়ে। নিজের অবস্থাটা যে সে উপলব্ধি করিতে পারে এখনো, সেইজন্যই বোধ হয়। অশোভন গাম্ভীর্য্যে সে মানুষের চলা ফেরা আর মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে বসে এক একদিন—কি ভাবে ওরা আমাকে ? এইসা টিট্ করব সব্বাইকে—আবার কেত্তন গেয়ে বেড়াব, সাধু সেজে বসব। ভগোবানে বিশ্বেস নেই বলেই না এই দুর্দ্দশা !

হঠাৎ তাহার চিন্তাসূত্র পিসিমার গলার স্বরে ছিঁড়িয়া যায়।

—বউটার এই অবস্থা আর তুই—

—যাও পিসিমা, যাও। কোনো কথায় আমি আর নেই জেনো—প্রচুর নাটকিয়ানা করিয়া সে তাহার অভিমান প্রকাশ করে।

পিসিমা বিমূঢ় হইয়া তাঁহার সাধের ভাইপোর দিকে তাকান। এই সব দেখিয়া শুনিয়া তিনি যে যন্ত্রণা না পান, এমন কথা নয়। তবে, সম্প্রতি বৌকে দেখাইবার জন্যই যেন হারাণের দুর্দশায় তাঁহার চোখের জল ফেলিতে ভুল হয় না। এবং থান কাপড়ের আঁচল সিক্ত না করিয়া সোজা চলিয়া যান সুন্দরীর কাছে। সমবেদনা দিয়া বৌকে জয় কবিবেন যে এবার !

অতীতের যত দুর্ব্যবহার আজ মুছিয়া ফেলিবেন তিনি সুন্দরীর মন হইতে। বৌ যে মা-হইতে চলিয়াছে। আহা, কি পোড়াকপাল না বৌটার !

নকল সমবেদনার কৌশলগুলি, কেন জানি, এক একবার সত্য বলিয়া মনে হয় পিসিমার।

পিসিমা সহজেই সরিয়া পড়েন বলিয়া হারাণ একটু স্বস্তি অনুভব করে।

কাঁথাটা ভালো করিয়া জড়াইয়া সাময়িক শান্তি ও শীতের আরামপ্রদ আমেজে একটি নিঃশ্বাস ফেলে হারাণ। তামাক টানিবার ইচ্ছাটা তখন প্রবল হইয়া ওঠে; নিকোটিনের ঝাঁঝালো স্বাদের লোভে খানিক এদিকে ওদিকে তাকায় সে।

হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় পিসিমার পরিবর্ত্তনের কথাটা। শুধু পিসিমা নন—সকলের সঙ্গে বিধাতা মিশিয়া যাওয়ায় হইয়াছে পাঁচজন। চক্রান্ত না ? এভাবে অপদস্থ করিবার কি মানে হয় ?

একে একে সকলকেই সন্দেহ করে হারাণ—ষড়যন্তর, ষড়যন্তর! আমার চোখ এড়ায়? বাবা জাতমাতাল, চোখ খুলে ঘুমোই!

কিন্তু শাস্তি প্রয়োগ করিবার কোনো সুযোগ মিলে না বলিয়া বাধ্য হইয়া শেষে নিজের দাঁতই কড়মড় করিতে হয়। নিজের রেখাবহুল কপালটিতে তীক্ষ্ণ একটি চিম্‌টি কাটিয়া শারীরিক যন্ত্রণায় ভাবনা-চিন্তাগুলি দূরে সরাইয়া দিতে চায় সে।

পরে লজ্জিত হইয়া নিজের মনেই একচোট হাসিয়া নেয়। অবশ্য, হাসিটা উপভোগ্য হয় না কোনো মতেই। ভাগ্যটাই কি খারাপ নয় আসলে? নইলে নেশাখোর হইতে সে যাইবে কেন? এর চেয়ে চিররুগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলেও মন্দ ছিল না! জোলো সমবেদনা ও রুটিন-বাঁধা শুশ্রূষায় বেশ মসৃণ ভাবে দিন কাটিতে পারিত!

খুব তাড়াতাড়িই পুরুষকারের প্রভাব মুছিয়া যায় তাহার মন হইতে। সচেতন ও স্বাভাবিক চেতনার মুহূর্তে ঝর্‌ঝরে শরীরে সে যাহা ভাবিয়াছে অদৃষ্টবাদে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

শুধু পিসিমা নয়, সুন্দরীও কেমন ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাকায় হারাণের দিকে। বিবাহিত জীবন তাহার যত পুরানো হইতে চলিয়াছে তত দুর্বোধ্য হইতেছে হারাণ। তাহাকে সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না আজকাল। কিন্তু একদা প্রথম যৌবনে, সুন্দরীর শরীর যখন পরিপুষ্ট হইবার মুখে তখন মনটা ছিল তাহার বয়সের মতই কাঁচা। তবু কষ্ট হয় নাই মানুষটার স্বভাব-চরিত্রে। যৌবন তাহাদের সমস্ত কিছুই সহজ করিয়া রাখিয়াছিল, জৈবনিক কামনায় তাহারা ছিল এক।

মনে সুন্দরী এখনো কাঁচাই রহিয়া গেল, শরীরে সে প্রায় গৃহিণী হইতে চলিয়াছে।

আচ্ছা, কি আর রহস্য আছে মানুষটিকে ঘিরিয়া? আসল কথা, লোকটার আন্তরিকতা আজ আর এক ফোঁটাও নাই! শুধু দাম্পত্য প্রেমের ব্যাপারে নয়, জীবনযাপনের প্রণালীতে পর্য্যন্ত। সব জায়গায় জুয়ার চালই চালিতেছে। লাগে তো লাগে—সেটা তার মহাভাগ্য, না লাগে তো কি আর করা যায় বলো না? কে দেখে অত তলাইয়া? অত গভীর দৃষ্টি হারাণের নাই।

রোজগারের ফিকিরে সে ঘোরে বটে, কত ফন্দি আঁটে,—নানা ধান্দায় থাকি, তোমরা তার বুঝ্‌বে কি ! বিরক্ত কোরো না, ভাগো।

তাহার চলা ফেরা সম্বন্ধে সুন্দরী মাঝে মাঝে কি বলিতে গিয়া থামিয়া যায়—বিদ্রোহ করিতে চায় সে। অনুযোগগুলি তীক্ষ্ণ অভিযোগ হইয়া প্রখর শোনায় হারাণের কানে। এবং অক্ষমতার দরুণ সাদা বিচার-বুদ্ধির সাহায্য নেয় না সে। রাগিয়া যায়, ভীষণ রাগিয়া যায় তাই।

—তোর কি মাগী ? আমার টাকা আমি ওড়াবো—বলে কিনা, স্বামীর ওপর দরদ নেই পিরীত যত টাকার সঙ্গে ! ছোটো মানুষের ঝি, আখ্‌খুটে হারামজাদী।

তাই একটা অবাঞ্ছিত উদাসীনতা জন্মিয়াছে সুন্দরীর বঞ্চিত মনে। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উদাসীনতার কারণ আরো জানা যায়।

মানসিক বিকারগ্রস্ত লোক না ঐ হারাণ ? নারীর সহজ ও স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির ওঠা-নামা সম্বন্ধে আজ তাহার নিশ্চিন্ত অজ্ঞতা। একটা নিয়া মানুষকে থাকিতেই হইবে, তাই মদ ও বন্ধু। সঙ্গীগুলি তাহার অদ্ভুত জীব। সামাজিক অস্তিত্ব তাদের মোটেই মূল্যবান নয়। সারাটা দ্বিপ্রহর নিদ্রারসে কাটাইয়া সন্ধ্যার দিকে সে অবসন্ন মনে নিজের দুরবস্থার কথা ভাবিতে থাকে। আর তার প্রতিক্রিয়া দুঃসহ হইয়া ওঠে সুন্দরীর সঙ্গে তাহার ব্যবহারে।

নিশাচর বৃত্তির জন্য তাহার মনটা ঐ সময়ে নিয়মিত ভাবে পাগল হইয়া ওঠে। সব কিছু ভুলিয়া যায় হারাণ। সুন্দরী বাধা দিতে আসিলে যায় ক্ষেপিয়া। লোকসানের নেশায় সে এমন মরীয়া হইয়া উঠিয়াছে।

অকর্মণ্য বুঝি সে হইত না। সংসার সাজাইতে পারিল না সুন্দরী। উর্বরতা নাই তাহার, হারাণ তো তাই ভাবে। একটা শিশু থাকিতে নাই।

—যা ভাগ্—কথা বলিস্ না আর। তাকাবো ? কেন তাকাবো তোর দিকে ? শরীর দিয়ে ভোলাবি তুই, এমন রূপ তোর আছে ? বাঁজা মেয়েছেলের মুখ দেখলেও পাপ।

শিশুর জন্য তাহার মন কাঁদে না কি ? আশ্চর্য্য তো। না, দোষ দেখাইবার সুযোগ পাইয়াছে সে ?

সুন্দরী তো তাহার দিকে তাকাইতে বলে নাই হারাণকে—হারাণ তাই

ভাবে। সম্পর্কটা যেন কেমন জটিল হইয়া পড়িয়াছে, জানিতে চাহিলে প্রয়োজন পড়িবে অনেকখানি চিন্তার। নির্জীব মস্তিষ্কে ও-সব কেন? ভাবে সে ভাসা-ভাসা। গভীরতায় তাহার যত ভয়! নিঃসঙ্গতা সে চায়—হয়তো প্রাণ ভরিয়াই। কিন্তু নির্জনতায় মন যে অনেক চিন্তা আমদানী করে।

বিড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে বিকালটা তাহার কালো হইয়া আসে বন্ধুদের প্রতীক্ষায়। বিষণ্ণ সন্ধ্যা জমকালো হইয়া ওঠে কুয়াশায় ও অন্ধকারে। গ্যাসালোকবিদ্ধ জনাকীর্ণ পথের উদ্দেশ্যে সে বাহির হইয়া পড়ে, নিজেকে ভুলাইবার জন্যই। সহরতলীর কয়লার ধোঁয়ায় শ্বাস টানিতে কষ্ট হয় হারাণের, হাপরের মত হাঁস-ফাঁস করে।

পিসিমার আকস্মিক পরিবর্তনে সুন্দরী কম বিস্ময় বোধ করে নাই। এখনকার সদয় ব্যবহারগুলি সে ঠিক হাসি মুখে গ্রহণ করিতে পারে না। একদিন না পিসিমা বলিয়াছিলেন—পাঁচ বছর ঘর করছিস বৌ, এ তোদের কেমন পিরীত, জানিনে বাপু! তের বছর বয়সে বিয়ে, তা পোনেরতেই নন্দ-রাণীকে কোলে পেয়েছিলুম—অবাগী আমায় মেরে গেছে না?

মৃত কন্যার শোকে পিসিমা খানিক স্তব্ধ হইয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়াছিলেন আবার আসল কথায়—এমন রূপ তোর কোন্‌খানে বউ, গুমোরে যে—কথাটা তিনি মুখে শেষ করেন নাই। কাটা-কাটা কথায়, আভাসে ইঙ্গিতে যতটা বলা যায়, কসুর ছিল না। সুন্দরী চুপ করিয়া ছিল বলিয়া রাগে তিনি গরগর করিয়াছেন, অথচ মোলায়েম ভাবেই বলিয়াছেন—ছেলে যে আমার বার মুখো এজন্যে সম্পুণ্যো দোষ তোমার। এত যদি দেমাক তোমার, বউ, আইবুড়ো থেকে বাপমার ঘর উজ্জোল করলে না কেন?

এমন সময় প্রতিবেশী গণেশ আসিয়া দেখা দেয় কয়েক বছর প্রবাস বাসের পর।

আর মুহূর্তে পিসিমার মুখ শোকাবহ নির্বিকার ভাব ধারণ করে। পরে অবশ্যই অমায়িক হাসি ও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তিনি জিজ্ঞাসা করেন অত্যন্ত আত্মীয়তার সুরে—কোথায় ছিলিরে য়্যাদ্দিন? গণশা? সেই কাশীতেই? ভালো ছিলি?

—হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্বাদে এক রকম—অন্যান্য বারের মত কঠিন ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় না গণেশ ঘোষ—তারপর, উনি কি বৌ ঠাকরুণ নাকি আমাদের? পাঁচ বছর বাইরে কাটিয়ে এলাম, চিনতে পেরেছ যে এই তো আমার ঢের। তা এবার—

সন্ত্রস্তভাব গোপন করিয়া পিসিমা বলেন—চিনতে পারব না অমন নেমক হারাম আমি নই, জানবি। তোর অভাবের সংসার নয় গণশা, তোর চিঠি পত্র পেয়ে আমি চুপ করে' থাকিনি; চেষ্টা করেছি। হ'লই বা য়্যাতদিন। টাকা তোর মারা যাবে না, এ আমি দিব্যি দিয়ে বলতে পারি।

—আহা হা, সে কথা তো বল্‌ছিনে পিসিমা! টাকার কথা তুলে লজ্জা দিয়ো না খামাকা! বল্‌ছি কি—

গণেশের ধূর্ত, লোভী চোখের দিকে তাকাইতে পিসিমার সাহস হয় না; মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিলেও বলিতে বাধ্য হন—বেশ তো, নেমন্তন্ন রইলো তোর, আসবি।

গণেশ তাই টাকার কথা ভুলিয়া গিয়া এ বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিয়াছে। এবং তাহার ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে সুন্দরীর লজ্জা সরম অক্ষত থাকে নাই। হারাণ বাড়ী না থাকিবার সময়টুকু গণেশের মন ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে এ বাড়ীটির জন্য। হারাণের চোখে এই ব্যাপারটি ধরা পড়িয়াছে।

কিন্তু টাকা যাহার মিটাইয়া দেওয়া হয় নাই, তাহাকে অন্য কিছুর সুবিধা—সুবিধাটা কি? হারাণের চোখ হিংস্রতায় জ্বল-জ্বল করিয়াছে। সুন্দরী তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া থাকে বলিয়াই তো আরো বেশি ভয়। ভয়ই হিংস্রতা।

একদিন হারাণের মুখটা পাশব ভয়ঙ্কর দেখিয়া সুন্দরীর সঙ্গে সোহাগ চালাইবার প্রবল ইচ্ছাটার অপমৃত্যু হইল গণেশের। হারাণের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়া নধরকান্তি গণেশ রীতিমত ভদ্রলোকের চালে সহর দেখাইয়া আনিয়াছে সুন্দরীকে। পিসিমার আপত্তি ছিল না সঙ্গে গিয়াছেন বলিয়া। পরের মাথায় হাত বুলাইয়া ঠেকিয়া-থাকা চতুর্থ কালের সখ যদি মিটিয়া যায়, তার চেয়ে আকর্ষণের বস্তু কি থাকিতে পারে সংসারে? এবং লোভের প্রাবল্য দুর্দমণীয় ছিল বলিয়াই অন্য কোনো দিক তলাইয়া দেখিবার সময় ছিল না, সুন্দরীর যেমন ছিল না মার্জিত চাল-চলন ও সহুরেপণার মোহে।

সেদিন বাড়ীতে একটু রাত করিয়াই ফিরিয়াছিল ওরা। সুন্দরী লণ্ঠন জ্বালাইয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া শুইতে যাইবে, আলো ও অন্ধকারের সরল রেখায় সে কি বীভৎসই না দেখিল তাহার স্বামীর মুখ! গাধার মত চোয়াল, কোটরগত চক্ষু, শুইবার ভঙ্গিটি কি জঘন্য!

আলোটা নিভাইয়া জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল সুন্দরী, দিনের সমস্ত আকর্ষণ অন্ধকারে রূপ লইয়া কত প্রলুব্ধ করিল তাহাকে। গভীর ও চাপা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল বুক হইতে।

—হ্যাঁ গো বৌ ঠাকরুণ, কেমন লাগে তোমার এখানে? বায়স্কোপ দেখবে? হারাণ দা বুঝি—তোমার মত মেয়ের—

আস্তে আস্তে পা টিপিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সুন্দরী—আঃ কি বাতাস দিয়াছে! কি অন্ধকার আজিকার রাত্রিটা। না, ঠাণ্ডা লাগবে আবার।

পিসিমাকে জাগাইয়া তুলিল সে—এই না এলেন? শুনছেন? এখানে ঘুমোবো আমি।

পিসিমার কাছে ঘুমাইবে! পিসিমা তো তখন এমন ছিল না।

ঘুমজড়িত অস্পষ্ট স্বরে পিসিমা তাঁহার স্বাভাবিক বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন—যাও বৌ, জ্বালিয়ো না। চাবি কি আমার কাছে? কি বললে? না, আমি রাখিনি।

পিসিমার বালিশের তলা হইতে চাবি বাহির করিয়া সুন্দরী কঠিন মুখে হাসিয়াছে, এই তো চাবী—আর ওতো আমি চাইনি।

ঘুমন্ত অবস্থায়ই হাত বাড়াইয়া চাবি নিয়া পাশ ফিরিয়াছেন পিসিমা; ঘুমাইতে ঘুমাইতে তিনি তাঁর গুপ্ত ধন সম্পত্তি শঙ্কিত হইয়া আগলাইয়া থাকেন।

নিরুপায় সুন্দরী অবশেষে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া শুইয়াছে, ঘুম আসিতে আসিতে রাত হইয়াছে শেষ।

তারপরও গণেশ আসিয়াছে কার্তিকের মত সাজ করিয়া, হারাণের স্ত্রীর দিকে সে কেমনভাবে তাকাইয়াছে; ঘৃণায় ও লজ্জায় সুন্দরীর সমস্ত মোহ উপিয়া গিয়াছে।

লজ্জায় তাহাকে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয় নাই বেশি দিন। হারাণের মুখে এমন একটা হিংস্রতা ফুটিয়াছিল, সভ্য ও মসৃণ গণেশ ঘোষ যাহাতে

বর্ব্বর নৃশংসতার আভাস পাইয়া এবং টাকা না পাইয়া কাশীতে চলিয়া গিয়াছে প্রাণান্তকর কিছুর সম্ভাবনায়।

সেই হইতে হারাণের সম্মুখে সুন্দরীর অপরাধীর দুর্বলতা। এবং ঐ দুর্বলতার জন্য পরিষ্কার করিয়া কিছু বিচার করিতে পারে না সে। নিজেকে দোষী ভাবিয়া অনুতাপ করার আগেই হারাণের ছন্নছাড়া চরিত্রের উপর সমস্ত কার্য্যকারণ অন্ধের মত চাপাইয়া দেয় ; কিন্তু সান্ত্বনা যেন কোনো মতেই পাওয়া যায় না।

নিঃশব্দ বিলাপে সুন্দরী কাঁপিয়াছে !

এমন খাপছাড়া জীবনের নিষ্ফল জের টানিয়াই চলিয়াছে ওরা। একদিন যখন ওরা নতুন ছিল, ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রা তখন ওদের অবাধ কল্পনায় পড়িয়া মথিত হইত নাকি ?

স্বামীর ঘর করিতে আসিয়া সুন্দরী অল্পদিনের মধ্যে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, যতখানি ভাবিয়াছিল হারাণকে ততখানি পায় নাই বলিয়া। হারাণ তার স্ত্রীর হতাশা লক্ষ্য করিয়াছে, কারণটা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ভালোবাসাবাসির মধ্যে সুন্দরী তীব্র কোনো স্বাদের আকাঙ্ক্ষা রাখে নাই কেন ? কাজকর্ম সারিয়াও সে এদিকে তাকায় নাই। বরং, মাজা বাসন আবার মাজিতে বসিয়াছে। এমন করিয়া যৌবনকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার কি একান্তই তাহার জন্য ছিল ? হারাণের জন্য থাকুক তবে নেশা। সুন্দরীর উদাসীনতা তাহাকে প্রথম প্রথম আকৃষ্ট করিয়াছিল খুব। শেষে দূরে সরিয়া গিয়াছে। ঐ উদাসীনতা তো আমন্ত্রণ নয়, ওটা বিতৃষ্ণাই বহন করে বেশি।

এমনি জটিল ও রহস্যপূর্ণ মানুষের মনস্তত্ত্বের এই অধ্যায়টি।

আজো সুন্দরী বোঝে না, বুঝিয়া উঠিতে চায় না বলিয়া। বুঝিবার মত উদ্যমের অভাব তাহার। তার চেয়ে শিবনেত্র হইয়া নেশা করিয়া দিন কাটানো ভালো, যার প্রসাদে নাকি একটু বন্ধনমুক্ত বোধ করিবে সে।

সেই যে বিঁড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল হারাণ, ফিরিয়াছে রাত করিয়া।

—হ্যাঁ পিসিমা, কি যে বলছিলে তখন, ছাই মনে থাকে না! বউটার এই অবস্থায়—কি অবস্থায় গো ?

—জানিস না, ন্যাকা! যা' খেতে বোস্ গিয়ে—

—না না, বলো তুমি—কি অবস্থায় গো ? ও—অ, বুঝিচি! তা'লে ভাত খাবো কেন ? লাও তুটাকা সন্দেশের বাবদ।

আবিষ্কারের খুশি বিস্ময়ে ঝনাৎ করিয়া টাকা তুইটা মেঝেতে ফেলিয়া দিয়াছে হারাণ। মেজাজটা তাহার এত মধুর থাকে পিতৃত্বের আশ্বাসে! পিসিমা অবাক হন, সঙ্গে সঙ্গে খুশি হইতেও দেখা যায় তাঁহাকে; সুন্দরী তাহা হইলে ধরা দিয়াছে। ভাইপোর জন্য এত ভাবেও তাঁহার মন কাঁদে! কে জানিত এত কথা ?

—টাকা পেলি কোথায় তা ত' বল্‌লি না ?

—কি মনে করো তুমি আমাকে পিসিমা ? সংসার চালাতে হবে, রোজগার করব না ?

—বেশ, বেশ। পিসিমা হারাণের ঐকান্তিক উৎসাহে প্রীত হন; সুন্দরীর উপরে বাক্যবর্ষণ করেন না, কোনোদিন করেন নাই বোধহয়। শত আলস্য ও মন্থরতায়ও হারাণের স্ত্রী আর বাপের বাড়ী যাইবার উপদেশ শোনে নাই।

এবার সুন্দরীর মুখ দেখিলে নিশ্চয়ই পাপ হইবে না হারাণের। এখন নানা অনুযোগের ছদ্মবেশে সোহাগ যায় স্ত্রীর কাছে। সোহাগ 'শেষে স্পষ্ট রূপ নেয়।

—রান্না যা হয়েছে আজ, ফাশ্‌কেলাস। তুমি রেঁধেছ বুঝি পিসিমা ? সব জানিয়া শুনিয়া হারাণ চমৎকার ন্যাকামি করে, যে বয়সে সেটা লোক হাসানো ব্যাপার। লোকের মধ্যে পিসিমা, সুতরাং তিনিই মৃদু হাসেন: আমি রাঁধব কেন ?

বউ রেঁধেছে না ? ভালো রাঁধে। এক-পা-তু-পা করিয়া প্রশংসা অগ্রসর হয় হারাণের—সত্যিই তাই! নইলে আমি তারিফ করি ? বুঝতো পারছ না—

সুন্দরী কাছেই থাকে, সবই শুনিতে পায়; লজ্জায় লাল হইয়া ওঠে প্রায়। প্রায় অশোভন লজ্জা তাহার, লজ্জায় লাল হইবার মত রঙীন প্রেম তাহাদের নয়। নির্লজ্জভাবে পিসিমাকে মধ্যস্থ মানিতে তবু তাহার বাধে না। মধ্যস্থার

দিকে তাকাইয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে শোনায়—আরেকটু দোব কি পিসিমা ? ঘণ্টটা ?

ক্ষুধা যেন প্রচুর পাইয়াছে, হারাণ তেমনি ভাব ও উৎসাহ দেখায়। ক্ষুধা তাহার পাইয়াছে তো প্রচুর, মিলিয়াছে কতটুকু। এবার এই মিলনে যদি বা সে একটু তৃপ্ত হইতে পারে। কিন্তু মিলনটা সুপক্ক হইতে না হইতেই রস শুকাইয়া যায়। হারাণ বুঝিতে পারে, প্রতিদিন তাহার দাম কমিয়া আসিতেছে। উচিতমত যত্ন ও আদর সে সুন্দরীর কাছে পাইতেছে না এবং যতখানি স্নেহ ও আগ্রহ হারাণ তার পিসিমার কাছে প্রত্যাশা করে ততখানি সে পায় না।

পিসিমাও এমন হইয়া গেল! এত মাখামাখি কেন ওদের? ওরা তো এমন ছিল না। নিষ্ফল আক্রোশে হারাণ জ্বলিতে থাকে—দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজাটা! সারাটা ছুকুর ছুজনেতে খুব যে হাহা করে হাসি আর রসের আলাপ! ব্যাপারখানা কি ?

ব্যাপারখানা হারাণের কাছে চমৎকার পরিষ্কার।

অদৃশ্য ও অজাতশত্রুর উদ্দেশে অনেক শাপ উচ্চারণ করিল সে এবং নিষ্ঠুর বিমুখতায় দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ফিরিয়া গেল তন্দ্রাচ্ছন্ন নেশার জগতে, আবার সুরু হইল নিশাচর বৃত্তি।

তারপর একদিন ঘণ্টা ছুয়েক গোঙাইয়া সুন্দরী মা হইল। খোকাটি ফর্সা হইয়াছে খুব, সুন্দর নাক-মুখ-চোখ। বিস্মিত হইয়া সুন্দরী খোকাকে দেখিল; স্তনের বোঁটা তুলিয়া দিল শিশুর লাল পাৎলা ঠোঁটে। এক অনির্বচনীয় সুখে নতুন জননীটি প্রায় শিহরিয়া উঠিল এবং আদর যত্নের আতিশয্য হইয়া উঠিল নিপীড়নের সামিল। মা হইয়া এমন ছেলেমান্‌ষি আরম্ভ করিয়াছে যে, কি করিতে গিয়া কি করিয়া বসে ঠিক থাকে না।

আঁতুড় ঘরের দরজার পাশে বসিয়া পিসিমা খুশিতে চোখ উজ্জ্বল করেন—কাত্তিকের মোতোন ছেলে পেয়েছিস্ তুই বউ!—ওরে বাপরে, আবার কাঁদে যে! মাই দে, মাই দে। মধু দে তো একটু। হারামজাদা হাত-পা ছোঁড়ে কেমন ত্যাখ, বউ।

সুন্দরীর তৃপ্তি নাই দেখিয়া।

ওদিকে হারাণ প্রসব বেদনার সময় ধাত্রী আনিবার নাম করিয়া সেই যে গিয়াছে, তিন দিন হইল, ফিরিয়া আসিবার নামটি নাই। পিসিমা এবার অন্যান্যবারের মত দুশ্চিন্তা করিয়া কাতর হইতে ভুলিয়া যান।

সাত দিন বাদে ফিরিয়া আসিয়াছে হারাণ। চোখ দুইটা অকথ্য লাল ও চুলগুলি রুক্ষ, এলোমেলো করিয়া নোঙরা চেহারা লইয়া ফিরিয়াছে সে।

স্বভাবসিদ্ধ ইতরের মত তাহার কথাবার্ত্তার ধরণ। যে কোনো রকমের নোঙরা কথা হোক্ উচ্চারণ করিতে হারাণের এতটুকু বাধে না। বরং এই সব কথা বলিয়া অপরকে বিদ্রূপ করার মধ্যে সে অদ্ভুত একটা আনন্দ আবিষ্কার করে। স্ত্রীকে তাই বেহায়ার মত বলে—খোকা তোমার খাসা হয়েছে সুন্দো দিব্যি ফুট্‌ফুটে। মাইরি—

আরো কি সব বলিতে যায়, থামিয়া গিয়া মাংস-লুব্ধ পশুর মত খোকার দিকে তাকায়, কি ভাবিয়া সে আবার বিমর্ষও হয়; বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট গলায় বলে—শালা কোমর-বাঁধা শয়তান।

বিমূঢ়তা মিশ্রিত শঙ্কার সঙ্গে সুন্দরী প্রতিবাদ করে—মুখে কি তোমার কিছু বাধে না? যা তোমার ইচ্ছে প্রাণভরে বলো আমাকে, ওকে কেন?—বলিয়া সে বিভ্রান্তভাবে হাসে ও সন্দিগ্ধ হইয়া হারাণের দিকে তাকায় আর রাগে হারাণের শরীর জ্বলিতে থাকে, চেতনায় জ্বর আসে, বুদ্ধি হইয়া যায় ঘোলাটে। কিন্তু পিট্‌ পিট্‌ করিয়া চায় ও দাঁতে দাঁত চাপিয়া হাসে—দাঁড়া, কি মজাটা আমি দেখাই তোদের!

ভয়ে সুন্দরীর নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, সাহস করিয়া বলেঃ কাকে কি বলছ?

—ন্যাকা! বোঝ না কিছু! বুঝবে, বুঝবে। এই হারাণচন্দ্র সবাইকে বোঝাবে। তেমন লোক নই আমি, জানিস্ সুন্দো? নে, শুনে রাখ্।

অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারী করে হারাণ। ইতরতার নোঙরা রং এত জ্বল্-জ্বলে তাহার মুখে ও দৃষ্টিতে যে, বিশুদ্ধ সাধুতার শ্বেতাভার মতই সংসারে তা দুর্লভ। কৃত্রিম না অকৃত্রিম? কেমনতর লোক তাহার স্বামী? সুন্দরী সেদিনও তাই ভাবে।

ভাবিবার অবকাশ না দিয়া হারাণ এবার ঝুঁকিয়া পড়ে পরিপুষ্ট শিশুটির উপর।

—তোর রং পেয়েছে ছেলেটা, না সুন্দো ?

—নাঃ ! আমি তো কালো !

—আর আমার মত পেয়েছে মুখের চেহারা—চুপ করে থাকলে রেহাই নেই জান্‌বি।···কি গো সুন্দরী, তাও যদি না হল, তবে কার মোতোন হয়েছে তা বলবি তো।

একটু থামিয়া দম নিয়া আবার জড়াইয়া জড়াইয়া বলে—গোবর গণেশ ছেলে তোর—গণেশের মতোই দেখতে। হ্যাঁ-কি-না বল্‌।—আশ্চর্য্য, কি জানি কি হয় হারাণের মনের মধ্যে। খানিকবাদে কণ্ঠস্বরে স্নিগ্ধতা আনে হারাণ—মাইরি বল্‌ছি, সুন্দোর হয়েছে তোর ছেলে ! বউ, তোর ছেলে রাজপুত্তুর !

ঐ স্নিগ্ধতাটুকু সুন্দরীর বিশ্বাস হয় না ; তবু বলে—তাই বলো ! তবে যে কি মাথা-মুণ্ডু বলছিলে ?—হারাণের এই চরম ইতরতাকেও সুন্দরী শ্রদ্ধা করিতেছে কেন ?

জীবনের পিছন দিকে তাকাইলে সুন্দরীর এখনো মনে পড়ে, কত উদ্দামতা, কত ঐকান্তিতা লইয়া হারাণ প্লাবনের মত আসিয়াছিল ; স্নেহ ও সেবার দাবী লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল হারাণ। সেদিন ঠিক মত সাড়া দেওয়া হয় নাই। আজ সমস্ত অন্যায় তাহাকে সহ্য করিতেই হইবে। হায় ঈশ্বর, এত কাঁচা, ছেলে মানুষের মন লইয়া সে স্ত্রী সাজিয়াছিল।

—কি গো, কথা বল না যে !—স্ত্রীর মতন হাসিয়াই সুন্দরী এবার স্বামীর দিকে চায়।

অতটুকু সোহাগে আজ গলিবার পাত্র নয় হারাণ ; মনে মনে সে হাসে। বিভীষিকা সৃষ্টির ক্রিয়া-কৌশলগুলি ইতিমধ্যে সে আয়ত্তে আনিয়া ফেলিয়াছে। হঠাৎ গম্ভীর হইয়া হারাণ আরো কিছুক্ষণ ঘরেই বসিয়া থাকে।

ঘরের নিস্তব্ধ আবহাওয়া কেমন জটিল অর্থময় হইয়া ওঠে ; সুন্দরীর ভয় করে। অবস্থানটি আরো ভয়ঙ্কর হইয়া ওঠে হারাণ যখন কি একটা আবিষ্কার করিয়া উন্মাদের মত হাসে। সুন্দরী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে হারাণও।

বছরখানেক নিরুদ্দেশ থাকিয়া হারাণ কি মনে করিয়া যেন বাড়ী ফিরিয়াছে। কিন্তু যে স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছিল সে, সেই স্থানটুকুর শূন্যতা কাহারো মনে বাজে নাই। খোকাটি বিছানা জুড়িয়া শোয়, দুইটি হৃদয় জুড়িয়া তাহার রাজত্ব! বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে তো খোকাটি, খল্‌খল্ করিয়া হাসে। মুখে স্বাস্থ্যের রক্তিমাভাটি বেশ প্রলুব্ধ করে। হারাণের ইচ্ছা হয়, কোলে নেয় ছেলেটিকে। তবে বিপদ এই যে, নিজেকে সে ঠিক বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। স্বামী স্ত্রী দুজনের কাহারো চেহারার মিল যদি খোকার মধ্যে খুঁজিয়া না পায়? পিষিয়া মারিতে যদি ইচ্ছা হয় তাহার?

অপ্রস্তুতের মত তাই হারাণ একটু হাসে।

ব্‌ব্বা: খোকা হারাণের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে কচি মুখটি হাঁ করিয়া। ঐ নরম গাল দুইটা টিপিয়া দিবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জাগে তাহার। সঙ্কুচিত হইয়া হাত বাড়াইয়াছে হয়তো, অমনি হাহা করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সুন্দরী খোকাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

পিসিমা আসিয়া শঙ্কিতভাবে বলিল: এত বয়স হ'ল তোর হারাণ, এতটুকু দয়ামমতা নেই তোর মধ্যে?

কে বলিল দয়া মমতা নাই—কিছু বলে নাই হারাণ। বিহ্বল হইয়া পিসিমার মুখে সে তার আচরণের অনর্থ খুঁজিয়াছিল। পরে পা ঘষিতে-ঘষিতে চলিয়া গিয়াছে বাড়ির বাহিরে। এক বছর অজ্ঞাতবাস যাপনের পরও পিসিমা উদ্বিগ্ন হন না—ভালো ভাবে কথা বলেন না একটা! আশ্চর্য্য!

একশয্যায় শুইয়াও সুন্দরী বুঝি তাহাকে প্রবঞ্চিতই করিয়াছে। যত আকুতি আর যত সোহাগ সবই তাহাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য, তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া অকর্মণ্য করিয়া দিবার জন্য!

রাস্তায় রাস্তায় অনেক রাত পর্য্যন্ত কুয়াশার মধ্যে ঘোরা ফিরা করিয়া বাড়ীর দিকে চলিল হারাণ। অত্যন্ত সন্তর্পণতার সহিত জানলা ডিঙাইয়া চোরের মত সুন্দরীর ঘরে ঢুকিল। অন্ধের মত বিছানা হাতড়াইয়া অবশেষে খোকাকে পাইল সে। শয্যার উষ্ণতার মধ্যে ঠাণ্ডা স্পর্শে শিশুটি কাঁদিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছিল। অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া ভয়ে হারাণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে; আচ্ছা সেয়ানা ছেলে তো! গলা টিপে ধরলে যে

পাড়া শুদ্ধ লোকের ঘুম ভাঙাবে! এক অদ্ভুত হিংস্রতা হারাণকে পাগল করিয়া তুলিল।

ফতুয়ার পকেট হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া আনিল, বিশেষ মারাত্মক রকমের কালো বড়ি খোকার মুখের উদ্দেশে দিয়াই পালাইল, আর থামিল গিয়া রাস্তার মোড়ের পোড়ো বাড়ীটার ভিতরে গিয়া।

মিনিটে মিনিটে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া, আগাছার জঙ্গল মাড়াইয়া মরীয়া হইয়া বাড়িটার ভিতরে গিয়া থামিয়াছে সে। আর সে ফিরিয়া আসে নাই।

লোকজন আসিয়া হারাণের আকস্মিক মৃত্যুর কথা জানাইয়া গেল পিসিমা ও সুন্দরীকে। এই মৃত্যুটি কে আগে আবিষ্কার করিয়াছে, পাড়াপড়শীরা সেই আলোচনায় মজিল বেশি করিয়া। খোকাকে কোলে তুলিয়া হারাণকে দেখিতে বাহির হইল সুন্দরী, নিঃশব্দে। কান্নাকাটি করিয়া সমারোহ সহকারে যাইতে তাহার মনে বাধিল। এতদিনকার মমতাবোধ পিসিমার কান্নাতেই প্রকাশ পাইল এবং এই মর্মান্তিক সংবাদটি রাষ্ট্র করিতে সময় লাগিল না।

কিছু বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া ছেলেটা মাঝে মাঝে হাসিতেছিল। মৃত্যু-শোক বুঝিবার কথা নয় তাহার পক্ষে। সমস্ত ব্যাপারটায় সে একটা দুর্বোধ মজা আবিষ্কার করিয়াছে। অমন নির্লজ্জ হাসি দেখিয়া সুন্দরী আজ হারাণের বদলে গাল* টিপিল না। সেদিনকার মমতাশঙ্কিত মা ছেলেটার আজিকার নির্বুদ্ধিতায় বিষম রাগিয়া গিয়া দিল এক চিম্‌টি বসাইয়া।

ছেলেটা এবার সকলের সঙ্গে কাঁদিতেছে। কান্না তাহার থামে না, আবার কি মজা আবিষ্কার করিল সে, সে-ই জানে।

বিলাপ সংবরণ করিয়া পিসিমা শুধান—ছ্যাখ তো বউ, খোকার কানে কি। কাঁদে কেন? পোকামাকড়ে কামড়াচ্ছে না তো?

বুঝিতে সুন্দরীর কিছুই বাকী রহিল না। মৃত স্বামীটির জন্য করুণারই উদ্রেক হইল তাহার। ফ্যাকাশে, কঠিন মুখে বলিল—আফিম্, আফিমের গুলি পিসিমা। অন্ধকারে মুখে দিতে গিয়ে কানে গুঁজে গেছে, আপনার ভাইপো। ছ্যাখেন নি, জানলা টপ্‌কে নাউ চারাটি থেৎলে দিয়ে গেছেন!

কথা শুনিয়া পিসিমা আর কাঁদিবার উৎসাহ পান না, উৎস শুকাইয়া

গেল চোখের জলের। অথচ হারাণের শীর্ণ, পাণ্ডুর মৃতদেহ পাশেই পড়িয়া আছে। ভয়ে হোক, অনুতাপের দহনে হোক কৌটা উজাড় করিয়াছে সে আফিংএর। কোটরগত খোলা ফ্যাকাশে চোখের পিঁচুটি ভিজাইয়া চোখের জল দুই গাল বাহিয়া পড়িয়াছে। নিরক্ত ঠোঁট ভিজাইয়া হল্‌দে জল গড়াইয়াছে, মুখের দুই পাশে জমিয়া আছে ফেনা। হাত-পা ছড়িয়া গেছে কাঁটায় ও জঙ্গলে, কাপড়ে রক্তের দাগ। শেষ দেখা দেখিয়া পিসিমা বাড়ীর পথ ধরিলেন।

এ কাহিনী এইখানেই শেষ করিতে পারিতাম, কিন্তু যে লোকটি মরিয়া গেল কাহিনীর সম্ভাবনাকে সে মারিয়া যায় নাই, তাই উপায় নাই থামিবার।

মৃত্যুশোক যত জোরালোই হোক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত মরিয়াই যায়। হারাণের অভাব অনুভব করিয়া পিসিমা মাসে একবারও কাঁদিতে পারেন না। ছেলেটি ভুলিয়া গেছে যন্ত্রণাকর চিমটির কথা এবং তাহার মার নিষ্ঠুরতা। সুন্দরী কিন্তু সেদিনকার মৃত্যুটি আজো ভুলিতে পারিতেছে না, যেদিন সে তাহার খোকার গালে চিম্‌টি কাটিয়াছিল।

ছ'মাস তো চলিয়া গেছে!

হারাণের অভাব বোধ করিতে ভুলিয়া গেলেও পিসিমা সাংসারিক বিপর্য্যয়ের কথা ভুলিতে পারেন না। তার উপর সুন্দরীর শরীর এখন খারাপ। আগুনের মত যৌবন ছিল তো মেয়েটার, শরীরটা ছিল পুরুষালি রকমের মজবুত। এখন যেন সে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। নানারকম দুঃখ-যন্ত্রণা, অভাব-অনটন সত্ত্বেও সুন্দরী একদিন বাড়ীময় কাজকর্মে ছুটাছুটি করিয়া প্রাণ-সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। এখন শরীরটা হইয়াছে একটা ভার ও মনটা ব্যাধির সামিল। হাত পা রোগা হইয়াছে, রক্তহীন চোখ মুখ, গাল দুইটা শ্লথ হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; অস্বাস্থ্যকর নরম হইয়া হল্‌দে শরীরটা নীল শিরায় ছাইয়া গেছে। ঠোঁট দুইটা সর্বদা শুকাইয়া থাকে সুন্দরীর।

মাঝে একবার মাসখানেক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া উঠিয়াছে সে। আবার কিনা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে আরেকটি জীবন, আর তাহাকে শুষিয়া শুষিয়া তাহার বৃদ্ধি!

মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়া যান পিসিমা।

—কি গেরো বাঁধিয়ে গেল আবার?…উঠোনে অত বেরিয়ো না, বউ। শ্যাওলা ধরেছে, পা পিছলে পড়ে যাবার ভয় নেই তোমার?…কি যে বলতে এসেছিলাম, ছাই। হ্যাঁ, টক হবে না আজ? অরুচি যখন বাপু—খোকা, অ খোকা! ত্মাখো বউ, দস্যি ছেলের তোমার কাণ্ডখানা ত্মাখো। খোকা আমাদের ভোলানাথ। ধূলোমাটি মেখে চেহারার কি ছিরি হয়েছে লক্ষ্মীছাড়ার। বলে একটাকে নিয়েই পেরে উঠি না—

সুন্দরী তাহার দ্বিতীয় মাতৃত্বের কথা ভাবিয়া লজ্জা পায়। বিধবার বেশে স্ত্রীলোকের এই সম্ভাবনা বহন করার দৃশ্য দেখিতে লোকচক্ষু অভ্যস্ত নয়। কিন্তু, সুন্দরী তো জ্যোতিষী নয়। নিজেকে ভুলিতে ও স্বামীকে ভুলাইতে যুবতী স্ত্রীর কর্তব্যটুকু সে করিয়াছে। কে জানিত এত সব? বয়সটাই তাহার প্রতিকূলতা করিয়াছে। ফাঁকি দিতে গিয়া নিজেই তাহার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে।

রোদে বসিয়া সুন্দরী ভাবে: বেশ তো ছিলুম নির্ঝঞ্ঝাটে! কি আপদ জুটেছে বলো দেখি।

স্বামীর জন্যে সে দুঃখ করে; মরিয়া গিয়াছে বলিয়া নয়, বিপদে ফেলিয়া গিয়াছে বলিয়া। রাত্রে সুন্দরীর ভালো ঘুম হয় না, দিনের বেলায় পড়িয়া-পড়িয়া ঘুমানোর জন্য নয়। উঠানের এদিককার ঘরে উঠিয়া আসা অবধি পাশের বাড়ীর নূতন স্বামী-স্ত্রীর হাসি ঠাট্টায় তার সারা গা জ্বলিতে থাকে।

—আচ্ছা লোক তো তুমি। এই, শুনচো? বেড়াতে নিয়ে যাবে বলে কিনা রাত করে' ফিরেছ আজ। ওরকম করে' না নাচালেই নয়?

—নাচো কেন?

অবশ্য নাচিবার সময় তাদের। আর সুন্দরীর কানে কিনা তাহাই নির্লজ্জতা বলিয়া বাজে। কি আশ্চর্য্য মানুষের স্নায়ুগুলি!

—সাহেবকে বলতে বলো তা' হ'লে? বৌকে নিয়ে বেড়াতে যাবো, ছুটি দিন স্যার।

দুষ্টামি করিয়া ছেলেটি আবার হাসেও কম না। মেয়েটাই বা কি? দিন রাত গানের মৃদু গুনগুনানি তাহার লাগিয়াই আছে! আর শুনিতে চায় না সুন্দরী, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। একটি সুন্দর গানের সুর-মূর্চ্ছনায় যেন ওদের

সারাটা দিন কাটিয়া যায়। ওরা দুজন দুজনকে কেমন একান্তে পাইয়াছে! এখনো ঈর্ষা করে সুন্দরী? সুখী হইবার গোপন সাধ তাহারও জাগে তবে? এমন বয়স তাহার আছে নাকি?

ঈর্ষা বোধ হয় নয়, অতীতের জন্য যন্ত্রণাময় অনুতাপ! এখন তাহার মনে হয় হারাণ ঠিক দুর্বোধ্য ছিল না স্বভাব চরিত্রে। সুন্দরীই না হীনতা-বোধ জাগাইয়াছিল হারাণের জীবনে, যাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে সে সহজ ও সুন্দর হইতে পারে নাই।

সুন্দরীকে একদিন মুগ্ধ করে নাই হারাণ? বিশেষ একটি ভাবপ্রবণতার সাহায্যে তাহার বাপের বাড়ীর দেশে, কীর্ত্তনের আসরে? কুমারী মেয়ে সেদিন চিকের আড়াল হইতে গায়কের মিহি গলা ও আবেগময় ভাবভঙ্গি দেখিয়া দুর্লভ মানুষ বলিয়া তাহাকে ভাবিয়াছিল। মুখের চেহারা হারাণের তখনো মনোরম ছিল না। ফোঁটা-তিলক, তিন গাছি কণ্ঠী ও দুগাছি সাদা ফুলের মালায় লোকটাকে মধুরতার অপূর্ব নিদর্শন বলিয়াই জানিয়াছিল।

তবে, তাহাকেই স্বামীরূপে পাইয়া সুন্দরীর স্বপ্ন ভাঙিয়া গেছে কেমন করিয়া! কি আশ্চর্য্য মানুষের মন ও তার আকাঙ্ক্ষা।

মনে হয়, মেয়েদের ঐ বিশেষ বয়সটাতে এমন সব স্পর্শজাগর বৃত্তি থাকে যে, সহজেই তারা ভুল করিয়া বসে; শেষে, উপায় যখন আর থাকে না তখন সৌভাগ্যবান সুখী নর-নারীদের ভালো চোখে দেখিতে পারে না।

সুন্দরী অন্য কথাও ভাবে—বেশ তো আছি, খাসা। আর পাশের বাড়ীর নতুন বৌটি মন্দই বা কোনখানে? খোকাকে সেদিন বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র চুমা খাইয়াছে: জানিস খোকা, মাসীমা বলে ডাকবি আমাকে—পারবি না? ডাক তো একবার!

এ পর্য্যন্ত মন্দ লাগে নাই সুন্দরীর। তারপর মেয়েটা যখন বলে—তোর মা বুঝি তোকে ভালোবাসে না খোকা? তখন রাগে সুন্দরীর ভালোমন্দ জ্ঞান থাকে না; জানলা দিয়া মুখ বাড়াইয়া সে তাই প্রাণপণে চিৎকার করে—কে বলে আমি ভালোবাসি না ওকে? কিগো ভালোমানুষের ঝি, মুখে যে রা-টি নেই! মার চেয়ে মাসীর দরদ, আহা রে! আমি গরীব মানুষ, কষ্টেসিষ্টে আমার সংসার চলে; জানো না, আমি বিধবা? টাকার গুমোর দেখাতে আসো যে—

এমন ঝাঁঝালো কথা কেহ আশা করে না। কথা শুনিয়া মেয়েটির স্নিগ্ধ স্নেহময় হাতদুটি শিথিল হইয়া আসিয়াছে আর ক্ষুব্ধ হইয়া খোকা এ বাড়ীর সীমানায় পা ফেলিয়াছে। বৌটি স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকে কিছুক্ষণ, সুন্দরী এমন করিয়া আঘাত করে তাহাকে! আর যে কারণেই হোক নোঙরা সহরতলী ছাড়িয়া ওরা চলিয়া যায়। মেয়েটির নামও জানা হয় নাই সুন্দরীর। বয়স্কাদের স্বভাব-চরিত্র পাইতেছে সে।

অবশ্য দিনকতক যাইতে না যাইতেই মেয়েটির স্মৃতি মুছিয়া যায়।

এদিকে পিসিমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিবার জন্যই বোধ হয় আরেকটি শিশুর হয় আবির্ভাব, চিৎকার করিয়া সেই মানবক একদিন দুপুরে নির্জন, নিস্তব্ধ পাড়াটাকে সচকিত করিয়া তোলে।

—ভালো করে মুখটা তুলে ধর তো বউ, দেখি কার মোতোন—

কিন্তু সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার কথা যাহার, সেই সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাসী মানুষটাই আজ নাই! সুন্দরী ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে।

—কাঁদিস না বউ, কাঁদিস না। কাঁদতে আছে? অমঙ্গল হয় না? অবিকল হারাণ, ও ছেলেবেলায় ঠিক এমনি ছিল! এমনি রোগা—

হারাণের প্রতিনিধি কাকের চেয়েও কর্কশ গলায় চিৎকার করিতেছে, নবজাতকে হার মানাইয়া সুন্দরী আজ প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেছে! ওকি অলক্ষুণে কান্না? পিসিমা নানাভাবে সান্ত্বনা দেন।

এখানে আর মন টেঁকে না আমার—সুন্দরী অবশেষে বলে একদিন।

সেদিন তাহারা ঐ ভাড়াটে বাড়ীর উঠানে আসিয়া নামে। সুন্দরীর মুখে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা-শঙ্কিত ছায়া। পিসিমা খোকাকে নিয়া গাড়ীতে ওঠেন: ভয় কি বৌ, ভাবিস না খামকা!

পিসিমাকে সুন্দরীর ভরসা করিতে সাহস হয় সেদিন।

—তবু রোদ পড়ে এলে ভালো হ'ত না, পিসিমা? ম্লান বিষণ্ণ জিজ্ঞাসু মুখ তুলিয়া সে তাকায়।

সুন্দরীর কথা পিসিমা শুনিতে পান না বোধ হয়। এতদিনকার বাড়ী

ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার দুঃখ নাই ; এত জল ঢালিবার পর যে লাউ গাছটি চাল ছাইয়া ফেলিতে অগ্রসর হইয়াছে তাহার ফল ভোগ করিবে অন্যে, এই যা কষ্ট তাঁহার।

মৃদু আপত্তির পর সুন্দরী গাড়ীতেই উঠিয়া বসে। শূন্য ঘর-বাড়ীর দিকে সে ভয়েও চোখ ফিরাইল না। কঙ্করময় পথে চাকার ঘর্ঘর শব্দই বাজিতেছে। নতুন করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল সুন্দরী। পাড়াপড়শীদের মুখ ছোট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া গেল, গাড়ী চলিতেছে।

জন বিরল গ্রীষ্মের দুপুরে একটি সংসার যাহারা ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, তাহারাও কখন এক সময় নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শান্তিময় নীড়ের স্বপ্ন দেখিয়া লয়। রাস্তার দুই পাশে সুন্দরীর বিক্ষিপ্ত দৃষ্টি কখন অন্তর্মুখী কল্পনায় ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। অতীত যত নিষ্করুণই হোক্, তাহাকে পিছনেই ফেলিয়া যায়। বাঁচিবার অমর আশা মানুষকে অমন করিয়া প্রলুব্ধ করে।

কান্না কখন থামিয়াছে, সুন্দরীর খেয়াল থাকে না ; মার আগেই কান্না থামাইয়াছে কোলের ছেলেটি ; স্বচ্ছ কাকচক্ষু মেলিয়া জননীকে সে দেখিতেছে, গভীর রহস্যের সম্মুখীন হইয়া তাহারি আকর্ষণে পড়িয়া আমরা যেমন করিয়া তাকাই, সেই ভাবে।

জগদীশচন্দ্র পাল চৌধুরী

জেসন্

বহু কষ্টে শিখেছি সাঁতার।
অন্তত স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়া শক্ত নয় আর।
নদীতেও নানা বাঁক আছে।
সেগুলোর কোনোটাতে ঠেকে গিয়ে বাঁচে
এমন লোকেও যারা সাঁতারের স-টুকু জানে না।
সমুদ্র তো তাদের টানে না।
শরে বা শৈবালে
কিম্বা মৎস্যনারীদের সবুজ চুলের উর্ণাজালে
জড়ায় না তারা কানা মাছির মতন॥

বরঞ্চ ঘূর্ণির উন্মথন
তাদের নিক্ষেপ করে শরণসৈকতে।
বিষম দ্বৈরথে
জাগ্রত দৈত্যকে মেরে অর্দ্ধ রাজ্য রাজকন্যাসহ
তারাই কুড়িয়ে পায়; প্ররোহী আবহ
বাড়ায় তাদের বংশ; অবশেষে ঘুমিয়ে এখানে
স্বর্গের স্বাগত শোনে সচকিত কানে॥

আমগ্ন তরণী ছেড়ে ঝাঁপাতে পারি না তবু জলে।
বিফল কৌশলে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি। ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই।
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই।
ভুলে যাই একা আমি; সঙ্গে ছিলো যারা,
প্রলুব্ধ বন্দরে কিম্বা পথকষ্টে আজ আত্মহারা,

কে কোথায় প'ড়ে আছে, জানি না ঠিকানা।
শূন্য মনে ভূতে দেয় হানা ;
প্রকীর্ত্তির ছায়াচ্ছবি নিরাশ্রয় চোখে ফুটে ওঠে ॥

ফের এসে জোটে
উচ্ছল অর্ণবপোতে স্বদেশের শ্রেষ্ঠ বীর যত।
গুরুদীক্ষা, বাহুবল, সহায় দৈবত
তরায় সমূহ বিঘ্ন, নিরুদ্দেশে গন্তব্য চেনায়।
পুনরায়
স্বয়ম্বরা পণ্ড করে মায়াবীর চক্রান্ত, চাতুরী।
হাহাকারে ভরে রাজপুরী
তার উগ্র রিরংসায়। অভিসারী ঝড়ে
সবিতার বলি লুটে পলাতক তরীতে সে চড়ে ॥

স্বৈরিণীর অনুকম্পা চোকেনি তাতেও।
অযাচিত সন্তানে সে দিয়েছিলো আমাকে পাথেয়।
অপহৃত উত্তরাধিকার,
আমি নয়, সেই নিজে করেছিলো নির্দ্দয়ে উদ্ধার।
তবু তার গভীর মায়ায়
পারিনি তলিয়ে যেতে ; কৃষ্ণপক্ষ্ম চোখের ছায়ায়
সিন্ধুর উষর জ্বালা চাইনি জুড়োতে।
বিপরীত স্রোতে
সর্ব্বনাশ নিশ্চিত জেনেও
ভুলিনি শান্তির চেয়ে স্বধর্ম্মই শ্রেয় ॥

ফলত নিরবলম্ব, নিঃসন্তান, নিঃস্ব আজ আমি।
অন্তর্যামী
সাধ ও সাধ্যের ভেদ গোলায় কেবলই।

ঘটে অন্তর্জ্জলি
শতচ্ছিদ্র তরণীতে ; কিন্তু ভাবি অকূল পাথারে
স্বেচ্ছায় চলেছি ছুটে। বস্তুত জোয়ারে
ততটাই ফিরে আসি, যতখানি এগোই ভাঁটাতে।
অপ্সরীরা বসে আঘাটাতে
নিশ্চেষ্ট কৌতুক দেখে। স্তব্ধপাখা
সাগরবলাকা
অধীর চীৎকার হানে সন্ধ্যার আকাশে॥

তবে কী বিশ্বাসে
ভাঙা হাল ধ'রে থাকি, ছেঁড়া পাল সযত্নে খাটাই,
লুপ্তপ্রায় মানচিত্রে চাই,
মনে ভাবি
এ-কখানা জীর্ণ কাঠে অস্মিতার অসম্ভব দাবি
আবার প্রতিষ্ঠা পাবে সপ্তসিন্ধুপারে ?
তার চেয়ে নিঃশঙ্ক সাঁতারে
ব্যয় ক'রে নিঃশ্বাসের অন্তিম সঞ্চয়,
অগাধে সঙ্কল্পসিদ্ধি একাধারে নিশ্চিন্ত, নিশ্চয়॥

স্বপ্ন আজ ব্যর্থ বিড়ম্বনা,
জরাবিগলিত দেহে আত্মঘ্ন যন্ত্রণা
বিজিগীষা।
যে-প্রাক্তন তৃষা
মেটাতে পারেনি সিন্ধু, হয়তো বা নির্ব্বাণ হবে তা
জোয়ার-ভাঁটার সন্ধি নদীবক্ষে যেথা
মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক,
দুরাত্যয়, স্বস্থ, প্রগতিক॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

হিন্দুর দৃষ্টিতে অহিন্দু সমাজ

(১)

'পরিচয়ে'র চৈত্র সংখ্যায় শ্রীযুক্ত আশানন্দ নাগ 'অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির চিত্তকে আন্দোলিত করবে। তিনি নিজে খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী বলে যে হিন্দু সমাজকে আঘাত করবার জন্য এ প্রবন্ধ লিখেছেন তা নয়, দেশের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক কলহের বীজ কোথায় নিহিত আছে তারই অনুসন্ধান করে' সে বীজ উৎপাটন করবার উপায় উদ্ভাবন করাই হচ্ছে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। প্রত্যেক স্বদেশ-হিতৈষীর যে এতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সহানুভূতি আছে বলেই তাঁর কথা গভীরভাবে আলোচনা করা উচিত।

নাগ মহাশয়ের অভিযোগ যে "সাধারণ হিন্দু হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু কৃষ্টিকে ভালবাসেন কিন্তু ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শেখেন নি"। এবং এই কারণেই হিন্দু জাতীয়তাবাদের সম্পূর্ণ পরিপোষক হতে পারে নি। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ যে অন্ধকারাচ্ছন্ন তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ কি? "অহিন্দুর দৃষ্টিতে হিন্দু সমাজের সত্তা মায়িক" অর্থাৎ হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব "মর্ত্ত্যে নাই, স্বর্গে থাকাও একেবারে অসম্ভব। সমাজ বলতে সভ্য 'জগতে যে জিনিষটা বোঝায়, ঠিক সে জিনিষটা হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায় না। হিন্দুদের মধ্যে আছে water-tight compartments—তাঁদের আছে আড্ডা। বিংশ শতাব্দীর এই তৃতীয় দশকে যদি কোন লোক ডায়োজিনিসের মত লণ্টন হাতে করে হিন্দু সমাজের খোঁজে বের হয়, তা হলে সে দেখবে কায়স্থ সমাজ, ব্রাহ্মণ সমাজ, বৈদ্য সমাজ ইত্যাদি। হিন্দু সমাজ বলে কোন বস্তু তার চোখে পড়বে না।"

হিন্দু সমাজের সত্তা যদি 'মায়িক' হয় তাহলে কলহ কার সঙ্গে? কে জাতীয়তাবাদের প্রসারে অন্তরায় হচ্ছে? এ সমাজের সত্তা যদি 'বাস্তব' হত তাহলে কি তা জাতীয়তার পরিপোষক হত? বর্ত্তমানে "হিন্দু সভা" সে সমাজকে তার 'মায়িক অবস্থা' হতে বাস্তব অবস্থায় পরিণত করবার যে প্রচেষ্টা করছে

সে সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করা লেখকের অভিপ্রায় নয়। তাহলে বুঝতে হবে যে মায়া যেরূপ পারমার্থিক সত্য লাভের অন্তরায় ঘটায় এ মায়াও তেমনি জাতীয়তারূপ পরমার্থ লাভে ব্যাঘাত জন্মাচ্ছে। এই মায়াকে যদি কাটাতে হয় তাহলে তাকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করা ছাড়া উপায় নাই এবং তার উপায় বের করবার জন্য তাকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

'হিন্দু' শব্দটির উদ্ভাবনা হয় বিদেশীর হাতে এবং এই বিদেশীর অনুকরণে আমরাও ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট সমাজকে হিন্দু আখ্যা দিয়েছি। বস্তুতঃ অনেক বিদেশী এখনও 'হিন্দু' ও 'ভারতীয়' সমার্থবাচক মনে করে, সুতরাং তাদের চোখে ভারতীয় খৃষ্টান মুসলমান সকলেই "Hindou"। সে যাহোক বর্ত্তমানে এ দেশে আমরা হিন্দু বলতে বুঝি ভারতবর্ষের সেই জনগোষ্ঠী যা খৃষ্টান নয়, বা মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ এবং জৈনও নয়। সে হিসাবে হরিজনও হিন্দু এবং Census report-এর তথাকথিত 'animist'রাও হিন্দু।

এই হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে আছে অসংখ্য বর্ণ বা caste। এই বহু-বর্ণত্বই লেখকের হিসাবে সে সমাজকে মায়ায় পর্য্যবসিত করেছে। যদিচ বর্ণ-মাত্রই বৈজ্ঞানিকের মতে 'মায়া' তবুও আমরা ব্যবহারিক জগতে বাস করছি বলে সে 'বর্ণ'কে না মেনে নিয়ে উপায় নাই। হিন্দু সমাজের এই বর্ণবাহুল্যের মধ্যেই কলহের বীজ নিহিত আছে এ কথা বলা চলে না, কারণ বর্ণ সমূহের পরস্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গতার অভাব থাকলেও তারা জাতীয়তাবাদের প্রথম আকাশ-কুসুম নিয়ে কলহ সুরু করে নাই, এবং ১৯২০ সালের Census report-এ কোন Schedule-এরও সৃষ্টি হয় নাই। এমন কি হিন্দু, অহিন্দু শিখ, জৈন এবং বৌদ্ধদের মধ্যেও কোন কলহ নাই। ভারতীয় খৃষ্টান এবং হিন্দুর মধ্যেও কলহের কথা এ পর্য্যন্ত শোনা যায় নি। কলহ হিন্দু, মুসলমান এবং Scheduled caste বা বর্ত্তমান যুগের নব শাখাগুলির মধ্যে।

আর এই বর্ণবাহুল্য যে অহিন্দু সমাজের মধ্যে নাই তা মনে করা ভুল। জৈনদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী দিগম্বর, শ্বেতাম্বর, এবং সেই সব সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নানা গচ্ছ ও গণ আছে। চট্টগ্রাম, সিংহল ও ব্রহ্ম দেশের বৌদ্ধদের মধ্যেও সাধারণতঃ যে ঐক্য আছে মনে করা হয় বস্তুতঃ তা নাই। ঐ সব ধর্ম্মের কথা ছেড়ে দিলেও যেগুলিকে লেখক সত্যকার অহিন্দু সমাজ মনে

করেছেন তার কথাই ধরা যাক। লেখক বলেছেন "এই ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে প্রায় আঠার শ' বছর ধরে একটি বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায় খৃষ্টের ভজনা করছে। যখন শঙ্করাচর্য্যের নামও ভারতবর্ষে কেউ শোনে নি, যখন রামানুজ ও চৈতন্যের অস্তিত্ব কোনও ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা কল্পনা করতে পারতেন না তখন থেকে এই সম্প্রদায় খৃষ্টধর্ম অনুসরণ করে আসছে। এঁদের খৃষ্টানিও ভারতের নিজস্ব।"

এই খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ এবং তাঁদের মধ্যে ছ'টি পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায় আছে—Roman Catholic, Syrian Chaldean, Syrian Jacobite, Syrian Roman, Syrian reformed, এবং Protestants। Syrian খৃষ্টানেরাই মালাবার, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর প্রদেশে প্রায় আঠার শো বছর ধরে বসবাস করছে। খৃষ্টকে ভারতীয় ঋষি ধরে নিলে তারাও এতদিনে হিন্দু হিসাবে গণ্য হত। তার কারণ তাদের সামাজিক আচার ব্যবহার তথাকথিত হিন্দু আচার ব্যবহারের অনুরূপ। উপরন্তু—"It is also noteworthy that in former times it was the custom that Syrian Christians used to bathe in the morning and also if they had happened to touch any member of the polluted tribes, or a Nayar.....The rules imposed by the Synod of Diamper prohibiting the observance of such rules have been only partially effective." (The Anthropology of the Syrian Christians)। বাঙ্গালী খৃষ্টানদের মধ্যে গ্রাম্য অঞ্চলে কিছুদিন পূর্ব্বেও যে বর্ণ-বিভ্রাট ছিল তা আমরা অনেকেই জানি। ভারতীয় মুসলমান সমাজও যে একটি অখণ্ড সমাজ নয় তা 'মুসলিম লিগের' প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠছে। সুতরাং বিশেষভাবে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে ভারতবর্ষেযে কোন সমাজের মধ্যেই বর্ণবিভাগ আছে, আর সে বর্ণবিভাগ ধনী-দরিদ্র হিসাবে নয়, আচার ব্যবহারের খুঁটি নাটি নিয়ে। ভারতবর্ষের নানা সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে এও একটি ব্যাধি হিসাবে গণ্য হতে পারে।

চীন-জাপানের ইতিহাসের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করে লেখক বলেছেন যে সে দুই দেশে খৃষ্ট, বৌদ্ধ ও শিন্তো প্রভৃতি ধর্ম্ম পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তা-বাদের আদর্শ ক্ষুন্ন হয়নি। অর্থাৎ সে সব দেশে যদি হিন্দু ধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্মের মত

কোন ধর্ম্ম থাকত তাহলে চীনা ও জাপানীরা কেহই কোন রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করতে পারত না। এ থেকে তিনি অনুমান করেছেন যে "জাতীয়তাবাদ ও খৃষ্টধর্ম্ম চিরশত্রু নয়"। দুঃখের বিষয় চীন ও জাপানের ইতিহাস লেখকেরা এ উক্তির সমর্থন করে না।

চীন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় বারশো বছর টিকবার পরও খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে তা জাতীয়তাবাদের অন্তরায় হয়েছিল। এই বৌদ্ধধর্ম্মের সূত্র ধরে তুর্কী, মঙ্গোল প্রভৃতি জাতি চীন দেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, এবং চীন দেশ বৈদেশিক জাতির করতলগত হয়েছিল। সেই কারণে চীনারা চতুর্দশ শতক হতে বৌদ্ধধর্ম্মকে প্রায় নির্ব্বাসিত করে। ফলে চীন দেশ হতে বৌদ্ধধর্ম্ম বহুকাল লোপ পেয়েছে। খৃষ্টধর্ম্মের পেছনে যদি ইউরোপীয় রাজশক্তি না থাকত এবং চীনাদের যদি ভাগ্য বিপর্য্যয় না ঘটত তাহলে তারা খৃষ্টধর্ম্মকে তাদের দেশে কি স্থান দিত তা ভাববার কথা। চীনদেশে জাতীয়তাবাদ যেদিন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সেদিন বৌদ্ধধর্ম্মের মত খৃষ্টধর্ম্মও সে দেশ হতে নির্ব্বাসিত হবে এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয়।

জাপানের একমাত্র ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করেই জাপানের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে। শিন্তো কোন ধর্ম্ম নয়, আর সে শিন্তোও জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মকে একটি বিশিষ্ট জাপানী ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করেছে। সেই কারণে শিন্তো ও বৌদ্ধের মধ্যে বিরোধের কারণ ঘটে নাই। জাপানে খৃষ্টধর্ম্ম কোন দিনই প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নাই, জাপানী সরকার বরাবরই কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করে সে ধর্ম্মকে জাপানে প্রসার লাভ করতে দেয় নাই। প্রথম ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে—

"Franciscans were arrested and condemned to have their noses and ears cut off to be promenaded through Kyoto, Osaka and Sakai to be crucified at Nagasaki."

এই কার্য্যের জবাবদিহি করতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী হিদেয়োশী প্রচার করেছিলেন—"I have ordered these foreigners to be thus treated because they have come from the Phillipines to Japan, calling themselves ambassadors, although they were not so ; because

they have remained for long without my permission ; because in defiance of my prohibition they have built churches, preached their religion and caused disorder."

পুনরায় ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী অনুজ্ঞা প্রচার করেন যে—"all the foreign priests should be collected in Nagasaki preparatory to removal from Japan, that all churches should be pulled down, and that all converts should be compelled to abjure christianity." এই আদেশ অল্পদিনের মধ্যেই কার্য্যে পরিণত করা হয়েছিল।

বিগত শতকের মধ্যভাগে আমেরিকার নৌসেনাধ্যক্ষ পেরির হুম্‌কি খেয়ে জাপানীরা যখন জাতীয় পুনর্গঠন সুরু করে তখনও তাদের রাজনীতির মূলসূত্র হল খৃষ্টধর্ম্মকে প্রবেশ করতে না দেওয়া এবং নৌবল গঠন করা। "The two things most essential are that the christianity should not be admitted in the train of foreign trade and that the strictest economy should be exercised by all classes of the people so as to provide funds for the building of a navy and the fortification of the coasts." (Brinkley-Kikuchi—*A History of the Japanese people.*)

সুতরাং জাপানীরা খৃষ্টধর্ম্ম বা অন্য কোন বিদেশী-ধর্ম্মকে নেক-নজরে দেখে নাই। বরং সে ধর্ম্ম জাতীয়তার অনুকূল হবে না মনে করেই কঠোর দমননীতি অবলম্বন করেছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম মূলতঃ বিদেশী হলেও সে ধর্ম্মকেই তারা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষার একমাত্র বাহন মনে করে তাকে রক্ষা করেছে। যদিচ সেই জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে আজ অবধি বহু পরস্পর বিরোধী দল আছে এবং সে সমস্ত দলের মধ্যে এক সময়ে বহু যুদ্ধ বিগ্রহও হয়েছিল।

ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্ম মূলতঃ ইন্দো-ইউরোপীয় হলেও তা যে পনেরো-আনা ভারতীয় তাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্ম্মের সঙ্গে তার তুলনা করলেই তা সহজে বোঝা যাবে। সেই ধর্ম্মই ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম। যে যুগে ক্ষমতাপন্ন রাজশক্তি সে ধর্ম্মের সহায়ক ছিল সে যুগে যে

কোন বিদেশী-ধর্ম্মকে এ দেশ হতে সহজে নির্ব্বাসিত করা সম্ভব ছিল। হিন্দু ভারত যে তা করেনি তার কারণ ধর্ম্মবিশ্বাস নিয়ে কলহ করা কোন যুগেই তার স্বভাবগত ছিল বলে মনে হয় না। সেই কারণেই St. Thomas-এর ভক্তবৃন্দ, পার্শী, শক, যবন, পহ্লব, সকলেই ভারতবর্ষে স্থান পেয়েছে। যারা ভারতীয় হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল তারা হয় হিন্দু না-হয় বৌদ্ধ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল, এবং যারা নিজেদের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেনি, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করবার জন্য কেউ তাদের উৎপীড়ন করেনি। সুতরাং হিন্দু ভারত যে চীন, জাপান, মধ্যযুগের ইউরোপ এবং বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মানী বা ইতালীকে অনুকরণ করে জাতীয়তাবাদের প্রসারের পথ পরিষ্কার করেনি সেই জন্য তাকে দোষ দেওয়া চলে না। কিংবা চীন, জাপান, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশকেও প্রশংসা করা চলে না।

যে কারণেই হোক্ বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা জাতীয়তাবাদের অনুকূল নয়, এবং দেশের পক্ষে যে তা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক, একথা সকলেই স্বীকার করবেন। লেখক সেজন্য হিন্দুকেই মূলতঃ দায়ী করেছেন। কারণ "সাধারণ হিন্দু হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু কৃষ্টিকে ভালবাসেন, ভারতবর্ষকে ভালবাসেন না"। কিন্তু লেখকের কথাই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করে বলা চলে—"যে সাধারণ খৃষ্টান মুসলমান তাঁদের ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে ভালবাসেন, ভারতবর্ষকে ভালবাসেন না"। এই উভয় উক্তিই যদি সত্য হয় তাহলে মানতে হবে যে, কোন দেশের ভৌগোলিক সত্বাকে কেউ ভালবাসে না, ভালবাসে সেই দেশের অন্তরে বসবাস করে যে কৃষ্টি গড়ে তোলে সেই কৃষ্টিকে। ধর্ম্ম সেই কৃষ্টির অঙ্গমাত্র। সুতরাং কৃষ্টিকে বাদ দিয়ে দেশকে কেউ ভালবাসতে পারেনি, ভবিষ্যতে যে কোন জাতি তা পারবে তার সম্ভাবনাও কম। অতএব এই ভারতবর্ষে বাস করা সত্ত্বেও মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব কৃষ্টিকে ভালবাসবেই, এবং সেই কৃষ্টির সঙ্গে ভারতবর্ষের অঙ্গাঙ্গীভাব যে পরিমাণে ধরা পড়বে ভারতবর্ষকেও তারা সেই পরিমাণে ভালবাসবে। এ অবস্থায় যদি কোন বিশেষ জাতি-সংঘের কৃষ্টির সঙ্গে ভারতবর্ষের সে যোগসূত্র স্থাপিত না হয় তাহলে সে জাতি বহুকাল ধরে ভারতবর্ষে বাস করলেও যে সে দেশকে ভালবাসতে পারবে তা মনে করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

(২)

কোন সংস্কৃতির সংগঠনে বাইরের প্রভাবের মূল্য অতি অল্প। একটি বিশিষ্ট জাতি-সংঘ একটি বিশিষ্ট দেশের গণ্ডীর মধ্যে যে কৃষ্টির উদ্ভাবনা করে তা মূলতঃ তার নিজস্ব কৃষ্টি। সে দেশের জল, বায়ু, ভৌগোলিক আবেষ্টনী, ফল, ফুল প্রভৃতি সে কৃষ্টির সংগঠনে প্রভূত সহায়তা করে, সুতরাং তাদের সঙ্গে সে কৃষ্টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিদেশী কৃষ্টির আক্রমণে সেই জাতীয় কৃষ্টির ধারা ঈষৎ আন্দোলিত হয় বটে কিন্তু কোন দিনই তা কক্ষচ্যুত হয় না। বৈদিক আর্য্যগণ বিদেশী হলেও আর্য্যসভ্যতা ভারতবর্ষে যে রূপ পরিগ্রহ করে তা ভারতর্ষেরই নিজস্ব। বরুণ ও Uranus, দ্যৌস্-পিতর্ ও Zeus মূলতঃ এক হলেও বরুণ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় দেবতা এবং Uranus গ্রীক। অগ্নি এবং সোম বৈদিক যজ্ঞে যে স্থান অধিকার করে অন্য ইন্দো-ইউরোপীয় ধর্ম্মে তা করে না। St. Thomas-এর খৃষ্টধর্ম্ম, বা মুসলমান ধর্ম্মও এই ভারতীয় প্রভাব হতে মুক্ত নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত জাতি বসবাস করেছিল তারা ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় যে কৃষ্টির সংগঠন করেছিল তার আকর্ষণী শক্তি হতে ভারতের কোন সমাজ বা ধর্ম্মই মুক্ত নয়।

আমরা যাকে হিন্দু সংস্কৃতি বলি তার মূল উপাদান হচ্ছে এই প্রাচীন ভারতীয় কৃষ্টি। ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, চিত্রকলা, ভাস্কর্য্য সমস্তই এই মূল ভারতীয় কৃষ্টি হতে উদ্ভূত। সুতরাং ভারতীয় কৃষ্টি ও হিন্দু সংস্কৃতি সমার্থবোধক। ভারতীয় কৃষ্টি যদি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অনুকূল হয় তাহলে হিন্দু সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে সে জাতীয়তাবাদের প্রসারে অন্তরায় ঘটাতে পারে না।

এ কথা ঠিক যে হিন্দু সমাজের মধ্যে অসংখ্য বর্ণ বা "water-tight compartments" আছে। কিন্তু সে সমস্ত বর্ণই হিন্দু সমাজ-বিধান এবং হিন্দুধর্ম্ম মেনে চলে। নানা বর্ণের সমাজবিধানের মধ্যে প্রভেদ আছে সত্য, কিন্তু তা হিন্দুশাস্ত্রকারদের কপোলকল্পিত প্রভেদ নয়। প্রত্যেক বর্ণ বহু শতাব্দী ধরে সমাজ নিয়ন্ত্রণ করবার যে বিধিব্যবস্থার উদ্ভাবনা করেছিল, শাস্ত্রকার শুধু তা লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। সেই কারণে প্রত্যেক বর্ণের অস্তিত্বকে স্বীকার করে

নেওয়া হয়েছে এবং তার গণ্ডীকে দৃঢ়তর করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক বর্ণই হিন্দু সংস্কৃতির অধিকার হতে বাঞ্চত হয় নাই, প্রকৃতপক্ষে তাকে বঞ্চিত করা সম্ভবও নয়। বর্ত্তমান যুগে এ ব্যবস্থা আমাদের মনঃপূত নয়, তার কারণ আমরা বর্ণবাহুল্যে বিশ্বাস করি না। সে বর্ণবাহুল্য কিসে বিনষ্ট হতে পারে তা নির্দ্ধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। "আর্য্য সমাজ" "হিন্দু সভা" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তা দূর করে একটি অখণ্ড হিন্দু সমাজের সৃষ্টি করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছে তাও আমাদের মনঃপূত নয়। কারণ তা জাতীয়তার অনুকুল নয়।

মুসলমান ভুলে যান যে ভারতবর্ষের নদ নদী পাহাড় প্রভৃতি তাঁর মনে যে দোলা দেয় আরবের মরুভূমি তা দেয় না, মাতৃভাষা তাঁর ভাবপ্রকাশে যে সহায়তা করে আরবী ভাষা তা করে না। ভারতীয় খৃষ্টানের দৃষ্টি Holy land এবং Holy Bible-এ যতই নিবদ্ধ থাক্ না কেন ভারতবর্ষের মাটির সঙ্গেই তাঁর অন্তরঙ্গতা সর্বাপেক্ষা বেশী।

বর্ত্তমানকালে হিন্দু এবং নানা অহিন্দু ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করে বিভিন্ন অখণ্ড সমাজের সৃষ্টি করাও যে জাতীয়তাবাদের অনুকূল এ কথা মনে করবারও কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। কারণ সেই সংস্কারের চেষ্টার সঙ্গেই কলহের উদ্ভব হয়েছে। মুসলমান এখন আর হিন্দুর পূজা দেখতে যায় না, হিন্দুও পীরের দরগায় শিরণী দেয় না। পূর্ব্বে সাধন-পন্থী হিন্দু মুসলমান ফকিরের নিকটেও দীক্ষা নিত, এবং সত্যপীরের পূজা করত। মুসলমান লক্ষ্মীপূজার দিন ঘরে লক্ষ্মীর 'আড়ি' স্থাপনা করত, দুর্গাপূজায় নূতন কাপড় পরত ও দলবদ্ধ হয়ে ভাষাণ দেখত। মসজিদের সামনে কাঁসর ঘণ্টা বাজালে নমাজ নষ্ট হত না বা হিন্দুর বাড়ীর পুকুর পাড়ে নমাজ পড়লেও হিন্দুর হিন্দুত্ব ক্ষুণ্ণ হত না। কিন্তু যে দিন হতে ধর্ম্ম-সংস্কার করবার চেষ্টা এবং প্রত্যেক সমাজের "মায়িক" সত্ত্বাকে বাস্তবে পরিবর্ত্তিত করবার প্রয়াস সুরু হয়েছে সেই দিন হতেই গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সংস্কার-প্রচেষ্টার ফলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে চৈতন্যোদয় হয়েছে তাতে ব্রাহ্ম আর লক্ষ্মী সরস্বতীর নাম সইতে পারেন না, মুসলমান প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে প্রচলিত জাতীয় সঙ্গীতকে মূর্ত্তি পূজার সহায়ক বলে বর্জন করতে যত্নবান হন,

খৃষ্টানের ভিতর প্রচলিত ভারতীয় আচার ব্যবহারকে হিন্দু প্রভাব মনে করে Synod তা বর্জন করবার অনুজ্ঞা দেয়।

সুতরাং ধর্ম্ম সংস্কারের চেষ্টা এবং সামাজিক জীবনে দলবদ্ধ হবার চেষ্টাই হচ্ছে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কর্ম্ম। তা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বলেই জাতীয়তাবাদের প্রসারের অন্তরায়। হিন্দু সমাজের সত্তা 'মায়িক' বলে অর্থাৎ হিন্দু সম্পূর্ণভাবে দলবদ্ধ নয় বলে স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দু যতটা সাহায্য করে অন্যে তা করে না। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী অথচ সে প্রতিষ্ঠান এখনো 'হিন্দু সভায়' পরিণত হয় নাই।

ধর্ম্ম বাদ দিলে হিন্দু সংস্কৃতির যা অবশিষ্ট থাকে তা হচ্ছে ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধন। যে কোন ভারতীয় সম্প্রদায়ের কৃষ্টি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে এই মূলধনের খোঁজ পাওয়া যাবে। নাগ মহাশয় বৈশাখ সংখ্যার 'পরিচয়ে' বলেছেন "কিন্তু আমাদের ভারতীয় প্রাণের অন্তরতম স্থানে কোথায় যেন একটা মিলনেচ্ছা সুপ্তাবস্থায় রয়েছে। সেখানে মাঝে মাঝে বেদনার একটা ক্লেশকর স্পন্দন অনুভূত হয়।" যে সাধারণ ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়িক কৃষ্টির পেছনে বর্ত্তমান তারই আকর্ষণে এই "মিলনেচ্ছা"! সুতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন সেই সংস্কৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ হবে তখনই সাম্প্রদায়িক কলহের অবসান হবে বলে মনে হয়। সুতরাং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে যে কোন বুদ্ধিজীবি ব্যক্তির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে সেই যোগসূত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বৈষম্যের দিকে নয়।

আমরা স্বীকার করি আর না করি সে যোগসূত্র অচ্ছেদ্য। ভারতবর্ষের মাটিতে যে জন্মেছে সে সূত্র সেই মাটির সঙ্গেই তাকে সংযুক্ত করেছে আর সেই যোগসূত্রকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে আমাদের সর্ব্ববিধ সংস্কার। বিদেশী ধর্ম্ম এই সংস্কারের সংখ্যাকে পরিবর্দ্ধিত করেছে মাত্র কিন্তু প্রাচীন জাতীয় সংস্কারকে বিনষ্ট করতে পারে নি। কুসংস্কার ও সুসংস্কার উভয়েই সংস্কার। আর এই সংস্কারকে অবলম্বন করেই জাতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব। সুতরাং ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কারের যে মূল্য জাতীয় জীবনে তার মূল্য তদপেক্ষা কম নয়। জাতীয় জীবন সে সংস্কার অতিক্রম করতে পারে না। একথা স্বীকার করে নিলে মানতে হবে যে হিন্দু-অহিন্দু সমস্যা কোন সত্যকার সমস্যা নয়।

নাগ মহাশয় বলেন—"হিন্দু-মুসলমান সমস্যা হেসে উড়িয়ে দেবার কিংবা ফষ্টিনাষ্টি করবার বিষয় নয়। সমস্যা আছে—এটা জলজ্যান্ত সত্য। তবে এর কারণ সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি ততটা পরিষ্কার নয়।" হিন্দু-অহিন্দুর কলহ সাময়িক, এবং সাময়িক বলে তা সমস্যা নয়। এ কলহের কারণ উপলব্ধি করা যে অত্যন্ত শক্ত তা মনে হয় না। যেখানে কলহের বীজ পূর্ব্বে ছিল না সেখানে সে বীজ নূতন করে আসতে পারে না। একথা স্বীকার না করে পারা যায় না যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই এই কলহের উদ্ভব হয়েছে। সেই জাতীয়তাবাদের অগ্রগতি রোধ করবার জন্য যে সমস্ত উপায়ের উদ্ভাবনা করা হয়েছে এই কলহ যে তার মধ্যে অন্যতম তাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্মবৈষম্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যেমন এ কলহের সৃষ্টি করা সহজ, ধর্ম্ম-সাম্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে কলহের নিবৃত্তি করাও সহজ। হয় ত অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য সে কলহ নূতনরূপে পুনরায় দেখা দিতে পারে কিন্তু তার জন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে দোষ দেওয়া চলবে না। আর এ কথাও ভুললে চলবে না যে জাতীয়বাদও সভ্য জগতের শেষ কথা নয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

সিখ সম্রাট ও সতীর শাপ

লাহোরে বাদশাহী মসজিদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের মীনারের উপর দাঁড়াইয়া লর্ড লিটনের দরবার* সংক্রান্ত পাঞ্জাবের রাজাদের অপূর্ব্ব ক্যাম্প দেখিতেছি। আমার উচ্চ স্থান হইতে যে দৃশ্য আমি দেখিতেছি ইহা দেখিবার যোগ্য বটে। সন্ধ্যা আগত প্রায়। পশ্চিমে মসজিদের বিরাট গম্বুজত্রয়, তাহার পর রক্তের মত লাল মেঘলা আকাশের নীচে গলানো সোনার রংয়ে ঝকমকে রাবী নদী, বন, বাগান, ক্ষেত, ক্বচিৎ একখানি ছোট বৃক্ষহীন উদাস গ্রাম, ও দূর-প্রসারিত বালুময় খাকি-গোলাপী মরুভূমির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রবাহিত। পূর্ব্বদিকে, ঠিক নিচেই, প্রথমে সেই ক্ষাত্র-ধর্ম্মের আধার মহারাজা রনজীত সিংহের বিচিত্র সমাধি মন্দির, ইহার স্বর্ণচূড়া ম্লান হাসি হাসিতেছে। একটু পরে বাঁ ধারে পঞ্চম সিখগুরু অর্জুন সাহেবের স্মারক সৌধ, আর ডাইনে বিশাল (এক্ষণে বন্ধ) সিংহ-তোরণ, উহার পশ্চাতে সিংহ মহারাজার সাধের 'হজুরী বাগ্' যাহার মাঝখানে মর্ম্মর নির্ম্মিত অপূর্ব্ব বারাদরি হইতে গৌর মরা-মুখের মত ফ্যাকাসে শাদা আভা বাহির হইতেছে। এই সব ছাড়াইয়া আবার প্রকাণ্ড বন্ধ ফটক ও কেল্লার ভীম প্রাচীর ; ইহার মধ্যে সারি সারি সুদূর-ব্যাপ্ত সিংহ মহারাজার ইষ্ট দেবতা অষ্টভুজা দেবীর নৌলক্ষা মন্দির ও শিশ্‌মহল, জাহাঙ্গীরের মঞ্জিল, আকবরের প্রাসাদ, হুমায়ুন ভবন, ইত্যাদি। ইংরাজদের বানানো ছোট ফটকের উপর—কুৎসিৎ ক্ষুদ্র ফটকের সম্মুখে লালকুর্ত্তি গোরার আটক পাহারা, ও গিরিশ্রেণীবৎ মহান ও মৌন ইমারত-মালার সর্ব্বোচ্চ শিখরে ইয়ুনীয়ন্ জ্যাক্ পতাকা স্পষ্ট নজরে পড়িতেছে। দক্ষিণ ভাগে ক্রোশজোড়া মধুচক্রবৎ ছবির ন্যায় সুন্দর সুউচ্চ পাকা হাবেলী-ময় জমাট্ নগর, তারপর ইংরাজদের নূতন উপনিবেশ, বৃক্ষ মধ্যে এখানে সেখানে শাদা বাংলো,

* প্রত্যেক বড়লাটের শুভাগমন উপলক্ষে লাহোরে একটি মহাদরবার হইয়া থাকে। সমস্ত চীফেরা সহরের উত্তরে কেল্লার নীচে বিস্তীর্ণ ময়দানে ছাউনি ফেলিয়া ৮।১০ দিন বাস করে। এবার কাবুল বিজয়বার্ত্তা ঘোষণার্থ বেশী জাঁক।

নোট :—"শীখ" ও "রণজিত" আমি, উচ্চারণমত, "সিখ" ও "রনজীত" বানান দিয়াছি।

তারপর অনন্ত মরুভূমি হা হা করিতেছে। দিকচক্রবাল ভেদ করিয়া ভয়রোঁনাথ মন্দিরের চূড়া ঝাপসা নয়নগোচর হইতেছে। উত্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে নেত্র আর ফিরিতে চাহিবে না। দূরে, অতিদূরে, হিমালয়ের 'ধবলধারা' রক্তাভ-বেগুনে বুনিয়াদের উপর অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত গৌরবে দাঁড়াইয়া ধব্ ধব্ ধক্ ধক্ করিতেছে। আর পায়ের নীচেই বিখ্যাত 'পেরেট' ময়দান যেখানে পাঠান, মোগল, বাগাত্তা, খালসা সৈন্যদের 'আলিমা'* পর্য্যায়ক্রমে হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে ইংরাজ ফৌজের হয়। আজ কিন্তু পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রান্তের রাজা, নবাব, সর্দ্দার, খান ও মলিক, সকলে এখানে বস্ত্রাবাস ফেলিয়া ও যথাসাধ্য সাজাইয়া এই সমস্ত মাঠটিকে যেন আলিফ লয়লার কোনো রাজধানীর মত শোভান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। একবার বাম সীমানা হইতে চক্ষু বুলাইয়া যাও। সর্ব্বপ্রথম, পেশাওয়ার যাইবার ঐতিহাসিক বড় সড়কের শিরিষ বৃক্ষশ্রেণীর পাশেই, রাবীর একটি শাখার তীরে, রাজপুত কুলতিলক কাশ্মীরের মহারাজা রণবীর সিংহের ডেরা। লাল কানাতের দ্বিতল সিংহদ্বার, কানাতের প্রাচীর ঘেরা, কেন্দ্রে মহারাজার শ্বেত পশমিনার অট্টালিকা, সম্মুখে ও আশে পাশে দরবারীদের ও রেসালা, পলটন ও তোপখানার কাতার কাতার তাম্বু, বিস্তর হস্তী, উট সখের খাস্ ঘোড়া, সোনা রূপার পাল্কী, চৌঘুড়ী ইত্যাদি; সওয়ার, পেয়াদা, বন্দুকির ছুটাছুটি, সব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কাশ্মীরের পাশে নবাব ভাওয়ালপুরের, পরে পরে ক্রমশঃ সমান জমকালো পাটিয়ালা, জীন্দ, নাভা, কপুরথালা, ফরীদকোট, সরমূর, মণ্ডি, সুকেত ও মালের কোটলা আদি বড় বড় নৃপতিদের বস্ত্র-রচিত মাইলব্যাপী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ইন্দ্রভবন-তুল্য বস্ত্রাবাস সকল। প্রত্যেক ক্যাম্পে সুন্দর সবুজ 'লন্' ও ফুলবাগান। এই উদ্যানগুলির পথে পথে ঝাড়-লণ্টনের সারের পর সার, নানাবর্ণের অসংখ্য 'গেলাস'; সন্ধ্যা নিকট দেখিয়া সব এর মধ্যেই জ্বালাইয়া দিয়াছে। প্রত্যেক ছাউনির তোরণস্থ নহবৎখানায় নহবৎ বাজিতেছে।

সান্ধ্য সেলামীর জন্য অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য, এবং জঙ্গী সর্দ্দারেরা সজ্জিত হইয়া নিজ নিজ রাজ দেউড়ির সামনের ফর্সা রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। হাজার হাজার নগরবাসীরা চার পাঁচ থাক সার বাঁধিয়া

* Review.

ঐ চওড়া পথের এধারে তারের বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া পুলিশের প্রহার খাইতে খাইতে তামাশা দেখিতে লাগিল। কেল্লা হইতে গোরারা ও সিবিল ষ্টেশন এবং রেলওয়ে লাইনস্ হইতে বিস্তর সাহেব ও মেম বেড়া ডিঙ্গাইয়া পথের উপর সজ্জিত রাজাদের ফৌজের ভিতর দিয়া, দেউড়ীর চোপদার ও বন্দুকিদের শশব্যস্ত সেলাম লইয়া ক্যাম্পে সকলের মধ্যস্থ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু অতি মনোরম উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। আমার উচ্চস্থান হইতে এইসব বিপুলকায় বাছা বাছা সিখ ও ডোগরার পার্শ্বে মামুলি গোরা ও সাহেবেরা ছোট দেখাইতেছিল। ডিসেম্বর মাস, একটা দমকা জলো হাওয়া বহিল।

হঠাৎ অন্ধকার নামিয়া আসিল। গুরু অর্জুনের মন্দিরে প্রসিদ্ধ সিংহ দামামা দগড় দগড় রোলে, সমস্ত শব্দ ছাপাইয়া, জল-স্থল-আকাশ কাঁপাইয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে একত্রে সহস্র সহস্র সিখ কণ্ঠ হইতে "বাহ গুরুজী কা খালসা"* ও ডোগরাবাহিনী হইতে "জয় রঘুনাথ জী" গগনভেদী মহারব উত্থিত হইল। ঘোড়া, খচ্চর, উট, হাতী, পোষা বাঘ ক্যাম্পময় ডাকিতে লাগিল; রাজাদের সব পূজার তাম্বুতে শঙ্খ, ঘণ্টা, নরশিঙ্গা নিনাদিত হইল। অনেক আলো জ্বলিতে লাগিল। বোধ হইল আমার মিনার টলমল করিতেছে। আমার প্রাণের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল। আমি বালক, কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার স্কন্ধে ভর দিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সর্দ্দার, কুমেদান শিব সিংহ, দাঁড়াইয়া ছিলেন; আমাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। ইনি সিংহ মহারাজ রনজীতের প্রিয় পারিষদ ও Aide-de-Camp ছিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ থাকিয়া আমি হঠাৎ ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে বলিয়া ফেলিলাম, "তাঁ ফের ভাইয়াজী, তুসী এনহাঁ পাসোঁ কানূ হারে?" "তবে, দাদামহাশয় আপনারা ইহাদের (ইংরাজদের) কাছে কী করিয়া হারিলেন?" উত্তর, সজলকণ্ঠে, "পুত্তর, সান্নু রব দি মায় প্যই। সান্নু ফরঙ্গী ফৌজ নে নৈ, সান্নু সতী নার দে শাপ নে গরক্ কীতা।" "পুত্র, আমাদের উপর ভগবানের কোপ পড়িল। ইংরাজের ফৌজ নহে, এক সতী নারীর অভিশাপ আমাদের সর্ব্বনাশ করিল।"

সর্দ্দার সাহেবের বয়স আশীর উপর, কিন্তু এখনও গাড়া বল্লমের মত খাড়া। সিংহ মহারাজের পার্শ্বে সর্ব্বদা ইহার স্থান ছিল, যুদ্ধের সময় বা

* সেই গুরুজীর জয়।

অন্য সময়.। কতবার ইনি রণস্থলে সিংহ মহারাজের প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন; আর মহারাজাও ইঁহাকে কতবার বাঁচাইয়াছেন। নৌশেরার ভীষণ সংগ্রামে একবার দুই জনেই আহত হন, ইনি কিন্তু অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তখন "ধাওয়া" (Charge) আরম্ভ হইয়াছে। ধুমে, ধুলায় কিছু দেখা যাইতেছে না। সমর-কল্লোলে কর্ণ বধির। সিখ ঘোড়সওয়াররা, স্বয়ং মহারাজের নেতৃত্বে, প্রলয়-ঝড়ের মত আগু হইতেছে। এমন অবস্থায় সিংহ-মহারাজ ইঁহাকে চকিতে নিজের ঘোড়ার উপর তুলিয়া, কোমর-বন্ধ দ্বারা পিঠে বাঁধিয়া, বিদ্যুৎ বেগে শক্রর রেসালা ভেদ করিয়া, পাঠান মোর্চ্চা কাড়িয়া লইয়া, শাহী জররাহকে (Royal Surgeon) ডাকান ও ইঁহার (সর্দ্দারের) সংজ্ঞাহীন দেহ তাহার জিম্মায় পালকি করিয়া ডেরায় পাঠাইয়া দেন। (সিংহ-মহারাজ দীর্ঘে ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি মাত্র ও অতি লঘুকায় ছিলেন। সর্দ্দার ৬ ফিট আর ঐ পরিমাণে স্থুল অথচ নিরেট গঠন। আদর করিয়া মহারাজ ইঁহাকে "ব্রহ্মদেত্ত"—ব্রহ্মদৈত্য—বলিতেন। এই ঘটনা দ্বারা সিংহ-মহারাজের অতুল দৈহিক বল ও ক্ষিপ্রতা পাঠক মহাশয় আন্দাজ করিবেন)। এই সব গল্প যখন আমাদের বাটীতে করিতেন, সর্দ্দারের দুই চক্ষে শতধারা বহিত ও আমার পিতৃদেব, মাতাঠাকুরাণী ও বালক আমি সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতাম। আমার পিতামাতা সর্দ্দারকে "বাপ্পুজী" (পিতা) বলিয়া ডাকিতেন ও তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতেন। সিংহ-মহারাজের বিস্তর প্রিয় পারিষদের মত, সর্দ্দার ইংরাজদের নিকট হইতে নিজের জায়গীর ও অন্য স্থাবর সম্পত্তি চাহিয়া লয়েন নাই, সেজন্য সর্দ্দার এখন গরীব হইয়া পড়িয়াছেন। ইংরাজ নিয়ম করিয়াছেন যে তলওয়ার ছুঁইয়া দিব্য গালিয়া ইংরাজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার না করিলে ও কখনও বিপক্ষতা করিবে না, এ প্রকার প্রতিজ্ঞা না করিলে কাহাকেও জায়গীর ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না। এই কারণে সিংহ-মহারাজের প্রিয় ভক্ত ওমরাহরা, সর্দ্দার সাহেবের ন্যায়, খালসা-রাজদত্ত বিষয়-আশয় ফিরিয়া পাইবার জন্য নূতন 'ফিরিঙ্গি' কর্ত্তাদের নিকট আবেদন মাত্র করেন নাই। এই মর্ম্মাহত, ভগ্নহৃদয়, হৃতসর্ব্বস্ব, জরাজীর্ণ সিংহ-দলের প্রধান আড্ডা আমাদের লাহোরের ও জম্মুর বাটীতে ছিল.।

কেবল এক সতী নারীর কোপে এতো বড় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত খালসা সলতনৎ

ধ্বংশ হইয়া গেল, সর্দ্দারের মত বিজ্ঞ ও বহুদর্শী বৃদ্ধের মুখে এ বার্ত্তা শুনিয়া আমি, পাদরি ফোরম্যানের খাস্ ছাত্র, প্রথমে হাসিয়া ফেলিাম, পরে তাঁহার মুখের গম্ভীর ও ম্লানভাবে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার কোমড় জড়াইয়া ধরিলাম ও অনুতপ্ত অনুনয়ের স্বরে আরজ করিলাম, "ভাইয়া জী, সতীর অভিসম্পাতের বৃত্তান্ত, যদি কষ্ট না হয়, আমাকে শুনান না?" সর্দ্দার আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, সমস্ত আবদার শুনিতেন। কিয়ৎক্ষণ আবিষ্টের মত চুপ থাকিয়া, আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "তবে বাড়ী যাই। মাইজীকে এ ভীষণ কাহিনী এখনও শুনাই নি। তিনিও শুন্‌বেন।"

আমার মার ঘরে, তাঁহার দিনের কাজ চুকিবার পর, রাত্রি ৮টা-৯টার মধ্যে রোজ আমাদের নিভৃত, আরাম-মজলিস বসিত। মা আর বাবা, চুঁচুঁড়া ও ফরাশডাঙ্গার (তাঁহাদের জন্মভূমি) মতো সুন্দর স্থান যে ভারতে আর নাই, ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্য অসংখ্য উদাহরণ ও প্রমাণ এ সময়টায় রোজ দিতেন। আবার চুঁচুঁড়া বেশি ভাল জায়গা, কি ফরাশডাঙ্গা, এই লইয়া দুজনের অফুরন্ত তর্ক চলিত। চুঁচুঁড়ার বারিক, হুগলি কলেজ, খোড়ো বাজার, ষাঁড়েশ্বর তলা, কদমতলা, বায়ো দোয়াবীর ঘাট, গোঁসাই ঘাট, বোড়াই চণ্ডীতলা, গঞ্জ, সাহেবের হাট, বোড়ো, তোলা ফটক, খলিসানির বৌবাজার ইত্যাদি— এ সকল স্থানের গল্প করিতে করিতে দুজনের চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। আমরা, ভাইবোনেরা, কখনও দেশ দেখি নাই। সিন্ধুনদপারে ডেরা ইস্মাইল খাঁ ও ডেরা গাজী খাঁ, জম্মু ও কাশ্মীর, এবং লাহোর, ইহাই আমরা দেশ বলিয়া জানি। ঐ সব দূর বাংলা মুলুকের কথা প্রাণের টানের সহিত জনক জননী যখন বলিতেন, আমি মনে মনে, গঙ্গাতীরে গাছপালা ঢাকা তাঁহাদের ও-সমস্ত প্রাণ-প্রিয় স্থানের চিত্র আঁকিতাম। তাঁহাদের ভাগ্যে দেশে ফেরা আর হয় নাই। লাহোরে রাবী তীরেই দুজনের জন্মভূমির জন্য সদা ব্যাকুল প্রাণ আসল স্বদেশে গিয়াছিল। আমি যখন অনেকদিন পরে, কিছুদিনের জন্য খবরের কাগজের নরক-ঘাঁটা কাজে ছুটি লইয়া, সেই এক কাল বৈশাখীর ঝোড়ো সন্ধ্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইলাম, তখন আমার ভিতরের সহিত বাহিরের সুর মিলিয়াছিল ভালো। প্রাতে উঠিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে আমার শৈশবের কল্পনার চিত্রের সহিত বাস্তব চিত্র লাইনে লাইনে মিলিয়া গেল।

সর্দ্দার শিবসিংহজী আমাদের বাড়ীর লোক হইয়া গিয়াছিলেন। আমরা সবাই একত্রে আহার করিয়া ঘরে গিয়া বসিলাম। সে কক্ষের সেই রাত্রের ছবি আমার অন্তরে চির মুদ্রিত। মেঝের উপর নমদা ও কম্বল পাতা। মাঝখানে আগুনের আংটি। একধারে, "গো-পুচ্ছ" থামের নকলে বানানো, একটা পিতলের শামদান জ্বলিতেছে। বাবা এক কোণে চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতেছেন। তাঁহার সামনে চা পানের সরঞ্জাম, একটা কাশ্মীরী সামোয়ার। মা সুমুখের পানদানের উপর রামায়ণখানি রাখিয়া মৃদুস্বরে সুর করিয়া সীতার বনবাসের আখ্যান পড়িতেছেন। কাহার সাধ্য আগুনের একটু তফাতে, আলোয়ানের ভিতর হইতে হাত বাহির করে—এমন শীত। বাহিরে বেগে হাওয়া বহিতেছে, জানেলার উপর মোটা পরদাগুলি নড়ায় বুঝিতেছি, মধ্যে মধ্যে মেঘ গর্জ্জন ও হালকা বৃষ্টির টুপুর টাপুর শব্দ শুনা যাইতেছে। রাস্তার কাদায় লোকজন গাড়িঘোড়া চলার শব্দ কানে আসিতেছে।

মা এক সময় থামিবামাত্র আমি সতীর শাপে সিখদের সর্ব্বনাশের কথা বলিতে দাদামহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিলাম। মা, বাবা আগ্রহের সহিত আমার অনুরোধে যোগ দিলেন। সর্দ্দার সাহেব বলিতে লাগিলেন। কয়েক সপ্তাহ এই হৃদয় বিদারক ইতিহাস চলিয়াছিল। সংক্ষেপে তাহা এই ঃ—

"তখন সিংহ-মহারাজের জীবনসন্ধ্যাকাল; কিন্তু আমরা তাঁহার ভক্ত অনুচরেরা কেঁহ মনেও করি নাই যে আমাদের ভাগ্য-বিধাতা, খালসাপতি, হিন্দুর শেষ গৌরবসূর্য্য, মধ্যাহ্ন পার হইয়াছেন। গ্রীষ্মকাল। মহারাজ তাঁহার প্রিয় গ্রীষ্মাবাস দীনানগরে সুখে আছেন। মাইজীর সহিত জ্বালামুখী যাত্রার পথে সেদিন দীনানগর দেখিয়াছ, মনে আছে তো? সেই লাল, সবুজ, সজল, সীমাহীন প্রান্তরের মধ্যে ঘন আমবাগান-ঘেরা, বাদসাহী নহরের* ধারে, হিমালয়ের চরণতলে, ক্ষুদ্র ম্রিয়মাণ নগরটি মনে পড়ে? যেদিন তোমাদের সঙ্গে দীনানগর পৌঁছাই, আমি গাড়ি হইতে নামিলাম না, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া পড়িয়া রহিলাম, তোমার মা তখন আমাকে টানিয়া তুলিয়া স্বহস্তে কেশীস্নান†

---

* জাহাঙ্গীর এ নহর লাহোরের শালামার বাগের জন্ত কাটাইয়াছিলেন। ২৫।২৬ বৎসর হইল P. W. D. এই চমৎকার কৃত্রিম-নদী স্থানীয় লোকের মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

† সিখদের একটি ধর্ম্ম-সংলগ্ন পদ্ধতি—সাম্প্রদায়িক পবিত্র চিহ্ন; মস্তকের দীর্ঘকেশ মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে দধি সাহায্যে ধৌত করিয়া চূড়ারূপে বাঁধিয়া পূজা পাঠে বসিতে হয়।

করাইলেন, ও পূজাপাঠের পর নিজে বসিয়া প্রসাদ খাওয়াইলেন। মা বুঝিয়াছিলেন যে দীনানগরের শ্রীহীন দশা দেখিয়া, পুরানো কথা সব মনে পড়িয়া, এ বুড়ার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, সিংহ-মহারাজ ডেরা করিয়া আছেন; পল্লীর চতুর্দ্দিকে দুই তিন ক্রোশ ব্যাপিয়া কী ধূম! চল্লিশ হাজার চতুরঙ্গ খালসা লস্করের তাম্বুর সমুদ্র-সাগর, পেশার (camp followers) অস্থায়ী শহর—উর্দী বাজারের পর বাজার, বড় বড় ওমারাহদের আলাদা আলাদা ডেরা, পীলখানা, আস্তাবল, বগ্‌গিখানা, রথখানা, সেলেখানা, বারুদখানা, শিকারখানা, বাজখানা, দফতরখানা ইত্যাদি ইত্যাদি—হজুরী দেউড়ী, অন্দরমহল, দৌলতখানা, কত বলিব? মুহুর্ম্মুহু ডঙ্কানিনাদ হইতেছে, তোপ, বন্দুক দাগিতেছে। সিংহ-মহারাজকে ঘেরিয়া আমরা সবাই দিবারাত্রই আছি। সদানন্দ 'ভোলে* বাদশাহ' সিংহজী, হাসি মসখরীতে, গানবাজনার মহাফিলে, ঘোড়দৌড়ে, শীকারে, কসরতে, ধর্ম্মচর্চ্চায় সকল বিষয়ই আমাদের দলের স্বাভাবিক নেতা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন জীবন কিরূপ ছিল শুনিবে? তিনি বেশীর ভাগ তাম্বুর প্রাসাদেই বাস করিতেন, ইট পাথরের ইমারতের ভিতর থাকা পছন্দ করিতেন না। শেষ রাত্র ৩টার সময় "সত্য নাম কর্ত্তা পুরুষ" মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যাত্যাগ করিতেন। অন্দরে খুব কমদিনই রাত্রিযাপন করিতেন। দরবার-খেমার এককোণে, কানাত ও পরদা তুলিয়া তাঁহার মামুলী খাটিয়া পাতা হইত। দেউড়ির ঘড়িয়ালে† (বড় gong) ৩টা বাজিবামাত্র পরদার বাহিরে "আসা দী ওয়ার" (সিখকের প্রভাতী ধর্ম্ম সঙ্গীত) গান সরকারী গায়ক-বাদকের 'চৌকী' আরম্ভ করিত। পরদার ভিতরে শয্যাপার্শ্বে সরকারের হাকিম-বৈদ্য ঔষধের শিশি, কোটা ও নিক্তি সাজাইয়া, খাসমুন্সি ও অন্যান্য অহলকার কলমদান, কাগজ ও মিসিল ইত্যাদি লইয়া বসিয়া যাইত। সিংহজী প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিতে করিতে জরুরী আহওয়াল (রিপোর্ট) শুনিতেন, হুকুম লিখাইতেন, গুপ্ত পরামর্শ করিতেন। শৌচের

---

* মহারাজ বড় সাদা প্রাণ ভোলা লোক ছিলেন, তাই তাঁহাকে সকলে "ভোলে বাদশাহ" নাম দিয়াছিল।

† সর্দ্দার লেহনাসিং মাজীঠীয়া, যাঁহার জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞান য়ুরোপেও প্রসিদ্ধ ছিল, দেশী দণ্ড, পল স্থানে য়ুরোপীয় সময় নির্ণয় প্রথা রাজধানীতে চালাইয়াছিলেন। লেহনাসিং ৺সর্দ্দার দয়াল সিংহের পিতা।

সময়টা পর্য্যন্ত রাষ্ট্রীয় কার্য্যে লাগাইতেন। সোহেৎখানার কানাতের মধ্য হইতে আদেশ লিখাইতেন।

"আমীর আখবর"কে* হাজির থাকিয়া দেশের ও বাহিরের বড় বড় সংবাদ বাছিয়া শুনাইতে হইত। এ নিয়মিত প্রভাত সম্মিলনের নাম "সুচেত্ দরবার" ছিল। ৫টা আন্দাজ স্নান সারিয়া সিংহজী মালা জপ করিতে করিতে "গুরু দোয়ার" মন্দিরে ধীরপদে যাইতেন। সিংহজীর অতি সামান্য বেশ; খালি পা, কাছ্পরা, খালিগায়ে মোটা চাদর, মাথায় ছোট্ট পাগ্। আমরা সবাই, তাঁহার দলবল, রেশম, জরি, মল্মল্, জোয়াহরাতে ঝল্মল্ করিতেছি। কিন্তু এই যে এক চক্ষু কাণা, কালো, খাটো, রোগা, মুখে বসন্তের দাগ লোকটি মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে ঈষৎ খোঁড়াইয়া চলিয়াছেন, যাঁহার এক লম্বা পাতলা শাদা দাড়ি ছাড়া আর কোন বাহ্যিক সম্ভ্রম-আকর্ষক চিহ্ন নাই, ইঁহাকে দেখিবামাত্র একজন দিগপাল বলিয়া বোধ হইত। সঙ্গে সেপাই সান্ত্রী পাহারার কোন বালাই নাই। গুরুদোয়ারায় প্রথমে গ্রন্থ সাহেবকে, শালগ্রাম শিলাকে ও নিজের ইষ্টদেবী অষ্টভুজার মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতেন। তাহার পর ভাইজী,† গোঁসাইজী‡ ও সমাগত সাধুপণ্ডিতদের সহিত অল্পক্ষণ সদালাপ করিয়া ও অভ্যাগত ভিক্ষুকদের স্বহস্তে অরদাসের§ সোনা রূপা দান করিয়া ফিরিতেন। তাঁহার খাস পাত্রমিত্র ছাড়া অন্য সকলকে বিনীতভাবে বিদায় দিয়া অন্দর দেউড়িতে 'গড়ওয়ইখানার' মুক্তার জল ও সরবৎ পান করিতেন ও আগত সকলে

* খালসা রাজ্যের বড় বড় জনপদে ও মণ্ডীতে, ব্রিটিশ ভারতের প্রধান প্রধান শহরে ও বিশেষ বিশেষ দেশীরাজ্যের রাজধানীতে, এবং কাবুল, তুকিস্থান, সীইস্থান, ফারস্ আদির প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থানে বিশ্বাসী সংবাদদাতা থাকিত। তাহারা লাহোরে খবর পাঠাইত। এগুলি তিনভাগে বিভক্ত হইত—"ঘরকী", "হিন্দকী", "বাহারকী"। রাস্তার অবস্থা, বাজার দর, চুঙ্গী ও জগাত (octroi, custom), পথে ডাকাতপতিদের মাসুলের জিরিথ (black mail) ও অন্য দরকারী বিষয় এই তিনরকম আখবারে থাকিত। পাঁচ, সাতশো কাপি হাতে লিখিয়া বড় বড় শেঠ ও হাকিমদের পাঠানো হইত। এই সকল সংবাদের চুম্বক মহারাজ প্রভাতে নিয়মিত শুনিতেন। এই সংবাদ বিভাগের কর্ত্তা দেওয়ান রতনচাঁদ দাড়িওয়ালা ছিলেন। ইনি ১৮৭৩-এ স্বর্গারোহণ করেন। আমি ছেলেবেলা দেওয়ান সাহেবের বাটীতে রদ্দির গাদার মধ্যে এ রকম কয়খানা সংবাদপত্র দেখিয়াছি।

† সিখপূজারী।

‡ মহারাজের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। নিবাস বৃন্দাবন। ইঁহার পুস্তকাগার জগৎ প্রসিদ্ধ ছিল।

§ চড়াওয়া। ঠাকুর বা গ্রন্থ সাহেবের সম্মুখে অর্থ বা অন্য কিছু নিবেদন করা—তাহাকে 'অরদাস করনা' ব'লে।

গুরুপ্রসাদ পাইত। গল্প ও মন্ত্রণা করিতে করিতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া দরবার খেমায় আসিতেন। এখানে লোকারণ্য; দুই তিন ঘণ্টা সমানে রাজকার্য্য করিয়া অন্দরে যাইতেন। দ্বিতীয় প্রহরের পূর্ব্বেই "লঙ্গরখানায়" মধ্যাহ্ন ভোজন হইত; আমরা ১৫০-২০০ লোক প্রত্যহ তাঁহার সহিত আহারে বসিতাম। পাতার সালবোট, দোনা; কেবল 'দারু'পানের জন্য বেলওয়ারের পেয়ালা ও সোনার সোরাই। একপাত্র শীরাজীর অধিক সিংহজী কখনও পান করিতেন না। আধ ঘণ্টার অধিক আরাম করিতেন না, দিবানিদ্রাকে ঘৃণা করিতেন। এ সময়টায় পরিবারবর্গের তত্ত্ব লইতেন; হাকিম বৈদ্য দৈবজ্ঞদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন, নূতন ভূষণ রত্নাদি আজমায়স্ করিতে ও প্রধান মন্ত্রী রাজা ধ্যান সিংহ ও খাস উজীর ফকির আজীজুদ্দিনের সহিত পরামর্শ করিতে ৩টা বাজিত, তখন আমরা সবাই আবার জমিতাম।

(ক্রমশঃ)

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অত্যুক্তি

মন যে দরিদ্র, তার
তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাই তো ভাষার।
কল্পনা-ভাণ্ডার হতে তাই করে ধার
বাক্য অলংকার।
কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই ;
শুনে তাই
কেন তুমি হেসে ওঠো আধুনিকা প্রিয়ে,
অত্যুক্তির অপবাদ দিয়ে।
তোমার সম্মানে ভাষা আপনারে করে সুসজ্জিত
তারে তুমি বারে বারে পরিহাসে কোরো না লজ্জিত।
তোমার আরতি অর্ঘ্যে অত্যুক্তি-বঞ্চিত ভাষা হেয়,
অসত্যের মতো অশ্রদ্ধেয়।
নাই তার আলো,
মৌন তার চেয়ে ঢের ভালো।
তব অঙ্গে অত্যুক্তি কি কর না বহন
সন্ধ্যায় যখন
দেখা দিতে আসো।
তখন যে হাসি হাসো
সে তো নহে মিতব্যয়ী প্রত্যহের মতো,
অতিরিক্ত মধু কিছু তার মাঝে থাকে তো সংহত।
সে হাসির অতিভাষা
মোর বাক্যে ধরা দেবে নাই সে প্রত্যাশা।

অলংকার যত পায় বাক্যগুলো তত হার মানে,
তাই তার অস্থিরতা বাড়াবাড়ি ঠেকে তব কানে।
কিন্তু ওই আসমানি সাড়িখানি
ও কি নহে অত্যুক্তির বাণী ?
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত,
সে যে অঙ্গের সঙ্গীত।
আমি তারে মনে জানি সত্যেরো অধিক,
সোহাগ-বাণীরে মোর তুমি কেন বলো কাল্পনিক ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ-বিদেশ

ইয়োরোপে সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রবাহের গতি এখন এত ক্ষিপ্র যে মাসিক সমালোচনার পক্ষে তার সঙ্গে তাল রেখে চলা দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। সে-প্রবাহের বর্ণনার চাইতে তাই মূলস্রোতের লক্ষ্য নির্ণয়ই এখন এক্ষেত্রে বিধেয়। বিস্তর আলোচনার ফলে এতদিনে ফাশিষ্ট্ অগ্রগতির স্বরূপ অনেকের কাছেই পরিস্ফুট হয়েছে। আসন্ন শ্রমিক-বিপ্লবের বিপদ থেকে দেশবিশেষে ধনতন্ত্রের আত্মরক্ষার উপায় হিসাবেই ফাশিজ্ম্-এর উৎপত্তি হয়েছিল। কিন্তু তারপরও আভ্যন্তরীণ আর্থিক সঙ্কটের চাপ থেকেই যাওয়াতে, ও এমন কি বৃদ্ধি পাওয়াতে, ফাশিষ্ট্ রাষ্ট্রগুলিকে সম্প্রসারণের নীতি অবলম্বন করতে হয়েছে; তার লক্ষ্য অবশ্য দেশের অবসন্ন ধনতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন। জাপান, ইটালি ও জার্মানির সাম্প্রতিক অগ্রসর-নীতির বাস্তব ব্যাখ্যা হ'ল এই; এই দেশগুলিতে স্থানীয় ধনতন্ত্রকে বাঁচবার জন্যই উগ্র সামরিক আকার অবলম্বন করতে হয়েছে। কিন্তু ফাশিজ্ম্-এর সাময়িক সাফল্য যতই হোক না কেন, এর অন্তর্নিহিত তাড়নায় পরিণামে ধনতন্ত্রের পক্ষে উভয়সঙ্কট সূচিত হচ্ছে। ফাশিষ্ট্ অগ্রগতি অপ্রত্যাহত থাকলে, পৃথিবীর নূতন ভাগাভাগির উপলক্ষ্যে, গত মহাযুদ্ধে বিজয়ী সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে ধনতন্ত্র অধিকতর বিপন্ন হ'য়ে পড়বে—কারণ ফাশিষ্ট্দের লাভে তথাকথিত ডেমক্রাটিক্ দেশগুলির পদে পদে ক্ষতির সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, ফাশিষ্ট্ নীতির বৈদেশিক সাফল্যের অবসান হ'লে, আভ্যন্তরীণ চাপের ফলে ফাশিষ্ট্-ধনতন্ত্রের পতন বা আমূল পরিবর্ত্তন হওয়াই সম্ভব। ফাশিজ্ম্কে ধনতন্ত্রের শেষ দশা বলে' বর্ণনা করবার মূলে রয়েছে এই বিশ্লেষণ।

ষ্টালিনের ভাষায়, গত কয়েক বছরের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ-প্রসূত দ্বিতীয় এক মহাসমর আংশিক ভাবে নানা অঞ্চলে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন, আবিসিনিয়া, স্পেন, মহাচীন, অষ্ট্রিয়া, সুদেৎ-প্রদেশ—এই সব অঞ্চলের ভাগ্য পরিবর্ত্তন সেই সঙ্ঘর্ষের বিভিন্ন অধ্যায়। এই বৎসরে মার্চ্ মাসে, সুদেৎ বর্জ্জিত চেকোস্লোভাকিয়া—বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও রুমেনিয়া—এই

তিন খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হবার পর, ফাশিষ্ট্‌দের হাতে স্বাধীনতা হারাল। প্রথম দু'টি অংশ এখন নামে জার্মানির আশ্রিত এবং কার্য্যতঃ নাৎসি সাম্রাজ্যভুক্ত; শেষ প্রদেশটির বেশীর ভাগ হাঙ্গারিকে দলে রাখবার জন্য অধিকার করতে দেওয়া হয়েছে। এর পর ইটালি আল্‌বানিয়া দখল করেছে এবং মেমেল-অঞ্চল দুর্ব্বল লিথুয়ানিয়ার প্রভাবমুক্ত হ'য়ে জার্মান্‌-রাইশের মধ্যে ফিরে এসেছে। চেকোস্লোভাকিয়া এবং আল্‌বানিয়া অধিকারের ফলে আর একবার বামপন্থী বিশ্লেষণের যাথার্থ্য প্রমাণিত হ'ল। এরপর আর তর্কের খাতিরেও বলা চলবে না যে ফাশিষ্ট্‌ বৈদেশিক-নীতির উদ্দেশ্য হ'ল শুধু ভের্সায়ি-ব্যবস্থার ন্যায্য সংশোধন অথবা স্বজাতীয়দের মুক্তিকামনা।

বৃহত্তর শক্তির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে ফাশিষ্ট্‌ প্রসার যে আপনা থেকে এখানেই থামবে, একথা কেউই বিশ্বাস করে না। তবুও অবস্থাটা পরিষ্কার করে' নেবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট্‌ রুজ্‌ভেল্ট্‌ হিট্‌লার্‌ ও মুসোলীনির কাছ থেকে সম্প্রতি একটা অঙ্গীকার চান যে তাঁরা অন্ততঃ কয়েক বৎসর কোন দেশকে আক্রমণ করবেন না; সে প্রতিশ্রুতি পেলে যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ং উদ্যোগী হ'য়ে আন্তর্জাতিক সকল বিবাদের নিষ্পত্তি এবং অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের আয়োজন করবে। বলা বাহুল্য যে ডিক্‌টেটার্‌দ্বয় এ-প্রস্তাবে সম্মত হ'ননি; কারণ প্রসারের অভাবে তাঁদের দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা সঙ্গীণ হয়ে উঠ্‌বে। এরপর আমেরিকাকেও আন্তর্জাতিক সঙ্কটের জালে ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে পড়তে হ'তে পারে। বর্ত্তমান যুগের সঙ্ঘর্ষগুলি যে মূলতঃ ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালের উপর নির্ভর করে না, রুজ্‌ভেল্ট্‌-হিট্‌লার্‌-সংবাদ থেকে এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। রাষ্ট্রের প্রতিভূ শাসকেরা বাস্তব স্বার্থেরই সন্ধান করেন; তাঁদের মূর্খ, বাতুল অথবা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষমতালিপ্সায় উন্মত্ত মনে করবার কোন বৈধ কারণ নেই।

ওদিকে গণতান্ত্রিক মহাশক্তিগুলির পক্ষে সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হ'য়ে উঠ্‌ছে। সর্ব্বময় সামরিক ব্যবস্থার অভাবে এই সব দেশে ধনতন্ত্রের নূতন আর্থিক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফ্রান্‌স্‌ নিজের দুর্ব্বলতার জন্য এবং সোভিয়েট্‌ রাশিয়ার প্রতি অবিশ্বাসের ফলে এখন প্রায় সম্পূর্ণ ইংল্যাণ্ডের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে পড়েছে। সুতরাং এদিক থেকে এখন চেম্বার্‌লেন্‌-নীতিই অদূর ভবিষ্যতের

ঘটনাবলীকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করবে। সে-নীতির বামপন্থী বিশ্লেষণও এতদিনে সুপরিচিত হওয়া উচিত। ফাশিষ্ট্ অগ্রগতিতে ইংল্যাণ্ড্ প্রভৃতির প্রচুর স্বার্থহানির সম্ভাবনা রয়েছে একথা বোঝা খুবই সহজ। অন্যদিকে কিন্তু বিপদ এই যে, আততায়ী শক্তিদের সবলে বাধা দিতে হ'লে, প্রথমতঃ সোভিয়েট্ রাশিয়ার সঙ্গে সখ্য আবশ্যক এবং দ্বিতীয়তঃ জার্মানি ও ইটালিতে এবং হয়ত অন্যত্রও শ্রমিক-বিপ্লবের সম্ভাবনা হবে। সেক্ষেত্রে সমগ্র ইয়োরোপে ধনতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক এবং চেম্বার্লেন্ ও দালাদিয়ের পিছনে চালক যে-অর্থশক্তি রয়েছে তার কাছে এ-অবস্থা নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। পশ্চিমের ধনতন্ত্রী ডেমক্রাটিক্ দেশগুলির বৈদেশিক নীতি বুঝতে হ'লে এই দোটানার কথা সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। নিজরাষ্ট্রের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত স্বার্থ-নাশের ভয় অথবা আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের ক্ষতির আশঙ্কা এই উভয়সঙ্কটের মধ্যে কোনটি যে শেষ পর্য্যন্ত তাদের কাছে প্রবলতর তাড়না হ'য়ে দাঁড়াবে সেকথা এখনও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। বহুকাল যাবৎ চেম্বার্লেন্ জার্মানি ও ইটালির চাপের সামনে পথ ছেড়ে দিয়ে ফাশিষ্ট্দের সঙ্গে সদ্ভাবরক্ষার চেষ্টা করেছেন; পশ্চিমের চার মহাশক্তির মৈত্রীর জল্পনার মূল কথাই হ'ল এই। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ নীতি সম্ভবতঃ হিট্লার্কে পশ্চিম থেকে পূর্ব্বে মুখ ফেরাতে উৎসাহ দিয়েছিল; রুমেনিয়ার মধ্য দিয়ে জার্মানি কোনও প্রকারে উক্রেন্-অঞ্চলে পৌঁছে রাশিয়ার সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে প্রবৃত্ত হ'লে চেম্বার্লেনের দলেরই লাভ। সে সংগ্রামে উভয় পক্ষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লে ব্রিটিশ প্রাধান্য আবার নিরঙ্কুশ ভাবে বিরাজ করবে, এই কূটনীতির অস্তিত্বও এক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা চলে না।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আগুন নিয়ে খেলার বিপদ আছে। তাছাড়া সাম্রাজ্যতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্ঘাত খুবই বাস্তব। চার মহাশক্তির মিলন অথবা হিট্লার্ ও মুসোলীনিকে অল্পে তুষ্ট রাখার সংকল্প তাই বারবার ভেঙ্গে পড়ছে—বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত চাপের ফলেই। কোন কোন বামপন্থী বিশ্বাস করেন না যে অবস্থা বিশেষে ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্স্কে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জার্মানি ও ইটালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হ'তে পারে। তাঁদের এ-মত সত্য হ'লে সোভিয়েট্ রাশিয়ার কর্ণধারদের মূর্খ বলতে হয়, কারণ রুষরাষ্ট্র

গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সখ্যবদ্ধ হবার বারবার চেষ্টা করেছে। চেম্বার্‌লেনী নীতি যে আজ দোটানায় পড়েছে একথা স্বীকার না করলে আজকের পরিস্থিতিকে অযথা সহজ ভাবে দেখা হবে। ইংরাজ ও ফরাসী শাসকশ্রেণীর পক্ষে উভয়সঙ্কট এসেছে বলেই আজ পপুলার্‌ ফ্রন্টের চাপ দেবার কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে। অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হ'লেই তাই পপুলার্‌ ফ্রন্টেরও অবসান হবে।

ফ্যাশিষ্ট্‌ অগ্রগতিতে চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে পর্য্যন্ত বিচলিত হওয়াতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। চেকোস্লোভাকিয়ার পতনের পর তাই পোলাণ্ড্‌কে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, যদিও ডান্‌সিগ্‌ কিম্বা পোলিশ্‌ করিডর্‌ সম্বন্ধে জার্মানির দাবী বোহেমিয়া ও এমনকি সুদেৎ প্রদেশের সম্পর্কে দাবীর চাইতে বেশী ন্যায্য। তারপর গ্রীস্‌ ও রোমানিয়াকেও রক্ষা করবার অঙ্গীকার দেওয়া হ'ল। তুরস্ক ও রাশিয়ার সঙ্গে কথাবার্ত্তাও এখন চল্‌ছে। অন্যদিকে জার্মানি ও ইটালি রব তুলেছে যে অন্যায়ভাবে তাদের ঘিরে ফেলবার চক্রান্ত হচ্ছে; সেই বেড়াজাল ছিঁড়বার জন্যে ফাশিষ্ট্‌রা আগেই হাঙ্গারিকে হাত করেছে, তারপর যুগোস্লাভিয়া ও বুল্‌গেরিয়াকে দলে টানবার প্রচেষ্টা চলছে, এমনকি রোমানিয়া ও পোলাণ্ডের প্রতি ফাশিষ্ট্‌ আশ্বাসবাণীরও কোনও অভাব নেই।

ইংল্যাণ্ড্‌ ও ফ্রান্সে শাসকদের মধ্যেও একটা আতঙ্কের ভাব ও যুদ্ধের আয়োজন তাই বাস্তব সত্য—ব্রিটেনে সামরিক শিক্ষা অবশ্যকর্ত্তব্য করবার ব্যবস্থা তার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু সুবিধা হওয়ামাত্র চেম্বার্‌লেনী নীতি আবার তার পূর্ব্ব রূপ ধারণ করতে পারে একথাও নিঃসন্দেহ। উভয়সঙ্কটে পড়লে রাষ্ট্রনীতি দোদুল্যমান হ'তে বাধ্য। তাই কিছুদিনের মধ্যে মিউনিকের পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ ফাশিষ্ট্‌দের সামনে আবার পথ ছেড়ে দেবার প্রহসন ঘটাও বিচিত্র হবে না। একথার সমর্থনে লীগের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি পুরাতন যুক্তির উল্লেখ না করলেও চলে। সোভিয়েট্‌ রাশিয়ার সঙ্গে নিবিড় সখ্যবন্ধন ফাশিষ্ট্‌দের আটকাবার প্রকৃষ্ট উপায়। অথচ চেম্বার্‌লেনের দল কিছুতেই তাতে প্রস্তুত হ'তে পারছে না। সোভিয়েট্‌ রাষ্ট্র সকল বিপন্ন দেশের এক মিলিত সঙ্ঘ গঠনের উদ্দেশ্যে এক পরামর্শ সভার প্রস্তাব করেছিল; কিন্তু

এতে পর্য্যন্ত ইংরাজ ও ফরাসী সরকার রাজি হ'তে পারেনি। অবশ্য চেক্ সমস্যার মতন এবারও দোষ চাপানো হচ্ছে রাশিয়ার উপর কিন্তু রাশিয়াকে একঘরে করে' রাখবার চক্রান্ত সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে অতি স্পষ্ট হ'য়েই উঠেছে। এ-অবস্থায় সোভিয়েট্ রাশিয়াকে বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার অন্য উপায় ভেবে রাখতে হচ্ছে। লিট্‌ভিনভের পদত্যাগ রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি পরিবর্ত্তনের সূচনা নাও হ'তে পারে কিন্তু চেম্বারলেনের কূটনীতির অনিশ্চয়তার জন্যই সোভিয়েট্ শক্তির আচরণও অনিশ্চিত থাকবে একথা বোঝা শক্ত নয়। চেক্‌রাজ্য উচ্ছেদের অব্যবহিত পরেও যখন ব্রিটিশ ফেডারেশন্ অব্ ইণ্ডাষ্ট্রির মুখপাত্রেরা জার্মান ধনিকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, টাইম্‌স্ পত্রিকা যখন বরাবার পোল্যাণ্ডের অঙ্গচ্ছেদ করে' আর একবার শান্তির চেষ্টা দেখতে ইঙ্গিত করেছে, সম্মিলিত আত্মরক্ষার আদর্শকে যতদিন বারবার চেপে রাখা হচ্ছে, ততদিন সোভিয়েট্ রাশিয়ার পক্ষেও সতর্ক থাকবার যথেষ্ট কারণ আছে।

* * *

ভারতবর্ষে গত চার মাসে কংগ্রেসের উপর দিয়ে যে-ঝড় বয়ে গেছে তার অবসান এখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের দ্বন্দ্ব থেকে সুরু করে' সুভাষচন্দ্র বসুর পদত্যাগ পর্য্যন্ত সকল ঘটনাই সুপরিচিত কিন্তু এই ঘটনাবলী যে-ঘূর্ণাবর্ত্তের প্রতীক তার সম্যক আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

১৯৩৬-এ লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর থেকে জাতীয় মহাসভার ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়েছে বলা চলে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সভ্যসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি ও প্রতিষ্ঠানটির প্রতিপত্তির বিশাল প্রসার। সেইসঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ ও বাম মতামতের একটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বও লক্ষ্য করা যায়। নেতৃস্থানীয়েরা বারবার আশ্বাস দিয়েছেন যে এই দ্বন্দ্ব নাকি কল্পিত, সমালোচকেরাও সেকথা অনেকবার বলেছেন। তবুও স্বীকার করা উচিত যে কংগ্রেসী মহলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব বাস্তব সত্য। তবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানের ইচ্ছা এই পার্থক্যকে এখনও ছাপিয়ে রয়েছে; সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ইউনাইটেড ন্যাশনাল্ ফ্রন্টের আদর্শের উদ্ভব হয়েছিল সেই বিশ্বাস থেকেই।

আধুনিক কংগ্রেসের স্বরূপ তাই একটি সুসম্বদ্ধ পার্টি নয়, একে বরং সাম্রাজ্যতন্ত্রবিরোধী একটি সম্মেলন হিসাবেই দেখা উচিত। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে কার্য্যতঃ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব খুবই স্বাভাবিক। কংগ্রেসের ছায়াশ্রিত বিভিন্ন ভাবধারাকে ব্যাপকভাবে দক্ষিণ, মধ্য ও বাম বিশেষণ দ্বারা চিহ্নিত করা চলে। তবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ ঐক্যের আড়ালে যে-বিরোধ নিহিত রয়েছে তার মূলকথা হ'ল এই যে কংগ্রেসের পরিচালনা এখনও দক্ষিণ-পন্থীদের হাতে অথচ তার বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ বামমার্গীয় মতমত দ্বারা পরিপুষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

ত্রিপুরীতে প্রমাণিত হ'ল যে কংগ্রেসী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখনও দক্ষিণপন্থার প্রভাব অতি প্রবল রয়েছে। সর্দ্দার পাটেল্ প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বস্পৃহা এবং অতি সাবধানতার প্রতি একটা বিরক্তি রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের সময় মধ্যপন্থীয়দিগকে সুভাষচন্দ্রের স্বপক্ষে চালিত করেছিল। ত্রিপুরীতে দক্ষিণী নেতারা সুকৌশলে গান্ধিজিকে কংগ্রেস্ থেকে সরাবার ভয় দেখিয়ে সেই মধ্য মার্গীয়দের পুনরায় দলে টানলেন। ফলে দেখা গেল যে কংগ্রেসের বিষয়নির্ব্বাচনী আলোচনা সভায় বামপন্থীদের সংখ্যা আশাতিরিক্ত হ'লেও গান্ধিভক্তদের সংখ্যাধিক্য এখনও অবিসংবাদিত রয়েছে। পণ্ডিত পন্থের প্রস্তাবের অনুমোদন এর সাক্ষ্য দিল।

কংগ্রেসে দক্ষিণ মতবাদের মেরুদণ্ড গান্ধি সেবাসঙ্ঘ নামক এক দৃঢ়সম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠান। সে-মতবাদের বৈশিষ্ট্য—চরকা, খাদি, হরিজন অন্দোলন ও সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার। দক্ষিণপন্থার প্রধান অস্ত্র হ'ল মহাত্মা গান্ধির অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও জনপ্রিয়তা এবং তাঁর পার্শ্বচরদের মধ্যে অনেকের বহুদিনের বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ব-প্রতিপত্তি। কিন্তু কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থার বাস্তব বিশ্লেষণে সত্য ও অহিংসানীতির বিশেষ সার্থকতা আছে বলে' মনে হয় না। আসলে গান্ধিভক্তেরা ভারতের উদীয়মান ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থের সংরক্ষক মাত্র। একথায় যাঁরা বিচলিত হবেন সামাজিক বিশ্লেষণে তাঁরা বিশেষ অভ্যস্ত নন। মনে রাখতে হবে যে চরকা ও খাদি ভারতের কলকারখানার ক্ষতি করেনি এবং করেবও না ; স্বদেশীভাবাপন্ন বিস্তর ধনিক গান্ধিবাদকে শত্রু মনে করা দূরে থাক, এখনও গান্ধিজির পরম

ভক্ত; তাছাড়া ব্রিটিশ ধনিকদের সঙ্গে একটা মিটমাটের গুপ্ত ইচ্ছা বারবার মহাত্মাজির পার্শ্বচরদের মধ্যে দেখা গেছে; অন্যদিকে শ্রমিক-আন্দোলনের প্রতি গান্ধিপন্থীদের বিতৃষ্ণাও তাই স্বাভাবিক ও সুবিদিত। সম্প্রতি বিশ্বভারতী ত্রৈমাসিকে আচার্য্য কৃপালানি নিজেদের পরম বিপ্লবী বলে' সান্ত্বনা দিয়েছেন; কিন্তু বামপন্থীদের দৃঢ় বিশ্বাস যে গান্ধিবাদের বৈপ্লবিক রূপ সাময়িক এবং ধনতন্ত্রের আওতার মধ্যে সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ।

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনকে পরিণামে গান্ধিবাদ থেকে মুক্ত করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বামপন্থীদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই। কিন্তু আজকের দিনের মূর্ত্ত প্রশ্ন হ'ল এই যে তার প্রকৃষ্ট উপায় কি। বামমার্গীয়দের অনৈক্য-প্রসূত দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ হ'ল এ-সম্বন্ধে মতভেদ। অবশ্য স্থিরদৃষ্টিতে দেখলে ত্রিপুরী ও কলিকাতায় বিজয়লাভের পরও কংগ্রেসে দক্ষিণী প্রভাব শিথিলতর হয়েছে। গান্ধিবাদী নেতাদের যে-কৌশল ও কূটনীতি অবলম্বন করে' আধিপত্য বজায় রাখতে হয়েছে তাতে তাঁদের দুর্ব্বলতাই সূচিত হচ্ছে। আজ তাই অগণিত লোকের মনে সন্দেহ জেগেছে এবং নানাদিক থেকে ধিক্কার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। মহাত্মাজির মাহাত্ম্য পর্য্যন্ত আজ অনেকের কাছে খসে পড়েছে এবং বিশ্লেষকের মনে একথা উদয় হওয়া অন্যায় নয় যে গান্ধিবাদ সম্প্রতি এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। সুভাষচন্দ্র বসুকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করায় হয়ত শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণপন্থী নেতারা সুবিবেচনার পরিচয় দেন নি।

কিন্তু দক্ষিণ-দলের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হলেও এখনও কংগ্রেসের মধ্যে তার কর্ত্তৃত্ব বজায় আছে। বামপন্থীদের উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মতানৈক্য অবশ্য তার অন্যতম কারণ। এই অনৈক্যের জন্য ব্যক্তিগত দায়িত্ব প্রথমতঃ পণ্ডিত জওহরলালের। পণ্ডিতজির আত্মচরিতের পাঠকেরা ইতিপূর্ব্বেই লক্ষ্য করে' থাকবেন যে তাঁর মন সর্ব্বদা গান্ধিভক্তি এবং সমাজতন্ত্রী আদর্শের মধ্যে দোলায়মান। গান্ধিজির অনুসরণ তাঁর পক্ষে তাই শুধু ট্যাক্‌টিক্সের কথা নয়, গান্ধিবাদের দিকে তাঁর আকর্ষণ আন্তরিক। এই প্রভাবে আচ্ছন্ন তাঁর মনকে সজাগ রাখবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনি সোশ্যালিষ্ট্। কোনও এক শুভদিনে ভারতবর্ষে সোশ্যালিজ্‌ম্ আসবে, কিন্তু তার জন্য আয়োজনের দায়িত্ব পণ্ডিতজি বরাবর এড়িয়ে চলবারই চেষ্টা করেছেন। এই

মনোভাবে জওহরলাল তরুণ বুদ্ধিজীবীদের অনেকেরই প্রতীক এবং তাঁর প্রভাবের কারণও এখানে। জওহরলালের অনুসরিত মার্গ সঙ্কটের সামনে বিপন্ন হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের কর্ম্মসমিতির পুরাতন সভ্যেরা একজোটে পদত্যাগ করে' যখন সুভাষবাবুকে বিপদে ফেলেন, তখন বামপন্থীরা সকলেই প্রথমে পণ্ডিত নেহেরুর দিকে চেয়েছিল। তিনি সে সময় রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সহযোগিতা করলে বামপন্থী সকল দলের একটা মিলন এবং ত্রিপুরী অধিবেশনের পূর্ব্বে একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির উদ্ভব সম্ভবপর হ'ত। ত্রিপুরীতে তিনি দক্ষিণ-দলের কৌশলের বিরুদ্ধাচরণ করলে প্রাচীন কূটনীতি হয়ত ব্যর্থ হ'ত। সে-অবস্থায় নেহেরুর সমর্থন ও সহযোগ রাষ্ট্রপতি বসুকে তাঁর মারাত্মক ভুলের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। কিন্তু ত্রিপুরীতে জওহরলাল কার্য্যতঃ বামপন্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে সাহায্য করলেন। কলিকাতায় নিখিল-ভারত কংগ্রেস্-সমিতিতে জওহরলাল অবশ্য প্রকৃত ঐক্যের চেষ্টা করেন, কিন্তু ততদিনে সমস্যা কঠিনতর রূপ গ্রহণ করেছিল। এ-অবস্থায় জওহরলাল নেহেরুর পুরাতন কর্ম্মসমিতি ত্যাগ এবং নূতন কর্ম্মসমিতিতে যোগদানে অসম্মতি বুদ্ধিবাদীদের আত্মাভিমানেরই নিদর্শন মাত্র।

কংগ্রেস্-সমাজতন্ত্রী দল বরাবরই জওহরলালের সবিশেষ অনুগত—ত্রিপুরীর সমস্যার সময়ও তাই শেষ পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রীরা পণ্ডিতজির মুখাপেক্ষী হয়ে বামমার্গীয় অন্য দলদের বর্জ্জন করে। পন্থের প্রস্তাবের প্রথমে প্রতিবাদ করে' পরে মহাসভার অধিবেশনে সে-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকা এ-কথারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। জাতীয় দাবীর আলোচনার মধ্যে সোশ্যালিষ্ট্ কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন সম্বন্ধে মেহের আলির প্রস্তাব অকস্মাৎ প্রত্যাহার করা এ-বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ। তবে জওহরলাল যেমন সর্ব্বথা গান্ধির অনুসরণ করেন না, সমাজতন্ত্রী দলও তেমনি অবস্থার চাপে সর্ব্বদা পণ্ডিতজির আশ্রয়ে থাকতে পারবে না। জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রীরা তাই নির্ব্বাচনের সময় সুভাষ বসুর সমর্থন করেন এবং ত্রিপুরীর পর সাম্যবাদীদের সঙ্গে তাঁদের সংযোগস্থাপনে বামপন্থার পুষ্টিসাধন হওয়া উচিত।

ত্রিপুরীতে ও তারপরে উগ্রপন্থার আকস্মিক আস্ফালনকে বিচার করতে হ'লে বলতে হয় যে চরম মতের এই আবির্ভাব কার্য্যতঃ জওহরলাল ও সমাজতন্ত্রী

দলের পশ্চাদ্‌গমনের অপর দিক মাত্র। ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে অধীর উচ্ছ্বাসের আবেগে অতি দ্রুত অগ্রসর হবার আকাঙ্ক্ষা এবং অত্যধিক সাবধানতার প্রভাবে স্থিতিশীলতা প্রায় একই পর্য্যায়ের বস্তু। আমাদের সাম্প্রতিক পলিটিক্সে দুই চরম মত এখন মাথা তুলেছে, উভয়ের সম্বন্ধেই উপরের মন্তব্য প্রযুজ্য। সুভাষ বসুর নূতন প্রগতিশীল দল এবং মানবেন্দ্র রায়ের রাডিকাল্‌ লীগের কিছু আলোচনা তাই এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

গত চার মাসে সুভাষচন্দ্রের চারিদিকে যে-একটা দল গড়ে উঠেছে তাকে সঙ্ঘবদ্ধ করবার অভিপ্রায়ে সম্প্রতি প্রগতিশীল সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপের উপরই অবশ্য এর সম্বন্ধে মতপ্রকাশ নির্ভর করা উচিত কিন্তু নূতন দলটির থেকে কংগ্রেসের যে বহু ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। সুভাষচন্দ্রের প্রতি গান্ধিপন্থীরা প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে একথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে স্বতন্ত্র দলগঠন সর্ব্বদা নিন্দনীয়। কংগ্রেস্‌-প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি বিশেষের চেয়ে বড় বলেই প্রেস্‌টিজ্‌ বজায় রাখার জন্য বিদ্রোহের কোন সার্থকতা নেই। সুভাষ বসুর সমর্থকেরা অবশ্য বলবেন যে তাঁদের যুদ্ধে নামা মূলনীতি রক্ষার খাতিরে, ব্যক্তিগত আক্রোশে নয়; কিন্তু এ-দাবী সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া এখন পর্য্যন্ত সহজ না। গণতন্ত্রের আদর্শের জন্য নূতন দলের প্রয়োজন বোঝা শক্ত, স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ প্রভৃতি অভাবাত্মক কথার উপর দলগঠন বাঞ্ছনীয় নয়। বামমার্গের প্রচলন নূতন সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য হ'তে পারে না, কারণ সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর পার্শ্বচরেরা আজ পর্য্যন্ত শ্রেণীবিহীন সমাজ গঠন সম্বন্ধে মন স্থির করে' উঠতে পারেননি; তাছাড়া সে-আদর্শের অনুযায়ী সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দু'টি দল আগে থাকতেই এদেশে বিরাজ করছে। সমাজতন্ত্রবাদ-বর্জ্জিত বামপন্থার কল্পনা আজকের দিনে পেটিবুর্জোয়া মনোভাবের পরিচায়ক মাত্র। সে-মনোভাবের একটা বৈশিষ্ট্য সাময়িক উত্তেজনা; নূতন প্রগতিশীল সঙ্ঘে কি সেই উষ্মাই প্রকাশ পাচ্ছে না? বামপন্থীদের মতন সুভাষচন্দ্রও নাকি কংগ্রেসে মিলিত চালক সমিতি চান; ত্রিপুরীতে কেন তিনি তাহলে প্রথমেই সে-সম্বন্ধে ব্যবস্থা করবার চেষ্টা না করে' পন্থ-প্রস্তাব উপস্থাপিত হবার সুযোগ দিলেন? রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে' তিনি ভালই

করেছেন, কিন্তু কর্ম্মসমিতির সভ্য থাকতে অনুরুদ্ধ হওয়াতে তিনি আত্মসম্মানের কথা না ভেবে সে পদ গ্রহণ করলে অন্যায় হ'ত না, তাহলে নেহরুকেও সমিতির মধ্যে রাখা সহজ হ'ত নিশ্চয়। ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট্ এখনও কার্য্যকরী আছে বিশ্বাস করলে সুভাষ বসু বক্তৃতায় কংগ্রেস-ভঙ্গের কথাই বা তোলেন কেন? বস্তুতঃ সুভাষচন্দ্রের সমর্থকদের মধ্যে অনেকেই প্রাদেশিক ভাবে আচ্ছন্ন, তাঁরা বাংলার অপমানের কথাটাই বড় করে' দেখছেন। যে-সংবাদপত্রগুলি আজ তাঁর প্রশংসায় মুখরিত, তাঁদের হিন্দু সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়াও বোধ হয় অন্যায় নয়, বহুবার তারা দেশভক্তি ও হিন্দুধর্ম্মকে এক করে' দেখতে চেয়েছে। বলা বাহুল্য যে প্রকৃত বামমার্গের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর স্থান থাকা উচিত না।

কিন্তু প্রগতি-সঙ্ঘের চাইতে অধিক আশঙ্কার কারণ বোধ হয় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নূতন আন্দোলনের মধ্যে রয়েছে। রায়পন্থা কিছুদিন থেকে এদেশে বিস্তার লাভ করছে, ত্রিপুরীর গোলযোগের পর রাডিকাল্-সঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব তুলে মানবেন্দ্র রায় অনেকখানি জনপ্রিয় হয়ে পড়েছেন। আজকের দিনে রায়পন্থীদের উদ্দেশ্য হ'ল দুটি—প্রথমতঃ গান্ধিবাদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমর ঘোষণা করে' কংগ্রেসে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন দক্ষিণপন্থী নেতাদের একেবারে বিতাড়িত করে' কংগ্রেসে নূতন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযান। সুভাষচন্দ্র এ-পন্থার অনুমোদন করেননি, কিন্তু বিদ্রোহের ধ্বজা তুললে তিনি কি রায়পন্থীদের হাতে গিয়ে পড়বেন না? মানবেন্দ্র রায়ের ব্যক্তিত্বে আজ ছাত্রসমাজ উত্তেজিত, কারণ ঘোর বিপ্লববাদ শ্রুতিমধুর হ'তে বাধ্য। কিন্তু চিন্তা করে' দেখলে রায়পন্থার গলদ ধরা বিশেষ শক্ত নয়। রায়পন্থার প্রধান দাবী এই যে ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের আর সার্থকতা নেই। থিওরির ভাষায় এই বক্তব্যের পিছনে যুক্তি হচ্ছে decolonisation-এ বিশ্বাস। অর্থাৎ এই মতানুসারে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আর কোন বৈপ্লবিক ভূমিকা নেই, ভারতীয় ধনিকেরা ব্রিটিশ ধনিকশ্রেণীর অংশ হয়ে পড়েছে—অতএব কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযানের কোন অর্থ হয় না। এই অতিসরল অতিসহজ ব্যাখ্যা ডায়ালেক্‌টিকের অভাবই সূচনা করে। ডায়ালেক্‌-টিকের নিয়মানুসারে কোনও অবস্থানের বিশ্লেষণ একদেশদর্শী হ'লে চলে না।

লেনিন্ দেখিয়েছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'ল পরাধীন জাতির মুক্তিপ্রয়াস। অনুন্নত দেশে সাম্রাজ্যতন্ত্র ভেঙ্গে পড়বার অবস্থা আগতপ্রায় না হ'লে স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণী স্বার্থের খাতিরেই বিদেশী ধনশক্তির বিরুদ্ধে যেতে পারে। ভারতীয় মধ্যশ্রেণী পরিণামে অবশ্য প্রতিবিপ্লবী হয়ে পড়বে কিন্তু এখনও সে-অবস্থা আসেনি বলেই মনে হয়। এখনও পিছনে শ্রমিক ও কৃষকের চাপ থাকলে তারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে পারে। এ-অবস্থায় গান্ধিবাদীদের কংগ্রেস্ থেকে বিতাড়িত করলে ভারতীয় মধ্যশ্রেণীকে মুক্তিসংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে' ফেলা হবে। অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে-শ্রমিক ও কৃষকদের শক্তি মধ্যশ্রেণীকে সংগ্রামের পথে চালাতে পারে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে মানবেন্দ্র রায়ের বিশেষ আপত্তি দেখা গেছে। সমাজতন্ত্রী আদর্শে কোনও দল গঠনেও তাঁর নিষেধাজ্ঞা এতদিন সুপরিচিত ছিল। বস্তুতঃ রায়পন্থার অসংলগ্ন মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। তাই সন্দেহ ওঠে যে রায়পন্থা প্রকৃতপক্ষে নেতার অনুসরণ মাত্র, তার উপর ফাশিজ্‌ম্-এর কিছু ছাপও হয়ত পড়েছে। রায়পন্থার অবাস্তব আস্ফালন খানিকটা ট্রট্‌স্কিরও অনুগামী ; স্পেনের P. O. U. M. দলের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

বর্ত্তমান পরিস্থিতির সাম্যবাদী বিশ্লেষণকে অন্য সকল ব্যাখ্যার চাইতে ব্যাপকতর এবং বেশী বাস্তব মনে করা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু সাম্যবাদী দলের সাম্প্রতিক পরিচালনা যে সকল বিষয়ে অনিন্দ্য হয়েছে একথা জোর করে' বলা শক্ত। তবে নিজেদের ভুল স্বীকার ও সমালোচনা করতে সাম্যবাদীরা পশ্চাদ্‌পদ হয় না। ত্রিপুরীতে সাম্যবাদী দলের মধ্যে মতভেদ দেখা গিয়েছিল এবং দলের অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তখন পাওয়া যায়নি। দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাবে ত্রিপুরীর গণ্ডগোল অযথা বাড়তে দেওয়া হয়েছিল একথাও বোধ হয় নিঃসন্দেহ। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের প্রভাবান্বিত করবার প্রচেষ্টাতে সাম্যবাদীদের কৃতিত্ব ও আগ্রহ উভয়েরই অভাব দেখা গেছে। কলিকাতায় দক্ষিণপন্থীদের আচরণের প্রতিবাদ না করাও শোভনীয় নয়। এসব হয়ত সামান্য ব্যাপার ; কিন্তু গুরুতর বিষয়েও সাম্যবাদী দলের দুর্ব্বলতা আছে।

প্রথমতঃ, থিওরির প্রচারে সাম্যবাদীদের ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা যায় অথচ থিওরিকে অবহেলা করা অনুচিত। ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট্ বা অন্য যে-কোনও সাময়িক নীতিকে থিওরির সঙ্গে খাপ খাওয়ালেই চলে না, ক্রমাগত সে-ব্যাখ্যার প্রচার না করলে মতবাদ কখনও সুপ্রসারিত হ'তে পারে না। সেই সঙ্গে গান্ধিবাদের অসারতা উদ্ঘাটন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাক্‌বিপ্লবী রাশিয়ায় লেনিন্ কোনও সময় এর অনুরূপ কাজ থেকে বিরত থাকেননি, তাঁর সারা জীবনের লেখা এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। থিওরি ও প্র্যাক্‌টিসের অঙ্গাঙ্গি যোগ ভিন্ন সাম্যবাদের অগ্রসর সহজ নয়।

দ্বিতীয়তঃ, মহাসমর এসে পড়লে কংগ্রেস্ সামরিক আয়োজনের বিরোধিতা করবার যে-নীতি গ্রহণ করেছে সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তার সমর্থক যুক্তির সম্যক ব্যবহার দেখা যাচ্ছে না। সাম্যবাদীদের মুখপত্রিকায় এতদিনে মাত্র একটি প্রবন্ধে সে-যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল—এবং তার লেখকও একজন ইংরাজ! যুদ্ধায়োজনে বাধা বামপন্থীদের পক্ষে গান্ধিজির বাঞ্ছিত শান্তিবাদ থেকে উদ্ভূত নয়, সাভারকারের নিরপেক্ষনীতিকেও তার মূল বলা চলে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ফাশিজ্‌ম্-এ পরিণত হচ্ছে বলেই বাধা দেবার কথা ওঠে, কারণ ধনতান্ত্রিক দুই দলের সঙ্ঘর্ষকে শুধু ভারতের রাষ্ট্রিক উন্নতির উপায় হিসাবেই ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু যুদ্ধ মাত্রই অন্যায় নয়, মার্ক্সের এই মত ছিল; এবং লেনিন্ দেখিয়েছিলেন যে সকল যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থতুষ্ট নয়। অবস্থা পরিবর্ত্তন হ'লে কোন কোন সর্ত্তে বামপন্থীদের তাই যুদ্ধবিরোধিতা থেকে বিরত হওয়াও অসম্ভব না। সোভিয়েট্ রাশিয়ার সঙ্গে নিবিড় সহযোগ এবং তার সংরক্ষণ এই পরিবর্ত্তনের অন্যতম অঙ্গ হবে। মূলনীতিকে সর্ব্বদা পরিস্ফুট না করলে ট্যাক্‌টিক্স্ বদলাবার সার্থকতা বোঝানো দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

শ্রীবিজন রায়

ভুল

রাতের আকাশ দিনে হয়ে যায় মিছে,
দিন, রাত, দুইই সত্য তবুও রহে।
তারকা স্ফুরণে যে গীত গুঞ্জরিছে
দিবসে সমীর তাহারি রণন বহে।

সেদিন জ্যোছনা ঝরেছিলো গলে' গলে'
সেদিন জ্যোছনা বুকে পড়েছিলো ঢলে'
সেদিন জ্যোছনা পথ ভোলাবার ছলে
দেখায়েছে পথ, সে কথা ভুলি কি বলে'?

সেদিন যাহার চরণের ধূলিকণা
শ্রেষ্ঠভূষণ গণিয়াছি মনে মনে,
বুকে টানিয়াছি যাহারে নগ্নস্তনা,
প্রাণ সঁপিয়াছি নিবিড় আলিঙ্গনে,

জানি সে আমারে কভু ভালোবাসে নাই,
জানি সে কাহারে ভালোবাসা বলে তাই
নাহি জানে, তবু জেনে শুনে ভুল করি ;
তিলে তিলে তবু তাহারি লাগিয়া মরি।

ভুল, ভুল সবই—ভালো লাগা, ভালোবাসা।
জন্ম জন্ম চলে যাওয়া, ফিরে আসা,
সবই বিভ্রম, জানি সে তত্ত্ব কথা।
তবু ভুল করে' ভালোবাসি বার বার,
ভালো লাগে সব, যারা ভালো লাগিবার,
ভ্রান্তিবিলাস সনাতন মত্ততা।

মণীশ ঘটক

পুস্তক-পরিচয়

Fallen Bastions—by G. E. R. Gedye (Gollancz).

The Shadow of the Swastika—by G. T. Garratt (Hamish Hamilton).

প্রথম বইয়ের লেখক হচ্ছেন একজন বিখ্যাত সাংবাদিক। প্রায় বিশ বছর তিনি লণ্ডন টাইম্‌স্‌, নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌, আর সম্প্রতি ডেলি টেলিগ্রাফের বিশেষ সংবাদদাতা হিসাবে জার্ম্মানী আর মধ্য ইয়োরোপে কাটিয়েছেন। অষ্ট্রিয়া হিটলারের হস্তগত হওয়ার পর তাঁকে সেদেশ ত্যাগ করতে হয়েছে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি নানা দেশে ছড়িয়েছে। হাউস্‌ অফ কমন্সে পর্য্যন্ত তাঁর রিপোর্টের যাথার্থ্য স্বীকৃত হয়েছে। অষ্ট্রিয়া আর চেকোস্লোভাকিয়ায় তাঁর যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ঘটেছিল, তার ফলে ফ্যাশিজ্‌মের বর্ব্বর রূপ সম্বন্ধে তাঁর আর কোন সন্দেহ নেই। চেম্বারলেনী মন্ত্রিসভা কিভাবে ফ্যাশিষ্টদের পরম বন্ধুর কাজ করে আসছে সে বিষয়েও বহু তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন।

ভিয়েনা শহরে নাৎসিদের নৃশংস অত্যাচার তিনি স্বচক্ষে দেখে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহুদীদের ধর্ম্মস্থান অপবিত্র করা, নাৎসি-বিরোধীদের নির্ম্মম, প্রকাশ্য প্রহার, প্রসিদ্ধ অস্ত্রোপচারকদের ফুটপাথ সাফ করার কাজে লাগিয়ে হাতে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া—ইত্যাদি খবর কাগজ মারফৎ এদেশে অনেকে পেয়েছেন। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে ডল্‌ফ্যুসকে যে নাৎসিরা খুন করেছিল, হিটলার তাদের কুকার্য্যেরে নিন্দা করলেও চার বছর পরে তাদেরই সম্মানে মিছিল, কুচকাওয়াজ, মর্ম্মর ফলক, বক্তৃতা ইত্যাদির ব্যবস্থা হিটলারের হুকুমেই হয়েছিল। হিট্‌লার অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করার অছিলা দিয়েছিল এই বলে যে "চান্সলার" জাইস্‌-ইনকুয়ার্ট তারে হিটলারকে আহ্বান করায় জার্ম্মান সৈন্য অগ্রসর হয়। কিন্তু আসলে নাৎসিদের হাতে কলের পুতুল জাইস্‌-ইনকুয়ার্ট চান্সলার হবার আগেই জার্ম্মানরা সীমান্ত পার হয়েছিল। আর আহ্বানসূচক কোন তারও কেউ পাঠায় নি।

এই বই থেকে দুটো ব্যাপার বেশ পরিষ্কার বোঝা যাবে। প্রথম হচ্ছে এই যে নাৎসি-ব্যবস্থা ধনিকতন্ত্রের রূপান্তর চায় নি, করেও নি, তাই তার আসন্ন পতনকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য লুণ্ঠননীতি অবলম্বন করা দরকার হয়ে পড়ে, অষ্ট্রিয়া, সুদেতেন প্রদেশ, চেকোস্লোভাকিয়া একে একে দস্যুর মত দখল করতে হয়, আর সর্ব্বশেষে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের বহুকাল সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য গ্রাসের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। তাছাড়া এই মতলব হাঁসিল করতে হলে তথাকথিত "গণতান্ত্রিক" দেশগুলিতে "Fifth Column" স্থাপন করতে হয়, সিনেমা, রেডিও, খবরের কাগজকে হাত করে, বড়লোকদের সঙ্গে খানাপিনা করে, কাণাঘুষো ছড়িয়ে, সাম্যবাদীদের বর্ব্বরতা আর অকর্ম্মণ্যতা আর পরস্পর অবিশ্বাস সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়ে ফ্যাশিজ্‌মের অনুকূল আবহাওয়া তৈরী করা দরকার হয়। এই সব বিষয়ে নাৎসি অধ্যাপক বান্‌সের বইয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আছে; সে বইয়ের ইংরেজী অনুবাদকে চাপা দেওয়ার জন্য নাৎসি সরকার বহু চেষ্টা করেছিল।

হিটলার-মুসোলিনির সামরিক শক্তি সম্বন্ধে নানা রকম কথা শোনা যায়। Gedye এ বিষয়ে যা বলছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, তাই তাঁর সাক্ষ্যের দাম আছে। জার্ম্মানীর অষ্ট্রিয়া আক্রমণ কালে নাৎসি বাহিনী একেবারেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি। কোনরকম প্রতিরোধ চেষ্টা হয় নি বলেই নাৎসিদের সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। অন্যদিকে চেকোস্লোভাকিয়ার পদাতিক বাহিনী আত্মরক্ষার জন্য এভাবে প্রস্তুত ছিল যে কোন দেশের পদাতিকরা কোনকালে সেরকম প্রস্তুত ছিল না। শোয়েবের লাইন ফ্রান্সের মাজিনো লাইনের মতই সুব্যবস্থিত ছিল। আজ তা নাৎসিদের হস্তগত হয়েছে।

লেখক নানা প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে চেকোস্লোভাকিয়া জার্ম্মানীর হাতে অতি সহজে নিষ্পিষ্ট হবে বলে চেম্বারলেন প্রভৃতি যে ধুয়ো তুলেছিল, তা মিথ্যা। চেম্বারলেনের দল আরও বলেছিল যে চোকাস্লোভাকিয়াকে নিশ্চিত বিলোপ থেকে রক্ষা করার উপায় "ডেমোক্রেসিদের" ছিল না, সোভিয়েট ইউনিয়ন চেকোস্লোভাকিয়ার জন্য এগিয়ে আসতে রাজী ছিল না। এই সব ফন্দিবাজী অপবাদ যে কতদূর মিথ্যা, তার প্রমাণ এ বইয়ে মিল্‌বে। চেক্

রাষ্ট্রপতি বেনেশের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রোভ্‌স্কির এ বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, তা বিশেষ গুরুতর। ফ্রান্স প্রতিশ্রুতি রক্ষা অস্বীকার করলেও সোভিয়েট চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য করতে তৈরী ছিল—"এখনই সকল উপায়ে" প্রাগের সহায়তা করতে রাজী ছিল। কিন্তু তার আগে চেক্ সরকারকে আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে জার্ম্মানীকে আততায়ী ঘোষণা করে জাতিসঙ্ঘের কাছে সাহায্য চাইতে বলা হয়েছিল। চেম্বারলেন-দালাদিয়েরের ধাপ্পায় ভুলে, আর দেশের মধ্যে "Fifth Column" কৃষকদলের চাপে বেনেশ সোভিয়েটের সাহায্য চাইতে সাহস করেন নি।

মিউনিকের বহুপূর্ব্বে চেম্বারলেনী বিশ্বাসঘাতকতার রাস্তা তৈরী হয়েছিল। গত বছর মে মাসে আমেরিকান সাংবাদিকদের কাছে চেম্বারলেন চেকোস্লোভাকিয়াকে প্রবঞ্চনার পূর্ব্বাভাষ দিয়েছিলেন, আমেরিকায় সে খবর ছড়িয়ে পড়েছিল, সত্যবাদী চেম্বারলেন অম্লান বদনে তার প্রতিবাদ করে নিজের দেশের লোকের চোখে ধূলো দিয়েছিলেন। কি উপায়ে হিটলার আর তার ক্রীড়নক হেন্‌লাইনের দাম্ভিক দাবীর চাপ দিয়ে চেম্বারলেন চেক্ সরকারকে অপমান করেছিলেন, তার বিস্তৃত বিবরণ এ বইয়ে পাওয়া যাবে। দূতীগিরির জন্য নাৎসিবন্ধু রান্সিমানকে ইংরেজ সরকার পাঠিয়েছিল; প্রথম থেকেই রান্সিমান হেন্‌লাইনের দলভুক্ত জার্ম্মান বড়লোকদের সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলেন, চেক্ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এমনভাবে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন যে চেক্ সাংবাদিকরা বলাবলি করত, "আমাদের ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহ করার আগেই ইংরেজ তাকে স্বীকার করে নিয়েছে!" সুদেতেন প্রদেশে সকল জার্ম্মান নাৎসি নয়, কিন্তু সেখানকার গণতান্ত্রিকদের দিকে রান্সিমান তাকান নি, রান্সিমান রিপোর্ট শুধু একদেশদর্শী হয় নি, বকবৃত্তির চূড়ান্ত হয়েছিল, ইংরেজ ভণ্ডামির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হয়েছিল।

মিউনিক চুক্তির সময় "গণতান্ত্রিক" শক্তি একত্র হলে হিটলারের অবস্থা সঙ্গীন হত। মধ্য ইউরোপে বিপ্লবের আশঙ্কায় তাই চেম্বারলেনকে মোড়ল করে সবাই একজোট হয়ে চেকোস্লোভাকিয়ার মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষর করল। আজও হিটলার-মুসোলিনির সাফল্য দেখে চেম্বারলেন মাঝে মাঝে যে মায়াকান্না কেঁদে থাকে, তা থেকে চেম্বারলেন গণতান্ত্রিক হয়েছে মনে করা হবে নেহাৎ বাতুলতা।

গণতন্ত্র আর সাম্যবাদ হচ্ছে চেম্বারলেনীদের চক্ষুশূল; সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস না করা পর্য্যন্ত তাদের কূটনীতির বিরাম নেই। স্পেনে ইতালী আর জার্ম্মানী যে যুদ্ধ চালিয়েছিল, তা হচ্ছে এর একটা প্রধান প্রমাণ। গত তিন বছরে স্পেনের ঘটনা নিয়ে গ্যারাট সাহেব দ্বিতীয় বইটি লিখেছেন। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ সুরু হয়; তার আগেই ফ্রাঙ্কোর সব 'প্ল্যান' ইংরেজ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে জানা ছিল। অথচ বহুকাল ধরে পররাষ্ট্র সচিব ঈড্‌ন্‌, (যিনি আজকাল সাধু সাজেন) সব কথা বেমালুম চেপে গেছ্‌লেন। নিরপেক্ষতা সমিতি বসিয়ে ইংরেজ সরকার যে বদ্‌মায়েসি করেছিল, পৃথিবী ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। ইংরেজ সরকারের এখনকার মূলনীতি হচ্ছে "Fabio-Fascism" (কথাটা ই, এম, ফর্ষ্টরের); ইংলণ্ডে ফ্যাশিষ্ট "Fifth Column" তৈরী রয়েছে। গ্যারাট দেখিয়েছেন যে শুধু লেডী অ্যাষ্টরের খানার টেবিল নয়, ক্যাথলিক আর হাই চার্চ্চ বড় কর্ত্তারা, কয়েকজন সাহিত্যিক, বড় বড় পুঁজিদার জমিদার প্রায় সকলেই সেই Fifth Column-এ আছে। সাধারণ লোকের চোখে ধুলো দিয়ে দেশে ফ্যাশিজমের ইংরেজী সংস্করণ ঢোকানোর যে ব্যবস্থা চলেছে তা আমাদের জানা দরকার।

চেম্বারলেনী কূটনীতির মহিমা বুঝ্‌তে হলে এই বই দুখানি খুবই সাহায্য করবে। সাম্রাজ্যতন্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতীক হচ্ছে চেম্বারলেন; তাই সে আমাদের শত্রু। সে যে কি বিষম শত্রু, তা না জানলে আমাদেরও বিপদ ঘট্‌বে।

মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত

The Wild Palms—by William Faulkner (Chatto & Windus).

দ্বিতল কাষ্ঠ কুটীরটি তৈল প্রদীপের স্বল্পালোকে নিঝুম হয়ে এসেছে। স্থানটি ছিল জন-বিরল সমুদ্রতীর, সময় তখন মধ্যরাত্রি। দ্বারদেশে ঈষৎ

করাঘাতের আহ্বানে গৃহস্বামীকে নামতে হলো। সে চিকিৎসক। মধ্যবয়সী। আটচল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে তেইশটি কেটেছে অপুত্রক স্ত্রীর সহবাসে। পেশা পসারশূন্য হলেও জীবিকা অর্জ্জনে উদ্যমের প্রয়োজন হয়নি যেহেতু পরলোকগত পিতার সম্পত্তি ছিল অর্থপ্রসূ।

সম্প্রতি খালি কুঁড়েটিতে নূতন ভাড়াটিয়া এসে মানসিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। তাদের হাবভাব দেখে স্বামী স্ত্রী উভয়েই মনে মনে স্থির করেছে যে আগন্তুকদ্বয় অবিবাহিত কিন্তু মুখ ফুটে স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছে। এরা যথার্থই ভব্য ব্যক্তি। ভয়ের কারণ, বিবেক যদি বলে বিতাড়িত করা বিধেয় তাহলে অগ্রিম ভাড়া প্রত্যর্পণের কথাও উঠবে।

যাই হোক, দ্বারের আওয়াজ অধৈর্য্য হয়ে উঠতে পা চালাতে হলো। টর্চের আলোকে নবাগত ভাড়াটিয়ার বিবর্ণ শীর্ণ মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠাতে বাড়ীওয়ালার হৃদয় হলো আনন্দে উৎফুল্ল। ভাবলো—'বাছাধনদের গোপন কথা এবার প্রকাশ হয়ে পড়বে'।

আগন্তুক বিপন্নভাবে বল্লে 'টেলিফোনটা ব্যবহার করতে পারি কি—ডাক্তার ডাকতে হবে—'

'বটে, আমিই ত' ডাক্তার—কি ব্যাপার'।

'রক্তস্রাব হচ্ছে, এক্ষুনি চলুন—এই নিন আপনার ফী'—

প্রথম পরিচ্ছেদটি এমনিভাবে অকস্মাৎ থেমেছে। এটি আখ্যায়িকার শেষ ভাগের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র। গ্রন্থকার এই অংশটিকে পট-ভূমি স্বরূপ ব্যবহার করেছেন, বোধ করি দীর্ঘায়িত দাম্পত্য জীবনের সচ্ছন্দ সচ্ছল গতির অন্তরালে অবসাদের ক্লেদ ও মালিন্য দেখাবার জন্যে। সম্ভবতঃ ভেবেছেন যে একথা স্মরণে থাকলে পাঠকের হৃদয় পরবর্ত্তী চরিত্রগুলির অসামাজিক আচরণে সঙ্কুচিত হবে না। এ সতর্কতার কিন্তু প্রয়োজন ছিল না। গ্রন্থকারের ভাবের আবেগ পাঠকচিত্তকে এমন এক অমরাবতীতে নিয়ে যায় যেখানে পাপ পুণ্য রীতি নীতির বিচার অবান্তর।

গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে দুইটি স্বতন্ত্র ধারার সমন্বয়ে। একটি, মূল্যবান জীবন প্রেমের আহ্বান অঙ্গীকার করে নিয়ে উচ্ছেদ হয়ে যায়। আর একটি, ভাগ্যহীন জীবন অযাচিত প্রেমের দান উপেক্ষা করে জীবন্মৃত হয়ে থাকে।

গ্রন্থকারের লিপিনৈপুণ্যে উভয় ট্র্যাজেডীই সমভাবে শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে।

গল্প বয়নে কোন জটিলতা নাই। কাহিনীদ্বয় খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত হয়ে পর্য্যায়ক্রমে গ্রথিত হয়েছে, তথাপি মনে হয় যেন একটি অখণ্ড তান স্বর বিস্তার করে চলেছে। কোথাও তর্কের খাতিরে ছন্দ-পতন নাই, ভাবালুতার ঝোঁক নাই। ঘটনার পরম্পরা সাবলীল, সঞ্চরমাণ। শব্দের চলনের দোলনে ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের ভাব আছে—অথচ গ্রন্থকার তাঁর শিল্প-সৃষ্টির মাল-মশলা সংগ্রহ করেছেন অসুন্দরের ভাণ্ডার হতে। তাঁর সৃষ্ট মানুষগুলি শ্রীহীন, অনশন ও অনটনে উৎপীড়িত। ঘটনার স্থান ও কাল ভয়াবহ, অপ্রীতিকর। কতকগুলি সংঘটনকে আষাঢ়ে বলা চলে। উদাহরণ স্বরূপ কিছু কিছু উদ্ধৃত করবো—

মিসিসিপি অঞ্চলে বন্যার বছর। স্থানীয় কারাগারে কয়েদীদের মধ্যে একজন ছিল দীর্ঘ ও শীর্ণকায়। মাথায় তার কালো চুল আর চোখে অভিযোগের দ্যুতি। সরকারি উকিল বা বিচারকের বিরুদ্ধে তার কোন নালিশ ছিল না। ক্রোধ পোষণ করে রেখেছিল ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখকদের ওপর। যখন সে দণ্ডিত হয় তখন তার বয়স ছিল মাত্র উনিশ। পাড়ার সজ্জন ব্যক্তিদের কাছে লোমহর্ষক গ্রন্থ ফিরি করে উপর্জ্জিত অর্থে ক্রয় করেছিল একটি ভাঙা পিস্তল, একটি লণ্ঠন ও আর একটি কালো রুমাল। যথারীতিতে মুখের অর্দ্ধেক আবৃত করে মেল লুঠ্ করতে গিয়ে পড়লো ধরা। কেউ বুঝলো না যে অর্থের তার কোন প্রয়োজন ছিল না, তাকে পেয়ে বসেছিল দুঃসাহসিকতার উন্মাদনা।

পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাত বছর যখন অতিবাহিত হয়েছে সেই সময় তুলোর ক্ষেতের একঘেয়ে কার্য্যের মধ্যে বৈচিত্র্য এলো। নদীর বাঁধ ভেঙে প্রবেশ করলো বন্যা। কয়েদীদের বেড়ি-কড়া-সহ তোলা হলো ট্রেনে। তারপর অনন্ত জলরাশির মধ্যে তারা যখন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে, দীর্ঘকায় কয়েদীটির প্রতি আদেশ জারি হলো অনতিদূরের বৃক্ষশাখা হতে একটি নারী ও ভিন্ন প্রান্তে কারখানা চূড়া হতে একটি পুরুষকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে। বেড়ি মুক্ত ক'রে তাকে দেওয়া হলো একটি নৌকা।

স্রোতের মুখে পড়তে তরণী ভাসমান ঘর বাড়ী জীব জন্তুর পশ্চাদ্ধাবন করে চল্লো আপন ঠমকে। গতি ক্রমশঃ উল্কার বেগে পরিণত হলো, তারপর,

বৃক্ষচূড়ায় ধাক্কা খেয়ে আরোহীকে দিল ছিটকে ফেলে। স্রোতের মোড়ে আবর্ত্তনের সময়ে অর্দ্ধনিমজ্জিত ক্ষতবিক্ষত দেহটি এলো উঠে। দাঁড়টি তখনও হস্তচ্যুত হয়নি। ক্রমে চক্রাকারে ঘুরে নৌকাটি একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষগাত্রে ঠেকলো।—

শাখা হতে নারীকণ্ঠে নালিশ এলো—

"অনেকক্ষণ লাগলো কিন্তু ঘুরে আসতে"—

ঘুরে আসতে ?

কয়েদী মাথা তুলে দেখে নিম্নতম শাখায় উপবিষ্ট একটি রমণী। দ্রাক্ষালতার সাহায্যে তরণীটিকে স্থির করাতে সে নেমে আসতে সক্ষম হলো। নারীটি গর্ভবতী, আসন্নপ্রসবা—বল্লে—"বাবা রক্তে যে নেয়ে গেছো, একি তুমি কয়েদী না কি,—"

"মনে ত হচ্ছে ফাঁসিও সাঙ্গ হয়ে গেছে, আপাততঃ আর একটি লোককে তুলে নিয়ে ফিরতে হবে"—

ভেবেছিল মেয়েটির ভারে নৌকা বুঝি ধাতে আসবে। দাঁড় চালিয়ে চল্লো সেই ভরসায়। প্রবল ধারায় বৃষ্টি হলো সুরু। হুড়মুড় করে পড়লো তারা নদীর মুখে। রাত্রি এলো ঘনিয়ে। উন্মত্ত জলের মধ্যে স্ফুরজ্জ্যোতিঃ, ঘূর্ণাবর্ত্ত ; মাথার ওপর বরফ-শলাকার মত হিম বৃষ্টি, মেঘ-নির্ঘোষ আর তড়িৎ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের আসে পাশে চল্লো ঘর বাড়ী আর মৃতদেহ।

পরদিন কখন তারা নদীবক্ষ ত্যাগ করে প্রান্তরে প্রবেশ করেছে টের পায় নি ; স্রোতের গতি মন্দীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে এসে পড়লো আর একটি তরণী। সেখানে আশ্রয় মিললো না, পাওয়া গেল যথেষ্ট পরিমাণে ভক্ষ্যদ্রব্য।

এদিকে গর্ভযন্ত্রণা সুরু হয়েছে। দাঁতের চাপে চিবুক বেয়ে পড়ছে রুধির বিন্দু। কয়েদী বিপুল উদ্যমে বেয়ে চল্লো গ্রামের পানে। উদভ্রান্ত হয়ে নেমে পড়লো কোমর জলে কিন্তু স্থলের উপর হতে পুলিশের দল দিলো গুলি চালিয়ে। তারা কয়েদীর পোষাক চিনে ফেলেছে। সে যে আত্মসমর্পণ করে যন্ত্রণাকাতর মেয়েটির গতি করতে চায় সে বার্ত্তা তাদের কানে পৌঁছল না। ফিরতে হলো। অবশেষে ঘোর অরণ্যের মধ্যে সর্পাকীর্ণ এক মৃন্ময় স্তূপের ওপর শিশুর হলো জন্ম। তারপর বহু বিচিত্র ঘটনাচক্রের মধ্যে একত্রে যাপন করে উভয়ের

মধ্যে তুশ্চেছ্য আত্মীয়তা গঠন হবার উপক্রম হওয়াতে কয়েদীটি আতঙ্কিত হয়ে কারাবরণ করে নিলো।

এই কাহিনীটির মধ্যে হৃদয় সম্পর্কিত কোন ব্যাপারের নাম গন্ধ নাই। দৈহিক উত্তেজনার ইঙ্গিত নাই। অথচ প্রেমের পরিপূর্ণ উপলব্ধি হয়।

দ্বিতীয় কাহিনীটি সেই তুলনায় আপাত উচ্ছৃঙ্খল; দেহের চাহিদা কদর্য্যভাবে পরিস্ফুট কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠকের চিত্ত তুইটির মধ্যে শালীনতার তারতম্য বিচার করে উঠতে পারবে না। সংক্ষিপ্তসার দিয়ে সমালোচনা শেষ করবো—

হ্যারি উইলবোর্ণ-এর কৃচ্ছ সাধনা বিস্ময়কর। শৈশব অবস্থায় পিতৃ-মাতৃ বিয়োগ হতে মানুষ হয়েছিল বয়োজ্যেষ্ঠ ভগ্নীর কাছে। তারপর ওয়ারিসী স্বত্বে প্রাপ্ত তুই হাজার ডলারের সাহায্যে চিকিৎসা বিদ্যা অর্জ্জন করে। সিগারেটের খরচা বাঁচিয়ে কষ্টে স্বষ্টে চার বছরের অধ্যয়ন সময় অতিবাহিত হয়। হাসপাতালে অল্প বেতনের চাকরি গ্রহণ করার পর ভগ্নীর ঋণ পরিশোধে যত্নবান হয়। সাতাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত তার সঙ্কল্প বিচ্যুত হয় নি। কঠোর সংযমের মধ্যে জীবন যাপন করে ভগ্নীকে উপার্জ্জনের সারাংশ পাঠিয়ে এসেছে নিয়মিতভাবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় সহকর্ম্মীদের একজন তাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলো কোন নৈশ বৈঠকে। রিটেন্‌মেয়ার-এর পত্নী শারলট-এর সঙ্গে পরিচয় হলো সেখানে। সে পতিপরায়ণা ভার্য্যা এবং তুইটি শিশু কন্যার মাতা। আকৃতি সৌন্দর্য্যহীন। কিন্তু নবীন চিকিৎসকটি তার প্রেমে পড়ে গেল গভীরভাবে। মেয়েটি বুঝলো সেও নিমজ্জিত। নিরুপায় স্বামী অবশেষে স্ত্রীকে তুলে দিয়ে গেল প্রণয়ীর গাড়ীতে। শিশুরা রইল পড়ে।

চিকাগো সহরে তার নূতন সংসার গুছিয়ে নিয়ে শারলট্‌ বল্লে—"দেখ এবার জীবনভোর মধুচন্দ্রিমায় কাটিয়ে দিতে হবে। আমাদের মাঝামাঝি কিছু নাই। হয় স্বর্গ না হয় নরক। শান্তি বা আরাম খুঁজতে গেছ কি দেখবে ভব্যতা, লজ্জা কিম্বা অনুশোচনা পেয়ে বসেছে।

সে আরও বল্লে—"লোকে বলে তুজন মানুষের মধ্যে পড়ে প্রেম যায় নষ্ট হয়ে। সে কথা মিথ্যে। প্রেম সমুদ্রের মত, কখনও মরে না। অনুপযুক্ত

লোকেদের শুষ্ক ডাঙার ওপর নিক্ষেপ করে দেয়। মরণ ত' আছেই, আমি শুখিয়ে মরার চেয়ে সমুদ্রের মধ্যে ডুবে মরতে চাই—"

জীবনযাত্রা অর্থের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠলো। বহু স্থান পরিবর্ত্তন ও শরীর-পীড়ন সহ্য করে এক সময় তারা দুজনেই উপার্জ্জনক্ষম হয়ে রীতিমত সৌখিনভাবে সংসার বিছিয়ে বস্‌লো। বন্ধু সমাগম হলো। হ্যারির গল্প লেখার প্রচেষ্টা অর্থকরী ও লোভনীয় হয়ে উঠলো।—তারপর হঠাৎ সজাগ হয়ে সে-স্থিতি তারা স্বেচ্ছায় ভেঙে দিয়ে চলে গেল সুদূর দেশে, খনির কাজ নিয়ে।

অদ্ভুত সে জায়গা। ম্যানেজার বল্লো রসদের অভাব নাই কিন্তু গত ক'মাস তারা অর্থের মুখ দেখেনি। চীনে কুলিরা ভেগেছে, আছে পোল কিন্তু দোভাষীর অভাবে আশঙ্কাজনক অবস্থাটা তাদের বুঝিয়ে দেবার সুবিধা হয় নি।

অসহ্য হিম। তুষার আচ্ছাদিত অধিত্যকার এক প্রান্তে ছোট্ট একটি কুটীর ঘরে সপত্নী ম্যানেজার বাস করে এবং তারই এক পার্শ্বে আশ্রয় মিললো নবাগত দম্পতির।

একমাস পরে যখন বসন্তের উন্মেষ হয়েছে শারলট্ হ্যারিকে নিভৃতে ডেকে বল্লে, "এরা এখান থেকে যাবে আর কোনও কাজের সন্ধানে—আমাকে অনেক করে ধরেছে—মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে—তোমাকে ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।"—

বসন্তের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়িনীর মন হাসিতে খুশীতে ভরে উঠেছিল। হ্যারি তার উপরোধ রক্ষা করলো। পত্র যোগে জানলো যে প্রক্রিয়া তার সফল হয়েছে।

তারপর দুজনে মনের আনন্দে খনির কাজ তদারক করে, মজুরদের মধ্যে খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ করে বসন্তের আগমণ স্বাগত করে নিল। শারলট-এর কাছে প্রতীয়মান হলো যে সার্থক হয়েছে তার আত্মোৎসর্গ। কিন্তু ক্ষণিকের জন্যে—

হ্যারি শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলো—কাঁপতে কাঁপতে জানতে চাইলো—কতদিন—? শারলেট-এর সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে। সে শান্ত ভাবে বল্লে, "কেন তুমি ত' পারো।"

"না না সে হতেই পারে না—"

"তুমি আমি অনাহারে থাকতে পারি কিন্তু বাচ্ছা না খেয়ে থাকবে কেমন করে?"

হ্যারি সহরে ফিরে পাগলের মত চাকরির উমেদারি করে বেড়ালো। উদ্‌ভ্রান্তের মত টোট্‌কার অনুসন্ধান করে লাঞ্ছিত হলো পদে পদে। অবশেষে একদিন যখন চৌকিদারের টুপি পরিধান করে গৃহে ফিরলো শারলট্‌ সেটা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে কেঁদে কেটে ভাসিয়ে দিলে। প্রকৃতিস্থ হতে সে নিজের হাতে যন্ত্রপাতি গরম জলে ফুটিয়ে এনে শুয়ে বল্লে—"কিছু ভয় নেই তুমি কর"—

হ্যারি যন্ত্র স্পর্শ করতে পারলো না—কাঁপতে লাগলো—

তারপর সমুদ্রতীরের সেই কুটীরের দৃশ্য। ধর্ম্মভীরু বাড়ীওয়ালা-চিকিৎসক স্রাব বন্ধের ব্যবস্থা না করে ছুটলেন পুলিশের সন্ধানে।

উপসংহার সহজেই অনুমেয়। শোকবিহ্বল অবস্থায় হ্যারির কাছে সমাজের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা ঠেক্‌লো অর্থহীন প্রহসনের মত। পলায়নের সুযোগ উপেক্ষা করে সমুদয় সাজা অঙ্গীকার করে নিলো সে।

কাহিনীটির সর্ব্বাঙ্গীণ সারসংগ্রহ করতে গেলে সমালোচনা দীর্ঘায়িত হয়ে পড়তো, সে চেষ্টাও করিনি। কতকগুলি প্রণিধানযোগ্য চরিত্রের কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করিনি। শারলট্‌-এর স্বামীর ঔদার্য্য ও প্রেম গ্রন্থখানির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাড়ীওয়ালীর অন্তরস্থ মানবসত্তার ক্ষণিক বিকাশ সাহিত্য জগতের দুর্ম্মূল্য রত্নরাজির মধ্যে আসন পাবার যোগ্য।

শারলট্‌-এর চরিত্র গঠিত হয়েছে ছোটখাট কথা ও কার্য্যের ঘাত প্রতিঘাতে, হ্যারি আপন হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করেছে আত্মদর্শনের ভাব ধারায়। ঘটনার তালিকা দ্বারা তাদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়।

এখানি ফকনার-এর দশম উপন্যাস। প্রথম খানি পড়ে আর্ণলড্‌ বেনেট্‌ বলেছিলেন, গ্রন্থকার কথা সাহিত্যের ভাবী সম্রাট্‌। তারপর তাঁর শক্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। আজ আমরা বোধকরি নিঃশঙ্কচিত্তে বলতে পারি যে সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। তবে একথা স্বীকার্য্য যে তাঁর লিখন-ভঙ্গীর আবহ শ্রম বিনোদনের অনুকূল নয়।

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Christmas Holiday:—by Somerset Maugham (Heinemann).

সমরসেট্ মমের আমি ভক্ত। এ দিকে তাঁর বিদগ্ধ সাবলীল নাটক আর অন্যদিকে তাঁর কঠিন বা মর্ম্মান্তিক উপন্যাস-গল্প দুইই আমার জীবনবীক্ষায় সাহায্য করে। অবশ্য তাঁর শিল্পশুদ্ধিও তার কারণ হতে পারে। শুনেছি তিনি নিজেকে মোপাসাঁর শিষ্য বলে' গর্ব্ব করেন এবং মোপাসাঁকে তো তাঁর গুরু ফ্লোবেয়র তিরিশ বছর অবধি লেখা ছাপতেই দেন নি, বুল্ দ সুইই নাকি প্রথম গুরুর অনুমোদিত গল্প! নাতি সম্পর্কে মম্ সেই একান্ত শিল্পচর্যার কাঠিন্যেই নিজেকে মানুষ করেছেন। তাঁর সমসাময়িক মহালেখকদের সম্বন্ধে আমাদের ভক্তি দূর থেকেই জমে ভালো, আজকে গল্স্ওয়ার্দি, বেনেট্ ইত্যাদির লেখা লোকে পড়ে খানিকটা ঐতিহাসিক কারণে, বা কর্ত্তব্যবোধে, থিসস্ লিখতে বা ব্যক্তিগত খামখেয়ালে।

কিন্তু মমের শিল্পসাধনা তাঁর বিলাসী বার্ধক্যেও তাঁকে শান্তি দেয় না। ফলে আজও তিনি নির্ভীক মনে বিশেষভাবেই আধুনিক জগতে ঘোরাফেরা করেন। বয়সের ও স্বভাবধর্মের পার্থক্য সত্বেও যে তিনি এতটা অনুকম্পা ধরেন সেটা তাঁর শিল্পমাহাত্ম্য। কারণ এই বড়োদিনের ছুটির ব্যাপারটা খুবই আধুনিক ইওরোপের জীবনের। সম্যক সমবেদনা হয়তো তাঁর নেই, কারণ শিল্পসাধনার লাভেরও সীমা আছে। যা আছে, আমরা তার জন্যই কৃতজ্ঞ, এ রকম গল্প বল্‌তে কজন পারেন?

উপন্যাসটি কয়েকদিনের ঘটনায় বদ্ধ। মেসন্-রা টাকাকড়ি করেছে তিন পুরুষ মোটে। বুড়ো সিবর্ট ছিল মালী, সেই জমি-খেলায় পয়সা করেছে, যার ফলে এক নাতি লেস্‌লি হয়েছে তিন হাজারী ভদ্রলোক, আরেকজন হয়েছে পার্ল্যামেণ্টের সভ্য ও ব্যারনেট্ এবং আসন্ন পিঅর্। লেস্‌লি পাব্লিক্ স্কুলে ও কেম্‌ব্রিজে মানুষ, সে যাকে বলে মাধুরী ও আলোর স্রোতে ভাসমান। বই, ছবি, সঙ্গীত সবেতেই তার পছন্দ লাগসই, প্রমাণসাইজ্। দুঃস্থ এলেমেলো বীণাপাণির সন্তানদের সে দূরেই রাখে, অথচ সে উঁচ্‌কপালে-র আত্মরতিও ভোগ করে, এমন কি নিজেকে নিরাপদ পরিমাণে বোহিমীয়ও ভাবে। তার স্ত্রী ভিনিশিয়া খাসা মহিলা, মধ্যবয়সী কিন্তু শরীর প্রায় ঠিকই আছে। সেও ভারি

সৌখীন, সুকুমার কিন্তু বেবুর হ্যাটও তার মাথায় উঠলে আর্মি এণ্ড নেভি ষ্টোরসের মাল বলে মনে হয়। তা হোক্ স্বামীস্ত্রীতে বড়ো ভাব, তারা বই পড়ে এক, ছবি দেখে এক, গানবাজনা শোনে এক। এবং লেস্‌লি বলে পিকাসোর ছবি বুঝেছে ভিনিশিয়াই প্রথম। আর ভিনিশিয়া বলে, সিবেলিউসের সঙ্গে বীটোফেনের মিলটা লেস্‌লিই ধরেছে আগে। যদিই লেস্‌লি কখনো বলে ফেলে যে ভিনিশিয়ার বাপ ছবিই আঁকতেন, আর্টিষ্ট ছিলেন না এবং ভিনিশিয়ার মুখ ভার হয়, তাহলে আবার লেস্‌লিই তার ঠাকুরমা মালীবৌর রান্নার কথা বলে হাসে। আবার স্বামীস্ত্রীতে ভাব হয়ে যায়।

এদের দুটি সন্তান, একটি চার্লি, আমাদের নায়ক আর তার বোন প্যাটসি। দুটির বেশী লেস্‌লিরা চায় নি, দুটিই ঠিক সংখ্যা, কমও নয় বেশীও নয়। অবস্থা মত ব্যবস্থা করেছে বলেই তারা শিক্ষা দিতে পেরেছে যথারীতি। চার্লি আর প্যাট্‌সির ঘরে তারা টাঙিয়ে দিয়েছে ভ্যান্ গঘের, গোগ্যাঁর আর মারি লরাঁস্যাঁর ছবি, শুনিয়েছে ওআগ্‌নার্, বীটোফেন, মোৎসার্ট, হাইড্‌ন্। রবিবারে রবিবারে কন্‌সার্টে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গেছে, ওল্‌ড্ মাষ্টার্‌স্‌দের পছন্দ না হলেও শিক্ষার পাকা বনিয়াদ গড়তে ন্যাশনাল্ গ্যালারিতে নিয়ে গিয়ে ছবিদেখা শিখিয়েছে। চার্লিরা ভালো ওস্তাদের কাছেই পিয়ানো বাজাতে শিখেছে, নিটোল মনুষ্যত্বের জন্যে সাইক্‌ল্ ও ঘোড়াও তারা চড়েছে, শিকারেও তাদের শিক্ষা বাদ যায় নি, এত কষ্ট সার্থকও হয় নি যে তা নয়, বালকবালিকা মাতিস্ পছন্দ করে জেনে বাপমার বিস্মিত পুলক হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

সেই চার্লি গেল বাপের স্কুল রগবিতেই—ব্যরনেট্ আত্মীয়ের ইটন্ নিয়ে পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও। লেস্‌লির শুভবুদ্ধি সুদূর প্রসারিত, ছেলের ভবিষ্যৎও সে ভেবেছে, সর্ উইল্‌ফ্রিডের কাছে সে প্রতিশ্রুতি বার করে' ছাড়লে যে মেসন্ এষ্টেটের যে কাজ সে নিজে করে, তার ছেলে তার পরে সেই নায়েবিই পাবে। চার্লি লেখাপড়া শিখ্‌ল, পিয়ানো বাজাল, ছবি আঁকল আর সাইমন ফেনিমোরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে। অদ্ভুত এই ছেলেটা, অসভ্য, গোঁয়ার, কিন্তু চালাক আর কথা যা বলতে পারে। ভিনিশিয়া নিরুপায়, কি করবে, ছেলের দারুণ বন্ধু, তার উপর বেচারার মা বাবা নেই, ভারতবর্ষ থেকে এসে বেচারা স্কুলে পড়ছে, গরীবও বটে। ভিনিশিয়া তাকে তিনজোড়া টাই কিনে দিতে বেচারা বিচলিত হয়ে পড়ল।

ভিনিশিয়া বল্লে, বেচারা তোমার মা বাপ নেই ! সাইমন তাতে বল্লে, না থেকে খুব ক্ষতি হয় নি অবশ্য, একজন তো ছিল বেশ্যা, আরেকজন পাঁড়মাতাল। এই রকম ছেলে সাইমন—পনেরো বছরেই।

যা হোক, চার্লি লায়েক হল, লেস্‌লিরা ঠিক করলে তাকে একটা উপহার দেবে—একা একা মজা করবার সুযোগ। তারপরে লাগ্‌বে কাজে। চার্লি এবার একা প্যারিসে যাবে বড়দিনের ছুটিতে। গেল, আবেগে উৎফুল্ল হয়ে গিয়ে খুঁজল্ সাইমন্‌কে। সাইমন্ বল্লে জনসাধারণের কথা, চার্লিদের ছেলেমানুষী, অন্ধ অসারতার কথা, বল্লে, এইবেলা যা পারো মজা করে' নাও, কবে কি হয়। সাবালক হবার জন্যে চার্লি গেল মজা করতে সাইমনের সঙ্গে। সাইমন্ সতেরো ঘণ্টা খাটে, শীতে আগুন জ্বালে না, কম করে খায়, চেকার কর্তার নির্মমতা তার আদর্শ, চার্লিকে সে নিয়ে গেল এক নাচঘরে। সেখানে বহু মেয়ে পায়জামা পরে' উত্তমাঙ্গ খুলে' প্রস্তুত, কিন্তু সাইমন আলাপ করিয়ে দিলে সকলের মধ্যে বেছে রাশ্যান্ বেশ্যা লিডিয়ার সঙ্গে। স্বামী তার দ্বীপান্তরে, নামজাদা ফরাসী জোচ্চোর ও খুনে সে।

আশ্চর্য বাহাদুরি তার পরের গল্পাংশে। আমি সে বাদ দিয়ে চলে যাচ্ছি শেষে। লিডিয়া ও চার্লি কাটাল রাত্রি ও দিন একসঙ্গে, কিন্তু দৈহিক মিলন তারা করলে না, সে কথাই উঠল না। লিডিয়াই বল্লে বেশী কথা, একসঙ্গে গেল মধ্যরাত্রির গম্ভীর উপাসনায়, লিডিয়া কাঁদল প্রচুর। তার পরদিন লিডিয়া নিয়ে' গেল আর্টজ্ঞানী চার্লিকে লুভ্‌রে। চার্লির দীর্ঘপরিচিত লুভ্‌রে লিডিয়া দিলে এক শিল্পের রহস্য বিষয়ে বক্তৃতা, শারদ্যাঁর একটা রুটির ছবির সামনে। ছুটি ফুরোল, ষ্টেশনে তারা বিদায় নিলে প্রথম চুম্বনের মধ্যে। চার্লি এল ঘরে ঘরের ছেলে। তার মা বাবা বোন তাকে নিরীক্ষণ করলে। তার বাবা ভাবলে, ছোক্‌রা ফূর্ত্তিই করেছে দেখ্‌ছি, আশা করি রোগে ধরে নি। তার মা বোনও ভাবলে। আর সে নিজেও ভাবলে অনেক—তার পা থেকে যে পৃথিবী সরে গেছে—the bottom has fallen out of his world.

আমাদের অনেকেরই পায়ের তলায় পৃথিবী নেই, তাই সরে'ও যায় না। অনেকে আবার সরে গেলেও টের পাই না, আর অনেকে হয়তো চার্লিরই মতো ভাবি আবার তার মতোই পৈতৃক কাজে মন দিই। তবু আমাদের সকলেরই

বইটা ভালো লাগবে। কারণ মম্ নিজেও ঈষৎ বিমূঢ়, ফলে বোঝা যায় না কখন যে তিনি হাসছেন, কাঁদছেনই বা কখন। তাই মতি স্থির না করেই শুধু এই উপাদেয় বইটির গল্প উপভোগ করা যায়।

বিষ্ণু দে

অজানিতার চিঠি—শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য।

ষ্ট্যালিন-লুড্‌ভীক্ সাক্ষাৎকার—শ্রীঅমিয় সেনগুপ্ত।

আতঙ্ক—শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত (কমলা পাব্লিশিং) মূল্য—৮০

লালপথে—শ্রীসত্যেন্দু দত্ত মজুমদার।

অন্ধের দৃষ্টি—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ।

সমুদ্রে যারা ঘুরে বেড়ায়—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় (কমলা পাব্লিশিং) মূল্য—॥০

প্রথম বই "অজানিতার চিঠি" বিখ্যাত লেখক ষ্টিফেন সোয়াইগ-এর "Letter from an Unknown Woman" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। বাঙ্গলা সাহিত্যে অনুবাদের স্বল্পতা সর্ব্বজন শোচিত হ'লেও, এদিকে অক্ষম প্রয়াসও কদাচ দৃষ্ট হয়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে যাঁদের অনুরাগ আছে বিধায়ক বাবুর এই অনুবাদ প'ড়ে তাঁরা নিঃসন্দেহে খুশি হবেন। তাঁর ভাষা সহজ ও সুন্দর এবং পড়বার সময় কোথাও বাধা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় বইখানিও অনুবাদ। সমাজতন্ত্রের বিরোধী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের প্রচারের ফলে রাশ্যার শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে অজ্ঞতা প্রসূত হেয়বোধ পোষিত হয়, জার্মানীর লুড্‌ভীক্‌ও তা' থেকে মুক্ত ছিলেন না। ষ্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে তাঁর ভ্রান্তি অপনীত হয়, এ-বই-এ তাই লিপিবদ্ধ হয়েছে। জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থনে পরিচালিত সোভিয়েট রাশ্যার শাসন-নীতির পরিচয় এ-বই থেকে পাওয়া যায়। বইখানির প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় বই 'আতঙ্কের' অন্তর্গত প্রত্যেকটি গল্প রহস্যময়তায় এবং লিপিচাতুর্য্যে পাঠককে আকর্ষণ করে। বৈজ্ঞানিক যুক্তি এবং অলৌকিকতার সংমিশ্রণে সুধাংশু বাবু সত্যকার রহস্য সৃষ্টি ক'রেছেন। 'মাকড়সা', 'মৃতের প্রতিশোধ' এবং 'নকল আঁচিল' আমার বিশেষ ভালো লেগেছে।

চতুর্থ বই 'লালপথে' কয়েকটি প্রগতিশীল গল্পের সঙ্কলন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দু দত্ত মজুমদারের সম্পাদনায় এখানি প্রকাশিত হয়েছে। ভূমিকায় প্রকাশক লিখেছেন "গল্প-লেখকদের...দেখতে হয়—জানতে হয়—যখনকার যে যুগের আদর্শ—জনসাধারণের মধ্যে কিভাবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে।...এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে—দুনিয়ার বর্ত্তমান আদর্শ সামাজিক অবস্থাকে রূপ দেওয়ার জন্যই এ বই প্রকাশ করা হয়েছে।" ফলে প্রচার-সাহিত্যের ঝাঁজ মাঝে মাঝে প্রকাশ হ'য়ে পড়লেও মোটের উপর বইখানি মন্দ হয়নি।

পঞ্চম বই 'অন্ধের দৃষ্টি'তে লেখক তাঁর বর্ম্মা প্রবাসের কাহিনী অবলম্বন করে "গল্পের ছলে, মানব-জীবনের বাস্তব-অনুভূতির সঙ্গে চরম সত্যের সামঞ্জস্য বিধানের" প্রচেষ্টা ক'রেছেন।

বিখ্যাত লেখক ভিক্টর হুগোর "টয়লার্স অব দি সি" নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত বিশু মুখোপাধ্যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিফহাল, তাঁদের কাছে অনুবাদকের নতুন পরিচয় অনাবশ্যক। বর্ত্তমান বইখানির ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং কিশোর পাঠক এ-থেকে নিঃসন্দেহে আনন্দ পাবে। তদুপরি বইখানির প্রচ্ছদ, ছাপা, কাগজ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট এবং সে-অনুপাতে দাম অত্যন্ত অল্প।

হরপ্রসাদ মিত্র

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।

পরিচয়—আষাঢ়, ১৩৪৬

বিষয়-সূচী

৮ম বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩৪৬

পরিচয়

বিজ্ঞানের ব্যর্থতা-মোক্ষণ

(২)

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা বিজ্ঞানের ব্যর্থতার প্রসঙ্গ উৎথাপিত করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম য়ুরোপের প্রধান কৃতিত্ব এই বিজ্ঞানে। বিবিধ বিভাগে বিজ্ঞানের বিশিষ্ট কীর্তির কথা স্মরণ করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। কিন্তু এত সত্ত্বে লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, বিজ্ঞানের সর্ব্বাঙ্গে ব্যর্থতা জ্বলদ্-অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা কয়েকজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমরা ইহাও দেখিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞান যে ঐরূপে নিজের ব্যর্থতা ও বন্ধ্যাত্ব ঘটাইয়াছে, তাহার মুখ্য কারণ এই যে, 'Science has outrun morals'; অর্থাৎ, বিজ্ঞান ধর্মের বি-সহচর— ধর্মোন্নতির সহিত বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গতি নাই। সে জন্যই যত অনর্থ। সে জন্যই বিবিধ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সত্যের অপব্যবহার।

এ যুগে যে বিদ্যার বিষম অপব্যবহার হইতেছে—এ কথা কোন বৈজ্ঞানিকই অস্বীকার করেন না—করিতে পারেন না।

এক জনের স্বীকারোক্তি শুনুন—

'As the world is, Science is made to serve especially the art of war and the art of money-making ?'

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যকার বার্ণার্ড শ-এর বিদ্রূপোক্তি উল্লেখযোগ্য :— তিনি বলেন বিগত ১০০০০ বৎসরে সামাজিক মানবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই—কিন্তু মৃত্যু-অস্ত্রের কি আশ্চর্য্য উন্নতি

হইয়াছে। 'In the arts of life, man invents nothing ; but in the arts of death, he outdoes Nature herself, and produces by chemistry and machinery all the slaughter of plague, pestilence and famine. * * * But when he goes out to slay, he carries a marvel of mechanism that lets loose at the touch of his finger all the hidden molecular energies, and leaves the javelin, the arrow, the blowpipe of his fathers far behind. —Man and Superman, Act iii.

তবে কেহ কেহ স্বদোষ ক্ষালন জন্য বলেন—'এ জন্য বৈজ্ঞানিক দায়ী নহেন—সমাজ ও সামাজিকেরাই দায়ী।'

It has to be admitted that Army Departments use scientists to find out new destructive uses to which scientific knowledge may be put. But, (asks the 'Statesman' of 19th August 1938) should those who revealed the secrets of flight be blamed, because harmless men, women and children are disembowelled by bombs from the air in China and Spain ?

কলিকাতায় বিগত জ্যানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান-সম্মেলনের সভাপতি স্যার জেমস্ জিন্স এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—I wonder if Scientists as Scientists can take any steps to check such misuse. Is not that the duty of the civic authorities ?

ঐ আগষ্ট মাসে বৃটিশ বিজ্ঞান-সভার সভাপতিরূপে লর্ড রেলির (Rayleigh) মুখে আমরা ঐ কথার প্রতিধ্বনি শুনিয়াছিলাম। The world is ready to accept the gifts of science and use them for its own purposes. It is difficult to see any sign that it is ready to accept the advice of scientific men as to what the uses should be। আর একজন বৈজ্ঞানিক আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—An angel invented the aeroplane but a gorilla got hold of it.

ইহার উত্তরে ডাঃ ভগবানদাস বলেন :—

এরূপে পাশ কাটাইলে চলিবে কেন ? বৈজ্ঞানিক। এ যুগে তোমরাই ত'

লোক-শিক্ষক—'Scientists constitute the spiritual power today'. তোমাদের কি উচিত ? They should guide the 'temporal power' everywhere—instead of allowing *themselves* to be misguided, exploited, prostituted by it. They should convert the destroying Satan of Militarism into the protecting Arch-angel of Humanism, so that the imminent hell of Armageddon may be averted and the Heaven of salvation, peace and prosperity may be achieved.

বন্ধু ! তোমরাই ত নিজের কৃতিত্ব জাহির করিবার জন্য বলিয়া থাক—the last world-war was much more a war of scientists than of soldiers.

আর সত্যই যদি রাজশক্তি ও সমাজশক্তি তোমাদের হিতকথায় কর্ণপাত না করে—তবে বৈজ্ঞানিক ! তোমার আবিষ্ক্রিয়া স্তম্ভিত কর, স্থগিত রাখ—Cease to discover, invent, teach—if the politicians and the soldiers do not cease to misuse the precious knowledge.

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোড এই সে দিন ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন :—

He proposed that no more inventions be let loose upon the community until it has been prepared for their impact. This involved appointing a Board of Scientists and Philosophers, who would give or refuse permits for scientific inventions likely to affect human life.

It entailed as a first step putting a veto on the publication of the results of scientific research, especially those which enabled us to increase our efficiency in the matter of slaughter, for at least 20 years.

বুঝিয়া দেখিলে—ব্রহ্মই ত' ক্ষত্রের প্রভু—ক্ষত্র ব্রহ্মের নয় ।

Science should compel the Sword to protect ; not the Sword compel Science to destroy.

আর সত্যই যদি বৈজ্ঞানিক-'ব্রাহ্মণে'র মেরুদণ্ড এমন শ্লথ হইয়া গিয়া থাকে যে, তিনি আর ক্ষত্রিয়ের প্রভু হইবার যোগ্য নন—তিনি দাস—তিনি অর্থলোভী, পদপ্রার্থী, গরিমার কাঙাল—তবে ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উভয়েই যাঁহার ওদন —যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ—সেই পরম দেবতা, যিনি সমস্ত বিদ্যার যোনি ('শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'), বাধ্য হইয়া বৈজ্ঞানিকের উদ্ভাবনা ও আবিষ্কার শক্তি অপহরণ করিয়া লইবেন—যেন বিজ্ঞান জারণ মারণ ও নাশন-কার্যে অপব্যবহৃত না হইতে পারে।*

আমরা দেখিলাম বিজ্ঞানের ব্যর্থতা ও বন্ধ্যত্বের মুখ্য কারণ—ধর্মোন্নতির সহিত বিজ্ঞানের অগ্রগতির অ-সঙ্গতি। কিন্তু উহার সহকারী কারণ--বিজ্ঞানের জড়ের প্রতি অত্যধিক পক্ষপাত এবং চিতের প্রতি অন্যায় অমনোযোগ। ভগবান্ দাস এ প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

Moreover, Science has gone astray on a most vital point. It devotes itself to the Science of Matter, ignoring the Science of Man.

এ সম্পর্কে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের উক্তি শুনুন—

The enormous advance gained by the science of inanimate matter over that of living things is one of the greatest catastrophies ever suffered by Humanity. * * Science develops at random. It is not at all actuated by a desire to improve the state of human beings. * * We are the victims of the backwardness of the Sciences of Life over those of Matter. * * The Science of Man has become the most necessary of all the sciences—Alexis Carrel's Man the Unknown, pp. 34-39.

---

* তত্ত্বদর্শিনী মিসেস্ বেসেন্টের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে মনে পড়িল। সকলেই জানেন Atom বা পরমাণুর মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তি বন্দী অবস্থায় আছে (is locked up in the atom), এমন কি এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত অ্যাটম্-পুঞ্জে নিগড়িত শক্তিকে যদি মুক্ত করিতে পারা যাইত, তবে ঐ শক্তি 'ন্যায়েগরা'-প্রপাতে উচ্ছ্বসিত শক্তিরাশির লক্ষ গুণ হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া বৈজ্ঞানিক সমাজে ঐ শক্তি মোক্ষণ করিবার অশেষবিধ প্রচেষ্টা চলিতেছে কিন্তু পাছে তাঁহারা ধ্বংসকার্যে ঐ শক্তির অপ-ব্যবহার করেন—এই সম্ভাবনায় বিদ্যার ধারক ও রক্ষক 'ঋষি-সংঘ' বিজ্ঞানের ঐ চেষ্টাকে ব্যর্থ ও বিফল করিতেছেন—thus withholding from science the technique of breaking up the atom,

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া আর একজন বলিতেছেন—

Another difficulty is the *isolation* of science, sociology, economics and politics from each other, and the academical isolation of scientific workers from the application of science to life and society. যেহেতু, 'Science is for Life, not Life for Science'. *

এই কথাই ডাঃ ভগবান্ দাস আরও মনোজ্ঞ ভাষায় বলিয়াছেন :—

Not only Science, but also Art and Literature, Law and Religion and Philosophy, all are for the amelioration and service of Life, not Life for these.

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া স্পিয়ার সাহেব বলিতেছেন—The divorce of science from humanist morality and spirituality is the one cause of the present horrible condition of the mutual relations of the nations and of the classes and sections within each nation.

সুখের বিষয় এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের সুর যেন কিছু ফিরিয়াছে। যেমন একশ্রেণীর রসিক 'Art for art's sake'-এর দোহাই দিয়া অশ্লীলতার অবাধ প্রবাহ উৎসারিত করেন, সেইরূপ বৈজ্ঞানিকেরা এতদিন 'Science for Science's sake'-এই অজুহাতে হৃদয়হীনতার অজস্র তরঙ্গ প্রবাহিত করিতেন। কেম্বি্জে অনুষ্ঠিত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সভার শেষ অধিবেশনের কার্যাবলী লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যেন তাঁহারা সম্প্রতি কিছু সজাগ হইতেছেন। তাহার ফলে বিজ্ঞান-সভার এক নূতন বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে—'whose purpose was to study the social and international relations of Science'। এই নব বিধান লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপক বার্নাল্ (Prof. J. D. Bernal F. R. S.) 'Reynold's Illustrated News'-পত্রিকায় সোৎসাহে লিখিয়াছেন—

Scientists *for the first time* have become conscious of the

---

* Life, mind, consciousness, is more and other and greater than Matter—Dr. Bhagavan Das,

need to concern themselves with the social consequences and possibilities of Science.

ইহা আনন্দের সংবাদ নয় কি ? কারণ, (অধ্যাপক বার্নাল্‌-এর ভাষায়)—

Up till very recently the pursuit of Science for its own sake was the conscious ideal of the Scientist. The results of science might be human welfare or destruction, but that was the concern of society, not of the Scientist. * * * Science, we had been taught, was intended for human welfare ; it was not being used for that purpose. * * Now we see Science everywhere being used for war or preparations for war ; Scientific invention blowing women and children to pieces every day, laboratories and universities sacked and bombed in Spain and China. The danger spreads, it threatens everyone. A little more and Science itself can hardly survive. * * *

পুনশ্চ, 'At the same time the direction of research is increasingly directed towards war-production, directly in armament research, indirectly through industrial, fuel and food research. Even in this country (England), the purely scientific research carried out directly for *war* purposes employs 840 trained scientists and costs £ 1,300,000 a year.

কিন্তু বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সভার পূর্ব-উল্লিখিত প্রকল্পের ফলে—'Science would be used for human welfare rather than for restriction and destruction'। কারণ এতদিন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল,—এখন 'Science would be properly used for human welfare and must come into alliance with those social forces that are working for democracy and socialism' (Bernal) অর্থাৎ, আশা করা যায়, জনহিতে ও জগতের কল্যাণে বিজ্ঞান অতঃপর আত্মনিয়োগ করিবে।

ইহাই বিজ্ঞানের প্রকৃত ব্যবহার। তাই এদেশে প্রাচীনেরা বলিতেন—সেই জ্ঞানই বি-জ্ঞান—যতঃ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ—All knowledge

should subserve 'the purpose of promoting human happiness here and hereafter.'

এ দৃষ্টিতে দেখিলে আত্মবিদ্যা (Philosophy, Psychology)—the 'Science of Man'-ই মুখ্য বিদ্যা—the chief of all Sciences। বিজ্ঞানের গোষ্ঠী হইতে এ বিদ্যাকে যদি বহিষ্কার করা হয়, তবে বিজ্ঞান পঙ্গু ও ব্যর্থ হইবে না ত' কি ?

If Science flings away spirituality and clings to materiality alone, then it makes inevitable its own prostitution and ultimate destruction by the sword, as seems inevitable now.

বিজ্ঞান এইরূপে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এবং ধর্ম হইতে বিচ্যুত হওয়ায়—বৈজ্ঞানিক এইরূপে আত্মবিদ্যার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ এবং জনহিতে উদাসীন হওয়ায়, জগতের কি ভীষণ অহিত হইতে বসিয়াছে—কিরূপে সর্বধ্বংসী মহা-কুরুক্ষেত্র (পাশ্চাত্যে যাহাকে 'Armageddon' বলে) আশুভাবী হইয়াছে এবং কি ভয়ানক দৈন্য ও দারিদ্র্য-সমস্যা অব্যশ্চম্ভাবী হইয়া সভ্যতাকে গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে—আগামী বারে আমরা তাহার যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পাশা

মোহমুক্তির দুরূহ তর্কজালে
শান্তির ছায়া কোন্ দূরে পলাতক,
বহু নিমেষের জরতী জারকারাক
জীবনের পাশা মেলেছে জুয়ার ছক।

বণিক মনের ক্লান্তির অবকাশে
নীল পাহাড়ের নির্জ্জন হাতছানি,
সেখানে বিছানো পাইন্-কুঞ্জবনে
বাঁকানো আকাশে শান্তির রাজধানি।

যে জীবন গাঁথা বহু মৃত্যুর ভিতে,
বিস্মৃতি পাবে ঈশ্বর আহেফিনে?
অস্থির নীচে অস্থির নীচতায়
অগ্রগতিকে পার্‌বে তো নিতে চিনে?

নীল আঁচলের শ্লথ কটিবন্ধনী
বাঁকানো ঠোঁটের কঠিন কুসুম মায়া,
নীল নয়নের নিভৃত আকাশ কোণে
বলাকার ডানা ফেলেছে কোমল ছায়া।

কোথা ফাল্গুনী! ফাল্গুন এলো এ যে!
জীবন শকুনী মেলেছে জুয়ার ছক:
মোহমুক্তির দুরূহ তর্কজালে
শান্তির ছায়া কোন্ দূরে পলাতক।

শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

"মদন গোপালের বিরহ"

(১)

সৌভাগ্য দেখা দিল ব্যঙ্গের আকারে। একেই বলে—কপাল।

এতদিন অত চেষ্টা করিয়াও চাকরির দেখা সাক্ষাৎ নাই, সেই এদিকে শ্বশুরের সঙ্গে কাকার মন কষাকষিটা মিটিল, দিব্যি ডাগোর ডোগোরটি হইয়া রাজু ঘরে আসিয়া উঠিল, ওদিক হইতে দাদার চিঠি আসিল—"বাবুকে ব'লে ক'য়ে মদনার একটা কাজের যোগাড় ক'রেচি, শিগ্‌গির তাকে পাঠিয়ে দেবে।"

তিনটি দিনও হয় নি রাজুর আসার। কাকা রাম পণ্ডিতের নিকট গিয়াছিল, কালই যাওয়ার স্থির হইয়াছে। মদনের মনটা বড় খারাপ হইয়া আছে সমস্ত দিন। সন্ধ্যার সময় হালের বলদ জোড়া কোন রকমে ঠেলিয়া ঠুলিয়া আনিয়া গোয়ালে তুলিল। এর পরে অন্যদিন একটু বেশ করিয়া তামাক খাইয়া ধামি করিয়া মুড়ি, চিঁড়া যা হয় একটা কিছু লইয়া বসে; ডবকা ছেলে, খাওয়ার দিকে একটু ঝোঁক বেশি। আজ কিন্তু সে সব কিছু করিল না; ভাজের সন্ধানে ঘরগুলোতে একবার করিয়া উঁকি মারিল, দেখিতে না পাইয়া দোলনায় কোলের ভাইপোটিকে ঘাঁটিয়া ঘুঁটিয়া কাঁদাইয়া দিল, এবং তাহাতেও ভাজ উপস্থিত না হওয়ায় খিড়কির আম বাগান দিয়া পুকুরের দিকে অগ্রসর হইল।

বেশী দূর যাইতে হইল না। দুই জায়ে পুকুরে গা ধুইয়া খোকার গলার আওয়াজে একটু ত্রস্ত পদেই চলিয়া আসিতেছিল। মাঝ পথে দেখা হইল। মদন একটু গরম হইয়া প্রশ্ন করিল—"কোথায় থাক' বড় বউ? সেই থেকে তোমায় খুঁজে খুঁজে নাজে হাল হ'চ্চি!..."

দুই দিককার আগাছার মধ্যে, একজনের যোগ্য এক ফালি রাস্তা; দুই জনেই দাঁড়াইয়া পড়িল। দুই জনেরই ভিজা কাপড়, বড় বৌয়ের কাঁকালে একটা পিতলের ঘড়া। বড় বৌয়ের আড়ালে থাকিলেও রাজু স্বামীকে দেখিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় ভিজা কাপড়ের ঘোমটা তুলিয়া দিল।

বড় বৌ হাসিয়া বলিল—"নাজেহাল হ'চ্চ!—বলি আমায় খুঁজে খুঁজে না আর এক জনাকে গো কত্তা?"

পিছনের মূর্ত্তিটি একটু দুলিয়া আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। মদন গম্ভীর হইয়া বলিল—"তামাসা রাখ, সব সময় তামাসা ভাল লাগে না। তোমাদের ফূর্ত্তি, এদিকে আমার যে সমস্ত দিন কেমনভাবে কাটচে…"

ভাজ মুখটা দুলাইয়া ভ্রূ দুইটা উঁচু করিয়া বলিল—"ও মা তাই নাকি! তা দুটি বোনে একত্তর হ'য়েচি হবে নি একটু ফূর্ত্তি গা?…নাও, এখন পথ ছাড় দিকিন্ মদনমোহন ঠাকুর, রাই বেচারি যে…"

মদন সেইরূপ স্বরেই বলিল—"ও যাক্ না, ওকে কে আটকাচ্চে? তোমার সঙ্গে দরকার, আর এই জায়গাই ভাল, একটা সলা পরামর্শের কথা আছে।… নাও, ওকে যেতে বল"—বলিয়া বন ঘেঁসিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

রাজু কিন্তু নড়িল না। আরও একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া গুটি গুটি সরিয়া সেই খানেই স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। বড় বৌ একবার ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার অবস্থাটা দেখিয়া লইল, তাহার পর আবার দেবরের পানে চাহিয়া বলিল—"তাই কি পারে গা—বরের ঘাড়ের ওপর দিয়ে একা চ'লে যেতে?… কি সলা পরামর্শ? বাড়ি গিয়ে হয় না?"

"ব'লছিলাম—কলকাতায় আমি যেতে লারব।"

ভাজ বিস্মিতভাবে ক্ষণমাত্র মুখের দিকে একবার চাহিল, তাহার পর খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; পিছনের মানুষটির অবস্থা বর্ণনাতীত। মদন একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, তাহার পর রাগিয়া উঠিয়া বলিল—"হাসি!— জান না তো কলকাতা কেমনধারা যায়গা—লোকের স্বভাব চরিত্তির ঠিক রাখা কত শক্ত!"

বড় বৌ চিবুকের একপাশে তর্জ্জনী স্পর্শ করিয়া চক্ষু পাকাইয়া চিন্তিতভাবে বলিল—"ওমা, সত্যিই তো! এতগুলি লোক বাড়িতে, এ কথা কি কেউ ভেবে দেখেচে একবারটি? ভাগ্যিস্ ঠাকুরপো বললে! আর দাদারই বা কি আক্কেল?—নিজে গেছেন গোল্লার দোরে, এখন ছোট ভাইটিকে দ—লে…"

আর গাম্ভীর্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, কথাটা সম্পূর্ণ করাও। বড়বৌ উচ্চ হাস্যে যেন ভাঙিয়া পড়িল একেবারে; রাজু ও যেন আরও কুঁক-ড়াইয়া গেল, কিন্তু তাহারই মধ্যে চাপা হাসিতে ব্রীড়ানত শরীরটাকে যেন ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।

তবুও মেয়েছেলের মন তো ?—তায় সম্বন্ধে ভাজ, তার উপর রাজু কিছু না বলিলেও, তাহার মুখের দিকেও চাহিতে হয় একটু ; বড়বৌ কথাটা পাড়িল খুড় শাশুড়ীর কাছে। অবশ্য কলিকাতার বদনাম দিয়া নয়, অন্যভাবে।

খুড় শাশুড়ীর মনটাও খুঁৎখুৎ করিতেছিল,—তবে নাকি নেহাৎ রোজগারের কথা—এত দিনে, ঠাকুর দেবতার ধর্ণা দিয়া জুটিয়াছে একটা কাজ, তাই দোমনা হইয়াছিল। মানুষটি এ-সব বিষয়ে একটু কড়াও, কিন্তু তবুও মেয়েছেলেই তো? বড়বৌ কথাটা অন্যভাবে পাড়িলেও তাহার আড়ালে ছেলের মনের সন্ধান পাইতে তাহার দেরী হইল না, এদিকে তাহাদের কথাবার্ত্তার সময় বরান্দায়, দুয়ারের আড়ালেও যে একটি মানুষ উৎকর্ণ হইয়া আছে সে আভাসও পাওয়া গেল। বুড়ী কথাটা পাড়িল কর্ত্তার কাছে। অবশ্য বড়বৌয়ের যুক্তি অবলম্বন করিয়া নয়। বলিল—'কুটুমের সাথে বিবাদটা মিটল, এতদিনে বউ পাঠালে, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে সরিয়ে দিলে কিন্তু কথাটা অন্যভাবে দাঁড়াবে নি ?—একে তো ঐ মানুষ সব—ছল ধরবার জন্যে ওৎ পেতেই রয়েচে অষ্টপহর।' বুড়া ঝানু, এই সব মেয়েছেলে লইয়াই তো তাহাকে ঘর করিতে হইয়াছে ? হুঁকার টানের সঙ্গে সঙ্গে চোখ পিট্ পিট্ করিয়া প্রশ্ন করিল—"কুটুমের ভাবনা,—না ?…হুঁ …বলি মদনা বেঁকে ব'সেছে কি না বল দিকিন ?…আর তো ন'ড়তে চাইবে না সে। আর এ্যাদ্দিন যে তার টিকি দেখা যেত না বাড়িতে, তার কি ? তাকে বলে দিও কিন্তু আর আবদার চলবে না। বড় রস হয়েচে, না ?…কোথায় গেল সে ছোঁড়া ?"

মদনা ঢেঁকশালের অন্ধকারে হুঁকা হাতে, তামাক টানা বন্ধ করিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল ; "বেয়াক্কেলে বুড়ো—বাহাত্তরে…" বলিতে বলিতে পা টিপিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

(২)

সব কটাই সমান। বড়বৌয়ের সব কথায় ঠাট্টা, সময় নাই অসময় নাই ঠাট্টা করিয়া বসিলেই হইল। কলিকাতা যে বদ জায়গা—একি নূতন কথা ? গোড়ায় গোড়ায় দাদার কথা মনে নাই ? আজ না হয় দাদা সাধু হইয়াছে—মাসে মাসে টাকা পাঠাইতেছে, কিন্তু আগেকার সেসব দিনের কথা কি ভুলিয়া গিয়াছে

সবাই ?...করুক ঠাট্টা,—একবার গা-জুরি করিয়া পাঠাক সবাই মদনকে কলি-কাতায়—ভাল করিয়া সবাইকে বুঝাইয়া দিবে কলিকাতায় স্বভাবচরিত্র বজায় রাখা দুষ্কর কিনা,—সেও দাদার ভাই।

আর তুই বুড়ী,—জানিস বুড়োর মেজাজ, শ্বশুর বাড়ির কথা তুলিয়া ওর চোখে ধূলো দিতে চাস্ ? তার মানে আর কিছু নয়—এদিকে লোক দেখানি, বলাকে বলাও হইল, অথচ দিব্যি যাতায়াত বন্ধ হইল। উপরে উপরেই মায়া,—পেটের মধ্যে জিলিপির প্যাঁচ!

সবচেয়ে রাগ হইল খুড়োর উপর—মদনা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—পাঠাক্ কলিকাতায় তাহাকে, ইহার পর একবারটি মাত্র সে বাড়ী আসিবে,—শুদ্ধ একবারটি,—বুড়ার শ্রাদ্ধের সময়। আর কলিকাতায় গিয়া কালীঘাটে সুধু এই মানতই করিবে—যেন সে দিনটা শীঘ্র শীঘ্র আসে। এই সব ছ্যাবলা ষড়যন্ত্রী আর একগুঁয়েদের মধ্যে শুধু একটি মানুষের মত মানুষ পাওয়া গেল।—ছোট বৌ রাজু। কী বুদ্ধি। কথার কি বাঁধুনি! সলা পরামর্শ করিতে হয় তো ঐরকম মানুষের সঙ্গে, একটা যে কথা বলিবে তা বেশ ওজন করিয়া—লাখটাকা দাম সে কথার। একবারও কি মনে হয় যে চৌদ্দ-পনের বছরের ছোট মেয়ের কথা?

রাত্রে রাজু বলিল—"বাপের রাগ করবার কথা যে বললেন খুড়ীমা, এতে তানাদের রাগ করবার কি আছে? নিজেদের বউ নিয়ে এসেচেন, তাকে ভাল রাখুন, মন্দ রাখুন, আর বাপ মায়ের কি? তারা তো এনাদের হাতে সঁপে দিয়ে খালাস—এখন এনারা রাজরাণী সোয়ামী সোহাগী ক'রে রাখুন ভাল, বনবাসে দিন, সেও ভাল। ...বনবাস বইকি—তুমিই যদি বাইরে রইলে তো বাড়ি কি আমার বনবাস হ'লো নি? আমিই না হয় চাষা-ভুষোর মেয়ে, কিন্তু মা জানকী কেন রাজপাট ছেড়ে রামচন্দ্রের সঙ্গে বনে গেছলেন? সোয়ামী বিহনে অযোধ্যাই তাঁর বনবাস হবে ব'লে তো? তুমিই যদি কলকাতায় রইলে তো সোনার গাঁ কি আমার বনবাস হ'ল নি! কও কি না?"

বৌয়ের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া মদনের তাক লাগিয়া গেল। ঐ টুকু মেয়ে তাহার বিবেচনা দেখ, শাস্ত্রের জ্ঞান দেখ। যা বলিল তাহার এক বর্ণও কাটুক দেখি কেহ! মদনের মুখে কথা সরিতেছিল না, তবুও সাধ্যমত বুঝাইল; বলিল—"কি করবে বল রাজু, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। কিছুদিন বুক

বেঁধে থাক তুমি। আমি এমন মতলব ঠাউরেচি যে চৌদ্দ বছর দূরে থাক, চৌদ্দ দিনও যাবে না,—ফিরে আসব।"

রাজু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল—"সে এখন বলব না, দেখতেই পাবে; এই রকম ক'রে তোমার কাছছাড়া করা বেরিয়ে যাবে বুড়োর।

রাজু অভিমান ভরে বলিল—"চোদ্দ দিন!—আমি ততদিন বেঁচে থাকব কি-না...ওনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।"

মদন বেচারি ভয় পাইল, এবং মনের কথাটা গোপন করিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—"বিষ খাবে নাকি!"

রাজু বলিল—"বিষ খেতে হবে কেন?—আর পাবই বা কোথায়!—কে আমার এমন বন্ধু আচে যে দয়া করে এনে দেবে!—আমি বলছিনু—যে যাকে ভালবাসে তাকে না দেখতে পেলে একদিনও বাঁচতে পারে কখনও? তুমি বাস না আমায় ভাল তাই চোদ্দ দিন কেন গোটা চোদ্দ বছরও দিব্যি হেসেখেলে বেঁচে থাকতে পার, তার ওপর কলকাতায়, আবার কত মনের মানুষ পাবে খন...তবুও শ্বশুর ঠাকুর বলবেন..."

হঠাৎ একটু চুপ করিয়া গেল, একটু ভাবিল, তাহার পর কতকটা আক্রোশের স্বরে বলিল—"আচ্ছা, শ্বশুর ঠাকুরের কি ও কথাটা বলা ঠিক হল?"

মদন প্রশ্ন করিল—"কোন্ কথা?"

রাজু মদনের মুখ থেকে দৃষ্টিটা সরাইয়া লইল, বলিল—"এই শুনি এত গন্যি মান্যি লোক, গাঁয়ের মোড়ল, ভাইপোকে কি বলা ঠিক হল যে রস হ'য়েচে?"

মদন অভিমত দিল—"ভীমরতি হ'য়েচে, আর বেশীদিন নয়।"

রাজু নিশ্চয় উৎসাহ পাইল। চকিতে একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল—"কে জানে বাপু, আমাদের বাপ খুড়োর মুখে সা'জন্মে ওরকম কথা বেরুত নি। গুরুজন, নিন্দে ক'রতে পারি না, কিন্তু কথাটা ইতরের মত হ'য়েচে,—হেলো চাষীর মুখেই মানায়। কথাটা সত্যি, অবশ্য গুরুজন বলেই কোন অসম্মানের কথা মুয়ে আনতে পারি না—মাথায় থাকুন তিনি..."---বলিয়া গুরুভক্তিতে মাথায় যুক্তকর ঠেকাইল।

মদনও অনুরূপ ভক্তির সহিত কাকার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া মনটা হালকা

করিল। তাহার পর সমস্ত রাত জাগিয়া তুই জনের পরামর্শ হইল—আপাতত যাওয়াটা স্থগিত করা যায় কি করিয়া। কালকের ফাঁড়াটা তো কাটান যাক্, তাহার পর আবার দিন দেখা, আবার তোড়জোড় করা। রাজু বলিল··· ত্যাতদিন চাকরির ফাঁড়াটাও কেটে যেতে পারে। চাকরি, না আমার পাপ সতীন যুটেচে।···ছ'টো পেট তো ?—চলে যাবে এক রকম ক'রে।"

রাজুই সলা দিল—"অসুখের ভান করে পড়ে থেক। অন্য অসুখ নয়—পেটে ফিক্ ব্যাথা।—শ্বশুর তো শ্বশুর, বভ্যিরও বাবার সাধ্যি নেই ধরে।··· দেখেচ মরণ!—পোড়া মুখে সোয়ামীর অসুখের নাম করলুম!"—বলিয়া ডান হাতে তুইটা আঙুল ঠোঁটে ঠেকাইয়া তিনবার কপাল স্পর্শ করিল।

—"কিন্তু খাওয়া বন্ধ হবে না তাতে ?"

সে মুস্কিলের আসানও রাজুরই করতলগত; বলিল—"সে ব্যবস্থা আমার হাতে, তোমার খাওয়া না হ'লে, আমিই কি খেতে পারি ?—বুদ্ধিসুদ্ধি তোমাদের সবারই একটু কম বাপু—তু একজনের যাও বা একটু আচে, শুধু ফিচলেমি।"

এমন লাগসই পরামর্শটাও কিন্তু বুড়ার কাছে টিঁকিল না। সে বধূবর্ণিত ইতর হেলো চাষী ভাষায় বরং আরও একটু শান চড়াইয়া বলিল—"ফিক্ ব্যাথা না ওর গুষ্টির মাথা,—ও যৈবনের রস—ঢের দেখলাম···রোজগার না থাকলে রস কটা দিন টেঁকবে জিগোও দিকিন ওকে। ওকে যেতে হবে, ওসব আবদার খাটবে নাক।"

যাহ'ক মেয়েদের কান্নাকাটিতে সে দিনটা স্থগিত হইল যাওয়াটা। ওরা তুজনে ভাবিল শুভ দিনের ফাঁড়াটা কাটিল, একটু নিশ্চিন্ত হইয়া এবার একটা পাকা রকম খাড়া করিবে।

ঘাঘী বুড়া কিন্তু কখন রাম পণ্ডিতের নিকট গিয়া পরের দিন রাত তিনটের সময় এক মাহেন্দ্রক্ষণের সন্ধান লইয়া আসিল। রাম পণ্ডিত বলিয়া দিয়াছে মদনাকে রাত তেপহরে উঠাইয়া গোয়াল ঘরে যাত্রা করাইয়া রাখিতে হইবে; আর বাড়ি না ঢুকিয়া সেখান হইতেই পরে রওনা হইবে। ভগবতীর ঘর, আর কোন দোষের ভয় থাকিবে না।

এতর পরেও যদি রসের কিছু অবশিষ্ট থাকা সম্ভব ছিল তো সেটুকু গোয়াল

ঘরের মশার পেটে দিয়া মদনা তৃতীয় দিন সকালে আহারাদি করিয়া খুড়ার সঙ্গে কলিকাতা রওনা হইল।

(৩)

কলিকাতায় আসিয়া শুনিল, যে-কাজটা পাইবার আশা ছিল তিন চার দিন দেরি হইয়া যাওয়ায় সেটা বিলি হইয়া গেছে। মদনার দাদা রতন ষ্ট্র্যাণ্ডরোডের জেটিতে পিয়নের কাজ করে, গম্ভীর ভাবে বলিল—"একি তোমার সোনার গাঁ কাকা? এ কলকাতার জেটি, বিলেতের, এ্যামেরিকার জাহাজ যাতায়াত করচে এখান থেকে, একটা ঘণ্টার এদিকে ওদিকে ওলট পালট হ'য়ে যায়—তোমরা দু' দুটো দিনের বিলম্ব ক'রে দিলে—আর কি কাজ পড়ে থাকে?

কাকা একবার মদনার দিকে চাহিল। প্রাণ খুলিয়া রসাধিক্যের কথাটা একবার সোনার গাঁর ভাষায় সালঙ্কারে বলিবার জন্য জিভটা সড়-সড় করিতে-ছিল কিন্তু রতনের ভাষায় কলিকাতার মার্জ্জিত রুচির আঁচ পাইয়া নিরাশ হইয়া থামিয়া গেল।

গোয়ালের যাত্রা যে মাঠে মারা গিয়াছে ইহাতে মদনা মনে মনে খুসী হইল।

বাবু আবার একটা আশা দিয়া রাখিয়াছেন; ঠিক হইল মদনা থাকিয়া যাইবে। বুড়া পরের দিন চলিয়া গেল।

পুল পার হইয়া শালকিয়ার একটি বস্তিতে রতনের বাসা। মাটি দিয়া লেপা ছ্যাঁচাবেড়ার পাশাপাশি দুইটি ছোট কুটুরি; মাথায় টিনের ছাদ। হাত চারেকের একটি উঠান, তার অপর দিকে একটি ছোট রান্না ঘর। উঠানের একদিকে সাহেব বাড়ি থেকে চারা আনিয়া রতন একটি সূর্য্যমুখীর গাছ করিয়াছে, একটা প্রকাণ্ড বেমানান ফুল ফুটিয়া আছে।

সকাল বেলাটা একরকম কাটিয়া যায়। দুই ভাইয়ে মিলিয়া বাজার করিয়া আনে, কুটনা কুটিয়া, বাটনা বাটিয়া, পাথুরে কয়লার উনান জ্বালিয়া খানিকটা গোছ এবং বেশিভাগ অগোছের মধ্যে রান্নাটা সারিয়া লয়; কোথা দিয়া যে সময়টা বহিয়া যায় টেরই পাওয়া যায় না। রতন স্নানাহার সারিয়া ঠিক সাড়ে নয়টার সময় উর্দ্দির বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বাহির হইয়া যায়।

বাহির হয়, মদনকে লইয়া যাইতে পারে না, নচেৎ সঙ্গে লয়। ক্রমে ক্রমে পরিচয় হইতে লাগিল কলিকাতার সঙ্গে—রাজুর মতই কলিকাতা ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন খুলিতেছে—সৌন্দর্যের আবরণ অপসারিত করিতেছে—

—মন্দ নয়···হ্যাঁ—কলিকাতাও যে ভাল এ চিন্তার সঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—রাজু বলিয়াছিল—কলিকাতা তাহার 'সতীন'।···যা অপছন্দ, যার উপর রাগ সে-সবকেই 'সতীন' বলিয়া বসা রাজুর একটা রোগ। চাকরি সতীন, কলিকাতা সতীন, একটু আদর পায় তাই বলদ জোড়াও সতীন, একদিন কাকার উপর রাগিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল—"বুড়ো আমার সতীন"।

অবশ্য তখনই জিভ কাটিয়া, মাথায় যুক্তকর ঠেকাইয়া গুরুজনকে সম্বন্ধবিরুদ্ধ কথার দোষটা খণ্ডাইয়া লইয়াছিল।

ক্রমে এমন হইতে লাগিল যে রতন কাজে লাগিয়া থাকিলে কিম্বা কার্যসম্পর্কে দূরে চলিয়া গেলে মদন একা একাই বাহির হইয়া পড়িতে লাগিল। অনির্দিষ্ট ভাবে এ রাস্তা সে রাস্তা, গংগার ধার, ইডেন গার্ডেন, কোন দিন বা চৌরঙ্গীর খানিকটা বা এদিকে ডালহৌসি স্কোয়ার বা আরও খানিকটা আগাইয়া যায়। রাজুর সতীনের সঙ্গে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,—সতীনের সঙ্গে সঙ্গে মনটা ক্রমাগত আরও বেশি করিয়াই যেন রাজুর জন্য লালায়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। হইতে পারে ট্রাম, বাস, পার্ক, ভিড়, চিনাবাদাম, সরবৎ সব একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে, কিম্বা হইতে পারে সময়ের দিক দিয়া ব্যবধানটা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে টান পড়িতেছে বেশি—মোট কথা দিন দিনই রাজুকে না দেখিতে পাওয়াটা যেন অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল মদনার কাছে। ভিতর থেকে এমন একটা মূক, ব্যাকুল ক্ষুধা জাগিয়া উঠিতে লাগিল যাহাকে শুধু কল্পনার প্রবঞ্চনা দিয়া আর ঠেকান যায় না। এই চক্ষু দিয়া দেখা যায়, এই হাত দিয়া স্পর্শ করা যায় এমন স্পষ্ট, সন্দেহলেশহীন রাজুর জন্য মনটা যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল।

একবার মনে করিল বাড়ি পলাইবে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখিল তাহাতে তিনটি বড় বড় অন্তরায় আছে। প্রথমত

পয়সার অভাব। আনা সাতেক পয়সা তাহার কাছে আছে, তাহাতে ফোড়নও হইবে না।

দ্বিতীয়ত, পহুঁছিলেও কাকার প্রহারের ভয় আছে। রাজু আসিয়া অবধি কাকা অনেকটা সংযত বটে, তবু অমন রগচটা লোককে একেবারে অতটা চটাইতে সাহস হয় না। তৃতীয় অন্তরায়টা আরও গুরুতর।—মদনা আসিবার সময় রাজুকে স্তোক দিয়া আসিয়াছে যে প্রথম চাকরি করিয়া সে তাহার জন্য গহনা লইয়া আসিবে। রাজুর কাছ থেকে খিল দেওয়া চারগাছা রূপার চুড়ি আনিয়াছে, দুইটা মাথার কাঁটা আনিয়াছে, রূপার কণ্ঠী আনিয়াছে, হাল ফ্যাশান মত সব সোনার পাতে মুড়িয়া লইয়া যাইবে। এমন কি, শুধু মদনার ফরমাসে রাত্রে যে কেমিকেল সোনার নথটা পরিত রাজু—ছেলেপিলে হইলে সেটা প্রকাশ্যে পরিবে, সেটি পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে,—বামনদের বউ বলিয়াছে কলিকাতায় মোটা করিয়া সোনার জল দেয়, যাইবার সময় মদনা ঠিক করিয়া লইয়া যাইবে। এ-সব না ব্যবস্থা করিয়া কি ভাবে যায় সে ?

এই পাঁচরকম চিন্তায়,—আকাঙ্ক্ষার পাশে পাশে নানারকম প্রতিবন্ধকে মনটা বড় অস্থির হইয়া আছে, কিছু ভাল লাগিতেছে না।

সেদিন দাদার সঙ্গে আফিসে গিয়া মদনা খানিকটা উস্‌খুস্ করিয়া কাটাইল, তাহার পর রতনকে কিছু না বলিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। বিশেষ কিছু গন্তব্য স্থির নাই। রাজু আর তাহার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে, তাহার মধ্যে দাদার খুব বেশি রকম হাত ; বাড়ি যাইতে না পারুক, কিন্তু এতে যে দাদাকে বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতে হইবে এর মধ্যে প্রতিশোধের খানিকটা আস্বাদ পাইল মদনা। শুধু ঐটুকুই নয়,—এর পর যখন অনুতপ্ত হইয়া দাদা, কাকা বাড়ি যাইবার জন্য জেদাজেদি করিবে, খুড়ীমা, বড় বৌ কান্নাকাটি জুড়িয়া দিবে, সে কলিকাতা ছাড়িয়া এক পাও নড়িবে না।…ওরা সব মদনাকে ভাবে কি ?

কথাগুলা যতই বিনাইয়া-বিনাইয়া ভাবিতে লাগিল, মনের কোন্ এক জায়গায় রাজুর মুখখানা ততই যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ-গলি সে-গলি, এ-রাস্তা সে-রাস্তা, এ-পার্ক সে-পার্ক করিয়া সারা দিনমান কোথায় কোথায় সে ঘুরিল শেষ পর্যন্ত কোন হিসাবই রহিল না।

ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পানে-সরবতে গোটা ন'য়েক পয়সা খরচ হইয়া গেল। বিকালের দিকে আসিয়া মদনা গোল দিঘিতে পহুঁছিল।

এখানে আসিয়া মদনার একটা জিনিস চোখে পড়িল যাহাতে কলিকাতার একঘেয়েমিটা অনেকদিন পরে কাটিল খানিকটা—পার্কের লোহার বেড়ার গায়ে গায়ে একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত রাশীকৃত ছবি টাঙান, বিচিত্র রঙের জলুসে সমস্ত জায়গাটা যেন আলো করিয়া আছে। কিছু ঠাকুরদেবতার ছবি আছে কিন্তু অধিকাংশই নানা বেশে, নানা ভঙ্গিতে, নানারকম মেয়ের ছবি; দু'একটা চেনাও, দাদার সঙ্গে একদিন বায়স্কোপে গিয়া দেখিয়াছিল যেন।

ছবিগুলা রাজুর কথা মনে করাইয়া দিতে লাগিল, কি রাজুর কথা ভুলাইয়া দিতেই লাগিল বলিতে পারা যায় না, তবে মদনা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া খুব গভীর তৃপ্তির সহিত ছবিগুলা দেখিয়া যাইতে লাগিল এবং অবশেষে একটা ছবির সামনে আসিয়া হঠাৎ বিস্মিত ভাবে দাঁড়াইয়া পড়িল।

ছবিটা অন্যান্য ছবিগুলার চেয়ে ঢের বড়, স্বধু একটি মেয়েই আছে; পুকুর, গাছপালা কি টেবিল-চেয়ারে জায়গা ভরিয়া দেয় নাই। মেয়েটি ভিজা কাপড় পরা, কাঁধে একটা গামছা ফেলিয়া ঈষৎ নতমুখে দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাপারটা এমন কিছুই মারাত্মক নয়, তবে কথা হইতেছে মুখে, গড়নে মেয়েটার রাজুর সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে। সেদিন খিড়কির পুকুরের রাস্তায় রাজু ফিরিয়া না দাঁড়াইয়া যদি সোজাসুজিই দাঁড়াইত তো কতকটা ঠিক এই রকম দেখিতে হইত নিশ্চয়।...মদনা অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিল। একবার সামনে খানিকটা আগাইয়া গেল, আবার ফিরিয়া আসিল, দাঁতে বুড়া আঙুলের নখ খুঁটিতে খুঁটিতে একটু পায়চারি করিল তাহার পর উৎসুক কুণ্ঠার সহিত আসিয়া ছবির বিক্রেতাকে প্রশ্ন করিল—"কততে হবে এটা।"

"ছ' আনা।"

মদন পকেট দুইটা হাতে উজাড় করিয়া পয়সা আনি যা ছিল সব বাহির করিল, গুণিয়া নিরাশভাবে দোকানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"তিনটে পয়সা ক'মচে যে— ?"

"আচ্ছা, হবে, দে"—বলিয়া দোকানী পয়সাটা লইয়া—ছবিটা গুটাইয়া হাতে দিয়া দিল।

তাহার পরদিন মদনা আর দাদার সঙ্গে আফিসে বাহির হইল না, একটা ছুতা করিয়া বাড়ি থাকিয়া গেল।

কয়েকদিন হইতে ভাইয়ের আচরণ যেন কেমন বোধ হইতেছে।—আজ বাড়ি থাকিয়া যাইবার জন্য ছুতাটাও যে করিল সেটা তেমন সন্তোষজনক নয়। কি মতলব আঁটিতেছে মদনা?—পলাইবে না তো? কিম্বা অন্য আরও কিছু মতলব নাই তো ভিতরে ভিতরে…আচ্ছা মুস্কিল!—সম্বন্ধবিরুদ্ধ হয়, খুলিয়া কিছু বলাও যায় না, কিন্তু বিবাহ কি কেহ করে না এক মদনাই করিয়াছে? প্রায় গোটা দু'ইয়ের সময় চিঠি বিলি করিতে বাহির হইয়া রতন বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়ারটা খোলাই ছিল, কতকটা ভয়ে, কতকটা কৌতূহলে রতন বাড়িতে প্রবেশ করিল। তাহার পর ব্যাপার দেখিয়া তাহার বুদ্ধিসুদ্ধি যেন লোপ পাইল একেবারে।—উঠানের দিকে পিছন ফিরিয়া কাৎ হইয়া শুইয়া মদন দেয়ালে টাঙান একটা ছবির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে, রতন দেয়ালের আড়াল হইয়া বিস্মিত কৌতূহলে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল।—

ছবিটার কাগজ ফুঁড়িয়া হাতে চারগাছা রূপার চুড়ি পরান, চুলে দুইটা কাঁটা, গলায় একটি রূপার কণ্ঠী, নাকে একটি প্রকাণ্ড নথ। এদিকে মদনার নিজের বাঁ হাতে সূর্যমুখী ফুলের পাপড়ি দিয়া গাঁথা একছড়া মালা। ছবিটা মন্দ নয়, কিন্তু তিন চারগুণ বড় ফাঁদের গয়নাতে গয়নাতে যেন বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে। কার গয়না এসব? কী-ই বা এত দেখিতেছে মদনা? ছোঁড়ার কি চরিত্র বিগড়াইল দুইদিন কলিকাতা আসিয়াই; না বৌ-কে দেখিতে না পাইয়া একেবারে মাথাই বিগড়াইয়া গেল?

রতন তেমনি পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া গেল। তাহার পর রাস্তা হইতে একবার সাড়া দিল—"মদনা আচিস্ তো ভেতরে?"

সালঙ্কারা চিত্রটিকে সামলাইয়া লইবার মত একটু সময় দিয়া প্রবেশ করিল, বলিল—"আবার কোণ নিয়ে পড়ে থাকতে লেগেচিস তো? কাকা, বড়বৌ এদের জন্যে যদি মনটা এতই খারাপ হ'য়ে থাকে তো না হয় ঘুরে আয় বাপু তুই একবার। বড়বৌও লিখেচে বড্ড করে…যা; চিঠিটা এলাম আবার আফিসে ভুলে— তা'হলে কালই যাবি?"

মদনা একেবারে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মনের আবেগটা সাধ্যমত চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিয়া বলিল—"একবার গেলে হ'ত দাদা ; মানে, আর কিছু না—কাল রাত্তিরে কাকার স্বপ্ন দেখে মনটা এত্তো খারাপ হ'য়ে আচে যে··· চাকরির জোগাড় হ'লেই কিন্তু তুমি সঙ্গে সঙ্গে খবর দিও···"

দাদা একটা শ্লেষ এবং দুঃখের হাসিকে অতিকষ্টে নিরোধ করিল। মনে মনে বলিল—'আর চাকরি !—যে চাকরির পাল্লায় এখন···'

—সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ কথাটা আর শেষ করিল না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ন্যায়মতে আত্মবাদ (২)*

নৈয়ায়িক পূর্বে (কারিকা ১৮২) বলিয়াছিলেন যে "আত্মা" বলিয়া যখন একটি পৃথক্ পদ রহিয়াছে তখন তদনুরূপ একটি বিশেষ বস্তুও থাকা উচিত। তাহার উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন :—

বুদ্ধিচিত্তাদিশব্দানাং ব্যতিরিক্তাভিধায়িতা।
নৈবৈকপদভাবেঽপি পর্যায়াণাং সমস্তি নঃ ॥ ২০২ ॥
অতোঽনৈকান্তিকো হেতুর্নন্বুক্তং তদ্বিশেষণম্।
উচ্যতে নৈব সিদ্ধং তচ্চেতঃ পর্যায়তাস্থিতেঃ ॥ ২০৩ ॥
অহংকারাশ্রয়ত্বেন চিত্তমাত্মেতি গীয়তে।
সংবৃত্ত্যা বস্তুবৃত্ত্যা তু বিষয়োঽস্য ন বিদ্যতে ॥ ২০৪ ॥

অর্থাৎ "বুদ্ধি", "চিত্ত" প্রভৃতি সমপর্যায়ের শব্দ ; কিন্তু এগুলির প্রত্যেকটি যখন পৃথক্ পদ তখন (পূর্বপক্ষীর কথা সত্য হইলে) প্রত্যেকটিই কোন বিশেষ পৃথক্ বস্তুর অভিধায়ক হইবে (ব্যতিরিক্তাভিধায়িতা)! কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত হেতু হইল অনৈকান্তিক। পূর্বপক্ষী যে (১৮৩ কারিকায়) বিশেষণ স্বরূপ আবার বলিয়াছেন "বুদ্ধীন্দ্রিয়াদি শব্দের পর্যায়ভুক্ত নহে বলিয়া যাহা সুনির্ধারিত"—তাহা অসিদ্ধ, কারণ চেতনা বাস্তবিকই (আত্মার সহিত) সমপর্যায়ের শব্দ। চেতনা অহংকারের আশ্রয় হইয়া পড়িলেই তাহা মায়ার বশে (সংবৃত্ত্যা) আত্মা বলিয়া প্রখ্যাত হয় ; প্রকৃতপক্ষে (বস্তুবৃত্ত্যা) কিন্তু এই আত্মার কোন অস্তিত্বই নাই।

কমলশীল এই কারিকাত্রয়ের অর্থ বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। পৃথক্ পদ থাকিলেও যে তদনুযায়ী পৃথক্ বস্তু নাও থাকিতে পারে—তাহাই দেখান এখানে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। "বুদ্ধি", "চিত্ত" ও "জ্ঞান" হইল সমপর্যায়ের শব্দ ; সেইরূপ "ইন্দ্রিয়" ও "অক্ষ" হইল সমপর্যায়ের ; "বেদনা" ও

* Prabodh Basu Mullick Fellowship Lecture No. 11.

“চিৎ” সমপর্যায়ের, এবং “তনু”, “কায়” ও “শরীর” হইল একই পর্যায়ের অন্তর্গত। এই শব্দগুলির প্রত্যেকটি একটি পৃথক্ পদ হইলেও সমপর্যায়ের শব্দগুলির অর্থ কিন্তু অভিন্ন। সুতরাং পূর্বপক্ষী শব্দপ্রয়োগ হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন তাহার বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়াও অসম্ভব নহে (বিপক্ষাদ্ব্যাবৃত্ত্যসিদ্ধেরনৈকান্তিকত্বম্)।

পূর্বপক্ষী কিন্তু এখনও বলিতে পারেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে প্রত্যেক শব্দের অনুযায়ী একটি বিশেষ পদার্থ থাকিবে। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, যে-সকল শব্দের সমার্থক অপর কোন শব্দ নাই সেই সকল শব্দের অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে অনৈকান্তিকতা দোষ থাকিতে পারে না। ইহার উত্তরে বৌদ্ধ বলিতেছেন যে ইহাতেও পূর্বপক্ষীর কোন সুবিধা হইবে না। তাঁহার প্রযুক্ত হেতুর এই বিশেষণটি (সিদ্ধপর্যায়-ভিন্ন) এক্ষেত্রে অসিদ্ধ, কারণ “আত্মা” হইল বাস্তবিকই “চেতনার” সহিত সমপর্যায়ের শব্দ। কথিত হইয়াছে যে চেতনাই অহংকারের আশ্রয়স্বরূপ হইলে আত্মা বলিয়া কথিত হয়। উদ্দ্যোতকর যে বলিয়াছেন মুখ্য পদার্থ না থাকিলে উপচারই সম্ভব হয় না, তাহা হইতে কেবল বুঝিতে হইবে যে তিনি অভিপ্রেত বিষয়টিই বুঝিতে পারেন নাই।—একটি বস্তুকে আর এক বস্তু মনে করার নামই “উপচার”। ঘটকে যদি পট মনে হয় তবে পট হইবে মুখ্য, ঘট হইবে গৌণ, এবং ঘটত্বে পটত্বের ভ্রান্ত আরোপের নাম হইবে উপচার। ন্যায়াচার্য উদ্দ্যোতকরের মতে মুখ্য পদার্থ না থাকিলে উপচারই সম্ভব নয়; সুতরাং চেতনায় আত্মার উপচার স্বীকার করিলেই আত্মাও স্বীকার করা হইল। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে কোন প্রকার উপচারের সম্ভাবনাই স্বীকার করেন না তাহা পূর্বেই স্থিরমতির ত্রিংশিকা-ভাষ্যের আলোচনায় দেখাইয়াছি। চেতনায় আত্মার উপচার হয় বলিয়া উদ্দ্যোতকর আত্মা স্বীকার করিয়াছেন, এবং বৌদ্ধ কমলশীল এই জন্যই তাঁহার প্রতি এখানে কটাক্ষ করিয়াছেন।

পূর্বপক্ষীর যুক্তির অনৈকান্তিকতা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহার মূলে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে ভ্রান্তজ্ঞানপ্রসূত আত্মা (সংবৃত্ত্যা) বাস্তবিকই বিচারের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু যদি বলা যায় যে আত্মা পারমার্থিক অর্থেও বুদ্ধ্যাদি হইতে পৃথক্ একটি বিশিষ্ট পদার্থ তাহা হইলে অনুমানের দ্বারা ব্যাপ্তি

বাধিত হওয়ায় যুক্তিটি অসিদ্ধ হইয়া পড়িবে। এই উদ্দেশ্যেই কারিকায় বলা হইয়াছে "বস্তুবৃত্ত্যা তু বিষয়োঽস্য ন বিদ্যতে।" কারণ পরে দেখান হইবে যে প্রত্যেক শব্দেই তাহার অর্থ বাহির হইতে আরোপিত হয় মাত্র (অধ্যারোপিতার্থ-বিষয়ত্বাৎ)। সুতরাং এই "আত্মা"-শব্দের প্রকৃতপক্ষে আপন অর্থ কিছু নাই। এ অবস্থায় হেতুর সহিত সাধ্যের ব্যাপ্তিই থাকিতে পারে না।

যে-সকল নামের সমপর্যায়ের আর কোন শব্দ নাই সেই সকল নাম হইতেও যে তদনুরূপ বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব অনুমান করা যায় না তাহাই দেখাইবার জন্য এইবার বলা হইতেছে ঃ—

নভস্তলারবিন্দাদৌ যদেকং বিনিবেশ্যতে।
কারকাদিপদং তেন ব্যভিচারোঽপি দৃশ্যতে॥ ২০৫॥

অর্থাৎ, আকাশকুসুমাদি যে-সকল বস্তুর কোন অস্তিত্বই নাই তাহাদেরও যদি "কারক" প্রভৃতি নাম দেওয়া যায় এবং সেই সকল নামের সমপর্যায়ের আর কোন শব্দ না থাকে, তাহা হইলে "কারক" প্রভৃতি বাস্তবিকই একপদ হইয়া পড়িবে। কিন্তু তাহা হইতে কি এই অনুমান সুসিদ্ধ হইবে যে আকাশকুসুমেরও প্রকৃত অস্তিত্ব আছে?—আপত্তি উঠিতে পারে যে আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় সম্পূর্ণ অলীক পদার্থে কারকাদি অর্থব্যঞ্জক নাম প্রয়োগ করা হইতে পারে না; ইহারই উত্তরে পরবর্তী কারিকায় বলা হইতেছে ঃ—

সংকেতমাত্রভাবিন্যো বাচঃ কুত্র ন সঙ্গতাঃ।
নৈবাত্মাদিপদানাং চ প্রকৃত্যার্থপ্রকাশনম্॥ ২০৬॥

অর্থাৎ, শব্দ প্রকৃতপক্ষে সঙ্কেত ভিন্ন আর কিছুই নহে; এ-অবস্থায় যে-কোন অর্থে যে-কোন শব্দ ব্যবহার করা চলিবে না কেন? "আত্মা" প্রভৃতি পদও আপনা হইতে কোন অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না।—কমলশীল তাঁহার টিপ্পনীতে আরও বলিয়াছেন, আলোচ্যমান পৃথক্ পদটি অসাধারণ (অসাময়িক) হইলেও তাহা হইতে প্রকৃত কোন পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপিত হইতে পারে না, কারণ শব্দ যে-প্রকারেরই হউক না কেন তাহা সঙ্কেত মাত্র, এবং আপনা হইতে কোন অর্থ প্রকাশ করিবার ক্ষমতাই শব্দের নাই। নতুবা যে-ব্যক্তি শব্দার্থ শিক্ষা করে নাই সেই ব্যক্তিও সকল শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিত, এবং

যে কোন উদ্দেশ্যে যে কোন শব্দ ব্যবহার না করারও সার্থকতা থাকিত না (স্বেচ্ছয়া চ নিয়োগাভাবপ্রসঙ্গাৎ)। শব্দের সাঙ্কেতিকত্বও এ-স্থলে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে "আত্মা" প্রভৃতি শব্দের আপন কোন অর্থই নাই ; অতএব "আত্মা" শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন যে আত্মা না থাকিলে শরীরে শ্বাসপ্রশ্বাস সম্ভব হইবে না (কারিকা ১৮৪)। তাহারই উত্তরে এখন বলা হইতেছে ঃ—

প্রাণাদীনাং চ সম্বন্ধো যদি সিদ্ধঃ সহাত্মনা।
ভবেত্তদা প্রসঙ্গোঽয়ং যুজ্যতেঽসঙ্গতোঽন্যথা ॥ ২০৭ ॥
ন বন্ধ্যাসুতশূন্যত্বে জীবদ্দেহঃ প্রসজ্যতে।
প্রাণাদিবিরহে হ্যেবং তবাপ্যেতৎ প্রসঞ্জনম্ ॥ ২০৮ ॥

অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত আত্মার সম্বন্ধ যদি সিদ্ধ হয় তবেই পূর্বপক্ষী এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারেন ; নতুবা তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়িবে। হয় দেখাইতে হইবে যে শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে ; না হয় প্রমাণ করিতে হইবে এতদ্দ্বয়ের একটি অপরটি হইতে উদ্ভূত। কেবল তাহা হইলেই পূর্বপক্ষী বলিতে পারিবেন যে শরীরে আত্মার বিনাশ ঘটিলে তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের নিবৃত্তি ঘটে। নতুবা পরস্পর সম্বন্ধশূন্য এই দুইটি পদার্থের একটির নিবৃত্তিতে অপরটিরও নিবৃত্তি ঘটে—এইরূপ অনুমানে অতিপ্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী ; বন্ধ্যাপুত্র অসম্ভব বলিয়াই কি তাহার সহিত অসম্বদ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাসও অসম্ভব ? পূর্বপক্ষীর যুক্তি কিন্তু ঠিক এইরূপ (তবাপ্যেতৎ প্রসঞ্জনম্)। যতক্ষণ না শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি অগ্রাহ্য। কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসাদির সহিত যে আত্মার বাস্তবিকই কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই তাহাই দেখাইবার জন্য বলা হইতেছে ঃ—

ন তাবদিহ তাদাত্ম্যং ভেদাঙ্গীকরণাদ্বয়োঃ।
কার্যকারণতা নাপি যৌগপদ্যপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২০৯ ॥
তদাত্মনো নিবৃত্তৌ হি তৎসম্বন্ধবিবর্জিতাঃ।
কিমমী বিনিবর্তন্তে প্রাণাপানাদয়স্তনোঃ ॥ ২১০ ॥

অর্থাৎ, আত্মার সহিত শ্বাসপ্রশ্বাসাদির তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকিতেই পারে না, যেহেতু এতদ্দ্বয়ের ভেদ স্বীকৃত হইয়াই থাকে ; এবং কার্যকারণ সম্বন্ধও এখানে হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে আত্মার ও শ্বাসপ্রশ্বাসাদির যৌগপদ্য সম্ভব হইত না। এ-ক্ষেত্রে কিরূপে বলা যায় যে আত্মা নিবৃত্ত হইলেই তাহার সহিত সম্বন্ধবিহীন শরীরস্থ প্রাণাপানাদিও নিবৃত্ত হয়?—আত্মার সহিত প্রাণাপানাদির তাদাত্ম্য যে কেন সম্ভব নয় তাহাই বুঝাইবার জন্য কমলশীল বলিয়াছেন, প্রাণাদি হইল অনিত্য, অসর্বব্যাপী এবং মূর্তিবিশিষ্ট ; আত্মা কিন্তু ইহার বিপরীত। আত্মা হইতে প্রাণাদির উৎপত্তিও সম্ভব নয়, কারণ প্রাণাদির সম্যক্ কারণ আত্মা যখন উপস্থিত রহিয়াছে তখন সকল শ্বাসপ্রশ্বাস এক সঙ্গেই ঘটিয়া যাইবে। সুতরাং আত্মার সহিত প্রাণাদির তাদাত্ম্য সম্বন্ধও নাই, এবং ইহাদের একটি হইতে অপরটির উৎপত্তিও হইয়া থাকিতে পারে না। এই দুইটি ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধও নাই (ন চৈতদ্ব্যতিরেকেণ সংবন্ধান্তরমস্তি)।* এ-ক্ষেত্রে জীবন্ত দেহ হইতে আত্মা বিযুক্ত হইলেই সেই আত্মার সহিত সম্বন্ধরহিত প্রাণাদিও নিবৃত্ত হইবে কেন? সুতরাং বুঝা যাইতেছে, পূর্বপক্ষী যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা অনৈকান্তিক। পূর্বপক্ষী যে ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ, জ্ঞান প্রভৃতিকেও আত্মার প্রমাণরূপে উপস্থিত করিয়াছিলেন—তাহাও এতদ্দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইল, কারণ শ্বাসপ্রশ্বাসের ন্যায় ইহাদেরও আত্মার সহিত কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। এই অনুমানের প্রয়োগটি এইরূপ :—যে-সকল বস্তু যে-বিষয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে সে-সকল বস্তু সেই বিষয়ের দ্যোতক (গমকাঃ) হইতে পারে না ; বলাকাদি হইতে যেমন তিলাদি সম্বন্ধে অনুমান করা যায় না ; শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই ; সুতরাং এ-ক্ষেত্রে ব্যাপকেরই উপলব্ধি হইতেছে না।

আত্মার সহিত শ্বাসাদির সম্বন্ধ প্রমাণ করিবার জন্য পূর্বপক্ষী এখনও বলিতে পারেন যে তাদাত্ম্য বা তদুৎপত্তি সম্বন্ধ না থাকিলেও, করণের জ্ঞান হইতে কর্তার জ্ঞান জন্মায় ; এক্ষেত্রেও এই প্রকার করণের জ্ঞান হইতে কর্তা

* তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি ভিন্ন অপর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না—এ-কথা কমলশীল কিরূপে বলিলেন বুঝা যায় না। হয়তো তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে এতদ্দ্বয়ের অঙ্গতার ব্যতিরেকে কোন প্রকার সম্বন্ধই সম্ভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলে কেবল "সংবন্ধ" না বলিয়া "সংবন্ধান্তর" বলা হইয়াছে কেন?

সম্বন্ধে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু এ কথাও অযথার্থ। কারণ চক্ষুরাদি পারমার্থিক অর্থে করণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, যেহেতু বিজ্ঞান উৎপন্ন করিতে সকল করণেরই সমান হেতুভাব থাকে এবং কর্তা ও করণের পার্থক্য স্বেচ্ছাকল্পিত মাত্র। পূর্বপক্ষী যদি বলিতে চাহেন যে আত্মা এইরূপ কর্তা মাত্র, তাহা হইলে আর কোন বিবাদই নাই, কারণ পরিকল্পিত কর্তা বৌদ্ধও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি নৈয়ায়িক পারমার্থিক অর্থে আত্মার কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে চাহেন তাহা হইলে কিন্তু অনৈকান্তিকতা দোষ অপরিহার্য, কারণ ঐ প্রকার আত্মার সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহা প্রমাণ করা যায় না (প্রতিবন্ধাসিদ্ধেঃ)।

পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন (কারিকা ১৮৫) সদ্যোজাত শিশুতে যে জ্ঞাতা বর্তমান, শিশু বৃদ্ধে পরিণত হইলেও সেই জ্ঞাতাই (অর্থাৎ, আত্মা) দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে তদুত্তরে বলা হইতেছে ঃ—

এবং চ সাধনৈঃ সর্বৈরাত্মসত্তাপ্রসিদ্ধিতঃ।
নিত্যব্যাপিত্বয়োরুক্তং সাধ্যহীনং নিদর্শনম্॥ ২১১॥

অর্থাৎ, প্রমাণের দ্বারা আত্মার অস্তিত্বই যখন সিদ্ধ হইতেছে না তখন সেই আত্মার নিত্যত্ব ও সর্বব্যাপিত্বের নিদর্শন সাধ্যবিহীন হইয়া পড়িতেছে (absence of probandum in the probans)।—কমলশীল ইহার উপর কেবল মাত্র বলিয়াছেন, শিশু বয়োলাভ করিলেও যে তাহার পরবর্তী জ্ঞান-গুলিকেও সে সমভাবে "আমার" বলিয়া মনে করে এবং তাহার পরিবর্তিত শরীর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই ভাবে—এই সকল হেতুর সহিত সাধ্যবিষয়ের কোন যোগ নাই (সাধ্যধর্মবিকলতা) ; সুতরাং তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব যে প্রমাণিত হইবেই তাহা বলা যায় না (অনৈকান্তিকতা)।

উদ্দ্যোতকর ও ভাবিবিক্তাদির মত লক্ষ্য করিয়া এইবার বলা হইতেছে ঃ—

অন্যৈঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বমাত্মনঃ পরিকল্পিতম্।
স্বসংবেদ্যো হ্যহংকারস্তস্যাত্মা বিষয়ো মতঃ॥ ২১২॥

অর্থাৎ, অপরে (উদ্দ্যোতকরাদি) মনে করিয়া থাকেন যে আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; কারণ অহংবুদ্ধি আপনা হইতেই অনুভূত হয় (স্বসংবেদ্য) ; এই

অহংবুদ্ধিরই বিষয় হইল আত্মা। "আমি" বলিতে আত্মা ভিন্ন আর কিছুই বুঝাইতে পারে না। আত্মার প্রত্যক্ষত্ব সম্বন্ধে উদ্দ্যোতকরের উক্তি কমলশীল আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ—মানুষের অহংজ্ঞান হইল এমন একটি পদার্থ যাহার অস্তিত্ব অনুমানের জন্য স্মৃতির সাহায্যে তদ্বিষয়ক লক্ষণের সহিত সেই পদার্থটির সংযোগ সাধন করিবার প্রয়োজন হয় না (লিঙ্গলিঙ্গিসংবন্ধস্মৃত্যনপেক্ষম্); সুতরাং রূপাদির জ্ঞানের ন্যায় ইহা প্রত্যক্ষ। রূপাদি এই অহংজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না কারণ অহংজ্ঞান রূপাদির জ্ঞান হইতে ভিন্ন রূপে প্রতিভাসিত হয়। সুতরাং এই অহংবুদ্ধির বিষয় রূপাদি হইতে পৃথক্ কিছু হইতে বাধ্য।—ইহাই হইল আত্মা সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের প্রধান যুক্তি। ইহার উত্তরে শান্তরক্ষিত যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—

> তদযুক্তমহংকারে তদ্রূপানবভাসনাৎ।
> ন হি নিত্যবিভুত্বাদিনির্ভাসস্তত্র লক্ষ্যতে ॥ ২১৩ ॥
> গৌরবর্ণাদিনির্ভাসো ব্যক্তং তত্র তু বিদ্যতে।
> তৎস্বভাবো ন চাত্মেষ্টো নায়ং তদ্বিষয়স্ততঃ ॥ ২১৪ ॥

অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর কথা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ আত্মার রূপ অহংকারে প্রতিভাসিত হয় না; আত্মার তথাকথিত নিত্যত্ব ও বিভুত্বাদি ধর্মও সেই অহংবুদ্ধিতে দেখা যায় না। অহংবুদ্ধিতে গৌরবর্ণাদির নির্ভাস স্পষ্টই বর্তমান; কিন্তু পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন না যে এই গৌরবর্ণাদিই হইল আত্মার স্বভাব। অতএব আত্মা অহংবুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না।—কমলশীল এই কারিকাদ্বয়ের অর্থ বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন ঃ—

আত্মাই যে অহংকারের বিষয় একথা অসিদ্ধ, কারণ অহংকারে আত্মার আকার অবর্তমান। যে বস্তুতে যে বস্তুর আকার নাই সেই বস্তু কখনও সেই বস্তুর বিষয় হইতে পারে না; শব্দ যেমন কখনই দৃষ্টিজ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। অহংবুদ্ধিতে কিন্তু আত্মার আকার দেখিতে পাওয়া যায় না: সুতরাং এই অহংবুদ্ধিকে আত্মার বিষয় বলিয়া মনে করিলে ব্যাপকের অনুপলব্ধি ঘটিবে।

ঐই যুক্তি যে অসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ অহংবুদ্ধিতে যে বাস্তবিকই আত্মার আকার নাই, তাহাই দেখাইবার জন্য কারিকায় বলা হইয়াছে "ন হি নিত্যবিভুত্বাদি-নির্ভাসস্তত্র লক্ষ্যতে"। পূর্বপক্ষীর মতে আত্মা নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সচেতনত্ব প্রভৃতি গুণসম্পন্ন; কিন্তু আত্মারই তথাকথিত বিষয় যে অহংবুদ্ধি,—তাহার মধ্যে কিন্তু এইসব গুণের প্রতিভাস (manifestation) দেখিতে পাওয়া যায় না। অহংবুদ্ধিতে প্রকৃতপক্ষে যে-সব প্রতিভাস দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি সবই "আমি গৌরবর্ণ", "আমার চোখ খারাপ", "আমি কৃশ", "আমি তীব্র বেদনায় কষ্ট পাইতেছি"—এই প্রকারের; এইগুলির সবই কিন্তু দেহাদির বিশেষ বিশেষ অবস্থার সংস্পর্শে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে দেহাদির বিশেষ অবস্থার সম্পর্কে যে অহংবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে দেহই হইল তাহার বিষয়, তদ্ব্যতিরিক্ত কোন আত্মা নহে।

উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি বলিয়াছেন যে সুখদুঃখাদির অনুভবক্ষেত্র যে শরীর—তাহাতেই ভ্রমক্রমে আত্মা আরোপিত হইয়া থাকে (উপভোগায়তনে শরীরেঽয়মাত্মোপচারঃ), অনুকূল ভৃত্য সম্বন্ধে রাজা যেমন বলিয়া থাকেন "আমিও যে আমার ভৃত্যও সে"। এই যুক্তি কিন্তু প্রত্যাখ্যেয়। শরীরাদিতে আত্মার আরোপ যদি গৌণার্থে হয় তাহা হইলে স্পষ্টতই ইহা ভ্রম। মাণবকত্বে সিংহত্বের আরোপ করিয়া লোকে সিংহমাণবকের কথা বলিয়া থাকে সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি সিংহ এবং মাণবক এই উভয় সম্বন্ধেই লোকে সমভাবে বলিতে পারে না "ইহাই সিংহ"।

পূর্বপক্ষী এখনও বলিতে পারেন, আত্মা যে শরীর হইতে পৃথক্‌রূপে কথিত হয় না একথা সত্য নহে, কারণ তাহা হইলে লোকে কেবল "শরীর" না বলিয়া "আমার শরীর" বলিবে কেন? ইহা হইতেই বুঝা যায় যে অহংবুদ্ধি শরীরাদিতেই নিবদ্ধ নহে (স্খলদ্‌বৃত্তিরহংকারঃ শরীরাদিষু)। কিন্তু এ-যুক্তিও ঠিক নহে, কারণ আত্মা-সম্বন্ধেও লোকে বিশেষ করিয়া "আমার আত্মা"র কথা বলিয়া থাকে। এ-জন্য কি আত্মারও আবার এক আত্মা অনুমান করিতে হইবে? যদি বলা যায় যে আত্মা হইতে "আমার আত্মা" প্রভৃতির ভেদ কাল্পনিক মাত্র, তাহা হইলে শরীর ও "আমার শরীরের" ভেদই বা কাল্পনিক হইতে বাধা কি?

পূর্বপক্ষী যদি প্রশ্ন করেন, "আমি গৌরবর্ণ" ইত্যাদি প্রত্যয় গৌণ না

হইয়া মুখ্য হইলেই বা আত্মা ইহাদের বিষয় হইতে পারিবে না কেন,—তাহারই উত্তরে কারিকায় বলা হইয়াছে "তৎস্বভাবো ন চাত্মেষ্টো নায়ং তদ্বিষয়স্ততঃ।" অর্থাৎ, আত্মা যে মুখ্যতঃ এই সকল প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারে না তাহার কারণ আত্মা সম্বন্ধে অগৌণার্থে কখনই বলা যায় না যে তাহা গৌরবর্ণ প্রভৃতি, যেহেতু আত্মার রূপাদি গুণ যে অসম্ভব তাহা সর্ববাদিসম্মত।

এতদ্দ্বারা দেখান হইল যে অহংবুদ্ধিতে যখন আত্মার আকার দেখিতে পাওয়া যায় না তখন আত্মাকে অহংবুদ্ধির বিষয়ও মনে করা যায় না। পরবর্তী কারিকায় বলা হইতেছে যে আত্মা যদি প্রত্যক্ষই অহংবুদ্ধির বিষয় হয় তবে আর তাহা লইয়া এত বাগ্‌বিতণ্ডা হইবে কেন ?

> যদি প্রত্যক্ষগম্যশ্চ সত্যতঃ পুরুষো ভবেৎ।
> তৎ কিমর্থং বিবাদোঽয়ং তৎসত্ত্বাদৌ প্রবর্ত্ততে ॥ ২১৫ ॥

ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক বলিতে পারেন, নীলাদি বিষয় প্রত্যক্ষীকৃত হইলেও তাহাদের ক্ষণিকত্ব লইয়া যেমন বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, আত্মারও সেইরূপ নিত্যত্বাদি লইয়া বিরোধ উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে। ইহারই উত্তরে বলা হইতেছে :—

> তথা হি নিশ্চয়াত্মায়মহংকারঃ প্রবর্ত্ততে।
> নিশ্চয়ারোপবুদ্ধ্যোশ্চ বাধ্যবাধকতা স্থিতা ॥ ২১৬ ॥

অর্থাৎ, অহংকার হইল এক প্রকারের নিশ্চয়জ্ঞান; এবং নিশ্চয়জ্ঞান ও আরোপবুদ্ধির সম্বন্ধ এরূপ যে একটির দ্বারা অপরটি বাধিত হইতে বাধ্য। সুতরাং অহংকাররূপ নিশ্চয়জ্ঞানে আত্মা কখনই আরোপিত হইতে পারে না। এই কারিকার উপর টিপ্পনীতে কমলশীল কতকগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন :—

ইহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই যে নীলাদি বিষয় প্রত্যক্ষীকৃত হইলেও তাহাদেরই অঙ্গস্বরূপ ক্ষণিকত্বাদি বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটিবে, কারণ এই সকল প্রত্যক্ষ নির্বিকল্প নিশ্চয়জ্ঞান উৎপাদন করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষণিকত্বাদি সম্বন্ধে তন্মধ্যে অনিশ্চয় থাকিয়া যাইতে বাধ্য। নৈয়ায়িক কিন্তু অহংপ্রত্যয় সম্বন্ধে এরূপ কথা বলিতে পারেন না, কারণ তাঁহার মতে অহংপ্রত্যয় হইল

সবিকল্প (definite, precise), এবং তাঁহাদের মতে এই সবিকল্প জ্ঞানদ্বারাই আত্মা সুনিশ্চিত হইয়া থাকে। যে বস্তু নিশ্চয়জ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে —তাহাতে তদ্বিপরীত এমন কোন বস্তুর আকার আরোপিত হইতে পারে না যাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে। নিশ্চয়জ্ঞানের অর্থই হইল এই যে তদ্দ্বারা বিষয় সুনির্ধারিত হয় ; তাহা যদি না হয় তবে বুঝিতে হইবে যে বিষয়ের গ্রহণই হয় নাই।

এইরূপে পরপক্ষ খণ্ডন করিয়া বিজ্ঞানবাদী এইবার স্বপক্ষস্থাপনে উদ্যোগী হইলেন :—

> তস্মাদিচ্ছাদয়ঃ সর্বে নৈবাত্মসমবায়িনঃ।
> ক্রমেণোৎপদ্যমানত্বাদ্বীজাঙ্কুরলতাদিবৎ ॥ ২১৭ ॥
> অথ বাধ্যাত্মিকাঃ সর্বে নৈরাত্ম্যাক্রান্তমূর্তয়ঃ।
> বস্তুসত্ত্বাদিহেতুভ্যো যথা বাহ্যা ঘটাদয়ঃ ॥ ২১৮ ॥

অর্থাৎ, পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে ইচ্ছাদি যে আত্মারই অঙ্গস্বরূপ তাহা নহে, কারণ বীজ, অঙ্কুর ও লতার ন্যায় ইচ্ছাদিও ক্রমানুযায়ী উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্মা ইচ্ছাদির সম্যক্ কারণ হইলে ইচ্ছাদি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন না হইয়া যুগপৎ উৎপন্ন হইত। সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক ভাবও হইল নৈরাত্ম্যের লক্ষণাক্রান্ত ; নিরাত্মক ঘটাদিতে যে বস্তুত্ব, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ দেখিতে পাওয়া যায় আধ্যাত্মিক ভাবাবলীতেও সেই সমস্তই বর্তমান ; সুতরাং আধ্যাত্মিক ভাবাবলীও আত্মনিরপেক্ষ হওয়াই সমীচীন।

যে ব্যাপ্তি আশ্রয় করিয়া এই অনুমান করা হইতেছে পরবর্তী কারিকায় তাহাই বুঝান হইয়াছে :—

> সাত্মকত্বে হি নিত্যত্বং তদ্ধেতূনাং প্রসজ্যতে।
> নিত্যাশ্চার্থক্রিয়াশক্তা নাতঃ সত্ত্বাদিসম্ভবঃ ॥ ২১৯ ॥

অর্থাৎ, দেহাদি যদি আত্মাধিষ্ঠিত হয় তবে আত্মাই হইল সেই দেহাদির হেঁতু, কেন না যাহা হেতু নহে তাহা কখন অধিষ্ঠাতাও হইতে পারে না,—নতুবা অতিপ্রসঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। এখন দেহাদির হেতু যদি হয় এই আত্মা, এবং এই

আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে দেহাদিও নিত্য হইবে, এবং তজ্জন্য দেহাদির ক্রমভাবিত্বও সম্ভব হইবে না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, দেহাদি নিত্য হইলেও তাহাদের বস্তুত্বাদি ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে। ইহারই উত্তরে কারিকায় বলা হইয়াছে "নিত্যাশ্চার্থ-ক্রিয়াশক্তাঃ" ইত্যাদি। অর্থাৎ, নিত্য হইলে দেহাদি অর্থক্রিয়া উৎপাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িবে, কারণ যুগপৎ-ই হউক আর ক্রমানুযায়ীই হউক, নিত্য বস্তু কখনও ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। সুতরাং যাহার পক্ষে অর্থক্রিয়া সম্ভব নহে তাহার পক্ষে বস্তুত্বও অসম্ভব, যেহেতু অর্থক্রিয়া উৎপাদনের সামর্থ্যই হইল বস্তুত্বের লক্ষণ এবং বস্তুত্বও এক প্রকারের ক্রিয়া।

উদ্দ্যোতকের বলিয়াছেন ঃ—দেহাদি নিরাত্মক—একথা বলিতে প্রকৃত পক্ষে কি বুঝায়? এ-কথার অর্থ যদি ইহাই হয় যে দেহাদি কোনক্রমেই আত্মার উপকারক হইতে পারে না, তবে এই যুক্তির সমর্থক কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না; কারণ ন্যায়মতে সমস্তই হইল আত্মার উপকারক (অর্থাৎ, জগতের সকল পদার্থের সহিতই আত্মার যোগ স্থাপন করা যাইতে পারে)। অথবা আত্মা অস্বীকার করার অর্থ যদি ইহাই হয় যে আত্মা শরীর নহে, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি কে বলিয়া থাকে যে শরীরই হইল আত্মা? (অর্থাৎ, আমরা একথা বলি না)। "নিরাত্মক" কথাটির পূর্বভাগ যে "নিস্", তাহা ঐ কথাটিরই উত্তরাংশ ("আত্মক") সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে, কারণ উত্তরপদ না থাকিলে কখনই "নিস্" উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায় না, যেমন "নির্মক্ষিক" ইত্যাদি শব্দে "মক্ষিকা" শব্দেরই উপসর্গরূপে "নিস্" ব্যবহৃত হইয়াছে। (অর্থাৎ, আত্মা কি তাহা নির্ণয় না করিয়া বৌদ্ধ "নিরাত্মক" কথাটিই ব্যবহার করিতে পারিবেন না।) অথবা বৌদ্ধ যদি এতদ্দ্বারা কেবল বলিতে চাহেন যে আত্মা শরীরে অবস্থিত নহে, তবে আমাদের সহিত বৌদ্ধের কোন বিরোধ নাই, কারণ কেই বা বলিতে চায় যে শরীরেই আত্মা অবস্থিত। বৌদ্ধের ঐ কথার যদি এই উদ্দেশ্য হয় যে শরীর আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে, তবে এই অনুমানের সমর্থক কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না, এবং তন্নিবন্ধন অনুমানও সিদ্ধ হইবে না।* বৌদ্ধের

* অনুমান সিদ্ধ করিতে হইলে উভয় পক্ষেরই অভিসম্মত সমর্থক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। বৌদ্ধের পক্ষে সমর্থক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা কঠিন নহে, কিন্তু নৈয়ায়িক যখন সকল বিষয়েই আত্মা আরোপ করিয়া থাকেন তখন তাঁহার অভিসম্মত উদাহরণ দিয়া নৈরাত্ম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা বৌদ্ধের পক্ষে অসম্ভব।

এই সকল প্রকার যুক্তিই যদিও ব্যর্থ তথাপি লক্ষ্য করিতে হইবে যে এগুলির প্রত্যেকটির উদ্দেশ্য আত্মার একটি বিশেষ গুণ অস্বীকার করা ; কিন্তু তাহাই কি প্রকারান্তরে আত্মা স্বীকার করা নহে (বিশেষপ্রতিষেধাচ্চ সামান্যং গম্যতে) ?

বৌদ্ধ যদি বলিতে চাহেন যে "আত্মা"-শব্দ যেহেতু শব্দমাত্র এবং শব্দ অনিত্য, সেই জন্য এই শব্দ যাহার জ্ঞাপক তাহাও অনিত্য হইবে, তবে মনে রাখিতে হইবে যে যে-শব্দটি এখানে আত্মা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা হইল "নিত্য"। সুতরাং সাধারণ শব্দের অনিত্যত্ব এবং এখানে ব্যবহৃত "নিত্য" শব্দটির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত অনৈকান্তিক হইয়া পড়িবে।* বৌদ্ধ যে আত্মা খণ্ডন করিতে প্রয়াসী সে আত্মা যদি শরীরাদিরই নামান্তর হয় তাহা হইলে নৈয়ায়িকের সহিত বৌদ্ধের কোন বিরোধ নাই (শরীরাদীনাং চোপচারাদাত্মবাচ্যত্বাৎ সিদ্ধসাধনম্)। আর যদি বৌদ্ধ বলিতে চাহেন যে (নিরাত্মক কথাটির অন্তর্গত) আত্ম-শব্দ দ্বারা যাহা বুঝায় তাহার বিষয় হইল শরীরাদি হইতে পৃথক্ কোন অনিত্য পদার্থ, তাহা হইলেও কিন্তু শরীরাদিতে রূপাদি হইতে পৃথক্ কোন বস্তু স্বীকার করা হইবে, যাহা বৌদ্ধের নিজের মতের পরিপন্থী।

মহানৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরের মত এইরূপে উপস্থিত করিয়া শান্তরক্ষিত এইবার তাহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইলেন ঃ—

ঘটাদিষু সমানং চ যদেবাত্মা নিষিধ্যতে।
পরৈর্জীবচ্ছরীরেঽস্মিংস্তদস্মাভিঃ প্রসাধ্যতে ॥ ২২০ ॥†

অর্থাৎ, ঘটাদির যে নৈরাত্ম্য নৈয়ায়িকাদি স্বীকার করিয়া থাকেন জীবন্ত শরীর সম্বন্ধেও আমরা তাহাই প্রমাণ করিতে চাই।—শান্তরক্ষিত কারিকায় এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন ; আসল প্রমাণটি দিয়াছেন কমলশীল ঃ—

---

* ইহাই উদ্দ্যোতকরের প্রকৃত উদ্দেশ্য কিনা তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, কারণ ভাষা এখানে অস্পষ্ট ঃ— অথাত্মশব্দঃ শব্দত্বাদনিত্যবিষয় ইতি সাধ্যতে তথাপি নিত্যশব্দেনানৈকান্তিকঃ।

† এই কারিকাটির পাঠ দুষ্ট।

আমাদের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িক উদ্দ্যোতকরের যে কথা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা সমভাবে আত্মবাদীর বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ঘটাদি বাহ্য বস্তুতে যে নৈয়ায়িক নৈরাত্ম্য স্বীকার করিয়া থাকেন তাহার কারণ হয় ঘটাদিতে আত্মার অধিষ্ঠান সম্ভব নহে, না হয় ঘটাদি আয়তনে আত্মার উপভোগ সম্ভব নহে (কারণ, এতদ্ভিন্ন তৃতীয় কোন পক্ষের অবকাশই নাই), অন্যথা নিরাত্মক শরীর যে শ্বাসপ্রশ্বাসবিহীন ঘটাদির মত—এই প্রসঙ্গ উপলক্ষ্যে নৈয়ায়িক কখনই দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঘটাদির উল্লেখ করিতেন না। দেহাদি সম্বন্ধে উদ্দ্যোতকর যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ঘটাদি সম্বন্ধেও সমভাবে সেই প্রশ্ন করা যাইতে পারে। অর্থাৎ আমরাও জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ঘটাদির নৈরাত্ম্য বলিতে কি ইহাই বুঝায় যে ঘটাদি আত্মার অনুপকারক, ইত্যাদি। তাহা হইলে দাঁড়াইল এই যে ঘটাদি আত্মার দ্বারা অনধিষ্ঠিত এবং ঘটাদি আত্মার উপভোগের ক্ষেত্র হইতে পারে না বলিয়াই আপনারা ঘটাদির নৈরাত্ম্য স্বীকার করিয়া থাকেন। জীবন্ত শরীরে কিন্তু আপনারা এই বলিয়া নৈরাত্ম্য অস্বীকার করিয়া থাকেন যে "জীবন্ত শরীর নিরাত্মক নহে," এবং এই নিষেধ হইতেই আবার আপনারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে জীবন্ত শরীরই হইলে সাত্মক, মৃত শরীর বা ঘটাদি সাত্মক নহে। আমরাও ঐরূপে বলিয়া থাকি যে জীবন্ত শরীর হইল নিরাত্মক, যেহেতু ইহাও একটি বস্তুমাত্র, ইত্যাদি। সুতরাং দেহ আত্মার উপকারক না অনুপকারক—এই প্রকার প্রশ্ন অনর্থক, যেহেতু আপনারাও ঘটাদিতে নৈরাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন।

আপনারা বলিয়াছেন এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই যদ্দ্বারা সিদ্ধ হইবে যে দেহ আত্মার অনুপকারক; কিন্তু একথাও ঠিক নহে। দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রয়োগসাধন এ ক্ষেত্রেও সম্ভব:—ক যদি খ-এর স্বভাবের অতিরিক্ত কিছু উৎপাদন করিতে না পারে তবে ক-কে খ-এর উপকারী বলা যায় না; হিমালয়ের পক্ষে যেমন বিন্ধ্য; শরীরাদি নিত্য ও একরূপ আত্মার কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না; সুতরাং শরীরাদি আত্মার অনুপকারক। যাহা নিত্য; কোন কিছুই তাহার উপকারী হইতে পারে না, কারণ নিত্য সত্তার কাহারও নিকট হইতে কোন উপকারের প্রয়োজন বা অবকাশ নাই।

পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কে বলে যে আত্মাই শরীর? কিন্তু

এ-প্রশ্নও অসম্যক্, কারণ উপনিষদ্-বাদিগণের ন্যায় এমন অনেকে আছেন যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন যে শরীরাদি হইল আত্মারই পরিণামরূপ।

পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে "নিরাত্মক" কথাটির অন্তর্গত নিস্-উপসর্গ দ্বারা যখন উত্তর পদ "আত্মা"ই প্রত্যাখ্যাত হইতেছে তখন বৌদ্ধের কর্তব্য "সাত্মক" বলিতে কি বুঝায় তাহাই প্রথমে নির্ণয় করা। কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ অসঙ্গত। যে উত্তর পদার্থ নিস্-উপসর্গের দ্বারা নিষিদ্ধ হইতেছে তাহা যে সদ্বস্তুই হইতে হইবে তাহা কে বলিল? আরোপিত অর্থও তদ্দ্বারা নিষিদ্ধ হইতে পারে; প্রকৃত প্রস্তাবে, যাহা সত্যই সৎ তাহা কখনই নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এখানে উত্তর পদটি দ্বারা যে পদার্থটি বুঝাইতেছে সেটি ভ্রান্তিবশে সমারোপিত হইয়াছে মাত্র। বৌদ্ধগণ "নিরাত্মক" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না যে তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। বৌদ্ধমত নিরাকরণের জন্য নৈয়ায়িকও বলিয়া থাকেন "প্রদীপাদি অক্ষণিক"। ইহা হইতে কি বুঝিতে হইবে যে নৈয়ায়িকও ক্ষণিকত্বে বিশ্বাস করেন? মনে রাখিতে হইবে যে উত্তরপদ ব্যতিরেকে কখনই নঞ্-এর ব্যবহার সম্ভব হয় না।

উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, কে বিশ্বাস করে যে শরীরই হইল আত্মা। কিন্তু একথাও ঠিক নহে। যাহারা মনে করে যে আত্মার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠের পর্বার্ধ, অথবা শ্যামাকাদি ফলের প্রমাণ, তাহাদের মতে আত্মা সত্যই মূর্তিবিশিষ্ট, এবং তাহাদের আত্মা বাস্তবিকই শরীরে অবস্থিত।—বলা হইয়াছে যে এমন কোন দৃষ্টান্ত নাই যদ্দ্বারা শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধাভাব সমর্থিত হইবে, কিন্তু এ-যুক্তি অসিদ্ধ। কারণ আত্মা ও শরীর যে পরস্পরের প্রতি উপকারক ও উপকার্য না হওয়ায় সম্বন্ধবিহীন তাহা বিন্ধ্য ও হিমালয়ের দৃষ্টান্ত হইতেই সমর্থিত হইতে পারে।

বলা হইয়াছে যে বিশেষের নিষেধ হইতে সামান্যের সমর্থনই বুঝায়। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হইয়া পড়ে অনেকান্ত। আপনারাও প্রদীপাদি বিশেষ বস্তুর ক্ষণিকত্ব অস্বীকার করেন বলিয়াই যে বস্তুসাধারণের ক্ষণিকত্ব স্বীকার করেন তাহা নহে। আপনারা যদি বলেন, প্রদীপাদি বাস্তবিকই যখন চিরকাল স্থায়ী হয় না তখন সাধারণভাবে প্রদীপাদির পক্ষেও ক্ষণিকত্ব স্বীকার করা

যাইতে পারে, তবে তদুত্তরে আমরা বলিতে পারি যে অহংকারযুক্ত মনকে আমরাও সাধারণভাবে আত্মারূপে স্বীকার করিতে প্রস্তুত।*

ইথোমাত্মাপ্রসিদ্ধৌ চ প্রক্রিয়া তত্র যা কৃতা।
নিরাস্পদৈব সা সর্বা বন্ধ্যাপুত্র ইব স্থিতা॥ ২২১॥

অর্থাৎ এইরূপে আত্মার অপ্রসিদ্ধি যখন প্রমাণিত হইল তখন তাহার প্রক্রিয়াদি যাহা স্বীকার করা হইয়াছে তাহার সমস্তই হইয়া পড়িল বন্ধ্যাপুত্রের মত অলীক।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

---

* আত্মশব্দপ্রবৃত্তিরপ্যস্মাভিঃহংকারসংমিশ্রিতে চেতসীষ্টৈবেতি সিদ্ধঃ সামান্যেনাত্মা।

অহিংসা

বাগবাদা গাঁয়ের সেই যে মহেশ চৌধুরী, যাঁর ছেলে বিভূতি গিয়াছে আসল সরকারী জেলে, যাঁর দুটি মেয়ে গিয়াছে শ্বশুরবাড়ী নামক নকল সামাজিক জেলে, যাঁর উপর রাজা সায়েবের ভয়ানক রাগ, আশ্রমে যিনি একেবারেই আমল পান না,, সুযোগ পাইলেই সকলের সামনে যাঁকে অপদস্থ করিবার জন্য সদানন্দকে বিপিন বিশেষভাবে বলিয়া রাখিয়াছে, মানুষটা তিনি একটু খাপছাড়া কিন্তু তুচ্ছ নন। তুচ্ছ নন বলিয়াই অবশ্য তাঁর উপর রাজা সায়েবের এত রাগ, আশ্রমে তাঁকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবার জন্য বিপিনের এত চেষ্টা। চারিদিকের অনেকগুলি গ্রামে মহেশ চৌধুরীর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি আছে, যেটা গড়িয়া তুলিবার জন্য কারও চেষ্টা করিতে হয় নাই, মহেশ চৌধুরীর জীবনযাপনের একনিষ্ঠ প্রক্রিয়া বহুকাল ধরিয়া তিলে তিলে যার জন্ম দিয়াছে। লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে, ভালবাসে। কিভাবে জানিয়াছে, কেন জানিয়াছে, জেরা করিলে কেহ বলিতে পারিবে না, কিন্তু সকলেই জানে মনে মনে মহেশ চৌধুরী সকলের মঙ্গল কামনা করেন, লোকটার ভক্তি ও নিষ্ঠা আন্তরিক, সকল সময় সকল বিষয়ে নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়। লোকটা বুদ্ধিমান কিন্তু চালাক নয়, ভিতরে বাহিরে মিল আছে লোকটার—দৈনন্দিন জীবনের কারবারে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে অসংখ্য দেওয়া-নেওয়া চলে তার মধ্যে মহেশ চৌধুরীর কাছে পাওনা গ্রহণ করিতে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা নাই।

[লেখকের মন্তব্য : কোন মানুষ সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা অসংখ্য ব্যক্তিগত ধারণার সমষ্টি কিন্তু ধারণাগুলি নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ভুক্ত, সীমাবদ্ধ, বৈচিত্র্যহীন। যার ব্যক্তিত্বের দু'টি একটি বিশিষ্ট দিক মাত্র অত্যন্ত স্পষ্ট ও স্থূলভাবে মানুষের কাছে আত্মপ্রকাশ করে, যার সম্বন্ধে মানুষ নিজের ধারণা কটির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়, নিজের মনে যতগুলি বিভিন্ন 'টাইপ' সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা মানুষের থাকে তার মধ্যে কোন একটি টাইপের সঙ্গে মানুষ যাকে মোটামুটি মিলাইয়া লইতে পারে, কেবল তারই ব্যক্তিত্বকে মানুষ স্বীকার করে। ব্যক্তিত্ব আসলে পরাশ্রয়ী, ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরধর্ম্মানুশীলনের প্রয়োজন, এই জন্য জোরালো

ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা ভয়াবহও বটে। যার ব্যক্তিত্বের প্রভাব যত বেশী, তাকে তত বেশী পরের ইচ্ছায় চলিতে হয়, নেতার চেয়েও সে পরাধীন। ব্যক্তিত্বকে প্রভাবশালী করিবার মূলমন্ত্র পরের মনে ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া সে ছোট আমি বড়, তার যা কিছু আছে কম আমার সে সব আছে অনেক বেশী। সুতরাং পরের ছোট-বড় কম-বেশীর সংস্কার ও ধারণা অনুসারে আমার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত না হইলে সেটা নিছক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে পরিণত হয় মাত্র। এ পর্য্যন্ত মোট কথা, কোন জটিলতা নাই। গোলমাল আরম্ভ হয় বিশ্লেষণ যখন সেই স্তরে পৌঁছায়, যেখানে ব্যক্তিত্বের সংগঠনে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মালমশলাগুলি পৃথক করিতে হয়, সমগ্র প্রক্রিয়াটার পিছনে কতখানি ক্রিয়াশক্তি অচেতন ও কতখানি সচেতন তাও পৃথক করিতে হয়।

আমার এসব কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই। সদানন্দ ও মহেশ চৌধুরীর ব্যক্তিত্বের একটি মৌলিক সামঞ্জস্যের কথা আমি সোজাসুজি আপনাদের বলিয়া দিতে চাই। সদানন্দ, বিপিন, মাধবীলতা এদের ব্যক্তিত্বের যেসব দিক আমি ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছি এবং চাই গল্পের মধ্যেই তা আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু মহেশ চৌধুরী ও সদানন্দের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সামঞ্জস্যটা আমি দেখাইতে চাই, গল্পের মধ্যে আপনা হইতে সেটা পরিস্ফুট করিয়া তোলা আমার সাধ্যাতীত। কারণ দুজন মানুষকে কাছাকাছি টানিয়া আনিয়া অথবা দুজনের মধ্যে একটি মধ্যস্থ খাড়া করিয়া একজনের ব্যক্তিত্বরূপী সচেতন মননশক্তির সঙ্গে অপর জনের ব্যক্তিত্বরূপী অচেতন মননশক্তির পার্থক্য সহজেই স্পষ্ট করিয়া তোলা যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য কোন রকমেই দেখান যায় না। যাই হোক, বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। কেবল বলিয়া দিই। মহেশ চৌধুরীর মধ্যে যে অচেতন মননশক্তি সকলের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছে এবং সদানন্দের মধ্যে যে সচেতন মননশক্তি সকলের মধ্যে জাগাইয়াছে সভয় শ্রদ্ধা, মূলতঃ তার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।]

মহেশ চৌধুরী প্রত্যেক দিন আশ্রমে যাতায়াত করেন, সাধারণতঃ বিকালের দিকে। সকালেও মাঝে মাঝে আশ্রমে তাঁর আবির্ভাব ঘটে, খুব ভোরে। রাত্রে তিনি ঘুমান কিনা অনেকের সন্দেহ আছে, প্রাতঃভ্রমণে বাহির হন একরকম শেষ রাত্রে। লাঠি হাতে চার মাইল পথ হাঁটিয়া হাজির হন আশ্রমে, আবছা আলো

অন্ধকারে এদিকে খোঁজেন ওদিকে খোঁজেন, রাত্রি শেষে কার সঙ্গে যেন খেলিতেছেন লুকোচুরি খেলা, খেলার সাথীটি তার কুটীরের পিছনে, গাছের আড়ালে, ঝোপের মধ্যে কোথাও গা ঢাকা দিয়াছে। খুঁজিতে খুঁজিতে যান নদীর ধারে। কোন দিন হয়ত সদানন্দের সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিয়া মহেশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। সদানন্দ যদি প্রথমে কথা বলেন তো বলেন, নতুবা মহেশ চৌধুরী মুখ খোলেন না।

'কে, মহেশ ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু। বড় জ্বালা প্রভু মনে, বড় কষ্ট পেয়েছি সমস্ত রাত। তাই ভাবলাম, ভোরবেলা প্রভুর চরণ দর্শন করে—'

সদানন্দের ধারণা জ্বালা তাঁরও আছে। তিনি বলেন, 'তোমায় না আশ্রমে বারণ করে দিয়েছি ?'

'না এসে পারিনা প্রভু।'

'বটে ? বেশ, বেশ। তোমার মত আর দু'একটি ভক্ত জুটলেই আশ্রম ছেড়ে আমায় বনে জঙ্গলে পালাতে হবে। তা তোমার আসল মতলবটা কি বল ত শুনি ?'

'চরণে ঠাঁই চাই প্রভু—মনে শান্তি চাই।'

পাগল ? মাথা খারাপ মহেশ চৌধুরীর ? এরকম অন্ধ ভক্ত সদানন্দের আরও আছে, কিন্তু এমন নাছোড় বান্দা কেউ নাই। বাড়াবাড়ির জন্য ধমক দিলে ভাবপ্রবণ ভক্ত দমিয়া যায়, মুখ হইয়া আসে কালো, ভক্তিও যেন উবিয়া যায় খানিকটা। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছুতেই দমে না, কিছুতেই হাল ছাড়ে না। সদানন্দের অবজ্ঞা, অবহেলা, কড়া কথা এসবও যেন তার কাছে পরম উপভোগ্য। বড় রাগ হয় সদানন্দের—বড় আনন্দ হয়। মনে হয়, আসলে মহাপুরুষ তিনি কেবল এই একজন মানুষের কাছে, প্রায় দেবতার সমান। আর সকলে তাঁকে ঠকায়, শুধু দাম দেয়, শুধু তাঁর দাবী মেটায়। তাঁরই বলিয়া দেওয়া মন্ত্রে পূজা করে তাঁর। কিন্তু মহেশ চৌধুরী কিছু জানে না, কিছু মানে না, নিজের রচিত একটি মাত্র মন্ত্র বলিয়া সে পূজা করে—তুমি আমায় চাও বা না চাও দেবতা, আমি তোমায় চাই।

একটু ভয়ও করে সদানন্দের মহেশ চৌধুরীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে, তার

সঙ্গে কথা বলিতে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মালমশলায় জীবনের সে আদর্শ তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন নিজের জন্য, সে আদর্শ অবাস্তব কল্পনা কিনা, অর্থহীন স্বপ্ন কিনা, আজও এবিষয়ে সদানন্দের সন্দেহ মেটে নাই। যে আত্মপ্রত্যয়ের নীচে এ সন্দেহ চাপা থাকে, মহেশ চৌধুরীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের কথায় তা যেন উবিয়া যাইতে থাকে—দেবতার সামনে পূজারীর মত মহেশ চৌধুরী দাঁড়াইয়া থাকে, পোষা কুকুরের মত তাকায়, স্তব করার মত কথা বলে—তবু। মনে হয়, আর যত ভক্ত তাঁর আছে, যাদের মধ্যে অনেকে মনে মনে তাঁর সমালোচনাও করে কম বেশী, তাদের ভুলাইতে কোনদিন তাঁর কষ্ট হইবে না, ভুলিবার জন্য শিশুর মত তারা উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে, কিন্তু এই অন্ধ ভক্তটিকে ভুলানোর ক্ষমতা তাঁর নাই। মহেশ চৌধুরীর পূজা গ্রহণ করিলে বর দিবার সময় ফাঁকি চলিবে না, ভেজাল চলিবে না। অবাস্তব পাগলামীর পুরস্কারকে করিয়া তুলিতে হইবে বাস্তব। কাব্যের জন্য কবিকে যেমন নারীকে দিতে হয় খাঁটি রক্তমাংসের দেহটি।

'তোমার ছেলে ছাড়া পেয়েছে মহেশ ?'

'আজ্ঞে না। ও কি আর ছাড়া পাবে !'

'এ্যাঁ ? সে কি কথা—ছাড়া পাবে বৈকি, দুদিন পরেই ছাড়া পাবে। ভেবো না।'

এই কি বাস্তব পুরস্কারের নমুনা ? ইহার বিরুদ্ধে দুটি মিষ্টি কথা বলা একটু অনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হিসাব করিলে যার দাম কাণা কড়িও হয় না কিন্তু মহেশ চৌধুরীর কাছে যা অমূল্য ?

কোনদিন সদানন্দ কথা না বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যান, মহেশ চৌধুরী ঠায় দাঁড়াইয়া যতক্ষণ দেখা যায় তাঁহাকে দেখেন তারপর আবার আপন মনে তপোবনে ঘুরিয়া বেড়ান আর সদানন্দের সম্মুখে পড়েন না। এখানে তিনি অনাহূত অবাঞ্ছিত আগন্তুক, বিপিনের শাসনে আশ্রমের কেউ তাঁর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলে না, মাঝে মাঝে রীতিমত অপমানও জোটে, তবু মোহাচ্ছন্নের মত তিনি আশ্রমের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ান, ধীরে ধীরে আশ্রমের জাগরণ লক্ষ্য করেন।

সদানন্দের অজ্ঞাতবাসের খবরটা মহেশ চৌধুরী পাইলেন মাতুনার শ্রীধরের

বাড়ীতে। বাগবাদায় নিজের বাড়ী হইতে আশ্রমে যাওয়ায় পথে শ্রীধরের বাড়ী পড়ে, মহেশ চৌধুরী এখানে কিছুক্ষণ বসিয়া যান। বিশ্রামও হয়, জানাশোনা অনেকের সঙ্গে কথা বলাও হয়, অনেকের খবরও পাওয়া যায়। আজ শ্রীধরের সদরের বড় ঘরটার দাওয়ায় লোক জুটিয়াছে অনেক। যারা অপরাহ্নে আশ্রমে যাইবে ভাবিয়াছিল সদানন্দ সাতদিন দর্শন দিবেন না শুনিয়া তাদের মধ্যে অনেকেই শ্রীধরের এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। শ্রীধর একটি নূতন বই সংগ্রহ করিয়াছে কোথা হইতে, কামরূপের এক রোমাঞ্চকর প্রামাণ্য উপন্যাস। কাল চারটি পরিচ্ছেদ পাঠ করা হইয়াছিল, আজ সকলে আসিয়া জুটিলেই বাকী অংশটুকু পড়া আরম্ভ হইতে পারিবে।

মহেশ চৌধুরী বলিলেন, 'কেউ দর্শন পাবে না?'

শ্রীধর বলিল, 'বিপিনবাবু তাই বললেন চৌধুরী মশাই। প্রকৃত ভক্ত ছাড়া কেউ দর্শন পাবে না—প্রভুর জন্য যে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারে, জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে, কেবল সেই দর্শন পাবে।'

'প্রভুর জন্য তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পার না, জীবন বিসর্জ্জন দিতে পার না শ্রীধর?'

উৎসুক দৃষ্টিতে মহেশ চৌধুরী সকলের মুখের দিকে চাহিতে থাকেন সকলে অস্বস্তি বোধ করে, চোখ নামাইয়া নেয়। বৃদ্ধ শ্রীধরের স্তিমিত চোখ দুটি বোধ হয় তামাকের ধোঁয়াতেই বুজিয়া যায়।

'আমি প্রভুর চরণ দর্শন করতে যাব শ্রীধর।'

সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে। অহংকারের কথা নয়, মহেশ চৌধুরীর অহংকার আছে কিনা সন্দেহ। সকলে তা জানে। কিন্তু একটা কথা প্রায় সকলের মনেই খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে থাকে, কঠিন একটা সমস্যা। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারেন, জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারেন, এত বড় ভক্তই যদি মহেশ চৌধুরী হন, সদানন্দ তাঁকে আমল দেন না কেন, কেন তাঁকে শিষ্য করেন না? এই সমস্যা আজ বহুদিন সকলকে পীড়া দিতেছে, এ বিষয়ে নিজেদের মধ্যে তারা অনেক আলোচনা করিয়াছে, মনে মনে অনেক মাথা ঘামাইয়াছে। কারও কারও মনে এ সন্দেহও জাগিয়াছে যে, মানুষটা

মহেশ চৌধুরী কি আসলে তবে ভাল নয়, নীতি ধর্ম্ম ভক্তি নিষ্ঠা সব লোক দেখানো ভালমানুষী ?

মহেশ চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলেন, 'যাই, একবার ঘুরে আসি আশ্রম থেকে ?'

কয়েকজন কৌতূহলভরে তার সঙ্গ নিলে তিনি তাদের ফিরাইয়া দেন, বলেন, 'না, আজ আর তোমাদের গিয়ে কাজ নেই ভাই। প্রভু যখন বারণ করে দিয়েছেন, মিছিমিছি গোলমাল না করাই ভাল।'

আশ্রমে গিয়া মহেশ চৌধুরী যাকে সামনে পাইলেন তাকেই প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে আবেদন জানাইতে লাগিলেন। কেউ জবাব দিল, কেউ দিল না। তখন মহেশ চৌধুরী গিয়া ধরিলেন বিপিনকে।

বিপিন বলিল, 'সাতদিন পরে আসবেন।'

মহেশ চৌধুরী মিনতি করিয়া বলিলেন, 'আপনি একবার প্রভুকে গিয়ে বলুন, প্রভুর জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করব, জীবন বিসর্জ্জন দেব। আপনি বললেই প্রভু আমায় ডেকে পাঠাবেন।'

বিপিন রাগিয়া বলিল, 'কে আপনাকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে, জীবন বিসর্জ্জন দিতে সেধেছে মশায় ? কেন আসেন আপনি আশ্রমে ? যান যান, বেরিয়ে যান আমার আশ্রম থেকে।'

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মহেশ চৌধুরী ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিলেন শেষ রাত্রে।

সদানন্দের সদরের কুটীরের সামনে কদম গাছটার তলায় বসিয়া পড়িলেন। কুটীরের আড়াল হইতে সূর্য্য উঠিলেন মাথার উপরে, তারপর আকাশ ঢাকিয়া মেঘ করিয়া আসিয়া ঘণ্টাখানেক বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর আবার কড়া রোদ ঢালিতে ঢালিতে সূর্য্য আড়াল হইলেন অন্য একটি কুটীরের আড়ালে, গাছতলা হইতে মহেশ নড়িলেন না। রোদে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া খাওয়া ছাড়িয়া কি তপস্যা করিতে বসিয়াছেন গাছতলায় ? এত যায়গা থাকিতে এখানে তপস্যা করিতে বসা কেন ? আশ্রমের সকলে সম্মুখ দিয়া যাওয়ার সময় বিস্ময় ও কৌতূহলভরা দৃষ্টিতে তাকে দেখিতে থাকে,—তাকে দেখিবার জন্য কেউ আসে না বটে কিন্তু এদিক দিয়া যাতায়াত করার প্রয়োজন আজ যেন সকলের বাড়িয়া যায়।

বেলা বাড়িলে তিন চার বার মহেশ চৌধুরীর বাড়ী হইতে লোক আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। বর্ষণের আগে আসিয়াছিল কেবল চাকর গোমস্তা, বর্ষণের পর আসিল মহেশের ভাগ্নে শশধর। গাছতলায় মাটিতে উপবিষ্ট মামার জলে ভেজা মূর্ত্তি দেখিয়া বেচারা কাঁদিয়া ফেলে আর কি। কিন্তু সেও মহেশের তপস্যা ভঙ্গ করিতে পারিল না। তবে দেখা গেল ছেলেটার বুদ্ধি আছে। নিজে হার মানিয়া সে ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু বিকাল বেলা হাজির হইল একেবারে মামীকে সঙ্গে করিয়া।

ভাগ্নে কেবল কাঁদিয়া ফেলার উপক্রম করিয়াছিল, স্বামীর অবস্থা দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিয়াই আকুল। কেন তার মরণ হয় না? যার স্বামী পাগল, ছেলে পাগল, সে কেন সংসারে বাঁচিয়া থাকে নিত্য নতুন যন্ত্রণা সহ্য করিতে? কাঁদিতে কাঁদিতে হাতের বালা দিয়া বিভূতির মা কপালে আঘাত করিলেন। রক্ত বাহির হইল একটু—ডান চোখের জলের ধারাটা লাল হইয়া গেল।

মহেশ চৌধুরী কাতরভাবে বলিলেন, 'শোন শোন, আহা এমন করছ কেন? বাড়ী ফিরে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব।'

খোলা জায়গার ফাঁকা গাছতলায় এমন নাটকের অভিনয় চলিতে থাকিলে দর্শকের সমাগম হইতে দেরী হয় না। একে একে আশ্রমের প্রায় সকলেই আসিয়া হাজির হয়, এলোমেলো ভাবে চারিদিকে দাঁড়াইয়া দুজনকে দেখিতে থাকে। পুরুষেরা ব্যাপারটা অনেকটা হাল্কাভাবেই গ্রহণ করে, মেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় চাপা উত্তেজনার চাঞ্চল্য; অনেকে ছোট্ট হাঁ করিয়া চোখ বড় করিয়া চাহিয়া থাকে, শেষ বেলার আলোয় দাঁত করে ঝক ঝক চোখ করে চক চক। আশ্রমে দাঁত মাজার নিয়ম বড় কড়া, দাঁতে ময়লা থাকিলে সদানন্দ রাগ করেন, মেয়েদের দাঁত তাই সত্যই ঝক ঝক করে—কারও কম কারও বেশী। রত্নাবলীর দাঁতগুলি বোধহয় সকলের চেয়ে বেশী সুন্দর আর বেশী ঝকঝকে, চোখও তার বড় আর টানা। তবু গাছতলার ব্যাপার দেখিতে দেখিতে গায়ের আঁচল টানিয়া টানিয়া সে দুহাতে পুঁটলী করিতে থাকে, তারপর রক্তপাত ঘটা মাত্র আঁচল সমেত হাত দিয়া চাপা দেয় নিজের মুখ। কাঁদে কিনা বলা যায় না, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপে। কী কুৎসিৎ যে দেখায় তার পরিপুষ্ট অঙ্গের অনাবৃত অংশের ঢেউ তোলা কাঁপুনি। শশধর অভিভূত হইয়া

চাহিয়া থাকে। মাধবীলতা তাড়াতাড়ি মহেশ চৌধুরীর স্ত্রীর কাছে গিয়ে আঁচল দিয়া তার কপালের রক্ত মুছিয়া দেয়।

তারপর আবির্ভাব ঘটে বিপিনের। রাগ করিয়া লাভ নাই, সে তাই রাগ করে না, আশ্চর্য্য হইবার ভাণ করিয়া বলে, 'আপনি যাননি এখনো ?'

মহেশ চৌধুরী বলেন, 'আজ্ঞে না। আপনাকে তো বলেছি একবার প্রভুর চরণ দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না।'

'তা হলে সাতদিন আপনাকে এখানে থাকতে হবে।'

'তাই থাকব।'

বিপিন একটু হাসিল, 'আপনার ভক্তিটা কিন্তু বড় খাপছাড়া চৌধুরী মশায়। প্রভুর আদেশ অমান্য করতে আপনার বাধবে না, প্রভুর চরণ দর্শনের জন্য আপনি ব্যাকুল।'

মহেশ চৌধুরী নিশ্চিন্তভাবে বলিলেন, 'ও আদেশ আমার জন্য নয়।'

মাধবীলতা বলিল, 'না সত্যি, উনি জানিয়েছেন, সাতদিন কেউ দর্শন পাবে না। সাতদিন উনি এক মনে সাধনা করবেন কিনা।'

'আমি আড়াল থেকে একবার দর্শন করেই চলে আসব।'

'তা কি হয় ?'

সন্ধ্যা হইল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, মহেশ চৌধুরী গাছতলায় মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিলেন। নিরীহ, শান্ত, ভীরু মানুষটা যে আসলে এমন একগুঁয়ে সদানন্দ ছাড়া এতকাল আর কে তা জানিত! তাকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া গেল। মাধবীলতা আর রত্নাবলী কোনরকমে তার স্ত্রীকে একটু দুধ খাওয়াইয়া শশধরকে ডাকিয়া নিয়া গেল আশ্রমের রাত্রির আহার্য্যের ব্যবস্থায় ভাগ বসাইতে। রাত্রে আশ্রমে রান্না হয় না, কিন্তু পেট ভরাইতে শশধরের অসুবিধা হইল না,—দুধ, ছানা, মিষ্টি, ফল-মূল এ সবের অভাব নাই। খাওয়ার পর সে আসিয়া আবার মামা মামীর কাছে বসিয়া রহিল গাছতলায়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত আশ্রমের দু'একজনকে সেখানে দেখা গেল, তারপর একজনও রহিল না। রাত্রি দশটার পর কারও কুটীরের বাহিরে থাকা বারণ—বিপিন ও সদানন্দ ছাড়া।

রাত প্রায় এগারটার কাছাকাছি গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিও নামিল, ছাতি মাথায়

বিপিনও হাজির হইল গাছতলায়। দাঁতে ব্যথা হওয়ায় বিপিন গলা, মুখ, চোয়াল, কাণ সমস্ত ঢাকিয়া সযত্নে কম্ফর্টার জড়াইয়াছে, ঠাণ্ডা লাগিলে তার দাঁতের ব্যথা বাড়ে। মুখের ঢাকা একটু সরাইয়া সে বলিল, 'আপনারা দাওয়ায় উঠে বসবেন যান। মাদুর আর বালিশ দিচ্ছি।' মহেশ চৌধুরী স্ত্রীকে বলিলেন, 'যাও না, দাওয়ায়, যাও না তোমরা ? বিষ্টিতে ভিজে যে মারা পড়বে তুমি। যাও, দাওয়ায় যাও।'

বিভূতির মা বলিলেন, 'আর তুমি ?'

'এক কথা একশ'বার কেন বলছ। বললাম না প্রভুকে দর্শন করতে না দিলে আমি উঠব না এখান থেকে ? তুমি এখানে বসে থেকে কি করবে, তাতে লাভটা কি হবে শুনি ?'

'তুমি এখান থেকে না উঠলে আমিও উঠব না।'

সন্ধ্যা হইতে এ বিষয়ে দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক, অনেক রাগারাগি হইয়া গিয়াছে, মহেশ চৌধুরী আর কিছু বলিলেন না, কেবল শশধরকে হুকুম দিলেন দাওয়ায় গিয়া বসিতে। শশধর দাওয়াতেও গেল, বিপিন মাদুর আর বালিশ আনিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ মাদুর বিছাইয়া শুইয়াও পড়িল। আপশোষ করিয়া বলিল, 'বর্ষাকালে একি ঠাণ্ডা মশায়, এঁ্যা ? একি শালার শীতকাল নাকি ?'

বিপিনের সহানুভূতি জাগিবার লক্ষণ নাই দেখিয়া গলা নামাইয়া আবার বলিল, 'বৌটা এসেছে কাল—ছমাস বাপের বাড়ী ছিল। কি গরমটা গেছে কাল রাতে, তা বৌ বলে কি, না বাবু, বাদলার দিন ঠাণ্ডা লাগবে। ব'লে—'

'আপনি বাড়ী ফিরে যান না ?'

শশধর উঠিয়া বসিল।—'আমি ? মামী কাল বাড়ী ফিরেই কি করবে জানেন ? কাণটি ধরে বলবে, বেরো বাড়ী থেকে। কেবল আমাকে নয় মশায়, নিজের জন্য কি আমি ভাবি,—বৌটাকে শুদ্ধু। গায়ে দেবার দিতে পারেন কিছু,—কাপড় চোপড় যাহোক ?'

বিপিন একটা চাদর আনিয়া দিল। কিন্তু বাদলা রাতে সদানন্দের সদর দাওয়ায় চাদর মুড়ি দিয়া আরাম করিবার অদৃষ্ট বেচারীর ছিল না। বিভূতির

মা ডাকিয়া বলিলেন, 'ও শশী, ও ভদ্র লোকের কাছ থেকে ছাতিটা চেয়ে রাখ, আর জিজ্ঞেস্ কর আরো যদি ছাতি থাকে একটা—'

একটা কেন, আরও তিনটা ছাতি ছিল, সবগুলি আনিয়া দাওয়ায় শশধরের কাছে ফেলিয়া বিপিন ভিতরে চলিয়া গেল। দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণায় তার মাথার মধ্যে তখন ঝিম্ ঝিম করিতেছিল, ইচ্ছা হইতেছিল মাটিতে শুইয়া হাত পা ছুড়িতে থাকে আর চীৎকার করিয়া কাঁদে।

ছাতি নিয়া শশধর গাছতলায় গেল। একটি ছাতি খুলিয়া দিল মামীর হাতে, আরেকটি ছাতি খুলিয়া মহেশ চৌধুরীকে দিতে গেলে তিনি বলিলেন, 'না, আমার ছাতি চাই না।'

স্ত্রী বলিলেন, 'কেন? এখেনে ধন্না দিয়েছো, না খেয়ে বসে থাকবে, তা না হয় বুঝলাম—বিষ্টি যখন পড়ছে ছাতিটা মাথায় দিতে দোষ কি?' মহেশ চৌধুরী বলিলেন, 'নিজে থেকে আমি কিছুই করব না।'

তখন মহেশ চৌধুরীর স্ত্রী আবার এমনভাবে নিজের মরণের জন্য আপশোষ আরম্ভ করিলেন যে মনে হইল আবার বুঝি তিনি আজ অপরাহ্ণের মত বালার আঘাতে নিজের কপাল কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িবেন। কিন্তু খানিক আপশোষ করিয়া নিজের ছাতিটা বন্ধ করিয়া শশধরকে ফেরত দিলেন, বলিলেন, 'যা তুই, দাওয়ায় শো' গে যা শশী।'

শশধর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'থাক, আমিও বসে বসে ভিজি এখানে, আমিই বা-বাদ যাব কেন।'

তারপর মিনিট দুই সব চুপচাপ। এ অবস্থায় গাছের পাতায় বাতাসের মৃদু শোঁ শোঁ শব্দ আর গাছের পাতা হইতে জল পরিবার ক্ষীণ জলো জলো আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ কাণে শোনাও পাপ। মনে অবশ্য অনেক কথা টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে, সেগুলি স্মৃতিও নয়।

'সারাটা জীবন আমায় তুমি জ্বালিয়ে খেলে, আমার শনিগ্রহ তুমি। আমার সব ব্যাপারে তোমার বাহাদুরী করা চাই, হাঙ্গামা বাঁধানো চাই। আমি যদি শান্তি পাবার জন্যে গাছতলায় ধন্না দিয়ে পড়ে থাকি, তোমার কি তাতে, কেন তুমি এসে আমার মন বিগড়ে দেবে, কে ডেকেছিল তোমায়? স্বামীভক্তি দেখানো হচ্ছে—স্বামীর একটা কথা শুনবে না, স্বামীভক্তি দেখাতে গাছতলায়

এসে ভেজা চাই। কি অদ্ভুত সতীরে আমার! স্বামীর শান্তি নষ্ট করে সতীত্ব ফলানো!'

বৃষ্টি আর বাতাস দুয়েরই বেগ বাড়িতে থাকে। মহেশ চৌধুরীর রাগ আর জ্বালাবোধ কিন্তু না বাড়িয়া এই সামান্য ভৎর্সনার মধ্যেই একেবারে ক্ষয় হইয়া যায়। আরও অনেকক্ষণ জের টানিতে পারিতেন, বলিতে পারিতেন আরও অনেক কথা, কিন্তু কিছু না বলিয়া একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। অন্ধকারে এত কাছাকাছি বসিয়াও কেহ কারও মুখ দেখিতে পাইতেছে না। গাঢ় অন্ধকারে শুধু একটি আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। কিছুদূরের একটি কুটীরে কে যেন একটি আলো জ্বালিয়া জানালা খুলিয়া রাখিয়াছে। জাগিয়া আছে না ঘুমাইয়া পড়িয়াছে মানুষটা কে জানে! এত রাত্রে চোখে ঘুম নাই এমন শান্তিহীন অভাগা কে আছে সাধু সদানন্দের আশ্রমে? সদানন্দের যে শিষ্য, সদানন্দের আশ্রমের কুটীরে যে বাস করিবার অধিকার পায়, জীবনের সব জ্বালা পোড়ার ছোঁয়াচ তো সঙ্গে সঙ্গে তার মন হইতে মুছিয়া যাইবে, সন্ধ্যার সঙ্গে শিশুর মত দু'চোখ ভারি হইয়া আসিবে শিশুর চোখের ঘুমে? আলোর বিন্দুটি নিভিয়া গেলে মহেশ চৌধুরী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। তাই বটে। কোন দরকারে কেউ আলো জ্বালিয়া রাখিয়াছিল—ঘুম আসিতেছিল বলিয়া নয়, মনের আগুন রাত্রি জাগরণের অবসাদে চাপা দিবার দরকার হইয়াছিল বলিয়া নয়। দুই হাত জড়ো করিয়া মহেশ চৌধুরী মনে মনে সদানন্দের চরণে মাথা লুটাইয়া প্রণাম করেন। হে মহেশ চৌধুরীর জীবন্ত দেবতা, মহেশ চৌধুরীর কল্যাণের জন্যই তুমি তাকে অবহেলা করিয়া দূরে ঠেলিয়া রাখ, দুঃখের আগুনে পুড়িয়া মহেশ চৌধুরীর মন যেদিন নির্ম্মল হইবে সেই দিন পায়ে ঠাঁই দিয়া মহেশ চৌধুরীর সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া তাকে তুমি শান্তি দিবে, একথা জানিতে কি বাকী আছে মহেশ চৌধুরীর। এই ধৈর্য্যের পরীক্ষায় শিষ্য না করিয়াও শিষ্যের মতই তাকে যে প্রকারান্তরে আত্মশুদ্ধির কঠোর সাধনায় নিযুক্ত করিয়াছ, সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য মহেশ চৌধুরী জীবন দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু আজ এই বিপদে তুমি তাকে রক্ষা কর। তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না প্রভু মহেশ চৌধুরীকে বাড়ীতে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য, মহেশ চৌধুরীর সাধনা ব্যর্থ করার জন্য একজন কি অন্যায় আবদার আরম্ভ

করিয়াছে, রাতদুপুরে গাছতলায় সম্মুখে বসিয়া নীরবে বৃষ্টির জলে ভিজিতেছে ? স্ত্রী বলিয়া নয়, ছেলের মা বলিয়া নয়, একজন স্ত্রীলোকের এত কষ্ট চোখে দেখিয়া স্থির থাকার মত মনের জোর যে মহেশ চৌধুরীর নাই প্রভু।

সদানন্দ অবশ্য তখন ঘুমাইতেছিলেন। আজ বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। কিন্তু জানা থাকিলেও মহেশ চৌধুরীর কিছু আসিয়া যাইত না। পাথরের দেবতার কাছেও মানুষ প্রার্থনা জানায়—ঘুমন্ত মানুষ তো জীবন্ত। নয় কি ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সুদূরপ্রাচ্যে খৃষ্টধর্ম্ম

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা পড়ে উপকৃত হ'লুম। তার জন্য বাগচী মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার প্রবন্ধ বাগচী মহাশয়ের চিন্তাশীল মনে "আন্দোলন" সৃষ্টি করেছে। তাঁর সমালোচনাও আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এখানেই শোধবোধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাঠকদের মধ্যে অনেকেই হয়তো শোধবোধসংবাদে তৃপ্ত হবেন না। তাঁরা চান আলোচ্য বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত। কিন্তু ভয় হয় পাছে আলোর চেয়ে তাপ বেশী হয়ে পড়ে। তবে ভরসা এই যে সাবধানের বিনাশ নেই।

চীনে ও জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে আমি চৈত্র সংখ্যায় যা' লিখেছিলুম, তা' ভেবে চিন্তেই লিখেছিলুম। চীনদেশের ও জাপানের বৌদ্ধ, শিন্তো, কনফুশিয়ান ও খৃষ্টান মনীষীদের সঙ্গে আলোচনা করে ও তাঁদের মতামত ওজন করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা পরিচয়ে ব্যক্ত করেছি। অবশ্য একথা বলে রাখা ভাল যে এঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ফরাসিদেশে ও ইংলণ্ডে। চীন ও জাপান সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় যে সব প্রামাণিক বই লেখা হয়েছে, সে সব বই বর্ণাশ্রমীদের প্রথা মতন একেবারে অস্পৃশ্য করে রাখিনি। বৃহত্তর-ভারতসমিতির সভায় অনেক বক্তৃতা শুনেছি; গোলদিঘির বিহারেও যাতায়াত ছিল। এ দুটি জায়গায় যা শুন্‌তুম, তা ইংরিজি কায়দায় with a grain of salt নিতুম।

আত্মচরিত ছেড়ে এখন যুক্তির পথে আসা যাক্। গীতাকার বলেন যে যদি শুধু মধ্য ব্যক্ত থাকে, তাহলেও পরিদেবনা সমীচীন হবে না। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে একথা সত্য হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। কিন্তু ঐতিহাসিক সমালোচনায় যদি প্রথমাঙ্ক ও তৃতীয়াঙ্ক বাদ দিয়ে কেবল দ্বিতীয়াঙ্ক উদ্ঘাটিত করা হয়, তাহলে কালস্রোত যে উদ্দেশ্য বহন করে চলেছে, সে উদ্দেশ্যটি ধরা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইতিহাস একটা বিকট প্রহসনে পরিণত হয়। প্রথমাঙ্কের একটি ঘটনা ও তৃতীয়াঙ্কের আর একটি ঘটনা সম্বন্ধে বাগচী মহাশয় একেবারে

চেপে গিয়েছেন। সেই গোপন কথাটি ঐতিহাসিকের মুখ দিয়ে পাঠকদের শোনাতে চাই।

Brinkley ও Kikuchi প্রণীত ইতিহাস থেকে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করে বাগচী মহাশয় বলতে চান যে "জাপানে খৃষ্টধর্ম্ম কোন দিন প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি, জাপানি সরকার বরাবরই কঠোর দমননীতি অবলম্বন করে সে ধর্ম্মকে জাপানে প্রসার লাভ করতে দেয়নি।" বাগচী মহাশয়ের মতে চীন ও জাপান সম্বন্ধে আমি যা লিখেছিলুম তা "ঐতিহাসিকেরা সমর্থন করে না।" ব্রিংক্লে ও কিকুচি প্রণীত বই থেকে বাগচী মহাশয় যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন, তা দিয়ে আমার মত খণ্ডন করা সম্ভবপর নয়। আমি তো এই সব ঘটনার কথাই বৈশাখসংখ্যায় উল্লেখ করেছিলুম। বাগচী মহাশয় যে সব অংশ উদ্ধৃত করেছেন, সে অংশগুলির সত্যতা কোন ঐতিহাসিক অস্বীকার করবে না। তবে তিনি একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন। তিনি জাপানের ইতিহাস একটু বিকৃত করে বর্ণনা করেছেন। সে দেশের ইতিহাসের গোড়ার ও শেষের দিগ্‌টা তিনি বেমালুম ত্যাগ করেছেন। পুঁথিতে পড়েছি যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হলে পণ্ডিতেরা অর্দ্ধেক ছেড়ে দেন ; বাগচী মহাশয় অর্দ্ধেকেরও বেশী ছেড়েছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম বিপন্ন হয়েছে না কি ?

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যখন খৃষ্টান প্রচারকেরা জাপানে এল, তখন জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ খৃষ্টধর্ম্মের খুব সহায়তা করেছিল। এর কারণ কি ? বৌদ্ধদের দাবিয়ে রাখবার জন্যই তারা খৃষ্টান প্রচারকদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। বৌদ্ধরা জাপানে অরাজকতা এনেছিল, তারা উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করতো। ষড়যন্ত্র করে রাজক্ষমতা নিজেদের হাতে আনতে চেষ্টা করতো। সেই ভয়ে জাপানের কর্ত্তৃপক্ষ খৃষ্টানদের সাদরে গ্রহণ করেছিল। বাগচী মহাশয় ইঙ্গিতে বলতে চান যে খৃষ্টধর্ম্মকে জাপানীরা ঘৃণা করে কারণ তারা ভাবে যে এই ধর্ম্ম একটা রাষ্ট্রীয় গণ্ডগোলের সৃষ্টি করবে। ইতিহাসের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট যুগে জাপানীরা খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে এ রকম ধারণা পোষণ করতো। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে জাপানের কর্ত্তৃপক্ষীয় লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও এই রকম মনোভাব দেখিয়েছিল। ব্রিটিশ বিশ্বকোষের চতুর্দ্দশ সংস্করণে "জাপান"শীর্ষক প্রবন্ধে কতকগুলি ঘটনা উল্লেখ

করা হয়েছে, যা পড়লে অনেকেরই বৌদ্ধপ্রীতি (অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্মকে খর্ব্ব করবার জন্য যতটা বৌদ্ধপ্রীতি দরকার) রূঢ়ভাবে বিচলিত হবে। একটি অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"Nobunaga hated and feared the Buddhist Church and was resolved to humble it. For this reason and because he hoped to use Christianity as a counterpoise he encouraged the new religion i. e. Christianity". (Ency. Brit., 14 th. ed.)

এর পূর্ব্বেকার ইতিহাস নিম্নলিখিত অংশ থেকে বোঝা যাবে। "Buddhism became more and more temporal. It began to interfere in political affairs. Great monastaries were filled with armed monks, its prelates were involved in intrigues about the throne,...The Emperor Sherakawa once exclaimed, "Three things there are which I cannot control—the river Komo in flood, the fall of the dice and the monks of Buddhism" (Ency. Brit. 14 th. ed. "Japan")

ব্রায়ন তাঁর "জাপানের ইতিহাস" নামক পুস্তকে খৃষ্টানপীড়নের বর্ণনা দিয়েছেন এবং কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে ব্রায়ন সম্বন্ধে কিছু বলে রাখা ভাল। তিনি জাপানে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ইদানীং তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানের সভ্যতা ও ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। বাগচী মহাশয় যে সব হেতু দেখিয়েছেন, সে সব ব্রায়ন বাদ দেননি। উৎপীড়কদের স্বপক্ষে যথেষ্ট রাজনৈতিক কারণ দেখানো যেতে পারে। ব্রায়ন মোটের ওপর জাপানী রাজপুরুষদের দোষী বলে মনে করেন না। তবে অনেক নির্দ্দোষ জাপানী খৃষ্টধর্ম্মের জন্য নির্ভয়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। জাপানে খৃষ্টানপীড়নের অনেকগুলি কারণ ছিল। দুটি কারণ এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

"But when Hideyoshi saw that the Christian Church could not approve of his character and was bound to oppose his principles and practices, he issued an edict against Christianity...Hideyoshi said to one of the Jesuits, 'Everything in your religion contents me except the prohibition of more than one wife" (History of Japan by Bryan pp. 43-44)

নিম্নলিখিত অংশ থেকে আর একটি কারণ জানা যাবে। "In 1622 there were 120 martyrs···the following year there were 500. It is believed that the number of martyrs between 1614 and 1638 was about 200,000 including many well-born ladies...mothers with children went fearlessly to the cross. A religion of such obduracy signified itself as all the more dangerous to the state" (Bryan's History of Japan p. 49)

বাগচী মহাশয় ইতিহাস ঘেঁটে যে সব খবর সংগ্রহ করেছেন, সে সব ১৮৭৩ সনের আগেকার কথা। জাপান যখন নিজেকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তখনকার কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হয়েছেন। কিন্তু সে ইতিহাস তো হেমকবিবর্ণিত "অসভ্য জাপানের" ইতিহাস। জাপানের গৌরবময় যুগ আরম্ভ হ'লো যখন জাপান বিচ্ছিন্নতার জাল কেটে বেরুলো এবং উন্মুক্ত বহির্জগতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অধ্যাপক আনেসখি সে যুগের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। আনেসখি বুদ্ধের উপাসক। তাঁর "জাপানী ধর্ম্মের ইতিহাস" পড়লে মনে হয় যেন দুটি বিষয়ে তিনি বড় অসোয়াস্তি বোধ করছেন। একটি হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিদেশীয়ত্ব আর একটি হচ্ছে বিশ্ববিজয়ী খৃষ্টধর্ম্মের অনিরুদ্ধ জয়যাত্রা। প্রথমোক্ত কারণে তিনি শিন্তো প্রচারক মোতোয়ারি (১৭৩০ খৃঃ) ও হিরাতার (১৭৭৬) বিস্তৃত সমালোচনা না করে আমতা আমতা করে সেরেছেন। এ দুজনই জাপানী সাহিত্যাকাশে দুটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। দুজনই জাপানকে বিদেশী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। বলা বাহুল্য যে পরমসৌগত আনেসখি এ দুজনকে নেকনজরে দেখেন না। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে আনেসখি বেশ একটু মুস্কিলে পড়েছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের এই নূতন প্রতিদ্বন্দ্বীকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাবেন না নাসিকা কুঞ্চিত করে এই ধর্ম্মকে অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক বলে অপদস্থ করবেন। বিভ্রাট আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে কারণ জাপানের বর্ত্তমান বৌদ্ধসমাজে খৃষ্টান তোহিকো কাগোয়ার মতন জনসেবক আবির্ভূত হয় নি। কিন্তু জাপানী চিন্তাধারা বাস্তবের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক সত্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করে না। মোটের ওপর অধ্যাপক আনেসখি খৃষ্টধর্ম্মকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। তাঁর Buddhist Art নামক গ্রন্থটি তিনি খৃষ্টান সন্ন্যাসী St. Francis of

Assisi র পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। আনেসখি তাঁর "জাপানী ধর্ম্মের ইতিহাসে" লিখেছেন—

"The most prominent feature of the religious movements in the eighties was the rise of Christianity…the attitude of the government was one of tolerance, even of encouragement in some quarters because they highly appreciated the amount of educational work done by the missionaries… the year 1873 was memorable for the repeal of the prohibition of Christianity…a remarkable man was Nakamura (1891). He combined his Confucianism with Christian theism.. He produced a translation of Mill's "Liberty" and Martins "Evidences of Christianity" and this latter inspired some Confucianists with enthusiasm for Christianity." (History of Japanese Religion by Prof. M. Anesaki ; pp. 346, 350, 353).

তাঁর গ্রন্থে অধ্যাপক আনেসখি নিসিমা, সায়ায়ামা প্রভৃতি খৃষ্টান জননায়কদের জীবনী বর্ণনা ও আলোচনা করেছেন।

১৮৭৩ সন জাপানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই সময় খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রদ করা হয়। বিগত শতাব্দীর পঞ্জিকা থেকে যদি এই বৎসরটি বাদ দেওয়া সম্ভবপর হতো, তাহলে জাপান আজ ভারতের উত্তরাংশে স্থিত কোনও এক তথা-কথিত "স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের" মত isolation নামক যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকতো। কিন্তু নিপ্পন বিচ্ছিন্নতার মোহ কাটিয়ে একবার তাকালে বিরাট পৃথিবীর দিকে। বিরহবিধুরের মতন জাপান ব্যাকুল হয়ে উঠলো বিশ্বের সঙ্গে যোগ স্থাপন করবার জন্য। নূতন চিন্তাস্রোত ও অভিনব ভাবধারা জাপানীহৃদয় আন্দোলিত করলে। তথাগতের রাজ্যে খৃষ্টের বাণী প্রচারিত হলো। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল জাতি খৃষ্টধর্ম্মের আহ্বান অগ্রাহ্য করলে না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পর যা ঘটেছিল, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অধ্যাপক ব্রায়ন দিয়েছেন,—

"Some 3000 Christians were found to have descended from the Church of the Martyrs…The Christian Church made steady progress and Christian ethics had more influence over the national mind than any other one moral force, as may still be seen from the Press, and public opinion generally.

There are about 300,000 baptized Christians in Japan and some 300,000 in Korea". (History of Japan by Bryan p. 68).

৫৮৩ খৃষ্টাব্দে কোরিয়া থেকে এক বুদ্ধমূর্ত্তি আমদানি করা হলো। সে সময়ে জাপানে কতকগুলি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। জাপানীরা ভাবলে যে যত অনিষ্টের মূল হচ্ছে এই নূতন দেবমূর্ত্তি। তারা গেল চটে। ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজকুমার শোতাকু বৌদ্ধধর্ম্মকে জাপানে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নিজ শক্তি প্রয়োগ করলেন। এর ফলে জাপানে অনেক বৌদ্ধমন্দির তৈরি হলো। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম্ম খানিকটা প্রসার লাভ করলে। কিন্তু বৌদ্ধ প্রচারকেরা বুঝতে পারলেন যে শিন্তোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না হলে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তৃতি কষ্টকর হবে। শিন্তোধর্ম্মের দেবতারা হয়ে গেল বুদ্ধের অবতার। তাতে এই বিদেশী ধর্ম্মের প্রসার কিছু পরিমাণে সহজ হলো বটে কিন্তু আশানুরূপ ফল হয়নি। ৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তেম্মু জাপানে বৌদ্ধানুষ্ঠান গৃহস্থের পক্ষে বাধ্যতামূলক করলেন। রাজপুরুষদের সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যেতে লাগলো। শিন্তোর প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর ঘটলো এবং শিন্তোও বৌদ্ধপ্রভাবে কিছু পরিবর্ত্তিত হলো। মধ্যযুগে চীনের তাও ও কন্‌ফুশীর সাহিত্য জাপানী বৌদ্ধধর্ম্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো। চীনের সভ্যতা ও বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানের সংস্কৃতিকে একটা নূতন রূপ দিলে। শিল্প ও কৃষ্টির অন্যান্য অঙ্গ পুষ্টিলাভ করতে লাগলো।

আধুনিক জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্য্যন্ত এই ধর্ম্মের প্রভাব অর্দ্ধশিক্ষিত ও ঈষৎ শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত-সমাজ এই ধর্ম্মকে বড় একটা গ্রাহ্য করতো না। ইদানীং খৃষ্টধর্ম্মের প্রেরণায় ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মতলবে জাপানের বৌদ্ধ-সমাজ জেগে উঠেছে। জাপানের বৌদ্ধমহলে revival সুরু হয়েছে। কিন্তু জাপানী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞদের মতে জাপানের জাতীয় জীবনের ওপর খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব বৌদ্ধধর্ম্মের চেয়ে বেশী। Young East নামক বৌদ্ধ পত্রিকায় একজন জাপানী লেখক "Christian Stimulus to Buddhism" শীর্ষক প্রবন্ধে নির্ভীকভাবে স্বীকার করেছেন জাপানের আধুনিক বৌদ্ধসমাজ নবজাগরণের প্রেরণা পেয়েছে খৃষ্টধর্ম্ম থেকে। জাপানের বৌদ্ধ-যুব-সঙ্ঘ, বৌদ্ধ-মুক্তি-ফৌজ,

বৌদ্ধ রবিবাসরীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি খৃষ্টানদের অনুকরণে গঠিত হয়েছে (Young East, Japan, Dec. 8, 1925. p. 202) অধ্যাপক আনেসখি তাঁর জাপানী ধর্ম্মের ইতিহাসে খৃষ্টধর্ম্মের কাছে জাপানের ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আনেসখি বলেছেন, "In social work Japanese Buddhism has derived much stimulus from Christainity". (History of Japanese Religion, p. 407)। বাস্তবপ্রিয় জাপানী মনোবৃত্তি ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে না।

জাপান সম্বন্ধে যাঁরা খোঁজ রাখেন, তাঁরা জানেন যে টোকিয়োস্থ Foreign Affairs Assosiation কর্ত্তৃক Japan Year Book নামক একটি তথ্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। মিষ্টার কে, ইনাহারার সম্পাদনায় বিশেষজ্ঞেরা এই গ্রন্থে প্রবন্ধ লেখেন। ১৯৩৫ সালের সংস্করণের ভূমিকায় ইনাহারা লিখেছেন যে জাপানের অবস্থা যথার্থভাবে বর্ণনা করা গ্রন্থটির উদ্দেশ্য ("to present the country as it is before the reader")। উক্ত পুস্তকে "জাপানের ধর্ম্ম" শীর্ষক অধ্যায়ে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য ব্যক্ত করা হয়েছে—

"Christianity has made valuable contribution towards the civilisation of Japan with its world-wide nature and positive teachings on human life. The number of believers is comparatively small but its influence on people's thought and morals is said to be even greater than that of Buddhism. It has raised Japan's moral standard waging war against licensed prostitution, the low position of women, drinking and smoking, and polygamy as practised in a certain section of society...The future of Christianity is hopeful".—Japan Year Book, 1935, edited by K. Inahara and published by the Foreign Affairs Association of Japan. p. 808

জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে জাপানীদের মত উদ্ধৃত করেছি। এখন দু'একজন বিশেষজ্ঞ বিদেশীদের অভিজ্ঞতা আলোচনা করবো। অধ্যাপক ব্রায়নের পরিচয় আমি গোড়াতেই দিয়েছি। তিনি জাপানের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখেছেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে বইখানা ছাপা হয়। ষষ্ঠদশ অধ্যায়ের শেষভাগে অধ্যাপক ব্রায়ন লিখেছেন—

"In recent years the public mind (of Japan) has assumed a more

favourable attitude toward Christianity...Christianity is beneficial to the nation. The scientists of Japan feel too that Christianity has more prospect of being able to endure the light of modern learning than either Buddhism or Shinto." (A History of Japan by Bryan p. 79)

আর একজন বিশেষজ্ঞ বিদেশীর মত উল্লেখ করবো। অধ্যাপক George William Knox, টোকিয়োর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র পড়াতেন। তারপর তিনি নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষভাগে Development of Religion in Japan নামক এক নাতিদীর্ঘ বই লিখেছিলেন। এই বইয়ে তিনি শিন্তো, কন্‌ফুশীয় ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মেরও মাঝে মাঝে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন —

"The influence of Christianity already stirs Japan and the future is with it." (p. 195)

খৃষ্টধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের জয়পরাজয় নিষ্পন্ন হবে স্বাধীন জাপানে। কিন্তু সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম বনাম খৃষ্টধর্ম্ম নিয়ে শক্তিপরীক্ষা হবে না। পরীক্ষা হবে প্রীতির ; সংগ্রাম হবে ত্যাগের। যে ধর্ম্ম যত বেশী নিঃস্বার্থ জনসেবা ও আত্ম-ত্যাগ দেখাতে পারবে, সেই ধর্ম্ম তত বেশী শক্তিশালী হবে। এ বিষয়ে জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। আধুনিক জাপানে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে।

বাগচী মহাশয় বলেন যে "জাপানে একমাত্র ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম। শিন্তো কোন ধর্ম্ম নয়।" একটি নির্দ্দিষ্ট দার্শনিক অর্থে শিন্তো হয়তো ধর্ম্ম নাও হোতে পারে। সেই নির্দ্দিষ্ট অর্থে কন্‌ফুশিয় নীতিও ধর্ম্ম নয়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম—বিশেষতঃ হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম—ধর্ম্ম নয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতগুলি নৈতিক প্রণালী মাত্র। কিন্তু ব্যাপক অর্থে এই তিনটি ধর্ম্মপদবাচ্য। Aston তৎপ্রণীত "Shinto the Way of the Gods" নামক গ্রন্থে শিন্তোর উপাসনা পদ্ধতি, প্রার্থনা ও সংস্কার বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্যাপক অর্থে শিন্তো কেন ধর্ম্ম বলে অভিহিত হবে না, তা বলা শক্ত। আনেসখি তাঁর "জাপানী ধর্ম্মের ইতিহাসে" শিন্তোবাদ, কন্‌ফুশিয়ান্ নীতি, তাও নীতি, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্মের উল্লেখ ও সমালোচনা করেছেন। তবে বইখানি ১৯০৭ খৃঃ অব্দে

লেখা হয়েছিল। এখন বোধ হয় চীন-বিদ্বেষের দরুণ কন্‌ফুশিয়ান ধর্ম্ম ও তাও-নীতি জাপানে তেমন প্রবল নয়। অধ্যাপক নক্‌স তাঁর "Development of Religion in Japan" নামক পুস্তকে শিন্তো, কন্‌ফুশিয়ান্ নীতি, ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মেরও উল্লেখ করেছেন। ইনাহারা সম্পাদিত Japan Year Book (1935) নামক পুস্তকের "জাপানের ধর্ম্ম" শীর্ষক অধ্যায়ে শিন্তো, বৌদ্ধধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম—এই তিনটি ধর্ম্মই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে। নির্দ্দিষ্ট দার্শনিক অর্থে শিন্তো ধর্ম্ম নাও হোতে পারে। কিন্তু শিন্তোর প্রভাব জাপানে খুব বেশী। শিন্তোবাদই জাপানীদের শিখিয়েছে যে জাপান দেবভূমি ও জাপানীরা অমৃতের পুত্র। শিন্তোর দেবতারা উদীয়মান সূর্য্যের দেশে বিচরণ করে, পশ্চিমের কোন এক চিরপরাধীন দেশ তাদের জন্মভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র নয়। এমন অনেক জাপানী আছে যাদের বৌদ্ধধর্ম্মে মোটেই বিশ্বাস নেই। কিন্তু এমন কোন জাপানী নেই যে শিন্তোর অন্ততঃ কতকগুলি মতে (সব মত নয়) সায় না দেয়। জাপানী লেখক Nitobe বলেন—

"Shinto is the ensemble of the emotional elements of the Japanese nation."

অধ্যাপক নক্‌স বলেন—"In a true sense Shinto embodies the religion of the Japanese people—its power is not in dogmas nor in forms of worship : it is a spirit—the spirit of old Japan Yamata damashi. (Development of Religion in Japan, p. 97)

অভিজ্ঞ পর্য্যবেক্ষক Holland বলেন—"In Japan Shinto remains today not merely the real faith of the Japanese as a whole but the embodiment of the loyalty of the people to the motherland. It is for this reason that there can be but one answer to the enquiry, "what is the religion of the Japanese ?" (Old and New Japan, by Holland, p. 26)

বৌদ্ধপ্রীতির বশবর্ত্তী হয়ে বাগচী মহাশয় বলেছেন যে, "শিন্তো ও বৌদ্ধের মধ্যে বিরোধের কারণ ঘটে নাই।" জাপানের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান ভাসা ভাসা, তাঁরা হয়তো বিনা আপত্তিতে বাগচী মহাশয়ের এই উক্তি সমর্থন করবেন। কিন্তু যাঁরা জাপানী ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা

করে থাকেন, তাঁরা জানেন যে এ বিষয়ে ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্য রকম। বৌদ্ধধর্ম্মের বিদেশীয়ত্ব নিয়ে অনেক জাপানী লেখকই ফাঁপরে পড়ে যান। এই ঐতিহাসিক সত্যটি হজম করা তাঁদের পক্ষে খুব সহজ নয়। একথা অবশ্য সত্য যে জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানীরূপ গ্রহণ করেছে, জাপানের আবহাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। কিন্তু রূপক ভাষায় বলা যেতে পারে যে যদিও বুদ্ধ জাপানে কিমোনো পরে চলাফেরা করেন, তা'হোলেও তাঁর বিদেশীয়ত্ব সম্বন্ধে অনেক জাপানীই সচেতন। আর এই বিদেশীয়ত্ব নিয়েই শিন্তোর সঙ্গে সৌগতধর্ম্মের সংঘর্ষ হয়েছিল। বুদ্ধভক্ত অধ্যাপক আনেসখি তাঁর গ্রন্থে এ বিষয় নিয়ে বেশী উচ্চবাচ্য করেন নি। তার কারণও সহজে অনুমেয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাবুচি, মোতোয়ারি ও হিরাতা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জাপানকে এই বিদেশীয় ধর্ম্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করা। হিরাতা বলতেন, "বৌদ্ধধর্ম্মের বিবরণ স্ত্রীলোক ও শিশুদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে। এই মতবাদ এত হেয় যে তা খণ্ডন করাও আমার আত্মমর্য্যাদার পক্ষে হানিকর হবে।" অধ্যাপক আনেসখি তাঁর পুস্তকে তোজু নামক এক ধর্ম্মপ্রচারকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। আনেসখি বলেন যে তোজু (১৬০৮-১৬৪৮ খৃঃ) বিশ্বাধিপতির পিতৃত্ব ও মানুষের পুত্রত্ব প্রচার করেছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, তবে আনেসখি লিখেছেন যে তোজু খৃষ্টান প্রচারকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। এই জাপানী প্রচারক বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধিতা করেছিলেন এবং বৌদ্ধসুলভ কর্ম্মবিমুখতার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তোজুর ওপর শিন্তোবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা সে বিষয় আনেসখি কোন বিচার করেন নি। তবে মাবুচি, মোতোয়ারি ও হিরাতা যে শিন্তোর প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে বৌদ্ধধর্ম্মকে জাপান থেকে বিদূরিত করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন, সে কথা অনেক ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এঁদের শিক্ষার প্রভাবে গত শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত অর্থাৎ disestablished হয়েছিল। সে সময় জাপানের বৌদ্ধসমাজে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

এখন দুজন বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করবো। B. H. Chamberlain টোকিয়োস্থ রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞের নাম Dr. W. G. Aston। ইনি টোকিয়োর ব্রিটিশ দূতাবাসের দপ্তরে একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। জাপানী ভাষায় তাঁর বেশ দখল ছিল। তিনি "Shinto the Way of the Gods" নামক এক প্রামাণিক গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় রচনা করেছিলেন। তিনি জাপানী সাহিত্যের একখানা ঐতিহাসিক বিবরণও লিখেছিলেন। অধ্যাপক চেম্বারলেন বলেন—

"During the 17th and 18th centuries, the literati of Japan turned their eyes backward on the country's past...soon the movement became religious and political—above all patriotic, notably chauvinistic. Buddhism and Confucianism were sneered at because of their foreign origin. The great scholars Mabuchi (1697—1764), Motoori (1730—1801) and Hirata (1779—1843) devoted themselves to religious propaganda...Buddhism was disestablished and disendowed and Shinto was installed as the only state religion. The literary style of the Shinto writers outshines anything produced by the Buddhists." (Things Japanese, by Prof. B. H. Chamberlain pp. 416-18).

ডক্‌টার এস্‌টন তৎপ্রণীত "জাপানী সাহিত্যের ইতিহাসে" লিখেছেন—

"Shinto had suffered grievously from the encroachments of Buddhism··· This state of things was a great grief to Motoori. It drove him back from the present to the old unadulterated Shinto···Here he found the satisfaction to his mind and heart which he had failed to find elsewhere. Himself convinced of the excellence of the old, national religion, he made it the business of his life to propagate Shinto among his fellow-countrymen and to denounce the abominable depravity of those who neglected it in favour of sophistical heresies imported from abroad." (History of Japanese Literature, by Aston, pp. 326-27)

মাবুচি, মোতোয়ারি ও হিরাতা—এই তিনজন জাপানী জননায়ক কন্‌ফুশিয়ান নীতি ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এ দুটি ধর্ম্ম জাপানীদের কাছে বৈদেশিক। মোতোয়ারির লেখায় কন্‌ফুশিয়ান নীতির বিদ্বেষ ও হিরাতার লেখায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিদ্বেষ অধিকতর স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বাগচী মহাশয় লিখেছেন, "খৃষ্টধর্ম্মের পেছনে যদি ইউরোপীয় রাজশক্তি

না থাকত এবং চীনাদের যদি ভাগ্যবিপর্য্যয় না ঘটত তাহলে তারা খৃষ্টধর্ম্মকে তাদের দেশে কি স্থান দিত তা ভাববার কথা। চীনদেশে জাতীয়তাবাদ যেদিন সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সে দিন বৌদ্ধধর্ম্মের মত খৃষ্টধর্ম্মও সে দেশ হতে নির্ব্বাসিত হবে একথা মনে করা অসঙ্গত নয়।" চীনদেশ সম্বন্ধে বাগচী মহাশয় যা বলেছেন, তাতে তিনি নিজের ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছেন। অনেকেই ভাবেন যে তাঁদের অবরুদ্ধ বাসনার বোঝা বহন করা ছাড়া ইতিহাসের অন্য কোন জরুরি কাজ নেই। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের আকাঙ্ক্ষা সাফল্যমণ্ডিত করা যে ইতিহাসের চরম লক্ষ্য নয়, ইতিকথা যে নিজের গরবে গরবিনী, এ সব সত্য তাঁরা মনে রাখতে পারেন না। চীনদেশে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে এখানে সবিস্তারে আলোচনা করবো না। শুধু দুয়েকটি প্রসঙ্গের অবতারণা করবো। নব্যচীনের অগ্রদূত Sun Yat Sen খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টভক্ত বলে পরিচয় দিতে তিনি গৌরব অনুভব করতেন। আধুনিক চীনের অনেক বিশিষ্ট রাজদূত খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস করেন। সমরনায়ক চিয়াংকাইসেক খৃষ্টের উপাসক এবং তিনি ভক্তিপ্লুত চিত্তে বাইবেল পড়ে থাকেন। আধুনিক ইউরোপের রাজনৈতিক প্রতাপ খৃষ্টধর্ম্মের সহায়তা করেনি। খৃষ্টধর্ম্মের বিস্তৃতির পথে এই রাজনৈতিক প্রতাপ একটা মস্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর দরুণ অনেকেই ভয়ে ও ঈর্ষায় খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধিতা করে থাকেন।

খৃষ্টধর্ম্ম জগতে ছড়িয়ে পড়েছিল সেই যুগে যে যুগে খৃষ্টানদের কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না। খৃষ্টধর্ম্ম উৎপীড়ন ও বিঘ্ন সত্ত্বেও প্রবল হয়েছিল বলেই Constanine এই ধর্ম্মের পৃষ্টপোষকতা করেছিলেন। তিনি যখন এই ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ান। অদীক্ষিত অবস্থায় তিনি এই ধর্ম্মের ভবিষ্যৎ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। খৃষ্টধর্ম্ম চীনদেশে সাদরে গৃহীত হয়েছিল যখন ইউরোপ অর্দ্ধবর্ব্বরতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। আর খৃষ্টধর্ম্মের বার্ত্তা চীনদেশে প্রচার করেছিলেন প্রাচ্যদেশীয় খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা। তাঁরা সিরিয়াদেশের লোক ছিলেন। তাঁদের মাতৃভূমি তখন বিদেশীরা অধিকার করে নিয়েছে। তাঁদের তখন কোনই রাজনৈতিক প্রতাপ ছিল না। নিম্নে উদ্ধৃত বর্ণনা থেকে এর ইতিহাস স্পষ্ট বোঝা যাবে।

"According to inscriptions it would appear that Christianity was

brought to China about the year 635 A. D. by Alopen, who, coming from Syria with sacred books, braved difficulties and dangers. This was in the time of the Emperor Taitsung (627-650 A. D.) of the Tang dynasty. The Emperor was favourable to the new religion and in 633 issued the following decree. "Alopen, a Persian monk, bringing the religion of the scriptures from far, has come to offer it at the chief metropolis. The meaning of his religion has been carefully examined. It is mysterious, wonderful, calm. It fixes the essentials of life and perfection. It is right that it should spread through the Empire. Therefore let the ministers build a monastary and let twenty-one members be admitted as monks." Alopen was thus able to establish a monastary, and before the end of the century the new religion had spread through ten provinces, many more monastaries being founded. The next Emperor, if not himself a Christian, nevertheless continued to favour the new faith.. a little latter there was again an Emperor favourable to the Christians, YuenTsung (713-755 A. D.)"—The Nestorian Churches, by Vine (pp. 130-37).

রাজকীয় অনুশাসন লিপি পড়ে আমরা জানতে পারছি যে চীনসম্রাট তাইত্সুং (৬২৭-৬৫০ খৃঃ) খৃষ্টধর্ম্মের গভীরতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে এই ধর্ম্ম যাতে অবাধে প্রচারিত হতে পারে সে জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন। যাঁরা এ সময় খৃষ্টধর্ম্মের বার্ত্তা চীনদেশে প্রচার করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন প্রাচ্যবাসী নিঃসম্বল খৃষ্টান সন্ন্যাসী। ক্ষুদ্র ও পরাধীন সিরিয়া দেশ থেকে তাঁরা এসেছিলেন। তাঁদের মাতৃভূমি তখন অখৃষ্টান বিদেশীদের করতলগত ছিল। এই সন্ন্যাসীদের পেছনে কোন রাজশক্তি ছিল না। প্রাচ্যের গগনে তখন ইউরোপীয় রাজশক্তির ত্রাসজনক ধূমকেতু দেখা দেয়নি। আর ইউরোপে তখন অন্ধকার যুগের তমিস্রা ঘনিয়ে আস্‌ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম উপনিষদের ভূমার মতন নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। এ ধর্ম্ম রাজশক্তির মুখাপেক্ষা করে না। চীনদেশের ইতিহাস পড়লে এই সত্যটি বোধগম্য হবে।

অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনভাষার শিক্ষক অধ্যাপক সুট্‌হিল এ বিষয়টি

তাঁর "চীনদেশের ইতিহাস" নামক বইয়ে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে সম্রাট্ তাইত্সুং অমিতপ্রতাপ অধিপতি ছিলেন এবং তাঁর রাজত্বকালে চীনদেশ খুবই সমৃদ্ধিশালী ছিল অর্থাৎ চীনদেশের তখন "ভাগ্য বিপর্য্যয়" স্বপ্নেরও অতীত ছিল। চীনাধিপতি আড়ম্বরহীন খৃষ্টধর্ম্মের শান্তভাব ও গভীরতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। ব্রিটিশ বিশ্বকোষের একাদশ সংস্করণে চীনদেশ সম্বন্ধে যিনি প্রবন্ধ লিখেছেন, তিনি সেই প্রবন্ধের "চীনদেশের ধর্ম্ম" শীর্ষক অধ্যায়ে সম্রাট্ তাইত্সুং-এর অনুশাসন লিপি নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন।

ইউরোপের রাজনৈতিক প্রতাপ ঈশার ধর্ম্মের পরিপন্থী। এ জন্যই খৃষ্টবিভীষিকা ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে উৎকট আকারে দেখা দিয়েছে। ইংরাজ মিশনারি এদেশে খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারে সহায়তা করেছে না বাস্তবিকপক্ষে এ ধর্ম্মের প্রসার কষ্টসাধ্য করে তুলেছে, সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখক অকৃত্রিম সন্দেহ পোষণ করে থাকেন। স্বদেশপ্রীতির উন্মাদনায় অনেকে বিদেশীদের আঘাত করতে গিয়ে এশিয়ার দুলাল যীশুকে আঘাত করেছে। উত্তেজনার বশে লোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে; আত্মপরজ্ঞান লোপ পায়। চীন ও জাপানের ঐতিহাসিক রঙ্গমঞ্চে এই ভীতিমূলক নাটকের অভিনয় একাধিকবার হয়ে গিয়েছে। ঘটনাবহুল খৃষ্টধর্ম্মের ইতিহাসের ওপর এই বিভীষিকা মস্ত একটা গ্লানির ছাপ রেখে যাবে। আর এই কলঙ্করেখা প্রত্যেক খৃষ্টভক্তকে ধিক্কার দেবে। কিন্তু পূর্ব্ব এশিয়ার ইতিবৃত্তে এইটি শেষ পর্ব্ব নয়। এই কালিমার পেছনে আছে বালার্কের সুবর্ণচ্ছটা। নেপথ্যে সাধারণ দর্শকের অগোচরে প্রাচ্যের পূর্ব্ব সীমায় নূতন এক ভাবাত্মক কাব্যের মহড়া চলছিল। এর পরিণতি লক্ষ্য করে ঐতিহাসিক শেষ অধ্যায়ে লিখবে যে সুদূর প্রাচ্যে খৃষ্টধর্ম্ম নবযুগের ও নবজীবনের প্রেরণা এনেছিল।

শ্রীআশানন্দ নাগ

সিখ সম্রাট ও সতীর সাপ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শৌচাদি সারিয়া সিংহজী হাস্যমুখে বাহিরে আসিয়া জঙ্গীদের সেলামী ও অন্য দরবারীদের "ফতেঃ বুলাওয়া" লইতেন ও সকলকে আত্মীয় বন্ধুভাবে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া সবাইকার সহিত এক আসনে বসিতেন। এখন ঘটা করিয়া আফিং খাইতেন। সরদাই, মাজূণ, ফলক-সয়র আদি প্রস্তুত থাকিত এবং যাহার যা 'আমল' করা অভ্যাস, সেবন করিত। সিখেদের সকলরকম ধূমপান নিষিদ্ধ, সে জন্য গাঁজা, চরস ত্রিসিমানায় আসিত না। আমাদের মধ্যে অ-সিখ যাহারা তামাক খাইত, তাহাদের অন্য এক কামরায় যাইতে হইত। জোঁদা গোঁড়া সিখ সর্দ্দারদের উদারতা শিখাইবার জন্য মিসর দেওয়ান চাঁদকে দরবার মধ্যে তামাক খাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। মিসরজীকে ত লক্ষ টাকা দামের ফর্শি ও পেঁচওয়াল সিংহজী উপহার দিয়াছিলেন। মিসরজী খালসার দ্রোণাচার্য্য। এই ব্রাহ্মণ মহারথী সিখদের সমরবিজ্ঞান শিক্ষাদান করিয়াছিলেন, ও ইঁহারই রণকৌশলে সিংহ মহারাজ নিজ নাম সার্থক করিয়াছিলেন। বৈকালে নিয়ম ছিল জঙ্গী সর্দ্দাররা পূরা উর্দ্দি (full uniform) পরিবে ও অন্যরা যাহার যথাসাধ্য সাজসজ্জা * করিবে ও অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত হইয়া আসিবে। সিংহজী কিন্তু খুব সাদাসিধা মলমলের অংরখ্যা, লষ্ঠার চূড়ীদার পাজামা, বাসন্তী রংয়ের সাফা পরিতেন। সকলে ঘোড়ায় করিয়া বাহির হইতাম। সিংহজী জগতে অতুল, কাবুল হইতে আনীত "লয়লা" নামক পেয়ারের অশ্বিনীর সওয়ারী করিতেন। হাঁটুতে বাতের বেদনার দরুণ একটি মোড়ার উপর উঠিয়া ঘোড়া চড়িতেন। তাঁর মত পাকা সওয়ার কম ছিল। আমরা ৩০০।৪০০ সওয়ার মেদিনী কাঁপাইয়া নানাবিধ 'চাল' দেখাইতে দেখাইতে আশে পাশে পশ্চাতে চলিতাম। আগে আগে এক ঐরাবৎ তুল্য

---

* সিখ দরবারের পরিচ্ছদের বিষয় ইংরাজী ইতিহাসে আছে—"Runjeet's was the best dressed court in the world".

হস্তীর উপর 'নিশান সাহেব' (খালসা পতাকা) ও আর এক মহাবারণ পৃষ্ঠে মহাশব্দে জয়ডঙ্কা চলিত। মৃদুগতিতে যাওয়া দস্তুর ছিল, সে জন্য খুব পাকা চাবুক সওয়ার ছাড়া অন্যর পক্ষে এ সব ষাঁড়-ঘোড়া আর তেজস্বিনী ঘোড়ী সামলানো মুস্কিল হইত। সকলের আবার একটি বাহু জোড়া, কারণ সকলকার বাঁ প্রকোষ্ঠের উপর একটি বাজ বা শিকারী পক্ষী। সিংহজীর ঠিক ডানদিকে আমার স্থান ছিল। আমার ঘোড়ার জীনের সামনে দুইপাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝোলা ছিল, তাহাতে নিরেট সোনা ও রূপার নকল বাদাম এবং নানকশাহী টাকা মোহর ভরা থাকিত। সিংহজীর ইঙ্গিতমত আমি মুঠা মুঠা ছড়াইতাম, বিশেষ যেখানে রাজদর্শনের জন্য মেয়েরা ছেলে কোলে করিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। সিংহজী সুন্দর শিশু বড় ভালবাসিতেন, দেখিলেই যতই ধূলামাখা হউক না কেন, কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতেন। ফুলও তেমনি ভাল বাসিতেন। আর কোন শান্ত মনোহর দৃশ্য, বিশেষ সরিষার পুষ্পিত ক্ষেত, দেখিলে ত আনন্দে দিশেহারা হইতেন। যদি কখনও রাগ করিতেন বা অধিক চিন্তাযুক্ত হইতেন ত আমরা যোগাড় করিয়া ফুটফুটে ছেলে দেখাইয়া দিতাম, আনিয়া হাজির করিতাম, কিংবা কাহাকে ভাল একটি ফুল বা ফুলের তোড়া হঠাৎ উপহার দিতে শিখাইয়া দিতাম; অথবা যেখান হইতে হিমালয়মালা ভাল দেখা যায় সেখানে লইয়া যাইতাম। সব ভুলিয়া যাইতেন। একদিন এ রকম জলুসে বাহির হইয়াছেন, দেখেন একস্থানে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ-তলে কচি গমের সবুজ মখমলের গালিচা, গাঢ় বাসন্তী সরিষাফুলের ফুলকারী করা, যতদূর দৃষ্টি যায় বিছানো রহিয়াছে। বালকের মতো সিংহজী, হাঁটুর ব্যথা ভুলিয়া অতি উচ্চ ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লাফাইয়া পড়িলেন আর আমাদের "খড়ে রহো" হুকুম দিয়া দেখিতে দেখিতে ক্ষেতের মধ্যে বহুদূর প্রবেশ করিয়া কখনও গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, কখনও হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিলেন। হায় রে! কোথায় পড়িয়া রহিল তলওয়ার, কোথায় উড়িয়া গেল বাজ, কোন হুঁস নাই! সিংহজী আনন্দে উন্মত্ত! আমরা, ও পথের ধারে রাজদর্শনার্থীদের জনতা, "থ" হইয়া এ লীলা দেখিতে লাগিলাম। ফিরিয়া আসিয়া লজ্জিতভাবে কহিলেন, "আমাকে আজ অলখ নিরঞ্জন দেখা দিয়াছেন।" দেহযষ্ঠি থর থর কাঁপিতেছে, নেত্রে ধারা বহিতেছে।

ক্ষেত্রস্বামীকে ডাকাইয়া নিজ কণ্ঠের মুক্তার হার তাহাকে স্বহস্তে পাঠাইয়া দিলেন, আর এক প্রহর রাত্র পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দুই হস্তে 'বাদাম' টাকা, মোহর ছোট ছেলেমেয়েদের ও সন্তান ক্রোড়ে গ্রাম্য মহিলাদের বিলাইলেন। সুতরং শওয়ারের ডাক বসাইয়া আমাকে ১০।১২ বার আমার দুই ঝোলা ভরাইতে হইয়াছিল।

বৈকালের এ প্রাত্যহিক শোভাযাত্রা বায়ু সেবনের জন্য ছিল না। সিংহজী সৈন্যদলের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, কাওয়াদ করাইয়া ফৌজ চালনার দোষগুণ বলিয়া দিতেন; চাঁদমারী মোলাহজা করিতেন। বন্দুক তোপের কারখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেন: কুকুর, ঘোড়া, হাতী, বাজ পরিদর্শন করিতেন; কুস্তি ও কসরতের আখাড়ায় গিয়া বখ্‌শিস দিতেন।

গোধুলির সময় সওয়ারী ফিরিত। সিংহজী গুরু দোওয়ারায় নামিয়া গঙ্গাজলে * গা ধুইয়া, গ্রন্থ সাহেবের আরতি ও দেবীর আরতিতে যোগ দিতেন। তারপর নহরের ধারে ঘাসের উপর বসিয়া সাধু সন্ত পণ্ডিতদের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। তানজান বা পালকী করিয়া সোজা দরবার-তাম্বুতে আসিতেন ও রাত্র দেড় প্রহর পর্য্যন্ত রাজকীয় কথাবার্ত্তা বা খোস গল্প চলিত। এখান হইতে অন্দরে যাইতেন। আমরা সকলে এবং আমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা 'জলুস খানায়' বসিয়া প্রাত্যহিক নৈশ জলসার নাচ দেখিতাম, কালওয়াতদের গান শুনিতাম, ও আমোদ আহ্লাদ করিতাম। সিংহজী এখানে একবারটি দর্শন দিয়া, সকলকে সঙ্গে লইয়া অন্দর ও সদরের মধ্যস্থ ভোজনশালায় গিয়া পানাহারে বসিতেন। আমাদের মধ্যে যাহারা আচারী, তাহারা 'লঙ্গা খানায়' খাইত, কারণ সিংহজীর ফ্রেঞ্চ অনুচরেরা আর ২।১ জন ইংরাজ অতিথি প্রায়ই সিংহজীর (একটু তফাতে) ভোজনে শামিল হইত। এ সময়কার খাওয়াটা প্রায়ই কুরসিতে বসিয়া, ছোট ছোট চৌকির উপর ভোজ্য, পেয় দ্রব্যাদি রাখিয়া, হইত।

ঐ যাঃ! খালসা-রবির চির রাহুগ্রাসের কারণ না বলিয়া খালসা গৌরব-রবিরই কথা বলিয়া যাইতেছি। জানো তো মহাদেববৎ, মহাদেবের অংশ,

---

* মহারাজের স্নান ও পানের জন্য গঙ্গা জল প্রত্যহ হরিদ্বার হইতে উট ও বাঙ্গী ডাকে যেখানে মহারাজ থাকিতেন আসিত।

সিংহমহারাজের কথা বলিতে আরম্ভ করিলে আমাদের জিহ্বা আর থামে না। সিংহজী লেখা-পড়া করিবার সময় কখনও পান নাই কারণ বার বৎসর বয়স হইতে কঠোর কর্ম্ম ঝঞ্ঝাটে আবৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মেধা ও স্মরণশক্তি কিন্তু এমন আশ্চর্য্য ছিল যে এত বড় রাজ্যের সমস্ত খুঁটিনাটি তাঁহার মাথার মধ্যে মজুদ থাকিত। মহাফেজখানায় * কোন বিষয়ের নথি তল্লাশ করিয়া বাহির করা মুস্কিল হইলে, সিংহজীকে অবসর বুঝিয়া খোশ মেজাজের সময় জিজ্ঞাসা করিত, তিনি একটু ভাবিয়া যা জানিবার দরকার সব বলিয়া দিতেন। এমন কি মিশর রুপলাল, দেওয়ান মাল, † সপ্তাহে একদিন, বৃহস্পতিবার, বৈকালে সাম্রাজ্যের জমা খরচের হিসাব শুনাইতেন, আর বড় বড় মংদের ‡ আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় ইরাদা § ও মঞ্জুরী লইতেন। দেখিয়াছি এক একটি অঙ্ক সিংহজীর মনে থাকিত, এমন কি দেওয়ানজী কখনও ভুল করিলে হাসিতে হাসিতে ঠিক করিয়া দিতেন। কখনো তুচ্ছতম অহলকারের মনে রূঢ় বা শ্লেষবাক্য দ্বারা কষ্ট দিতেন না। জ্ঞানতঃ অন্যায় বা চুরী, বা প্রজার প্রতি জুলুম, দেখিলে বজ্রের মত কঠিন হইতেন। অকাতরে দুই হাতে দান করিতেন। দারু ব্যবহার করিতেন, তখনকার প্রথা ছিল, কিন্তু ২৫ বৎসরে কদাপি নেশায় বিভোর হইতে তাঁহাকে দেখি নাই। প্রজার ও অনুচরবর্গের সম্পর্কীয় মহিলাদের নিজ কন্যার ন্যায় দেখিতেন। নাচের মহফিলে নর্ত্তকীদের সহিত রসিকতা করা তখনকার চাল ছিল; সিংহজীও মজলিসী ছিলেন। কিন্তু তখনকার সেপাহি লোকের মধ্যে বেশ্যা আসক্তিটাকে নির্দ্দোষ আমোদ মনে করিলেও তিনি এ মুখে-হাসি-বুকে-হাহাকার হতভাগিনীদের দূরে দূরে রাখিতেন। গোঁড়ামির লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। নিজে সিখপন্থের নেতা ছিলেন, অথচ তাঁহার সচিবদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সিখ খুব কমই ছিল। তিনি যোগ্যতা দেখিতেন, জাত ও ধর্ম্ম-মত নহে। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী রাজা ধ্যানসিংহ ডোগরা রাজপুত; প্রধান উজির, ফকির আজিজ্‌উদ্দীন; প্রধান সেনাপতি, মিশর দেওয়ানচাঁদ, ব্রাহ্মণ; প্রধান দুই সুবাদার, মিশ্র বেলীরাম, ব্রাহ্মণ, ও দিওয়ান

---

* Record office.
† Fniance Minister.
‡ Proposal.
§ Heades of account.

সাওয়ান মল্ল, ক্ষেত্রী ; প্রধান দেউড়িওয়ালা, (যাহার অনুমতি ছাড়া কেহ প্রাসাদে বা দরবারে আসিতে পাইত না) জমাদার খুশাল সিংহ, ব্রাহ্মণ ; প্রধান কোষাধ্যক্ষ বখশী ভগৎরাম, ক্ষেত্রী ; প্রধান মোসাহেবদ্বয়, রাজা লাল সিংহ ও জওয়াহির সিংহ, ব্রাহ্মণ ; প্রধান অর্থসচিব, মিশর রূপলাল, ব্রাহ্মণ ; প্রধান ধর্ম্ম-উপদেশক, গোঁসাই রাধাকিষণ, ব্রাহ্মণ ; এবং পেশকার রাজা দীনানাথ, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। রণজীত সিংহের সময় ব্রাহ্মণরা নিজ বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে, রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে, সকল বিভাগে, সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না যে খালসা সাম্রাজ্যের মস্তিষ্ক ও ভুজবল ব্রাহ্মণরাই ছিলেন। Patriotism শব্দে যাহা বুঝায়, তাহা সিখ রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদেরই মধ্যে ছিল। ইংরাজেরা ইহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয় এই যে সিখ শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই পাঞ্জাবে ব্রাহ্মণের প্রভাব ও নেতৃত্ব লোপ পাইল। ইংরাজী শাসনের ২৫।৩০ বৎসরের মধ্যে পাঞ্জাব জনসমাজে ব্রাহ্মণ নগণ্য হইয়া দাঁড়াইল। কেবল নগণ্য নহে, আধুনিক সিখ অগ্রণীদের মতে ঘৃণ্য ! ইংরাজী সরকারী রিপোর্ট, গেজেটীয়র ইত্যাদিতে কখনও কখনও ব্রাহ্মণ জাতিকে 'মিরাসি'দের মত parasite classএ ধরা হয়। মিরাসিদের পেশা ভাঁড়, নর্ত্তক, গায়ক হওয়া। অবশ্য সিখ আর হিন্দুতে যে কোন প্রভেদ আছে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না, এখন ইংরাজীনবিশেরা পার্থক্য বাধাইয়াছে।

সিংহজী যেমন উদার তেমনি দয়ার আধার ছিলেন। প্রাণদণ্ড তিনি তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিলেই হয়। ক্ষমা করিবার কোনো পথ পাইলে তিনি আর দণ্ড দিতেন না।

ঐ যাঃ আবার অন্নদাতারই* কথা ! আচ্ছা এবার আসল কথা বলি।

সিংহ-রাজের জ্যেষ্ঠপুত্র, টিক্কাসাহেব,† শেরসাহেব, আমাদের সহিত দীনানগরেই ছিলেন। তাঁহার পট্টাবাস, প্রাসাদ ও প্রমোদ উদ্যান পিতার কম্পুর কিছু দূরে ছিল। শেরসিংহের বীর বপুর দিকে শত্রুও ফিরিয়া চাহিত ; ছয় ফিটের উপর দীর্ঘ, ইস্পাতের মত দৃঢ় ও লঘু দেহ, বড় বড় ভাসা নেত্র, খাড়া

* রাজস্থানে ও পাঞ্জাবে রাজাকে "অন্নদাতা" বলে।

† যুবরাজকে পাঞ্জাবে 'টিকা' অর্থাৎ রাজ-তিলকের উত্তরাধিকারী বলে।

নাক, রেশমের মতন তা দেওয়া মোটা গোঁফ, দুদিকে চোমরান দাড়ী। খোলা প্রাণ লোক, মারপেঁচ বুঝিতেন না। সাজগোজ, গানবাজনা, আমোদ প্রমোদ বড় ভালবাসিতেন। কুকুর, বাজ, ঘোড়া; লড়ায়ে মোরগ, তিতির, বটের, বুলবুল; বন্দুক, তলওয়ার, পেশকব্ধ—এই সব তাঁহার সখের জিনিস ছিল। সাদাসিধে মিষ্ট কবিতা বড় ভালবাসিতেন। হাতিয়ারের কাজে ও কুস্তিতে ইঁহার সমকক্ষ পাঞ্জাবে ছিল না। ইঁহার চোখের এমন এক উদাস অথচ সরস দৃষ্টি ছিল যে লোকে ইঁহাকে 'ফগ্‌গুন আওতায়' বলিত। ফাল্গুন মাস উদাস মাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই যে গানে আছে, "আয়ো ফগ্‌গুন উদাস মহিনা!" সাধাসিধে সুমিষ্ট কবিতা বড় ভালবাসিতেন। দেশ দেশান্তর হইতে শায়ের ও কবি তাঁহার দরবারে নিজের প্রতিভার পরিচয় দিতে আসিত। তাঁহার পছন্দসই ফারসী, হিন্দি বা চলিত পঞ্জাবী রচনা কেহ পেশ করিলেই তৎক্ষণাৎ আবৃত্তি করিতে আজ্ঞা দিতেন, এবং এমন বহুমূল্য খেলাৎ ও শিরোপা দান করিতেন যে গরীব ভিক্ষা-জীবী বেচারারা চিরকালের জন্য নেহাল হইয়া যাইত। তাঁহার দেউড়ি-ওয়ালার* এক প্রধান কার্য্য ছিল দর্শনপ্রার্থীদিগের মধ্যে কবি বাছাই করা ও কৌশলে ইহাদের তাঁহার তফাতে রাখা, কারণ ইহাদের উপর তিনি এত ধন লুটাইতেন যে কবি গোছের লোক দেখিলেই তাঁহার শুভাকাঙ্খী পারিষদদের ভয় হইত।

সিংহজীর বড় সাধ ছিল যে কুঁয়র শের সিংহ রাজকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করে, আর মন দিয়া নিজেকে সকল বিষয়ে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবার উপযুক্ত করে। কুঁয়র সাহেবের এদিকে চেষ্টাই ছিল না। সিংহজী প্রায়ই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেন যে তাঁহার পরে ফরঙ্গী† বেনিয়ার "লালে লাল" করিবার সামর্থ্য ও সঙ্কল্পের সম্মুখে যদি কেহ পিটের ‡ মত চতুর রাজনীতি-বিশারদ ও নেপোলিয়নের মত সমর-কুশল হয়, তবেই রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে, নচেৎ নহে। কুঁয়র সাহেবের প্রকৃতি এ দুই আদর্শের ঠিক উল্টা ছিল।

---

* Lord Chamberlain.

† সিখেরা ইংরাজ ও অন্য ইউরোপীয়ানদের "ফরঙ্গী" বলিত।

‡ Pitt.

তাই সিংহজী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর মনে মনে বিরক্ত ছিলেন, তবুও এই বিশালকায় প্রিয়দর্শন সন্তানকে কাছে রাখিতে ভালবাসিতেন।

মাস দুইতিন হইতে কুঁয়রজীকে দীনানগরে কেহ দেখিতে পাইতেছে না। নিয়মমত একবার না একবার রোজ মাতাদের প্রণাম করিতে আসিত ; অন্য সময় না হৌক, রাত্রে গানবাজনার মহফিলে নিশ্চয় হাজির হইত, ও পিতাকে "ফতেহ বুলাইয়া" ভালমানুষটির মত খানিকক্ষণ তাঁহার সামনে কায়দামত হাতজোড় করিয়া বসিয়া থাকিত। যেই তাঁহার দৃষ্টি অন্যদিকে পড়িত অমনি পাশ কাটাইয়া, পিতার নজরের আড়ালে বয়স্যদের গুলতানের মধ্যে গিয়া যোগ দিত। দুই এক পেয়ালার পরেই তাহার হাসির গর্‌রার আর "ওয়াহ, ওয়াহর" হররার সিংহনাদে সেই জনাকীর্ণ হাজার-থামের মণ্ডপ কাঁপিতে থাকিত। কুঁয়র উপস্থিত না থাকিলে রাস্‌ মুজরার্‌ মজলিস গুলজারই হইত না। সিংহজী এই মহাকায় খোকার কাণ্ড কারখানায় বড় তৃপ্তি বোধ করিতেন ; কারণ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র ও দলাদলি লইয়াই তাঁহার সব আমীর অমাত্যরা থাকিত। তাহাদের হাসি তামাসার মধ্যেও কোন মতলব বা কাহারো প্রতি ঠেশ্‌ থাকিত। এক এই সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভরসা কুঁয়রই কোন লুকোচুরি জানিত না, কোন অভিসন্ধি রাখিত না। তাই ইহার খোলাপ্রাণের হাস্য-লহর, চতুর্দ্দিকের মতলব-আঁটা-আঁটি চাল-কাটাকাটির মধ্যে, সিংহজী বড়ই উপভোগ করিতেন। মজা দেখিবার জন্য কখন কখন সিংহজী ইয়ারকীতে মশগুল কুঁয়রকে চোবদার দ্বারা তলব করিতেন। কুঁয়র এমন আসন্ন-ক্রন্দন শিশুর মত মুখের ভাব লইয়া ত্রস্ত ভীড় ঠেলিয়া ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দাঁড়াইত যে সিংহজী ও তাঁহার খাস 'হাম-পেয়ালা হাম-নেওয়ালা' বৃদ্ধ সখারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত। বুড়ারা যে তাহাকে লইয়া রঙ্গ করিতেছে, ইহা কুঁয়র বুঝিতে কিছুতেই পারিতেন না।

প্রথম প্রথম কুঁয়রের উপস্থিত না হইবার কারণ সিংহজী মনে করিলেন কোথাও দূরে শীকার অভিযানে গিয়াছে। তারপর, অনেকদিন যখন হইয়া গেল, কুঁয়র না কোন ছুটির জন্য পিতার সকাশে দরখাস্ত পাঠাইলেন, না কোন মামুলী পত্রদ্বারা সংবাদ দিলেন, তখন সিংহজী কিছু চিন্তিত হইলেন। কুঁয়রের সহচরেরা এবং বড় কর্ম্মচারীরাও কিছু বলিতে পারিল না। কুঁয়রের

অন্দরে খবর লইয়াও কোন ফল হইল না। "খুকিয়া-নিগায়"রা, * যাহাদের কাজ সিংহজীকে সকল রাজপুত্রদের ও অন্যান্য রাজপরিবারের লোকের এবং সমস্ত অমাত্য ও প্রধান গণের যাওয়া-আসা, মেলা-মেশা, কথাবার্ত্তার দৈনন্দিন বিবরণ দেওয়া, যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়া যা সিংহজীকে জানাইল তাহার সারাংশ এই :—

"একদিন কুঁয়র সাহেব অল্পসংখ্যক সঙ্গী সহিত ৪০।৫০ ক্রোশ দূরে বেয়াস্ নদীর তীরে বেড়াইতেছিলেন। সচরাচর যেমন তিনি মধ্যে মধ্যে দলবল ছাড়িয়া একা বিচরণ করিতেন, তেমনি সেদিন সকলকে ডেরায় ফিরিতে আজ্ঞা দিয়া একদিকে ঘোড়া সরপট্ ছুটাইয়া দিলেন। তখন ভোর। সারাদিন ফিরিলেন না। দুপুর অবধি অপেক্ষা করিয়া, চাকরবাকররা চতুর্দ্দিকে তাঁহার খোঁজে বাহির হইল, কিন্তু কোন সন্ধান পাইল না। রাত্রি হইল ; মশাল লইয়া সওয়ার ও পেয়াদারা দলে দলে তাঁহার তল্লাস করিতে লাগিল। হঠাৎ, ঘোড়াকে বড় বড় চক্র কাটাইয়া কাটাইয়া, যাহাতে কোন্‌দিক হইতে আসিতেছেন বোঝা না যায়, মহারাজ-কুমার হাসিতে হাসিতে দেখা দিলেন। সকলকার ধড়ে প্রাণ আসিল। সমস্ত রাত গজ্‌ল গাইয়া, পায়চারি করিয়া কাটাইলেন, তাঁহার প্রত্যেক ভঙ্গিতে ও মুখের ভাবে গভীর আনন্দ প্রকাশ পাইতেছিল। কিন্তু কাহার নিকট কিছু ভাঙ্গিলেন না, যদিও তাঁহার স্বভাব পেটে কথা পাক্ পায় না। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ডেরায় দারোগাকে ডাকাইয়া হুকুম দিলেন—'এইক্ষণেই তোমরা সব তাম্বু কানাৎ তুলিয়া তিন পড়াও হটিয়া যাও। একজনও থাকিও না ; আমি কোথায় যাই, কি করি, কেহ জানিবার চেষ্টা করিও না। যদি আমি কাহাকে, এমন কি এই আমার দুধ ভাইকেও (foster brother), এই আদেশের অন্যথাচরণ করিতে দেখি বা শুনি, ত নিজহাতে গুলি করিব।' সবাই জানে, টিক্কাসাহেবের যে কথা সেই কাজ। তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাবাস ভাঙ্গিয়া হাতী, উট, খচ্চরের পিঠে রওয়ানা হইল। কাহারও মাথার উপর মাথা ছিল না যে পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকায়, কুঁয়র কি করিতেছেন।"

এ সংবাদও ৭।৮ সপ্তাহ আগেকার। ইহার মধ্যে কুঁয়র সাহেবের কোন

---

* তখনকার C. I. D.

সন্ধান পাওয়া যায় নাই, যেন উবিয়া গিয়াছেন। সিংহজী ক্রমে বাস্তবিকই উতলা হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মনে মনে। কেহ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। লোকে নানা কথা কানাকানি বলাবলি করিতে লাগিল। যে সিংহাসনের ওয়ারিস, তাহার নিশ্চয় অনেক শত্রু। আবার দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী —একজনের পৃষ্ঠপোষক খোদ মহারাণী জীন্দাঁ * যাহার কথায় সিংহজী উঠেন বসেন। অন্তঃপুরে, মহিষীদের তিন দল, জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কোলের কনিষ্ঠ মহারাজকুমারদের পক্ষ লইয়া। যুবরাজের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা তলে তলে তাহার বিপক্ষে নানারকম আজগুবি ও হানিকারক গুজব রটাইতে লাগিল। এমন কি বেনামীপত্র সিংহজীর নিকট আসিতে লাগিল; কেহ কেহ সাবধানে গা ঢাকা দিয়া সিংহ মহারাজের কর্ণগোচর করিতে লাগিল—আরতির হট্টগোলে, সৎসঙ্গের সময় বা রাত্রের আমদরবারের ভীড়ের মধ্যে—যে টিক্কা শেরসিংহ সৈন্যসামন্ত জড় করিতেছে, এবং বিদ্রোহের ঝাণ্ডা খাড়া করিবার জন্য অবসর দেখিতেছে। সিংহজী পুত্রকে খুব চিনিতেন। হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে কতবার আমাকে বলিতেন, 'আরে ব্রহ্মদেও! ছোঁড়াটা কোথাও পিরীতের জালে পড়েছে। তুই দেখে নিস্, আমার কথা ঠিক বেরুবে। নচ্ছার, জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে জানে না। আর লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না, তাই লুকিয়ে আছে। ওয়াহ গুরু করেন, যেন চামারনী ডোমনী না হয়।' আর আমি তো শেরসিংহকে এতোটুকু বেলা হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি। আমি আর ও পাজির মন জানি না? তাহার দুশমন্ হারামজাদারা যে সব ভয়ানক কথা তাহার বিষয় প্রচার করিতেছে তাহা শুনিয়া আমি ভাবনায় পড়িয়াছি বটে, কিন্তু ভয় পাই নাই। সিংহজীর আশ্বাসবাণীতে, তাই, আমি প্রাণপণে সায় দিতাম। আসল কথা কুঁয়রকে ওয়াহ গুরু আশিক-মেজাজ করিয়া গড়িয়াছেন, সে কি করিতে পারে? তাহার জীবাত্মার এক একটি অণু পরমাণু একবিন্দু প্রেম-অমৃতের জন্য নিরন্তর হাহাকার করিতেছে। হতভাগা রাজার ঘরে, কলিযুগের হিন্দুর পরিবারে

---

* "জীন্দাঁ" ঠেঠ্ পাঞ্জাবী শব্দ। ইহার আভিধানিক অর্থ জীবনদায়িনী, জীবন—দা=জীন্-দা। চলিত মানে প্রাণেশ্বরী।

জন্মিয়াছে। * আমার পরামর্শে সিংহজী অতি বুদ্ধিমতী, আদব-কায়দা-দুরস্ত, কন্যা খুঁজিয়া যুবরাজের বিবাহ দিয়াছিলেন। কুঁয়র বেচারা আদব-কায়দা-মাফিক সম্মান কৌরাণীর নিকট খুব পাইল ; নাচ, গান, করিবার সখ ছাড়িবার জন্য বিস্তর উপদেশ শুনিল। হাল্‌কা-ভাবে জীবনযাপন করেন, নিজের দলপুষ্টি ও শক্তি সংগ্রহের দিকে মন দেন না, শত্রু মিত্র সবাইকে সমান দেখেন —বৌরাণীর নিকট এই সব লইয়া বিস্তর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিল, বিশেষ কোন ফল হইল না। শেষে এই প্রকাণ্ড, ষণ্ডেশ্বরবৎ পতির কাণ্ডজ্ঞানহীনতা শোধরাইবার আশা ছাড়িয়া দিয়া, তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী যুবরাজ্ঞী, নিজের আখের বজায় রাখিবার দিকে, তাঁহার ঠাণ্ডা মাথা, দুরূহ আকাঙ্ক্ষা, কঠিন চিত্ত ও মায়া-মোহ-বিরহিত হৃদয় সর্ব্বক্ষণ লাগাইয়া দিলেন। অর্থাৎ, ধন রত্ন শতদিক দিয়া আকর্ষণ করিয়া নিজের গুপ্ত খাজানাখানায় জমা করিতে লাগিলেন, ও পিত্রালয়ের আত্মীয়দের বড় বড় পদে, নানা উপায়ে, বসাইতে থাকিলেন। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন যে বুড়া শ্বশুর মরিবার পরে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইবে। তাঁহার নির্ব্বোধ অদূরদর্শী শিথিল প্রকৃতির স্বামী সে হাঙ্গামা সামলাইতে পারিবেন না। তখন বেচারি নৃশংস স্বার্থান্ধ শত্রু পরিবেষ্টিত সন্তান লইয়া দাঁড়াইবে কোথায় ; করিবে কী ? ঐ প্রভূত সঞ্চিত অর্থ তখন কাজে লাগিবে। এই আশ্চর্য্য বালিকা পয়সা-পাগল পয়সা-সর্ব্বস্ব পৃথিবীর একমাত্র সারতত্ত্ব সাত দেউড়ির মধ্যে রাজ অন্তঃপুরে থাকিয়া, পয়সার অভাব কখনো স্বপ্নেও না জানিয়া এবং চিরজীবন খোলাম কুচির ন্যায় টাকা মোহর ছড়াইয়াও বুঝিয়াছিল যে অর্থের মত সহায় ও সম্বল আর নাই। না, তারও বাড়া, অর্থই একমাত্র যথার্থ সহায় ও সম্বল। কুঁয়রজী ঠিক ইহার

---

* মহারাজ জাতিতে জাট ছিলেন। এক্ষণকার রাজাদের মধ্যে ও পাঞ্জাবে জাটই প্রধান ; যেমন পাটিয়ালা, নাভা, জীন্দ, ফরিদকোট, কাপসীয়া। জাটরা সিখমন্ত্রে দীক্ষা (অর্থাৎ "পহোল") লইলে হিন্দু নিয়ম ও আচার ততটা মানে না। যেমন বাংলাদেশে বোষ্টমরা। কিন্তু মহারাজা ধার্ম্মিক, সামাজিক ও গার্হস্থ্য বিষয়ে পুরাদম রাজপুত চালে চলিতেন। আধুনিক বিজ্ঞ জাট সিখেরা বেশীর ভাগ হিন্দু আচার ও নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য মনে করেন। স্বর্গীয় নাভার মহারাজা আমাকে আজকালকার 'নবখালসা' নেতাদের অহিন্দু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া ছলছল নেত্রে বলিয়াছিলেন, "আমি বৃদ্ধ বয়সে এ দৃশ্য দেখিব, আমার অদৃষ্টে এই ছিল।" নব-খালসা বা সিখ সম্প্রদায়কে হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। এই নূতন, ছোট কিন্তু উদ্দমশীলদলের প্রধান পথপ্রদর্শক একজন অবসর-প্রাপ্ত সিবিলিয়ান ইংরাজ।

উল্টা। সে ধন দৌলত ভীষণ বোঝা মনে করে। জের খরচের টাকা (লাখটাকা মাসের হিসাবে, বৎসরে ১২ লাখ) পাইবামাত্র মাসখানেকের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। তারপর নিজস্ব জায়গীরের আয় হইতে কিম্বা পেশাগী লইয়া চলে। আমি একবার একটা বড় সাহুকার, যাহার কারবারে আমার হিস্‌সা ছিল ও যাহার কাছে আমার পয়সা কড়ি গচ্ছিত রাখিতাম, হঠাৎ দেউলিয়া হওয়ায়, সমস্ত ত হারাইলামই, তা ছাড়া ধারে ডুবিয়া গেলাম। ব্রাহ্মণীকে জানাইলাম না, ভাবনায় শুকাইতে লাগিলাম। লজ্জায় সিংহজীকেও জানিতে দিই নাই। কুঁয়র কি করিয়া টের পাইয়া, জোর করিয়া, মাথার দিব্য দিয়া, আশী হাজার টাকার হুকুমি হুণ্ডি আমার বৈঠকে ফেলিয়া গেল। আমি ব্রাহ্মণ হইয়া কি করিয়া দান লইব আপত্তি করায় আমাকে ধরিয়া এমন এক নাড়া দিল যে মাথার মগজ নড়িয়া গেল। এরূপ দান করিতে কুঁয়র বড় ভালবাসিত।

হৃদয়-প্রাণ-ময় কুঁয়র, হৃদয়বৃত্তির তাচ্ছিল্যকারিণী ও আবেগহীন বৃত্তির পক্ষপাতিনী কঁওরাণীর নিকট প্রাণের পিপাসা মিটাইতে পারিলেন না। আমি ও সিংহজী এ খবর রাখিতাম, সেজন্য আমাদের ভয় থাকিত কবে কোথায় মন হারাইয়া বসে, আর অযোগ্য পাত্রীকে চিত্ত সমর্পণ করিয়া ফেলে। তাই, সিংহজী যখন তার গূঢ় দুষ্ট অভিসন্ধির ধারণা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, আর সে প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়িয়াছে এ মত নিঃসন্দেহে প্রকাশ করিলেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার অনুমোদন করিলাম।

ক্রমশঃ

৺কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বন্ধনী

সৌখীন ছায়া যবনিকা টানে দীর্ঘতর,
তপ্ত ভ্রমণ অচল তবে ?
দীর্ণ সময় পালক ছড়ায় মুহুর্মুহু,
ফেননিভ ছোঁয়া শয্যা ছেয়ে।
আঙুলে আঙুলে রক্তিম ছিলো কী আগ্রহ—
সে আদি পর্ব্ব লুপ্ত কবে !
শীতল শিরায় ঘুম আনা সোজা দু চোখ যত
হবে অসহায় সামনে চেয়ে।

বহ্ন্যুৎসব ভুলে যাওয়া যায় অসঙ্কোচে ?
স্ফুলিঙ্গ তার উড়্ছে কোনো
দখিনা বাতাসে জান্‌লার ধারে, হয় তো কোনো
ঝোড়ো কুন্তলে তারার মতো।
লঘু আশ্রয়-বিলাসী প্রণয় নিরুদ্দেশে
হৃদয়কে চায়, জড়ায় মনও ;
বিদ্রোহী স্মৃতি পটভূমিকায় আগুন আঁকে,
লাল আভা কাঁপে ইতস্তত।

অপঘাত চাওয়া বিদ্যুতে সেই পাহাড়-পথে
সফল হ'লো কি আলিঙ্গনে ?
দুঃসহ পদশব্দ নেই বা এখন কাণে,
চম্‌কায় দীপ সঙ্গোপনে।

অরুণকুমার মিত্র

দেশ-বিদেশ

সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মহারাজকে দলপতি করিয়া কতিপয় বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দু দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে লাট-দর্শনে গিয়াছিলেন। ঠিক দর্শন বলা সঙ্গত হইবে না, কেননা ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল—লাট-সমীপে এক আর্জ্জিপেশ করা। এই আর্জ্জির মর্ম্ম এই যে বাংলার মন্ত্রিমণ্ডল প্রাদেশিক সরকারি চাকুরিতে বর্ত্তমান শতকরা ৪৫ জন স্থলে ভবিষ্যতে ৫৫ জন মুসলমান নিয়োগের যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত এবং অন্যায়, অতএব লাটসাহেবের কর্ত্তব্য এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে না দেওয়া।

এই অনুরোধ অদ্ভুত হইলেও অযৌক্তিক নহে, কেননা আইনত, অর্থাৎ ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রণীত ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনাধীন প্রদেশ সমূহেও গভর্ণর মন্ত্রিমণ্ডলের সমবেত সিদ্ধান্ত তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগদ্বারা নাকচ করিয়া দিতে পারেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা এইরূপ একটি বিশেষ ক্ষেত্র এবং যেহেতু বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলের উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ণ হইতে পারে অতএব নাকি গভর্ণরের কর্ত্তব্য—তাঁহার বিশেষ কর্ত্তৃত্বের প্রয়োগদ্বারা হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা।

আইনের যুক্তি আরও দেওয়া যাইতে পারে এই যে প্রাদেশিক গভর্ণর নিযুক্ত হইবার সময়ে যে অনুজ্ঞা-পত্র পান তাহার দশম ধারায় এই নির্দ্দেশ আছে যে সরকারি চাকুরিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক নিয়োগ সম্বন্ধে যে-নীতি ইতিপূর্ব্বেই গৃহীত হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন না করা—যদি না যে-যে সম্প্রদায়ের স্বার্থ এই বিষয়ে জড়িত তাহাদের বা জনসাধারণের হিতার্থে এই পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় মনে হয়। অবশ্য এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাঞ্ছনীয়তা বিচারের বা ভারত-শাসন আইনের বিধান অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ কোন্ ক্ষেত্রে বিধেয় তাহা নির্ণয়ের ভার সম্পূর্ণ গভর্ণরের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং দার্জ্জিলিঙে "হিন্দু ডেপুটেশন" লাটসাহেবের কাছে যে আর্জ্জিপেশ করেন তাহা সৎপরামর্শ মাত্র, তাহাকে কোনমতেই আইনগ্রাহ্য দাবী বলা যায় না।

অতঃপর গভর্ণর কি করেন দেখিবার জন্য অনেকেই উৎসুক রহিয়াছেন। হক-মন্ত্রিমণ্ডলের বিরুদ্ধাচরণ তিনি সহজে করিবেন বলিয়া মনে হয় না এবং যাহাই তিনি করুন বা না করুন আইন তাঁহার সহায় কেননা কৃত্যাকৃত্যের বিচারক একমাত্র তিনি নিজে। কিন্তু এই ব্যাপারটির একাধিক দিক্ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভাবিবার অনেক কিছু আছে। প্রথমত—এইভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে চাকুরির ভাগ-বাঁটোয়ারা কি সঙ্গত? ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন এক্ষেত্রে যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত—হিন্দু বা মুসলমানের ৪৫ বা ৫৫ কোনো সংখ্যাই নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত নহে। বলা বাহুল্য যুক্তি কাগজে কলমে অকাট্য। কিন্তু দেশ শাসন শুধু কাগজ কলমের ব্যাপার নয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেকস্থলেই শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সূত্রের সঙ্কোচন বা প্রসারণ প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে যে 'নিগ্রহ-মনোভাব' অত্যন্ত ব্যাপক ভাবে রহিয়াছে যদি কয়েকটিমাত্র চাকুরি লাভ করিয়া তাহার কথঞ্চিৎও উপশম হয় তাহাতে সমগ্র বাংলাদেশের বা হিন্দুসম্প্রদায়ের সমূহ ক্ষতি হইবে না। তাই কংগ্রেসের তরফ হইতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় 'বেঙ্গল এ্যাসেমব্লি'তে বলিয়াছিলেন যে যদি শতকরা ৬০টি সরকারি চাকুরিও মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তিনি খুসি বই অখুসি হইবেন না। সরকারি চাকুরি অবশ্য অনেক লোকের জীবিকার উপায় এবং বলা বাহুল্য সরকারি চাকুরির মোহ একাধিক কারণে অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু সমগ্রদেশের দিক হইতে বিচার করিতে গেলে—কয়টি লোক সরকারি চাকুরি পাইল বা পাইল না তাহা গুরুতর সমস্যাই নয়। যে অগণিত লোকের পক্ষে চাকুরি পাওয়া কোনো প্রকারেই সম্ভব নয় তাহাদের মঙ্গল বিধানই দেশের ও বিশেষভাবে গভর্ণমেন্টের অনেক বেশি গুরুতর কর্ত্তব্য। বাংলাদেশের হিন্দু বা মুসলমান দেশনেতারা আশা করি তাই চাকুরির ব্যাপার লইয়া অযথা কলহের সৃষ্টি করিবেন না।

এই গেল একদিক। আর এক দিক হইতেছে—এই ব্যাপার লইয়া গভর্ণর সমীপে হিন্দু সম্প্রদায়ের আর্জ্জিপেশ। যুগপৎ ভিক্ষুক ও দাসমনোবৃত্তির ইহাপেক্ষা লজ্জাকর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? এই কিছুদিন পূর্ব্বে গভর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে সারা ভারতবর্ষের জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া

উঠিয়াছিল, এই ক্ষমতার অযথা প্রয়োগ হইতে পারে এই আশঙ্কায় কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসনভার গ্রহণে বিশেষ ইতস্ততঃ করিয়াছিল। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে কতিপয় বাঙালী হিন্দু আজ প্রাদেশিক গভর্ণরের সেই বিশেষ ক্ষমতার শরণ ভিক্ষা করিতেছে নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য। এইভাবে স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতিকে অস্বীকার করিয়া ইঁহারা যে কলঙ্কে নিজেদের কলঙ্কিত করিলেন, শতকরা ৫৫টি চাকুরির অনিশ্চিত গৌরব কি তাহা মোচন করিবে? এখনো যাঁহারা হিন্দু স্বার্থ ও মুসলমান স্বার্থ লইয়া মাথা ঘামান প্রগতিশীল রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহাদের কোনোই স্থান নাই।

রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রগতির কথা উঠিলে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নব প্রতিষ্ঠিত 'ফরোয়ার্ড ব্লক'-এর কথা স্বভাবতই উঠে। এই দল ধীরে ধীরে পুষ্ট হইতেছে সত্য কিন্তু ইহাও সত্য যে বামপন্থী প্রায় সকল নেতাই অত্যন্ত তীব্রভাবে ইহার সমালোচনা করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্র সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাঁহাদের উত্তর দিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার অগ্রণীদলের উৎপত্তির কারণ ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা—ব্যক্তিগত রেষারেষি নহে এবং ইহার উদ্দেশ্য বামপন্থী নানাদলকে সংহত করিয়া কংগ্রেসকে নবশক্তিতে শক্তিমান করিয়া তোলা। সুভাষচন্দ্রের আন্তরিকতা সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই, কিন্তু ঐতিহাসিক অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা অনেকের কাছেই অত্যন্ত কষ্টকল্পনা মনে হইবে, আর তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বামপন্থী দলগুলিকে একত্র করিতে হইলে যে তত্ত্বের ভিত্তি অত্যাবশ্যক, সুভাষচন্দ্র এযাবৎ যখনই তাহার ব্যাখানের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা দক্ষিণ ও বামনীতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে এবং অগ্রণীদলের সভ্যদের অনেকেরই মতামত ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে যাহা জানা আছে তাহাতে এই দলকে যদি কেহ এই জাতীয় সংমিশ্রণেরই ফল বলিয়া মনে করেন খুব অন্যায় করিবেন না।

কিন্তু মতামতের এইরূপ অদ্ভুত সংমিশ্রণের দৃষ্টান্ত ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যবশত আরও পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রখ্যাতনামা সোশ্যালিষ্ট কমরেড অচ্যুত পটবর্দ্ধন 'কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি ঘোষণা করেন যে এই দেশে গান্ধি-নীতি ও সোশ্যালিষ্ট নীতির এই ভাবে বিকাশ সম্ভব যে পরিণামে এই দুইয়ের সম্পূর্ণ

সংমিশ্রণ ও সমন্বয় হইতে পারে। যদি এই মত একজন সোশ্যালিষ্ট প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলে সোশ্যালিষ্ট যে কে নয় তাহাই জিজ্ঞাস্য। বামপন্থী-দের ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ভর করে নিজেদের মধ্যে নিজেদের মতামতের পরিষ্কার আলোচনা ও উপলব্ধি ও কে প্রকৃত বামপন্থী ও কে নয় তাহা নির্ণয়ের উপরে। এই জন্য কমরেড যোশি ও জয়প্রকাশ নারায়ণ বোম্বাই সহরে যে বামপন্থী সম্প্রদায় সমূহের সম্মেলনের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমীচীন মনে হয়।

বৈদেশিক খবর সম্প্রতি এমন কিছু ঘটে নাই যাহা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ গুরুতর। চীন-জাপান যুদ্ধ তেমনি চলিতেছে। এই যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে চিয়াং-কাই-শেক ভবিষ্যৎ বাণী করিয়া বলিয়াছিলেন যে তিন অধ্যায়ে ইহা সমাপ্ত। প্রথম অধ্যায়ে জাপান হইবে বিজয়ী, দ্বিতীয় অধ্যায়ে চীন বিজয়ী জাপানের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইবে, তৃতীয় অধ্যায়ে জাপান চীন কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইবে। মনে হয় সম্প্রতি প্রথম অধ্যায়ের অবসান হইয়া দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুরু হইয়াছে। জাপানের আস্ফালন আর তেমন শোনা যায় না।

চীন জাপান যুদ্ধের ফলে আর যাই হোক বা না হোক সোভিয়েট রাশিয়া এসিয়াস্থ আপন অধিকারভুক্ত দেশসমূহ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে এবং পশ্চিমের অর্থাৎ পূর্ব্ব ইউরোপের সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা ও পরস্পরের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের সহিত রাশিয়ার যে-চুক্তি হইবার কথা চলিতেছে লিখিবার সময় পর্য্যন্ত তাহার শেষ খবর পাওয়া যায় নাই। এই বিলম্বের জন্য দায়ী সম্পূর্ণ ইংল্যাণ্ড। কেননা রাশিয়া আপন পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া এই তিনটি ক্ষুদ্র-রাষ্ট্রকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এই চুক্তির অন্তর্গত করিতে চায়। এই দাবী ন্যায্য। কিন্তু ইংল্যাণ্ড এখনো ইতস্তত করিতেছে। হয়তো দু'একদিনেই ইংল্যাণ্ড রাশিয়ার প্রস্তাবে রাজি হইবে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ভাবে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাশিয়ার সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে খুব বেশি উৎসাহ তাহার নাই।

এদিকে ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসিয়া জার্মেনির রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের মহাপ্রতাপান্বিত ভূতপূর্ব্ব পরিচালক ডক্টর শাখ্‌ট্‌ বলিয়াছেন জার্মেনি তাহার উপনিবেশগুলি —অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে যে-সকল উপনিবেশ তাহার করায়ত্ত ছিল— আবার ফেরৎ পাইবে, ইহাতে কোনোই নাকি অন্যথা হইবে না। ডক্টর শাখ্‌টের কথা ফলিতে পারে। শ্রীযুক্ত নেভিল চেম্বারলেন এখনো সুস্থ দেহে জীবিত আছেন এবং তাঁহার ক্ষমতার আশু অবসানের কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না।

শ্রীআদিত্য আচার্য্য

আশ্লেষ

দুইটি বিদ্যুৎ-কণা, তুমি আর আমি,
বহুদূর হতে যাত্রা করি' নিয়তির খেয়ালের বশে
পরস্পর কাছে আসি সংসারের তড়িন্ময় ভূমে।
কি আবেগ কি পুলক সে চৌম্বক আকর্ষণে।
আমরা চেয়েছি শুধু দিতে একজনা
আপনারে উজাড়িয়া অপরের প্রাণের প্রবাহে।
মোদের চরম লক্ষ্য, কামনার শেষ মোক্ষ,
দুটি কণা মিশে গিয়ে একেবারে এক হয়ে যেতে।

ঘনতর পরিচয়ে ভাঙিল সে ভুল।
সমধর্ম্মী স্বভাবের ফলে, সান্নিধ্যের অনুপাতে,
তোমার আমার মাঝে বাধিল সংঘাত,
এল বিকর্ষণ।
নাহি আর হাসি গান মান-অভিমান
প্রণয়ের কপট কলহ।
এখন আমরা দুয়ে, মহা শত্রু যেন,
নিরন্তর করি হানাহানি।
কঠিন কলঙ্কশূন্য শুষ্ক ব্যবহারে,
ভদ্রতার সুচিহ্নিত আতিশয্যে,
স্মিতবাক্ বক্রোক্তির সূচীমুখ শরে
দীর্ণ করি পূর্ব্বতন গ্রন্থি বন্ধনের।
দুইটি উন্মুখ চিত্ত হইল বিমুখ
স্বধর্ম্মের সমধর্ম্মিতায়।

তবু আমি ছাড়িনিক আশা।
জানি আমি আমাদের ঐকান্তিক মিলনের পথে
অন্তরায়—প্রকৃতির সার্ব্বিক নিয়ম।
এও জানি, যুক্ত হয় এক পরমাণু মাঝে
সমধর্ম্মী দুটি কণা অমোঘ আশ্লেষে ;
যে-আশ্লেষ তুচ্ছ করে লক্ষ-ভোল্ট-শক্তিমান বৈদ্যুৎ আঘাত ;
দুইটি অখণ্ড সত্তা মিলে গিয়ে যে-আশ্লেষে
ত্যাগ করে স্বাভিমান, থাকে না ক পূরা দুই ;
যে-আশ্লেষে সুপ্ত থাকে তেজস্-ক্রিয় মহাবহ্নি
ঊর্জ্জ যার ব্যাপ্ত হয় গ্রহ হতে গ্রহান্তরে
তারাময় নিখিলের বিবর্দ্ধিষ্ণু সীমায় সীমায়
নীহারিকা-বলয়ের পূর্ণ পরিধিতে।

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

পুস্তক-পরিচয়

সাংখ্য পরিচয়—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন প্রণীত; প্রকাশক: শ্রীকনকেন্দ্র দত্ত, ১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; মূল্য ১৷৷০।

বাঙ্গালা দেশে হীরেন্দ্রবাবু কেবল যে দর্শনাভিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত তাহা নহে, তিনি নিজেও আধুনিক যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। সুতরাং তাঁহার এই নূতন পুস্তক নিশ্চয়ই দর্শনামোদী সকল ব্যক্তির আনন্দ সাধন করিবে। ন্যায় পরিচয়, বেদান্ত-পরিচয় প্রভৃতি পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু কালার্কভক্ষিত সাংখ্যদর্শনের পরিচয় সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইলেও এতদিন সে চেষ্টা কেহ করেন নাই। হীরেন্দ্রবাবু অসাধারণ নৈপুণ্য সহকারে তাহাই সম্পাদন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বইটির বিশেষত্ব এই যে ইহাতে যেন গল্পচ্ছলেই সাংখ্য-দর্শনের আলোচনা করা হইয়াছে। এত সরল ভাষায় দর্শনের আলোচনা আর তো কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অথচ সাংখ্যের কোন মূল তত্ত্ব যে বাদ পড়িয়াছে তাহাও নহে। আমার নিজের বিশ্বাস—এ কথা আমি প্রবন্ধাদিতে পূর্বেও লিখিয়াছি—যে আদি সাংখ্য-দর্শনে প্রথমে প্রকৃতিরই একাধিপত্য ছিল, পুরুষের কোন স্থান ছিল না। পুরুষের সহিত যোগ সাধনের ফলেই সাংখ্যাচার্যগণ প্রকৃতির অন্তর্গত বুদ্ধিকেও অচেতন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে হয়তো এক অর্থে অচেতন বলা যাইতে পারে, কারণ তাহা nondiscriminating। কিন্তু 'বুদ্ধি'র অর্থই তো হইল discriminating intelligence, সুতরাং তাহা কিরূপে অচেতন হইতে পারে? হীরেন্দ্রবাবু একটি বিশেষ প্রবন্ধে এই বিষয়টির আলোচনা করিলে বোধ হয় অনেকের প্রভূত উপকার হইবে, কারণ আমার বিশ্বাস এই সমস্যা লইয়া আমার মত আরও অনেকের মনেই সন্দেহ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

আমার মনে হয় একটি বিশেষ অধ্যায়ে সৎকার্যবাদের আরও সূক্ষ্ম আলোচনা করিলে ভাল হইত, কারণ ইহাই যে সাংখ্য-দর্শনের মূল ভিত্তি তাহা সর্বজনাম্নু-

মোদিত। গ্রীক দার্শনিকগণ সূত্রাকারে বলিতেন panta rhei; অর্থাৎ সমস্তই পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু পরিবর্তনের দুই প্রকার অর্থ হইতে পারে; সাংখ্যের মত এক দিকে বলা যাইতে পারে যে একই আদি বস্তু নিয়ত পরিবর্তনশীল বিবিধ রূপ ধারণ করিতেছে (সংকার্যবাদ), অপর দিকে বৌদ্ধের মত বলিতে পারা যায় যে প্রত্যেক বস্তু (বা তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান) প্রতি মুহূর্তেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে (ক্ষণভঙ্গবাদ) কারণ pure change সম্ভবই নহে। একই মূল তত্ত্বের এই দুই প্রকার ব্যাখ্যার ফলেই এই দুই বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস, এবং এতদ্দ্বয়ের মধ্যে যে সাংখ্যমতই প্রাচীনতর তাহাও অস্বীকার করা যায় বলিয়া মনে হয় না। কারণ যাঁহারাই creation-এর অর্থে সৃজ্-ধাতুর ব্যবহার করিয়াছেন তাঁহারাই যে সংকার্যবাদী অর্থাৎ সাংখ্য তাহা অবশ্য স্বীকার্য। এই সকল কারণে মনে হয় যে সাংখ্যমত অতি প্রাচীন; কিন্তু সেই জন্যই সাংখ্য-শাস্ত্রের সংরক্ষিত প্রাচীনতম গ্রন্থ সাংখ্যকারিকাও যে সুপ্রাচীন তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না, বিশেষ ইহা যখন এমন একটি ছন্দে রচিত যাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত-ছন্দের অনুকরণে গঠিত।

সাংখ্যের পরিভাষা এক বিষম সমস্যা। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে "গুণ" কথাটি সাংখ্যশাস্ত্রে attribute অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? আমার মনে হয় constituent অর্থে। "প্রতিনিয়ত" কথাটির কোন অনুবাদ করা হয় নাই, এবং বাঙ্গালায় ইহার প্রতিশব্দ দেওয়া যায় বলিয়াও মনে হয় না, কারণ আমার বিশ্বাস ইহার প্রকৃত অর্থ dialectical antithesis। সাংখ্যশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে বলিতে চাই, Goldstuecker-এর পাণিনির উপর গ্রন্থের যে কোন প্রতিবাদ হয় নাই তাহা ঠিক নহে—না হইলে বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার হইত, কারণ বইটি বাস্তবিকই আগাগোড়া ভুলে পরিপূর্ণ। Goldstuecker-এর বই বাহির হওয়ার কয়েক মাস পরেই Weber তাঁহার Indische Studien-এ এই পুস্তকের দুইশত পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির করেন; Goldstuecker তাহার কোন উত্তরও দিতে পারেন নাই।

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

The Principles of Art—by R. G. Collingwood.
(The Clarendon Press)

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং" নামক ফাঁড়াটি অনেক গ্রন্থকারের কপালে লেখা থাকে। আধুনিক পাঠকের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা বহু পুঁথি হজম করতে চায়। এজন্যই গ্রন্থকারেরা তাঁদের ললাটলেখা সব সময় এড়াতে পারেন না। আর্ট সম্বন্ধে যাঁরা বই লেখেন, তাঁদের এ বিষয়ে ভাগ্যবিপর্য্যয় অস্বাভাবিক নয়। আর্টের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা আর্টের মতন স্বচ্ছ ও সুন্দর হবে। ইতিহাসে প্লেটোর আবির্ভাবের পর আর্টের বর্ণনায় অস্বচ্ছতা একটি অমার্জনীয় দোষ বলে গণ্য হওয়া উচিত।

আলোচ্য পুস্তকের রচয়িতা Collingwood পনরটি অধ্যায়ে নিজের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের অধিকাংশ স্থানে তিনি দর্শনের কচ্‌কচানি নিয়ে চুলচেরা বিচার করেছেন। এ সব জায়গায় অবশ্য আর্টের নৈসর্গিক স্বচ্ছতা একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্য্য চুটিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে শেষের দুটি অধ্যায়ে। এখানেই গ্রন্থকার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি মনোজ্ঞ ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানেই তিনি ব্যক্ত করেছেন সেই কথা "যে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।"

"Art must be prophetic. The artist must prophesy not in the sense that he foretells things to come, but in the sense that he tells his audience, at the risk of their displeasure, the secrets of their hearts. His business as an artist is to speak out, to make a clean breast. As spokesman of his community, the secrets he must utter are theirs. For the evils which must come from ignorance the poet as prophet suggests no remedy, because he has already given one. The remedy is the poem itself. Art is the community's medicine for the worst disease of the mind, the corruption of consciousness."

গ্রন্থকারের মতে চেতনার কতকগুলি ব্যাধি আছে। ব্যাধির দ্বারা চেতনার স্বভাবজ নির্ম্মলতা বিপন্ন হয়। অবদমন, অভিক্ষেপ ও বিষঙ্গ চেতনাকে পীড়িত করে। এই ত্রিতাপক্লিষ্ট চেতনার অব্যর্থ ভেষজ হচ্ছে আর্ট। এখানে গ্রন্থকার আর্টের ব্যাখ্যায় মনোবিশ্লেষণতত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে,

এ রোগের ওষুধ আর্ট কি করে হবে? আত্মপরীক্ষা আর্টের চেয়ে ফলপ্রদ নয় কী? আত্মপরীক্ষার বাহ্যিক অভিব্যক্তি নেই। এটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। সমষ্টির কল্যাণ এতে সাধিত হ'তে পারে না। আর একটা আপত্তি হচ্ছে এই যে আত্মপরীক্ষা একটা অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। সে ক্ষেত্রে রোগের চেয়ে ওষুধ অধিকতর বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যায় Aristotle বর্ণিত Katharsis তত্ত্বের প্রভাব খুব অস্পষ্ট নয়। আর্টের একটা বিক্ষেপশক্তি আছে এবং এই শক্তির প্রভাবে চৈতন্যের মলিনতাবোধ ভস্মসাৎ হয়ে যায়।

গ্রন্থকার বলেন :—

"This corruption of consciousness has already been described by psychologists in their own way; the disowning of experiences they call repression; the ascription of these to other persons, projection; the consolidation under a mass of experience, homogeneous in itself, dissociation".

যদি কেউ ভাবেন যে এই মতবাদ মেনে নিলে বর্ত্তমান যুগে আর্ট ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াবে, তা'হলে তাঁর আশঙ্কা নেহাৎ অমূলক হবে না। ম্যাথু আর্নল্ড যেমন বলেছিলেন যে কবিতা ধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করবে, তেমন আর্টের সমজদাররা ঘুরিয়ে বলতে চান যে আর্ট কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অধিকারভ্রষ্ট হবে। কিন্তু যত দিন আর্ট ধর্ম্মের আদর্শবাদকে নিজস্ব বলে অঙ্গীকার না করে, ততদিন পর্য্যন্ত আর্ট এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারবে না। যদি ধর্ম্মের আদর্শবাদ আর্টের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তাহলে ধর্ম্মের পরাজয় জয়েরই নামান্তর বলে প্রতীত হবে। আর এই পরাজয়ই হবে ধার্ম্মিকের সান্ত্বনা। গ্রন্থকারের আর্টতত্ত্ব সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও চিত্রবিদ্যায় বাস্তবপ্রিয়তা সমর্থন করে। আর্টের আসরে ন্যাকামি কল্কে পায় না। তবে একথা মনে রাখা উচিত যে বিচ্ছিন্নতায় কোন সৌন্দর্য্য নেই। অংশকে সমগ্রের আলোকে দেখতে হবে। এই বিশালদৃষ্টি নিয়ে দেখলে আপত্তিজনক কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। জীবনের কোনও একটা দিক যখন আমরা বিচ্ছিন্নভাবে দেখি, তখন নানা বিঘ্ন ও আপত্তি এসে সৌন্দর্য্যের আত্মপ্রকাশ কষ্টসাধ্য করে তোলে। অল্পকে

যখন অল্প হিসাবে দেখি, তখন সৌন্দর্য্যহানি হয়। অল্পকে যখন ভূমার অচ্ছেদ্য অংশরূপে দেখি, তখন সৌন্দর্য্য স্বতঃ স্ফুরিত হতে থাকে। খণ্ডের কদর্য্যতা ও অখণ্ডের লালিত্য আর্টের মূলমন্ত্র।

গোড়ার কথা হচ্ছে, আর্ট কাকে বলবো? গ্রন্থকার বলেন যে আর্টের স্বরূপ বুঝতে হলে, আর্টের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। আর বুঝতে হবে আর্ট ও আর্টের সমশ্রেণীর বিষয়গুলির মধ্যে পার্থক্য কোথায়।

"The palaeolithic paintings are not works of art, however much they may resemble them; what matters is the purpose and the purpose is different....The potraits of ancient Egyptian sculpture were not designed for exhibition and contemplation".

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যেন art ও craft এক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু বিশ্লেষণের পর বোঝা যাবে যে আর্ট ও ক্রাফ্‌টের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ আছে।

"Art as such does not imply the distinction between planning and execution...We next come to the distinction between raw material and finished product. Does this exist in art proper?···In every work there is something which may be called form···But it does not follow that there is a distinction between form and matter...That distinction does exist in artifacts...None of these statements applies to a work of art".

গ্রন্থকার ম্যাজিক সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এখানে অবশ্য ম্যাজিক মানে ভেল্কি কিংবা ইন্দ্রজাল নয়। নৃতত্ত্বে ম্যাজিক শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেই অর্থে ম্যাজিকের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন যে ধর্ম্মসম্পৃক্ত অনেক সংস্কারে ম্যাজিকের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে গ্রন্থকার ও নৃতত্ত্ববিদ্‌ Marett-এর সঙ্গে অনেক সামঞ্জস্য ও বৈষম্য আছে। গ্রন্থকারের মতে—

"Magical activity is a kind of dynamo supplying the mechanism of practical life with the emotional current that drives it. Hence magic is a necessity for every sort and condition of man, and is actually found in every healthy society."

গ্রন্থকার এই প্রসঙ্গে amusement সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে

আলোচনা করেছেন। একদিকে ম্যাজিক ও amusement অপর দিকে আর্টের পার্থক্য নির্দ্দেশ করতে গিয়ে গ্রন্থকার বলেছেন "While magic is utilitarian, amusement is not utilitarian but hedonistic. The work of art, so called, which provides the amusement, is, on the contrary, strictly utilitarian. Unlike a work of art proper, it has no value in itself. It is simply a means to an end."

আর্টের আসল প্রশ্ন হচ্ছে সৌন্দর্য্যতত্ত্ব নিয়ে। 'সুন্দর' শব্দটির অর্থ কি ?

"To call a thing beautiful in Greek, whether ordinary or philosophical Greek, is simply to call it admirable, or excellent or desirable."

সৌন্দর্য্যানুভূতি স্বতঃস্ফুরিত হয়ে থাকে। এই অনুভূতি বিষয়সাপেক্ষ নয়। এই অর্থে সৌন্দর্য্যানুভূতি স্বরাট্। এই অনুভূতির একটা প্রণিধানযোগ্য স্বাতন্ত্র্য আছে। এই স্বাতন্ত্র্যের মহিমাই সৌন্দর্য্যানুভূতির গৌরব বৃদ্ধি করে।

"The aesthetic experience is an autonomous activity. It arises from within; it is not a specific re-action to a stimulus proceeding from a specific type of external object."

অনুভূতি হিসাবে সৌন্দর্য্যানুভূতির স্বাতন্ত্র্য মেনে নিলেই যে বিষয়ের নিষ্ক্রিয়তা সিদ্ধ হবে, তা নয়। এ ক্ষেত্রে বিষয়েরও একটি কার্য্যকারিতা আছে। সৌন্দর্য্যানুভূতির স্বতঃস্ফুরণ যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অনুভূতির উৎস সময় সময় শুকিয়ে যায় কেন ? আবার সময় বিশেষে কেনই বা সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রবল বন্যার মতন হৃদয়ের কূল ছাপিয়ে দেয় ? খাঁটি সত্য হচ্ছে এই যে সৌন্দর্য্যানুভূতি একেবারে বিষয়নিরপেক্ষ নয়। একটি ব্যক্তি বা বস্তুর দ্বারা বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে। আকর্ষণের এই প্রকারভেদ ব্যক্তির বা বস্তুর মোহিনী শক্তির অভাব সূচনা করে না।

দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রন্থকার আর্টের সমালোচনা করেছেন। এ বিষয়ে Walter Pater কিংবা Tolstoy-এর সঙ্গে গ্রন্থকারের কোন মিল নেই। কিন্তু Bosanquet প্রমুখ লেখকদের সঙ্গে গ্রন্থকারের তুলনা হতে পারে। গ্রন্থের দুয়েক জায়গায় তিনি Bosanquet-এর বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন।

কিন্তু গ্রন্থকারের দার্শনিক মত জায়গায় জায়গায় দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। অস্বচ্ছতা ও চিন্তার গভীরতা এক জিনিষ নয়। তিনি Descartes, Locke, Berkeley, Hume, Leibnitz, ও Kant-এর মতবাদ আলোচনা করেছেন এবং তাঁর আলোচনায় যথেষ্ট নূতনত্ব আছে।

ভ্রম সম্বন্ধে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য। সত্য ও মিথ্যা প্রতিজ্ঞা-সাপেক্ষ। ঋত বা অনৃত বিষয়ে নিহিত নেই। বিষয় চিন্তার উপাদান ছাড়া আর কিছু নয়। বিষয়ের উপলব্ধিতে যখন অসামঞ্জস্য দেখা যায়, তখনই সত্য ও মিথ্যার প্রশ্ন ওঠে। তবে এই অসামঞ্জস্য ধরবার উপায় কি? এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার কোন বিচার করেন নি। ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে ভ্রমহীন সন্নিকর্ষ স্থাপন করা একটি অন্যতম উপায়। সন্নিকর্ষ যে ভ্রমহীন হয়েছে, তাই বা জানবো কি করে? ভাবনাত্মক তথ্যের প্রমাণ অনেক সময় কার্য্যকারিতায় খুঁজতে হয়। আর কার্য্যকারিতা উপলব্ধ হয়, ভাবনার দ্বারা। এই দুষ্ট চক্রের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা নিয়তই ঘুরপাক খাচ্ছে।

বর্ত্তমান যুগে সভ্য মানুষের বিক্ষিপ্ত মন আর্টে সান্ত্বনা খুঁজবে। আর্টের এই সুসমাচার গোড়াতেই ব্যক্ত করা হয়েছে। ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে আবহমানকাল থেকে অনেক বৈদ্যই অনেক রকম ওষুধের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু মানব তো চিররুগ্ন। হালে তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে। সুস্থ হবার ইচ্ছাও লোপ পেয়েছে। আর্ট যদি উন্মত্ত ও ব্যাধিত জগৎকে স্বাস্থ্য দান করতে পারে, তাহলে তত্র কা পরিদেবনা?

শ্রীআশানন্দ নাগ

Tumbling in the Hay—by Oliver St. John Gogarty.
(Constable)

বইখানির মলাটে এর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, বইখানিতে একটি যুগবিশেষের নাগরিক জীবনের চিত্র পাওয়া যাবে। বইখানির শেষে গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন, এই চিত্র বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ডাবলিনের।

গ্রন্থকার একজন অস্ত্রচিকিৎসক। তাঁর জন্ম এবং বাস আয়ারল্যাণ্ডে।

কয়েকজন চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে বইখানি গড়ে উঠেছে। আখ্যায়িকার দিক থেকে বইখানি যে খুব চিত্তাকর্ষক তা বলা যায় না। একটি ছাত্রের মেডিক্যাল স্কুলে ভর্ত্তি হওয়া থেকে সেখানে তার পাঠ শেষ পর্য্যন্ত কতকগুলি ঘটনার সমাবেশে বইখানি লেখা হয়েছে। এই ঘটনাগুলির পরস্পরের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, এগুলির একমাত্র যোগসূত্র ঐ ছাত্রটি। তার খেলা ধূলা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তার ইয়ারকি ও ফাজলামি, শিক্ষকদের বিষয়ে তার মতামত ও তাঁদের সঙ্গে তার সম্পর্ক—এই সমস্ত হ'ল বইখানির উপাদান।

এই সব উপাদানের সুনিপুণ সংমিশ্রণে যে রস সৃষ্টি হয়, সে রসের অভাব এ গ্রন্থে মোটেই নাই। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বইখানির মধ্যে একটি আনন্দের প্রবাহ বর্ত্তমান। বইখানি পড়তে পড়তে চার্বাকের দর্শনের কথা মনে পড়ে। 'যাবজ্জীবেৎ সুখং পিবেৎ'—এই নীতিকে ভিত্তি করেই যেন বইখানি লেখা হয়েছে।

চার্বাকের এই দর্শনের সঙ্গে গ্রন্থকারের যে বিশেষ সহানুভূতি আছে তা বোধহয় এক রকম নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে। আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রসিদ্ধ শিল্পী অগাষ্টস জনের নামে উৎসর্গীকৃত। এই উৎসর্গ পত্র থেকেও গ্রন্থকারের চার্বাক-দর্শন-প্রীতি প্রতিপন্ন হয়। উৎসর্গ-পত্রে লেখা হয়েছে—"Dedication to Augustus John. To you, Augustus, with your 'Don't be afraid of life"। এই সহানুভূতির পরিচয় আমরা গ্রন্থকারের আর একখানা বই থেকেও পাই। সে বইখানির নাম As I was walking down Sackville Street। এই বইখানি অনেকটা আত্মজীবনী গোছের। এখানিতে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যায় যে আইরিশ বিপ্লবের অনেক ঘটনা ও অনেক চরিত্রের প্রতি গ্রন্থকারের সহানুভূতি ছিল না, প্রধানতঃ এই কারণে যে এই বিপ্লব ধনী এবং সৌখীন লোকদের জীবনের সচ্ছন্দ এবং সুখাবহ গতিতে বাধা দান করেছিল।

কিন্তু শুধু মদ খেয়ে, পরিহাস ও প্রেম করে কি জীবন কাটান যায়? জীবনকে এমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে কাটান কি সম্ভব? "হেঁসে নেও দুদিন বইত না"—এই দর্শন অবলম্বন করে কজন জীবন যাপন করতে পারে?

ছাত্রাবস্থায় উদ্বেগশূন্য আনন্দের অবসর আছে বটে, কিন্তু এ আনন্দেরও একটা সীমা আছে এবং সকলের পক্ষে এ আনন্দ বেশীকাল উপভোগ করা সম্ভব নয়। এ কথা অস্বীকার করলে চল্‌বে না যে, সুখদুঃখ, হাসি-কান্না—সকলের জীবনেই এ দুয়েরই স্থান আছে। কাজেই আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন, তা একেবারে অপ্রকৃত না হলেও অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। এ চিত্রকে প্রকৃত জীবনের চিত্র বলে স্বীকার করতে হ'লে দুঃখের এবং গাম্ভীর্য্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হয়।

শ্রীদর্শন শর্ম্মা

The Present Condition of India—by Leonard M. Schiff, (Quality Press).

রেভারেণ্ড লেনার্ড শিফ্ জীবন কাটিয়েছেন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম নিয়ে—তিনি ছিলেন Birmingham Theological College-এর Vice Principal ; কিছুদিন লণ্ডনে পৌরহিত্য করেছিলেন ; তারপর দশ বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই লেখার দাবী তাঁর যথেষ্ট র'য়েছে—অভিজ্ঞতা, সুযোগ, দৃষ্টি-শক্তি এবং সব-চেয়ে বড় কথা, দরদ—একাধারে সবগুলির এমন সমন্বয় বড় বিরল।

আলোচ্য বইখানি ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত—"কিষাণ", "মজ্‌দুর", "বাবু", "রাজা", "সাহিব" এবং "মঝব্"। উপসংহারে আছে একখানি খোলা-চিঠি—ইংরেজ-সাধারণকে লেখা ; তাতে লেখক দেখিয়েছেন যে কৃষ্টি, সমাজ, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিক দিয়ে ইংলণ্ড ও ভারত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এবং সুভাষচন্দ্র বসুর কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন যে যারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তারা-ই ইংরেজ-সাধারণের প্রকৃত বন্ধু কারণ ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ঐখানেই। এ সংগ্রাম শুধু ভারতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, বিশ্বমানবের কল্যাণ এর উদ্দেশ্য এবং পরিণাম।

"কিষাণ" অধ্যায়টি যেন পল্লীজীবনের প্রতিচ্ছবি। যে-দেশে দুর্ভিক্ষ ও মড়কের চেয়ে-ও বেশী লোক মরে অন্নাভাবে, যে-দেশে মানুষের আয়ু মাত্র ২২ বছর (ইংলণ্ডে ৪৬), যে-দেশে সাড়ে-পনেরো-আনা লোকের পক্ষে বেঁচে-থাকা মানে কোনও মতে টি*কে থাকা, তার-ই ভেতর থেকে নিরন্ন, নিরক্ষর কিষাণ-সম্প্রদায়ের "splendid specimens of humanity" গ্রন্থকারের চিত্তাকর্ষণ করেছে। তাদের অভাব-ক্লিষ্ট জীবনের করুণ কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, তার কারণ অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন না হলে, জোড়াতালি দিয়ে এ-সমস্যার সমাধান অসম্ভব। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষা শস্যোৎপাদন করলো; জমিদারের খাজনা আর মহাজনের ডিক্রীর দায়ে ধান আর তার ঘরে উঠল না। অথচ বছর বছর দেনার অঙ্ক বেড়েই চলল। ভারতবর্ষে চাষের উন্নতি হয় না, চাষা কৃষিবিদ্যা জানে না, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীর ধার ধারে না—এই ধরণের মামুলি যুক্তির উত্তরে লেখক দেখিয়েছেন, Agricultural Commission Report থেকে, "the peasant is as efficient as any in the world * * agricultural experts have found it no easy matter to suggest improvements"। পরামর্শ কেউ চায় না; চায় ব্যবস্থা। ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ষোলটি ক্ষেতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। অবশিষ্ট ক্ষেতগুলির ব্যবস্থা করে কে? লেখকের মঁতে আসল কথা এ-দেশে চাষের উন্নতি চাষীর হাতে নয়; দ্বিতীয়তঃ চাষের উন্নতি হ'লেও চাষীর দুর্দ্দশা ঘুচবে না যতদিন পর্য্যন্ত না সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিভাগ ঢেলে-সাজা হচ্ছে।

চাষীর বর্ত্তমান দুরবস্থা—মহাজন, জমিদার, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, খরিদ-বিক্রীর ব্যবস্থার অভাব, ইংরেজ-রাজত্বে কুটীর-শিল্পের অপমৃত্যু, রেল, ম্যালেরিয়া ও আদালতের প্রকোপ—ইত্যাদি যাবতীয় সমস্যা আলোচনা ক'রে গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে কিষাণ-আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভরসা—রাশিয়ার মতন ভারতবর্ষ-ও economic plan করতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রধান আশঙ্কা—"What will the vested interest do? What will England do?"

“মজদুর” অধ্যায়ে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন ধনিক-তন্ত্রতা কতদূর নিষ্ঠুর ও স্বার্থান্ধ হ’তে পারে—“Indian Capitalism has always seemed to be at its worst and it was in a way decadent before it had ever time to develop”। শ্রমিক এ-দেশে নিঃসহায়, নিরক্ষর; শ্রমিকের কল্যাণ-কামনা বা উন্নতির চেষ্টা গুরুতর রাজনৈতিক অপরাধের নামান্তর; ধনিকের প্রধান সহায় পুলিশ এবং স্বয়ং সরকার বাহাদুর। এই সব দেখে গ্রন্থকার বলেছেন ভারতবর্ষ হচ্ছে “paradise for the exploiter”। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক পর্য্যন্ত এ অমরাপুরীতে আইনের কণ্টকটি-ও ছিল না; নিষ্পেষণের পথ ছিল যেমন প্রশস্ত তেমনি অবাধ। ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯১১ এবং ১৯২১-২২ সালের Factories Act-এর ফলে এ-বিষয়ে কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু তা-ও যথেষ্ট নয়। তবে, একটা শুভ লক্ষণ এই যে গত বিশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে ভাল ভাল শ্রমিক সংগঠন তৈরী হয়ে উঠেছে এবং জাতীয় কংগ্রেসের সাহায্যে ক্রমশঃই সেগুলি শক্তিমান হচ্ছে। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যে-ও আবার এ-বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, সুতরাং শ্রমিকের আশা ভরসা পূর্ণ হবে তখনই যখন তাদের মধ্যে থেকে বেন্ টিলেট্স্ এবং টম্ ম্যান্স্-এর মতন দলপতির আবির্ভাব হবে।

“বাবু” অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে এই সম্প্রদায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে হ’ল জমিদারের জন্ম; মেকলে-র কল্যাণে অল্পদিনের মধ্যেই তৈরী হয়ে উঠল সস্তাদরে কেরাণীর জাত; বাঙ্গালী তার অগ্রণী। ঠগী দমন হ’ল, দেশে শৃঙ্খলা দেখা গেল; পাশ করতে পারলে-ই বড়ো সাহেবের কেরাণী হওয়ার সাধ পূর্ণ হ’তে লাগলো। আর কি চাই? তখনো দেশ বোঝেনি কোথায় ঘুণ ধরেছে। তারপর এলো ভারতের জাতীয় জীবনে এক নব-জাগরণের যুগ—সাহিত্যে বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ; রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গ-বিচ্ছেদ থেকে আরম্ভ ক’রে, এখনো পর্য্যন্ত যে-অবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম চলেছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী, তার নেতা এবং সৈনিক অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর।

এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইত্যাদি দেশ নেতার আদর্শ ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করেছেন কিন্তু

চরিত্রাঙ্কনে তিনি পটুতার পরিচয় দেন নি। তাঁর মতে সুভাষচন্দ্র বসু "is not easy to characterise * * he has called himself a Socialist but one suspects that in many ways he is a little muddled"। এ-রকম অমূলক সন্দেহের কারণ বা সমর্থনকারী কোনও যুক্তি পাঠককে জানানো হয়নি।

কংগ্রেসের প্রতি লেখকের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তিনি দেখিয়েছেন, যে-অনুষ্ঠান প্রথমে ছিল কেবল মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সখের জিনিস, আজ তা' ভারতীয় জন-সাধারণের। ৩৫ লক্ষ্য সভ্য—এত বড় ব্যাপার পৃথিবীতে কোথাও নেই।

"রাজা" অধ্যায়ে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন কেমন ক'রে ইংরেজ সরকারের স্নেহচ্ছায়ায় পুষ্ট ৫৬১ জন স্বাধীন রাজা স্বেচ্ছাচারিতার মৌরসীপাট্টা বংশানুক্রমে ভোগদখল করছেন। প্রজার ওপর তাঁদের প্রভুত্ব আছে, দায়িত্ব নেই। Mysore ইত্যাদি কয়েকটি রাজত্বের শাসন প্রণালীর প্রশংসা আছে। কিন্তু মোটের উপর সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক উন্নতির পথে স্বাধীন রাজন্যবর্গ যে এক দুরূহ সমস্যা সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

চতুর্থ অধ্যায়—"সাহিব"। সেকালের ইংরেজদের মধ্যে অনেকেরই ভারতবর্ষের প্রতি দরদ ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে গ্রন্থকারের মতে "The Government became partisan, selfish and hostile to Indian aspirations"। তারপর থেকে "sun-dried bureau crat"-দের দাপটে ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বাড়তে লাগল। সরকারি সাহেবদের উঁচু মাহিনা জোগানো গরীব দেশের সাধ্যাতীত। কিন্তু "Rolls-Royce administration in a bullock-cart country" অবাধে চলতে লাগলো।

মিশনারি সাহেবদের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজ চরিত্রবলে ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করেছেন, কিন্তু সকলে সে শ্রেণীর নন। দম্ভ, সঙ্কীর্ণতা এবং "theocratic Imperialism" বিসর্জ্জন দিতে না পারলে, ধর্ম্ম-প্রচার অর্থহীন আড়ম্বর। যীশুখৃষ্টের আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে, মুখে তাঁর ধর্ম্মপ্রচার কপটাচার মাত্র।

"মঝব্" (ধর্ম্ম) অধ্যায়ে হিন্দু বা মুস্লিম ধর্ম্মের তত্ত্বকথা বিশেষ কিছু নেই। সমাজ ও রাজনীতির দিক দিয়ে উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ আলোচিত হয়েছে। হিন্দু ধর্ম্ম—হিন্দু কাল্চার—অসংখ্য মতবাদকে একত্র গ্রথিত করেছে বিনা-সুতোর মালার মতন। বৈষম্য আছে কিন্তু বিবাদ নেই কারণ সেই আবহমান "একের" কাছে "অনেক" করেছে আত্ম-সমর্পণ। হিন্দু-মুস্লিম গঙ্গা-যমুনার সমাবেশে ভারতবর্ষে যে-কাল্চার গড়ে উঠেছে, তা পাশ্চাত্য জাতীয়তার থেকে স্বতন্ত্র। ভারতবাসীর কাছে তার দেশ কেবল ভূ-খণ্ড নয় "but a single though immense organism filled with the tide of one pulsating life from end to end."

বর্ত্তমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধের সূত্রপাত ধর্ম্ম নয়, স্বার্থান্ধতার মধ্যে, তার ইন্ধনের আয়োজন প্রথম থেকেই ইংরেজের সাধনা। Asiatic Journal, 1821 এবং Lieutenant Coke-এর লেখা উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে "Divide and rule" এই হ'ল ব্রিটিশ শাসনের মূলসূত্র।

উপসংহারে একখানি খোলা-চিঠিতে ইংরেজ-সাধারণের প্রতি লেখকের নিবেদন এই যে ভারতবর্ষের ইতিহাস (সত্যি ইতিহাস) পড়লে তাঁরা এমন কথা জানতে পারবেন যাতে তাঁদের লজ্জায় মুখ নীচু হয়ে যাবে। "It is no good saying that our hands are clean, because they are not and only a fool or a knave will try to say so"। ইংরাজ-সাধারণ ভারতবর্ষের কোনও খবর জানে না। কেবল সংবাদ-পত্রের মারফৎ সময়ে-অসময়ে হিন্দু-মুস্লিম দাঙ্গা, পর্দ্দা, জাতিভেদ এবং ইংরেজ-শাসনের মহিমার সমাচার পেয়ে থাকে। গ্রন্থকারের আন্তরিক বিশ্বাস ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে সহজ আদান-প্রদান অসম্ভব যতো দিন পর্য্যন্ত না ইংরেজ ভারতবাসীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শিখবে।

তাঁর মতে প্রধান দরকার ইংলণ্ডের স্কুলপাঠ্য পুস্তকের সংস্কার—"impartial teaching of Indian history"। আর-ও দরকার ভারতীয় সাধনা ও কৃষ্টির অনুশীলনের জন্য ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থা। ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয় সাধারণের প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন তাঁরা যেন মনে রাখেন যে তাঁরা প্রত্যেকে-ই "unofficial ambassadors"। সে এক যুগ ছিল, যখন ট্রিনিটি-র ছাত্ররা

বলতো "Balliol ! Balliol ! bring out your black men"। তার তুলনাতে এখন ভারতীয় ছাত্রকে ইংরেজ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লেনার্ড শিফের বইখানিতে ভারতের যে-পরিচয় রয়েছে, তাতে ইংরেজ পাঠকের যথেষ্ট উপকার হবে আশা করা যায়। তিনি নিরপেক্ষভাবে সত্যি কথা সহজ ক'রে বলতে চেয়েছেন। তাঁর চেষ্টা সার্থক হয়েছে। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে তিনি কতো ভালবাসেন, তার পরিচয় পুঁথির পাতায় জানানো সম্ভব হয় নি এই তাঁর দুঃখ। তাঁর আন্তরিক বিশ্বাস "our attitude to India could become a turning point in world history"। দেড় শ' বছর পূর্ব্বে এই ধরণের কথা বলেছিলেন একজন মনীষী ইংরেজ—উইলিয়াম উইল্‌বার্‌ফোর্স।

শ্রীগেব্রিয়েল্ লামণ্ট্
শ্রীঅনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্য—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী (ভারতী-ভবন) মূল্য—১৲

উপরোক্ত পুস্তিকাখানির লেখক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী। আমি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রের এ জাতীয় লেখার যে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতে দ্বিধা করিনে তার প্রমাণ "পরিচয়" পত্রের মারফৎ ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি। এর কারণ—যে বিষয়ের তিনি আলোচনা করেন, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট জ্ঞান না থাকলেও যথেষ্ট কৌতূহল আছে। আমার কৌতূহল প্রবোধচন্দ্রের লেখা পড়ে চরিতার্থ হয়।

শ্রীযুক্ত প্রবোচন্দ্র বিলেতি-দস্তুর পণ্ডিত—ইংরাজীতে যাকে বলে scholar; সুতরাং তাঁর বর্ণিত facts সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। উপরন্তু অতীত হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি আছে, যা কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নেই। প্রবোধচন্দ্র যে কতদূর সুলেখক তার পরিচয় এই বৌদ্ধধর্ম্মের পুস্তিকার প্রথম অধ্যায় পড়লেই পাবেন। এ সব ক্ষেত্রে আমি তাকেই সুলেখক বলি, যিনি বহু facts আয়ত্ত করে সেগুলি সংক্ষেপে অথচ সুখপাঠ্য করে লিখতে পারেন।

পণ্ডিতের জন্য পণ্ডিতের লেখা স্বতন্ত্রজাতীয়। উক্ত পুস্তিকার প্রথম অধ্যায় আমার মতে চমৎকার। Facts-এর স্তূপ থেকে কোন্‌টি রাখতে হবে আর কোন্‌টি বাদ দিতে হবে সে জানা না থাক্‌লে বিরাট বৌদ্ধক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত মানচিত্র আঁকা যায় না। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র এই বিপুল বৌদ্ধ-ক্ষেত্রে বিচরণ করে বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি পরিচ্ছিন্ন অথচ পূর্ণাঙ্গ মূর্ত্তি খাড়া করেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র এশিয়ার নানা ভাষায় লিপিবদ্ধ। এসব ভাষার মধ্যে কোন্ ভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র প্রথম লেখা হয়, সে কথা আমাদের জানা দরকার। Rhys Davids প্রমুখ ইংরেজ পণ্ডিতরা বলেছেন যে, পালি ভাষাতেই আদি বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয়। এ মত আমি কস্মিনকালেও প্রসন্ন মনে গ্রাহ্য করতে পারিনি। দেখে খুসি হলুম যে, প্রবোধচন্দ্র বলেছেন এ মত প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। এবং সম্ভবতঃ প্রাচীন মাগধী প্রাকৃতেই আদি বৌদ্ধশাস্ত্র লিখিত হয়। তারপর সকলেই জানেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত—হীনযান ও মহাযান। এই মহাযান শাস্ত্রের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এবং ভারতবর্ষে এই শাস্ত্রই বহু দিন প্রভুত্ব করেছিল। এমন কি, বর্ত্তমান বাঙ্গলায় যে ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম নামে প্রচলিত, সে ধর্ম্ম মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মেরই রূপান্তর মাত্র। হীনযান যে আদি বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচায়ক, ও মহাযান তার বিকারমাত্র, একথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না।

প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, হীনযান আর মহাযান উভয়মতই ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত ; সুতরাং এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি আগে ও কোন্‌টি পরে, তা' নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৌদ্ধধর্ম্মের মতামতের মূলসূত্রগুলির সাক্ষাৎ এ উভয় শাস্ত্রেই মেলে। এর থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যোগসূত্র বিদ্যমান। প্রবোধচন্দ্র এই মূল সূত্রগুলির পরিচয় দিয়েছেন। এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির ব্যাখ্যা করেছেন ; যার ফলে আমরা সেই মূল সূত্রগুলি সহজে বুঝতে পারি। এই মূল সূত্রগুলি তথাকথিত বুদ্ধবচন হতে সংগৃহীত। আর এই বুদ্ধবচনের ভিত্তির উপরেই কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরাট সৌধ গড়ে' উঠেছে।

পৌরুষেয় ধর্ম্মমাত্রেই তার প্রবর্ত্তক মহাপুরুষের বাণীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টধর্ম্মও খৃষ্টবচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, বৌদ্ধধর্ম্মও বুদ্ধবচনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং এই মূল সূত্রগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রবোধচন্দ্রের পুস্তিকা সেই সূত্রগুলির সঙ্গে আমাদের সহজেই পরিচয় করিয়ে দেয়।

পৃথিবীর ধর্ম্মগুরুরা ভক্তদের মতে সকলেই man-God—নর-নারায়ণ। যিশু খৃষ্টও তাই, বুদ্ধদেবও তাই। সুতরাং তাঁদের বাণী যুগপৎ লৌকিক ও লোকোত্তর—human and divine। তাই সে বাণী মানুষের সমগ্র মনকে স্পর্শ করে ও জাগ্রত করে।

পুরাকালে ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ লোক "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"—এই ক'টি বাক্য উচ্চারণ করে' বৌদ্ধ সম্প্রদায় ভুক্ত হতেন। এই পুস্তিকায় প্রবোধচন্দ্র বুদ্ধের জীবনচরিত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করেননি। সম্ভবতঃ একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকায় তিনি বুদ্ধের অপূর্ব্ব জীবনের পরিচয় দেবেন। সঙ্ঘ সম্বন্ধে তিনি বেশি কিছু বলেননি। ভিক্ষুসঙ্ঘের বিধিনিষেধের ফর্দ্দ দিলে, তা' পড়বার ধৈর্য্য আমাদের থাকৃত না। অবশ্য বিনয়পিটকে বিধিনিষেধ ছাড়া অসংখ্য চমৎকার গল্প আছে। সে সব গল্পের তিনি আলোচনা করেননি। তিনি কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম্মেরই ব্যাখ্যান করেছেন।

ধর্ম্মমাত্রেরই পৃষ্ঠপোষক একটি না একটি দর্শন থাকে। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই দর্শনের নাম অভিধর্ম্ম। প্রাচীন পালিগ্রন্থে শুনতে পাই এই অভিধর্ম্মের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। পরে অভিধর্ম্ম পিটক বলে' সে ভাষাতে একটি পিটক লিখিত হয়। আমাদের হিন্দু দার্শনিকরা এই বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এবং তার আলোচনা করেছেন। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য এ দর্শনকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা :—সৌতান্ত্রিক মত, বৈভাষিক মত, মাধ্যমিক মত ও যোগাচার। তাঁর পূর্ব্বে শঙ্কর তাঁর বেদান্তভাষ্যে সর্ব্বাস্তিবাদ, শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদ, এই তিন ভাগে বৌদ্ধদর্শনকে ভাগ করেছেন। তিনি সৌতান্ত্রিক ও বৈভাষিক মতকে বলেছেন সর্ব্বাস্তিবাদ। মাধ্যমিককে বলেছেন শূন্যবাদ এবং যোগাচারকে বিজ্ঞানবাদ। প্রবোধচন্দ্র এই দর্শনচতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন এবং সর্ব্বাস্তিবাদের পরেই যে মাধ্যমিক মত ও তার পরে যোগাচার ওরফে বিজ্ঞানবাদ উদ্ভূত হয়, তা' দেখিয়েছেন। এই বিজ্ঞানবাদের সঙ্গে শঙ্করের মায়াবাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। এই কারণেই

পূর্ব্বাচার্য্যেরা শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলে' অভিহিত করেছেন। বেদান্তের সার কথা হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা। জগত যে মিথ্যা, সে কথা বৌদ্ধরাও স্বীকার করেন ; জীবাত্মা জগতেরই অন্তর্ভূত, অর্থাৎ তার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এই অনাত্মবাদ বৌদ্ধদর্শনের মূল কথা। Cogito ergo sum—এ কথা বুদ্ধবচন নয়। Jung একখানি প্রসিদ্ধ বই লিখেছেন, যার নাম "In Search of a Soul।" বৌদ্ধদর্শন শেষকাণ্ডে, অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদে এই soul-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিল। সে দর্শন যাকে বলে আলয়-বিজ্ঞান, সে ব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মহাকবি ও মহাদার্শনিক অশ্বঘোষের মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্রের কোন পরিচয় দেননি। যদিচ এই গ্রন্থই বিজ্ঞানবাদের আদিগ্রন্থ। অশ্বঘোষ যাকে 'তথতা' বলেন, সে যে ব্রহ্মের নামান্তর মাত্র, সে বিষয় সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধমতে সবই ক্ষণভঙ্গুর ; কিছুই অবিনশ্বর নয়। গীতা বলেছেন ঃ—

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥

২য় অধ্যায়, ১৭ শ্লোক।

অশ্বঘোষের 'তথতা' এই অবিনশ্বর বস্তু।

প্রবোধচন্দ্র বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড এবং জ্ঞানকাণ্ডের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এ ধর্ম্মের ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে তিনি নীরব। এবং এ ধর্ম্মে ভক্তির অবশ্য বিশেষ স্থান ছিল। নচেৎ জনসাধারণ সানন্দে এ ধর্ম্ম অবলম্বন করত না। শুনতে পাই শূন্যবাদের আদিগুরু নাগার্জ্জুন মহাভক্ত ছিলেন। এঁর দার্শনিক মতকে শঙ্কর বৈনাশিক মত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, তার বিচার পর্য্যন্ত তিনি করেননি। সেই নাগার্জ্জুনই যে কি কারণে মহাভক্ত হয়েছিলেন, তার সন্ধান নেওয়া আবশ্যক। বৈষ্ণবরা বলেন যে "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।" নাগার্জ্জুন দেখিয়েছেন যে, তর্কে সার সত্যের নাগাল পাওয়া যায় না। নাগার্জ্জুন যে ভক্ত ছিলেন এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে তিনি ভক্তিমার্গে বিশ্বস্ত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন যে তান্ত্রিকধর্ম্মও মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম। তন্ত্রশাস্ত্র আমার কৌতূহলকে আকর্ষণ করে কিন্তু আমার মনকে স্পর্শ করে না। সুতরাং সে সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করতে আমি অধিকারী নই; অতএব সে সম্বন্ধে আমি নীরব থাকলুম।

সে যাই হোক, প্রবোধচন্দ্রের এই পুস্তিকা আমি শিক্ষিত পাঠকমাত্রকেই পড়তে অনুরোধ করি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল কর্ত্তৃক আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ১১, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত।